भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA

वर्ग संख्या B
Class No. 891.4405
पुस्तक संख्या
Book No. V5822
रा०पु०/ N.L. 38 V.1

MGIPK—11 LNLC/67—3-1-68—1,50,000

বঙ্গদর্শন।

প্রথম খণ্ড।

(১২৭৯ অব্দের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত।)

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

ভবানীপুর;

সাপ্তাহিক সংবাদ যন্ত্রে শ্রীব্রজমাধব বসু
কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

NATIONAL LIBRARY
NO G.3633
DATE 9-5-74
CALCUTTA

সূচিপত্র।

J. C. Mookherjee Gift.

বঙ্গদর্শন।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

১ম খণ্ড। ১লা বৈশাখ ১২৭৯। ১ সংখ্যা।

পত্র সূচনা।

[illegible]রা বাঙ্গালা [illegible] গ্রন্থ বা সাম-
পত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহা-
[illegible] বিশেষ দুরদৃষ্ট। তাঁহারা যত যত্ন
[illegible] না কেন, দেশীয় কৃতবিদ্য সম্প্রদায়
[illegible] তাঁহাদিগের রচনা পাঠে বিমুখ।
[illegible]প্রিয় কৃতবিদ্য[illegible]দের প্রায় স্থির-
আছে, [illegible] পাঠের যোগ্য
[illegible] বাঙ্গালা [illegible] লিখিত হইতে
[illegible] না। তাঁহাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা
[illegible] বিদ্যাবুদ্ধি-
[illegible] নয়ত ইং-
[illegible] হাদের বিশ্বাস
[illegible]হা কিছু [illegible] ভাষায় লিপিবদ্ধ
[illegible] নয়ত কোন
[illegible]রাজিতে যাহা আছে; তাহা আর বাঙ্গালায় পড়িয়া আত্মাবমাননার প্রয়োজন কি? সহজে কালো চামড়ার অপরাধে ধরা পড়িয়া আমরা নানা রূপ সাফাইয়ের চেষ্টায় বেড়াইতেছি, বাঙ্গালা পড়িয়া কবুলজবাব কেন দিব?

ইংরাজি ভক্তদিগের এই রূপ। সংস্কৃতজ্ঞ পাণ্ডিত্যাভিমানীদিগের "ভাষায়" যেরূপ শ্রদ্ধা তদ্বিষয়ে লিপিবাহুল্যের আবশ্যকতা নাই। যাঁহারা "বিষয়ী লোক" তাঁহাদিগের পক্ষে সকল ভাষাই সমান। কোন ভাষার বহি পড়িবার তাঁহাদের অবকাশ নাই। ছেলে স্কুলে দিয়াছেন, বহি পড়া আর নিমন্ত্রণ রাখার ভার ছেলের উপর। সুতরাং বাঙ্গালা গ্রন্থাদি এক্ষণে

কেবল নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্র, গ্রাম্য বি- লয়ের পণ্ডিত, অপ্রাপ্ত-বয়ঃ-পৌর-কন্যা, এবং কোনং নিষ্কর্ম্মা রসিকতা-ব্যবসায়ী পুরুষের কাছেই আদর পায়। কদাচিৎ দুই এক জন কৃতবিদ্য সদাশয় মহাত্মা বাঙ্গালা গ্রন্থের বিজ্ঞাপন বা ভূমিকা পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া বিদ্যোৎসাহী বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন।

লেখা পড়ার কথা দূরে থাক্, এখন নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কাজই বাঙ্গালায় হয় না। বিদ্যালোচনা ইংরাজিতে। সাধারণের কার্য্য, মিটিং, লেক্‌চর, এড্রেস, প্রোসিডিংস্, সমুদায় ইংরাজিতে। যদি উভয় পক্ষ ইংরাজি জানেন, তবে কথোপকথনও ইংরাজিতেই হয়, কখন ষোল আনা, কখন বার আনা, ইংরাজি। কথোপকথন যাহাই হউক, পত্র লেখা কখনই বাঙ্গালায় হয় না। আমরা কখন দেখি নাই, যে যেখানে উভয় পক্ষ ইংরাজীর কিছু জানেন, সেখানে বাঙ্গালায় পত্র লেখা হইয়াছে। আমাদিগের এমনও ভরসা আছে, যে অচোরে দুর্গোৎসবের মন্ত্রাদি ইংরাজিতে পঠিত হইবে।

ইহাতে কিছুই বিস্ময়ের বিষয় নাই। ইংরাজি একে রাজভাষা, অর্থোপার্জ্জনের ভাষা, তাহাতে আবার বহু বিদ্যার আধার, এক্ষণে আমাদের জ্ঞানোপার্জ্জনের এক মাত্র সোপান; এবং বাঙ্গালিরা তাহার আশৈশব অনুশীলন করিয়া দ্বিতীয় মাতৃ ভাষার স্থলভুক্ত করিয়াছেন। বিশেষ ইংরাজিতে না বলিলে ইংরাজে বুঝে না; ইংরাজে না বুঝিলে ইংরাজের নিকট মান মর্য্যাদা হয় না; ইংরাজের কাছে মান মর্য্যাদা না থাকিলে কোথাও

থাকে না, অ...
ইংরাজ যাহা না শুন...
দন; ইংরাজ যাহা ন...
ভস্মে ঘৃত।

আমরা ই...
নহি। ইহা ব...
হইতে এ দেশের লো...
হইয়াছে, ইংরাজি শি...
প্রধান। অনন্ত-রত্ন-প্র...
যার যত অনুশীলন হ...
আরও বলি, স...
গুলি সামাজিক কা...
ভাষাতেই সম্পন্ন হও...
আমাদিগের এমন অ...
আছে, ...
হইবে। সে সকল ক...
বক্তব্য। এমন অনেক ...
তাহা কেবল বাঙ্গালির জন্য নহে,
ভারতবর্ষ তাহার শ্রোতা হওয়া উ...
সে সকল কথা ইংরাজি...
মগ্র ভারত...
নানা জাতি...
দ্যোগী না হইলে, ভ...
নাই। এ...
একোদ্যম, ...
নীয়; কেননা এখন স...
বাঙ্গালি, মহারাষ্ট্রী ...
ইহাদিগের সা...
ভাষা ...
গ্রন্থি বাঁ...
ইংরাজি ...
চলুক। কি...
বসিলে চলিবে না। বা...
হইতে পারিবে না।

ইংরাজ অনেক গুণে গুণবান্, এবং অনেক সুখে সুখী; যদি এই তিন কোটি বাঙ্গালী হঠাৎ তিন কোটি ইংরাজ হইতে পারিত, তবে সে মন্দ ছিল না। কিন্তু তাহার কোন সম্ভাবনা নাই; আমরা যত ইংরাজি পড়ি, যত ইংরাজি কহি, বা যত ইংরাজি লিখি না কেন, ইংরাজি কেবল আমাদিগের মৃত সিংহের চর্ম্ম স্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময়ে ধরা পড়িব। পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরাজ ভিন্ন তিন কোটি সাহেব কখনই হইয়া উঠিবে না। গিল্টী পিতল হইতে খাঁটি রূপা ভাল। প্রস্তরময়ী সুন্দরী মূর্ত্তি অপেক্ষা, কুৎসিতা বন্যনারী জীবনযাত্রার সুসহায়। নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালি স্পৃহনীয়। ইংরাজি লেখক, ইংরাজি বাচক, সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন কখন খাঁটি বাঙ্গালির সমুদ্ভবের সম্ভাবনা নাই। যত দিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালিরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, ত দিন বাঙ্গালির উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।

এ কথা কৃতবিদ্য বাঙ্গালিরা কেন যে বুঝেন না, তাহা বলিতে পারি না। যে উক্তি ইংরাজিতে হয়, তাহা কয় জন বাঙ্গালির হৃদয়ঙ্গম হয়? সেই উক্তি বাঙ্গালায় হইলে কে তাহা হৃদয়ঙ্গত না করিতে পারে? যদি কেহ এমত মনে করেন, যে সুশিক্ষিতদিগের উক্তি কেবল সুশিক্ষিতদিগেরই বুঝা প্রয়োজন, সকলের জন্য সে সকল কথা নয়, তবে তাঁহারা বিশেষ ভ্রান্ত। সমগ্র বাঙ্গালির উন্নতি না হইলে দেশের কোন ... নাই। সমস্ত দেশের লোক ইংরাজি বুঝে না, কস্মিন কালে বুঝিবে, এমত প্রত্যাশা করা যায় না। কস্মিন কালে কোন বিদেশীয় রাজা দেশীয় ভাষার পরিবর্ত্তে আপন ভাষাকে সাধারণের বাচ্য ভাষা করিতে পারেন নাই। সুতরাং বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত না হইবে, তাহা তিন কোটি বাঙ্গালি কখন বুঝিবে না, বা শুনিবে না। এখনও শুনে না, ভবিষ্যতে কোন কালেও শুনিবে না। যে কথা দেশের সকল লোকে বুঝে না, বা শুনে না, সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

এক্ষণে একটা কথা উঠিয়াছে, এডুকেশন "ফিল্টর ডৌন্" করিবে। এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, কেবল উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা সুশিক্ষিত হইলেই হইল, অধঃশ্রেণীর লোকদিগকে পৃথক শিখাইবার প্রয়োজন নাই; তাহারা কাজে কাজেই বিদ্বান হইয়া উঠিবে। যেমন শোষক পদার্থের উপরি ভাগে জলসেক করিলেই নিম্নস্তর পর্য্যন্ত সিক্ত হয়, তেমনি বিদ্যারূপ জল, বাঙ্গালি জাতিরূপ শোষক-মৃত্তিকার উপরিস্তরে ঢালিলে, নিম্নস্তর অর্থাৎ ইতরলোক পর্য্যন্ত ভিজিয়া উঠিবে! জল থাকাতে কথাটা একটু গরস হইয়াছে বটে। ইংরাজি শিক্ষার সঙ্গে এরূপ জলযোগ না হইলে আমাদের দেশের উন্নতির এত ভরসা থাকিত না। জলও অগাধ, শোষকও অসংখ্য! এত কাল শুষ্ক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা দেশ উচ্ছিন্ন দিতেছিল, এক্ষণে নব্য সম্প্রদায় জলযোগ করিয়া দেশ উদ্ধার করিবেন। কেননা তাঁহাদিগের ছিদ্র গুণে ইতর

লোক পর্য্যন্ত রসার্দ্র হইয়া উঠিবে। ভরসা করি বোর্ডের মণি সাহেব এবারকার আবকারি রিপোর্ট লিখিবার সময়ে এই জলপানা কথাটা মনে রাখিবেন।

সে যাহাই হউক, আমাদিগের দেশের লোকের এই জলময় বিদ্যা যে এতদূর গড়াইবে, এমত ভরসা আমরা করি না। বিদ্যা, জল বা দুগ্ধ নহে, যে উপরে ঢালিলে নীচে শোষিবে। তবে কোন জাতির একাংশ কৃতবিদ্য হইলে তাহাদিগের সংসর্গগুণে অন্যাংশেরও শ্রীবৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু যদি ঐ দুই অংশের ভাষার এরূপ ভেদ থাকে, যে বিদ্বানের ভাষা মূর্খে বুঝিতে পারে না, তবে সংসর্গের ফল ফলিবে কি প্রকারে?

প্রধান কথা এই যে, এক্ষণে আমাদিগের ভিতরে উচ্চ শ্রেণী এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর সহৃদয়তা কিছুমাত্র নাই। উচ্চ শ্রেণীর কৃতবিদ্য লোকেরা, মূর্খ দরিদ্র লোকদিগের কোন দুঃখে দুঃখী নহেন। মূর্খ দরিদ্রেরা ধনবান্ এবং কৃতবিদ্যদিগের কোন সু. সুখী নহে। এই সহৃদয়তার অভাবই ে. শান্নতির পক্ষে সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক। ইহার অভাবে, উভয় শ্রেণীর মধ্যে দিন দিন অধিক পার্থক্য জন্মিতেছে। উচ্চ শ্রেণীর সহিত, যদি পার্থক্য জন্মিল, তবে সংসর্গ ফল জন্মিবে কি প্রকারে? যে পৃথক, তাহার সহিত সংসর্গ কোথায়? যদি শক্তিমন্ত ব্যক্তিরা অশক্তদিগের দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী না হইল, তবে কে আর তাহাদিগকে উদ্ধার করিবে? আর যদি আপামর সাধারণ উদ্ধৃত না হইল, তবে যাঁহারা শক্তিমন্ত তাঁহাদিগেরই উন্নতি কোথায়? এরূপ কখন কোন দেশে হয় নাই, যে ইতর লোক চিরকাল এক অবস্থায় রহিল, ভদ্র লোকদিগের অবিরত শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। বরং যেং সমাজের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, সেই সেই সমাজে উভয় সম্প্রদায় সমকক্ষ, বিমিশ্রিত এবং সহৃদয়তা-সম্পন্ন। যতদিন এই ভাব ঘটে নাই—যত দিন উভয়ে পার্থক্য ছিল, তত দিন উন্নতি ঘটে নাই। যখন উভয় সম্প্রদায়ের সামঞ্জস্য হইল, সেই দিন হইতে শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ। রোম, এথেন্স, ইংলণ্ড এবং আমেরিকা ইহার উদাহরণস্থল। সে সকল কাহিনী সকলেই অবগত আছেন। পক্ষান্তরে সমাজ মধ্যে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে পার্থক্য থাকিলে সমাজের যে রূপ অনিষ্ট হয়, তাহার উদাহরণ স্পার্টা, ফ্রান্স, মিশর এবং ভারতবর্ষ। এথেন্স এবং স্পার্টা দুই প্রতিযোগিনী নগরী; এথেন্সে সকলে সমান; স্পার্টায় এক জাতি প্রভু, এক জাতি দাস ছিল। এথেন্স হইতে পৃথিবীর সভ্যতার সৃষ্টি হইল—যে বিদ্যা প্রভাবে আধুনিক ইউরোপের এত গৌরব, এথেন্স তাহার প্রসূতি। স্পার্টা কুলক্ষয়ে লোপ পাইল। ফ্রান্সে পার্থক্য হেতু ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে যে মহাবিপ্লব আরম্ভ হয়, অদ্যাপি তাহার শেষ হয় নাই। যদিও তাহার চরম ফল মঙ্গল বটে, কিন্তু অসাধারণ সমাজ-পীড়ার পর সে মঙ্গল সিদ্ধ হইতেছে। হস্ত পদাদি ছেদ করিয়া, যে রূপ রোগীর আরোগ্য সাধন, এ বিপ্লবে সেই রূপ সামাজিক মঙ্গল সাধন। সে ভয়ানক ব্যাপার সকলেই অবগত আছেন। মিশর দেশে সাধারণের সহিত

ধর্ম্ম-যাজকদিগের পার্থক্য হেতুক, অকালে সমাজোন্নতি লোপ পায়। প্রাচীন ভারতবর্ষে, বর্ণগত পার্থক্য। এই বর্ণগত পার্থক্যের কারন, উচ্চ বর্ণ এবং নীচ বর্ণে যে রূপ গুরুতর ভেদ জন্মিয়াছিল, এমত কোন দেশে জন্মে নাই, এবং এত অনিষ্টও কোন দেশে হয় নাই। সে সকল অমঙ্গলের সবিস্তার বর্ণনা এখানে করার আবশ্যকতা নাই। এক্ষণে বর্ণগত পার্থক্যের অনেক লাঘব হইয়াছে। দুর্ভাগ্য ক্রমে শিক্ষা, এবং সম্পত্তির প্রভেদে অন্যতর বিশেষ পার্থক্য জন্মিতেছে।

সেই পার্থক্যের এক বিশেষ কারণ ভাষাভেদ। সুশিক্ষিত বাঙ্গালিদিগের অভিপ্রায় সকল সাধারণতঃ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত না হইলে, সাধারণ বাঙ্গালি তাঁহাদিগের মর্ম্ম বুঝিতে পারে না, তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে না, তাঁহাদিগের সংস্রবে আসে না। আর, পাঠক বা শ্রোতাদিগের সহিত সহৃদয়তা, লেখকের বা পাঠকের স্বতঃসিদ্ধ গুণ। লিখিতে গেলে বা কহিতে গেলে, তাহা আপনা হইতে জন্মে। যে খানে লেখক বা বক্তার স্থির জানা থাকে, যে সাধারন বাঙ্গালি তাঁহার পাঠক বা শ্রোতার মধ্যে নহে, সে খানে কাজে কাজেই তাহাদিগের সহিত তাঁহার সহৃদয়তার অভাব ঘটিয়া উঠে।

যে সকল কারণে সুশিক্ষিত বাঙ্গালির উক্তি বাঙ্গালা ভাষাতেই হওয়া কর্ত্তব্য, তাহা আমরা সবিস্তারে বিবরিত করিলাম। কিন্তু রচনা কালে সুশিক্ষিত বাঙ্গালির বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করার একটী বিশেষ বিঘ্ন আছে। সুশিক্ষিতে বাঙ্গালা পড়ে না। সুশিক্ষিতে যাহা পড়িবে না, তাহা সুশিক্ষিতে লিখিতে চাহে না।

আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগ-
বিজ্ঞানম্।

আমরা সকলেই স্বার্থাভিলাষী। লেখক মাত্রেই যশের অভিলাষী। যশঃ, সুশিক্ষিতের মুখে। অন্যে সদসৎ বিচারক্ষম নহে; তাহাদের নিকট যশঃ হইলে তাহাতে লিপি-পরিশ্রমের সার্থকতা বোধ হয় না। সুশিক্ষিতে না পড়িলে সুশিক্ষিত ব্যক্তি লিখিবে না।

এদিকে কোন সুশিক্ষিত বাঙ্গালিকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, "মহাশয় আপনি বাঙ্গালি—বাঙ্গালা গ্রন্থ বা পত্রাদিতে আপনি এত হতাদর কেন?" তিনি উত্তর করেন, "কোন্ বাঙ্গলা গ্রন্থে বা পত্রে আদর করিব? পাঠ্য রচনা পাইলে অবশ্য পড়ি।" আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, যে এ কথার উত্তর নাই। যে কয় খানি বাঙ্গালা রচনা পাঠযোগ্য, তাহা দুই তিন দিনের মধ্যে পড়িয়া শেষ করা যায়। তাহার পর দুই তিন বৎসর বসিয়া না থাকিলে আর এক খানি পাঠ্য বাঙ্গালা রচনা পাওয়া যায় না।

এই রূপ বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বাঙ্গালির অনাদরেই, বাঙ্গালির অনাদর বাড়িতেছে। সুশিক্ষিত বাঙ্গালিরা বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ বলিয়া সুশিক্ষিত বাঙ্গালি বাঙ্গালা রচনা পাঠে বিমুখ। সুশিক্ষিত বাঙ্গালিরা বাঙ্গালা পাঠে বিমুখ বলিয়া, সুশিক্ষিত বাঙ্গালিরা বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ।

আমরা এই পত্রকে সুশিক্ষিত বাঙ্গালির পাঠোপযোগী করিতে যত্ন করিব। যত্ন করিব, এই মাত্র বলিতে পারি। যত্নের সফলতা ক্ষমতাধীন। এই আমাদিগের প্রথম উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়, এই পত্র আমরা কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে, আরও এই কামনায় সমর্পণ করিলাম যে, তাঁহারা ইহাকে আপনাদিগের বার্ত্তাবহ স্বরূপ ব্যবহার করুন। বাঙ্গালি সমাজে ইহা তাঁহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপি কৌশল, এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক্। তাঁহাদিগের উক্তি বহন করিয়া, ইহা বঙ্গ মধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক। অনেক সুশিক্ষিত বাঙ্গালি বিবেচনা করেন, যে এরূপ বার্ত্তাবহের কতক দূর অভাব আছে। সেই অভাব নিরাকরণ এই পত্রের এক উদ্দেশ্য। আমরা যে কোন বিষয়ে, যে কাহারও রচনা, পাঠোপযোগী হইলে সাদরে গ্রহণ করিব। এই পত্র, কোন বিশেষ পক্ষের সমর্থন জন্য, বা কোন সম্প্রদায় বিশেষের মঙ্গল সাধনার্থ সৃষ্ট হয় নাই।

আমরা কৃতবিদ্যদিগের মনোরঞ্জনার্থ যত্ন পাইব বলিয়া, কেহ এরূপ বিবেচনা করিবেন না, যে আমরা আপামর সাধারণের পাঠোপযোগিতা সাধনে মনোযোগ করিব না। যাহাতে এই পত্র সর্ব্বজন পাঠ্য হয়, তাহা আমাদিগের বিশেষ উদ্দেশ্য। যাহাতে সাধারণের উন্নতি নাই, তাহাতে কাহারই উন্নতি সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা বলিয়াছি। যদি এই পত্রের দ্বারা সর্ব্বসাধারণের মনোরঞ্জন সঙ্কল্প না করিতাম, তবে এই পত্র প্রকাশ বৃথা কার্য্য বিবেচনা করিতাম।

অনেকে বিবেচনা করেন যে, বালকের পাঠোপযোগী অতি সরল কথা ভিন্ন, সাধারণের বোধগম্য বা পাঠ্য হয় না। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া যাঁহারা লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগের রচনা কেহই পড়ে না। যাহা সুশিক্ষিত ব্যক্তির পাঠোপযোগী নহে, তাহা কেহই পড়িবে না। যাহা উত্তম, তাহা সকলেই পড়িতে চাহে; যে না বুঝিতে পারে, সে বুঝিতে যত্ন করে। এই যত্নই সাধারণের শিক্ষার মূল। সে কথা আমরা স্মরণ রাখিব।

তৃতীয়, যাহাতে নব্য সম্প্রদায়ের সহিত আপামর সাধারণের সহৃদয়তা সম্বর্দ্ধিত হয়, আমরা তাহার সাধ্যানুসারে অনুমোদন করিব। আরও অনেক কাজ করিব বাসনা করি। কিন্তু যত গর্জ্জে তত বর্ষে না। গর্জ্জনকারী মাত্রেরই পক্ষে এ কথা সত্য। বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের পক্ষে বিশেষ। আমরা যে এই কথার সত্যতার একটী নূতন উদাহরণ স্বরূপ হইব না, এমত বলি না। আমাদিগের পূর্ব্ব-তনেরা এইরূপ এক২ বার অকাল গর্জ্জন করিয়া, কালে লয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমাদিগের অদৃষ্টে যে সেরূপ নাই, তাহা বলিতে পারি না। যদি তাহাই হয়, তথাপিও আমরা ক্ষতি বিবেচনা করিব না। এ জগতে কিছুই নিষ্ফল নহে। এক খানি সাময়িক পত্রের ক্ষণিক জীবনও নিষ্ফল হইবে না। যে সকল নিয়মের বলে, আধুনিক সামাজিক উন্নতি সিদ্ধ হইয়া থাকে, এই সকল পত্রের জন্ম, জীবন, এবং মৃত্যু

তাহারই প্রক্রিয়া। এই সকল সামান্য ক্ষণিক পত্রেরও জন্ম, অলঙ্ঘ্য সামাজিক নিয়মাধীন, মৃত্যু ঐ নিয়মাধীন, জীবনের পরিমাণ ঐ অলঙ্ঘ্য নিয়মের অধীন। কালস্রোতে এ সকল জলবুদ্বুদ মাত্র। এই বঙ্গদর্শন কালস্রোতে নিয়মাধীন জলবুদ্বুদ স্বরূপ ভাসিল; নিয়মবলে বিলীন হইবে। অতএব ইহার লয়ে আমরা পরিতাপযুক্ত বা হাস্যাস্পদ হইব না। ইহার জন্ম কখনই নিষ্ফল হইবে না। এ সংসারে জলবুদ্বুদও নিষ্কারণ বা নিষ্ফল নহে।

ভারত-কলঙ্ক।

ভারতবর্ষের পূর্ব্ব সৌষ্ঠব লইয়া আমরা অনেক স্পর্দ্ধা করি। বাস্তবিক, স্পর্দ্ধা করিবার বিষয় অনেক আছে। এক্ষণে ইউরোপীয় জাতিগণেও প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের পাণ্ডিত্য, শিল্প সাহিত্যবিজ্ঞানদর্শনাদিতে ব্যুৎপত্তি স্বীকার করেন। কিন্তু আমরা কখন প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের রণনৈপুণ্য লইয়া গৌরব করি না। এ বিষয়ে ভারতবর্ষীয়দিগের চিরকলঙ্ক। ভারতবর্ষীয়েরা রণনিপুণ বলিয়া কস্মিনকালে সুখ্যাত নহেন। এই জন্য, তাঁহারা বাহুবলদর্পিত ভিন্ন জাতীয়দিগের কাছে কতকদূর ঘৃণিত। সাহেবেরা আধুনিক সিপাহীদিগকে যুদ্ধে কিছু দূর পটু বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু সে পটুতা তাঁহাদিগের প্রদত্ত শিক্ষা ও বিলাতী যুদ্ধ প্রণালীর গুণেই হইয়াছে বলিয়া থাকেন।

ভারতবর্ষীয়েরা, এক্ষণে যাহাই হউন, কোন কালে যে যুদ্ধে অন্যান্য ইতিহাসকীর্ত্তিত জাতির সমকক্ষ ছিলেন না, এমত আমরা সহসা স্বীকার করি না, এবং পূর্ব্বকালিক ভারতবর্ষীয়েরা যে পৃথিবীমধ্যে রণকুশলী জাতিগণের অগ্রে গণ্য হইতে পারিতেন, ইহা সমর্থন করিতে আমরা প্রস্তুত আছি।

আমরা স্বীকার করি, যে এই পক্ষ সমর্থন করা সহজ নহে, এবং এতদ্বিষয়ে পর্য্যাপ্ত প্রমাণ প্রাপ্তি দুঃসাধ্য। এই তর্ক কেবল পুরাবৃত্ত অবলম্বন করিয়া মীমাংসা করা সম্ভব, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অন্যান্য জাতীয়দিগের ন্যায় ভারতবর্ষীয়েরা আপনাদিগের কীর্ত্তিকলাপ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্ত নাই। সুতরাং ভারতবর্ষীয়দিগের যে শ্লাঘনীয় সমরকীর্ত্তি ছিল, তাহাও লোপ হইয়াছে। যে গ্রন্থগুলিন "পুরাণ" বলিয়া খ্যাত আছে, তাহাতে প্রকৃত পুরাবৃত্ত কিছুই নাই। যাহা কিছু আছে তাহা অনৈসর্গিক এবং অতিমানুষ উপন্যাসে এরূপ আচ্ছন্ন, যে প্রকৃত ঘটনা কি, তাহা কোন রূপেই নিশ্চিত হয় না।

সে যাহাই হউক, ভারতবর্ষীয়েরা পূর্ব্বকালে যুদ্ধ-নিপুণ কি হীনবল ছিলেন, তদ্বিষয় স্থির করিবার জন্য ইতিবৃত্ত-ঘটিত প্রমাণ এক্ষণে অতি বিরল। ভাগ্যক্রমে, ভিন্ন দেশীয় ইতিহাস-বেত্তাদিগের গ্রন্থে দুই স্থানে প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের যুদ্ধাদির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম, মাকিদনীয় আলেকজণ্ডর বা সেকন্দর দিগ্‌বিজয়ে যাত্রা করিয়া ভারতবর্ষে

আসিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রচনাকুশল যুনানী লেখকেরা তাহা পরিকীর্ত্তিত করিয়াছেন। দ্বিতীয়, মুসলমানেরা ভারতবর্ষ জয়ার্থ যে সকল উদ্যম করিয়াছিলেন, তাহা মুসলমান ইতিবৃত্ত লেখকেরা বিবরিত করিয়াছেন। কিন্তু প্রথমেই বক্তব্য যে,এরূপ সাক্ষীর পক্ষপাতিত্বের গুরুতর সম্ভাবনা। মনুষ্য চিত্রকর বলিয়াই চিত্রে সিংহ পরাজিত স্বরূপ লিখিত হয়। যে সকল ইতিহাসবেত্তা আত্মজাতির লাঘব স্বীকার করিয়া সত্যের অনুরোধে শত্রু পক্ষের যশঃকীর্ত্তন করেন, তাঁহারা অতি অল্প সংখ্যক। অপেক্ষাকৃত মূঢ়, আত্ম-গরিমা-পরায়ণ মুসলমানদিগের কথা দূরে থাকুক, কৃতবিদ্য, সত্য-নিষ্ঠাভিমানী ইউরোপীয় ইতিহাসবেত্তারা এই দোষে এই রূপ কলঙ্কিত, যে তাঁহাদের রচনা পাঠ করিতে কখনং ঘৃণা করে। অন্যের কথা দূরে যাউক, এক্ষণে যিনি ফরাসিস্ রাজ্যের চূড়া, সেই মহাত্মার লিখিত প্রথম নাপোলেয়নের যুদ্ধ বিবরণ এই কথার এক উদাহরণস্থল। গত ফরাসী-প্রুষীয় যুদ্ধে ফরাসী লেখকেরা, যেরূপ যুদ্ধ সম্বাদ প্রচার করিতেন, তাহা দ্বিতীয় উদাহরণস্থল। অন্য উদাহরণ যাউক, সত্যনিষ্ঠ ইংরাজগণ প্রচারিত ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত হইতে এ কথার ভূরিং প্রমাণ পাওয়া যায়। পলাসীর যুদ্ধ, "গ্লোরিয়স্ বিক্টরি।" যাঁহারা "সয়ের মতাক্ষরিণ্" নামক পারস্য গ্রন্থ বা তদনুবাদ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে ইংরাজের সে রণজয় কি প্রকার। ইহার পর চিলিয়ানওয়ালার উল্লেখ না করিলেও হয়।

যেং স্থলে মুসলমানদিগের লেখার সঙ্গে ভারতবর্ষীয়দিগের লেখা তুলনা করিবার উপায় আছে, সেইং স্থলে মুসলমান ইতিহাসবেত্তাদের স্বপক্ষবাদিত্ব পদেং প্রমাণ হয়। কর্ণেল টডের প্রণীত রাজস্থান পাঠ করিয়া অনেক স্থানে দেখা যায় যে মুসলমানেরাই চিরজয়ী নহে। রাজপুতেরা বহুকাল তাঁহাদিগের সমকক্ষ হইয়া, অনেক বার তাঁহাদিগকে পরাজিত এবং শাসিত করিয়াছে। মুসলমান লেখকেরা সে সকল বৃত্তান্ত প্রায় ত্যাগ করিয়াছেন। যদি সে সকল বৃত্তান্তের কোন উল্লেখ করেন, তবে প্রকৃত বৃত্তান্ত গোপন করেন, অথবা অতি সংক্ষেপে সে বিষয় সমাধা করেন। আর যেখানে মুসলমান মার্জ্জারে হিন্দু মূষিকশিশু ধৃত করিয়াছে, সেখানে সেখজীরা অনেক কোলাহল করিয়াছেন।

এরূপ তর্ক হইতে পারে যে, উভয় পক্ষের কথা যখন পরস্পর-বিরোধী, তখন কোন্ পক্ষ মিথ্যাবাদী তাহা কে স্থির করিবে? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে রাজপুত পক্ষে অনেক অবস্থা-ঘটিত প্রমাণ আছে। কিন্তু সে সকল বিচারের এস্থানে প্রয়োজন নাই। অস্মদাদির বিবেচনায় ভয়পক্ষই কিয়দ্দূর অসত্যবাদী হইতে পারে। এই জন্য দেশীয় এবং বিপক্ষদেশীয়, উভয়বিধ ইতিহাসবেত্তাদিগের লিপির সাহায্য না পাইলে, কোন ঘটনারই যাথার্থ্য নির্ণীত হয় না। কেবল আত্মগরিমা-পরবশ, পর-ধর্ম্মদ্বেষী, সত্যভীত মুসলমান লেখকদিগের কথার উপর নির্ভর করিয়া, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের রণনৈপুণ্য মীমাংসা করা যাইতে পারে না।

সে যাহাই হউক, নিম্ন লিখিত দুইটী কথা মুসলমান পুরাবৃত্ত হইতেই তর্কের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে।

প্রথম, আরব-দেশীয়েরা এক প্রকার দিগ্বিজয়ী। যখন যে দেশ আক্রমণ করিয়াছে, তখনই তাহারা সেই দেশ জয় করিয়া পৃথিবীতে অতুল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। তাহারা কেবল দুই দেশ হইতে পরাভূত হইয়া বহিষ্কৃত হয়। পশ্চিমে ফ্রান্স, পূর্ব্বে ভারতবর্ষ। আরব্যেরা মিশর ও সিরিয় দেশ মহম্মদের মৃত্যুর পর ছয় বৎসর মধ্যে, পারস্য দশ বৎসরে, আফ্রিকা ও স্পেন, একং বৎসরে, কাবুল অষ্টাদশ বৎসরে, তুর্ক-স্থান আট বৎসরে সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত করে। কিন্তু তাহারা ভারতবর্ষ জয়ের জন্য প্রথম মহালেবের সময় হইতে প্রায় এক শত বৎসর পর্য্যন্ত যত্ন করিয়াও ভারতবর্ষ হস্তগত করিতে পারে নাই। মহম্মদ কাসিম সিন্ধুদেশ অধিকৃত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর কিছু কাল পরে তাহা রাজপুতগণ কর্ত্তৃক পুনরধিকৃত হইয়াছিল। ভারতজয় দিগ্বিজয়ী আরব্যদিগের সাধ্য হয় নাই। এলফিন্‌ষ্টোন্ বলেন যে, হিন্দুদিগের দেশীয় ধর্ম্মের প্রতি দৃঢ়ানুরাগই এই অজেয়তার কারণ। আমরা বলি রণনৈপুণ্য,—যোধশক্তি। হিন্দুদিগের আত্মধর্ম্মানুরাগ অদ্যাপিও ত বলবৎ। তবে কেন হিন্দুরা সাত শত বৎসর পরজাতিপদাবনত?

দ্বিতীয়, যখন কোন প্রাচীন দেশের নৈকট্যে নবাভ্যুদয়-বিশিষ্ট এবং বিজয়াভিলাষী জাতি অবস্থিতি করে, তখন প্রাচীন জাতি প্রায় নবীনের প্রভুত্বাধীন হইয়া যায়। এই রূপ সর্ব্বান্তকারী বিজয়াভিলাষী জাতি, প্রাচীন ইউরোপে রোমকেরা, আসিয়ায় আরব্য ও তুরকীয়েরা। যেং জাতি ইহাদিগের সংশ্রবে আসিয়াছে, তাহারাই পরাভূত হইয়া ইহাদিগের অধীনস্থ হইয়াছে। কিন্তু তন্মধ্যে হিন্দুরা যত দূর দুর্জ্জেয় হইয়াছিল, এতাদৃশ আর কোন জাতিই হয় নাই। আরব্যগণ কর্ত্তৃক যত অল্প কাল মধ্যে মিশর, উত্তর আফ্রিকা, স্পেন, পারস্য, তুরক, এবং কাবুল রাজ্য, এই সকল উচ্ছিন্ন হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। তদপেক্ষাও সুবিখ্যাত কতিপয় সাম্রাজ্যের উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। রোমকেরা প্রথম ২০০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে যুনানী রাজ্য আক্রমণ করে। তদবধি ৫২ বৎসর মধ্যে ঐ রাজ্য একেবারে নিঃশেষ বিজিত হয়। সুবিখ্যাত কার্থেজ্ রাজ্য ২৬৪ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে প্রথম রোমকদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। ১৪৬ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে, অর্থাৎ এক শত বিশ বৎসর মধ্যে সেই রাজ্য রোমকগণ কর্ত্তৃক ধ্বংসিত হয়। পূর্ব্ব রোমক বা যুনানী রোমক রাজ্য চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তুরকীয়গণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ পঞ্চাশৎ বৎসর মধ্যে তুরকী দ্বিতীয় মহম্মদের হস্তে উচ্ছিন্ন যায়। পশ্চিম রোমক, যাহার নাম অদ্যাপিও জগতে বীরদর্পের পতাকাস্বরূপ, তাহাই ২৮৬ খৃষ্টাব্দে উত্তরীয় বর্ব্বর জাতি কর্ত্তৃক প্রথম আক্রান্ত হইয়া ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ প্রথম বর্ব্বর বিপ্লবের ১৯০ বৎসর মধ্যে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষ ৬৬৪ খৃষ্টাব্দে আরব্য মুসল-

মানগণ কর্ত্তৃক প্রথম আক্রান্ত হয়। তদ্দণ্ড হইতে পাঁচ শত উনত্রিশ বৎসর পরে শাহাবুদ্দীন ঘোরি কর্ত্তৃক উত্তর ভারত অধিকৃত হয়। শাহাবুদ্দীন বা তাঁহার অনুচরেরা আরব্য জাতীয় ছিলেন না। আরব্যেরা যেরূপ বিফলযত্ন হইয়াছিল, গজনী নগরাধিষ্ঠাতা তুরকীয়েরাও তদ্রূপ। যাহারা পৃথ্বীরাজ, জয়চন্দ্র এবং সেনরাজা প্রভৃতি হইতে উত্তর ভারতরাজ্য অপহরণ করে, তাহারা পাঠান বা আফগান। আরব্যদিগের প্রথম ভারতাক্রমণের ৫২৯ বৎসর পরে তুরকীদিগের প্রথম ভারতাক্রমণের ২১৩ বৎসর পরে, তৎস্থানীয় পাঠানেরা ভারত রাজ্যাধিকার করিয়াছিল। পাঠানেরা কখনই আরব্য বা তুরকী বংশীয়দিগের ন্যায়, সমৃদ্ধিসম্পন্ন বা প্রতাপান্বিত নহে; তাহারা কেবল পূর্ব্বগত আরব্য ও তুরকীদিগের সূচিত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল। আরব্য, তুরকী, এবং পাঠান, এই তিন জাতির যত্ন-পারম্পর্য্যে সার্দ্ধ পাঁচ শত বৎসরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লুপ্ত হয়।*

মুসলমান সাক্ষীরা এই রূপ বলে। ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ইহাদের নিকট হিন্দুরা যখন পরিচিত হইয়াছিলেন, তখন হিন্দুদিগের সু সময় প্রায় অতীত হইয়াছিল,—রাজলক্ষ্মী ক্রমে২ মলিনা হইয়া আসিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় অব্দের পূর্ব্বগত হিন্দুরা অধিকতর বলবান্ ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সেই সময়ে যুনানীদিগের সহিত পরিচয়। তাহারা নিজে অদ্বিতীয় বলবান্। তাহারা ভুয়োভুয়ঃ ভারতবর্ষীয়দিগের সাহস ও রণনৈপুণ্যের প্রশংসা করিয়াছে। মাকিদনীয় বিপ্লব বর্ণন কালে, তাহারা এইরূপ পুনঃ২ নির্দ্দেশ করিয়াছে যে, আসিয়া প্রদেশে এইরূপ রণপণ্ডিত দ্বিতীয় জাতি তাহারা দেখে নাই। এবং হিন্দুগণ কর্ত্তৃক যেরূপ যুনানী সৈন্য হানি হইয়াছিল, এরূপ অন্য কোন জাতি কর্ত্তৃক হয় নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের রণদক্ষতা সম্বন্ধে যদি কাহারও সংশয় থাকে, তবে তিনি মাকিদনীয় বিপ্লবের বৃত্তান্তলেখক যুনানীদিগের গ্রন্থ পাঠ করিবেন।

ভারতভূমি সর্ব্বরত্নপ্রসবিনী, পররাজগণের নিতান্ত লোভের পাত্রী। এই জন্য, সর্ব্বকালে নানা জাতি আসিয়া উত্তর পশ্চিমে পার্ব্বত্য দ্বারে প্রবেশ লাভপূর্ব্বক ভারতবর্ষাধিকারের চেষ্টা পাইয়াছে। পারসীক, যোনা, বাহ্লিক, শক, হুন, আরব্য, তুরকী সকলেই আসিয়াছে, এবং সিন্ধু পারে বা তদুভয় তীরে স্বল্প প্রদেশ কিছু দিনের জন্য অধিকৃত করিয়া, পরে বহিষ্কৃত হইয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দী কাল পর্য্যন্ত, আর্য্যেরা সকল জাতিকে শীঘ্র বা বিলম্বে দূরীকৃত করিয়া আত্মদেশ রক্ষা করিয়াছিল। পঞ্চদশ শত বৎসর পর্য্যন্ত প্রবল জাতি মাত্রেরই আক্রমণস্থলীভূত হইয়া এতকাল যে স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়াছে, এরূপ অন্য কোন জাতি পৃথিবীতে নাই, এবং কখন ছিল কি না সন্দেহ। অতি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যে হিন্দুদিগের সমৃদ্ধি অক্ষয় হইয়াছিল, তাহাদিগের বাহুবলই ইহার কারণ, সন্দেহ নাই। অন্য কারণ দেখা যায় না।

এই সকল প্রমাণ সত্ত্বেও সর্ব্বদা শুনা

* পশ্চিমাংশে আরব্য ও তুরকীয়েরা কিছু ভূমি অধিকার করিয়াছিল মাত্র।

যায় যে, হিন্দুরা চিরকাল রণে অপারগ। অদূরদর্শীদিগের নিকট ভারতবর্ষের এই চিরকলঙ্কের তিনটী কারণ আছে।

প্রথম,—হিন্দু ইতিবৃত্ত নাই ;—আপনার গুণগান আপনি না গায়িলে কে গায় ? লোকের ধর্ম্ম এই যে, যে আপনাকে মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত না করে, কেহ তাহাকে মানুষের মধ্যে গণ্য করে না। কোন্ জাতির সুখ্যাতি কবে অপর জাতি কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছে ? রোমকদিগের রণ-পাণ্ডিত্যের প্রমাণ—রোমক লিখিত ইতিহাস। যুনানীদিগের যোদ্ধৃগুণের পরিচয়,—যুনানী লোকের লিখিত গ্রন্থ। মুসলমানেরা যে মহা রণকুশলী, ইহাও কেবল মুসলমানের কথাতেই বিশ্বাস করিয়া জানিতে পারিতেছি। কেবল সে গুণে হিন্দুদিগের গৌরব নাই—কেননা সে কথার হিন্দু সাক্ষী নাই।

দ্বিতীয় কারণ,—যে সকল জাতি পররাজ্যাপহারী, প্রায় তাহারাই রণপণ্ডিত বলিয়া অপর জাতির নিকট পরিচিত হইয়াছে। যাহারা কেবল আত্মরক্ষা মাত্রে সন্তুষ্ট হইয়া, পর রাজ্য লাভের কখন ইচ্ছা করে নাই, তাহারা কখনই বীর-গৌরব লাভ করে নাই। ন্যায়-নিষ্ঠা এবং বীর-গৌরব একাধারে সচরাচর ঘটে না। অদ্যাপিও এ দেশীয় ভাষায়, "ভাল মানুষ" শব্দের অর্থ ভীরুস্বভাবের লোক —অকর্ম্মা। "হরি নিতান্ত ভাল মানুষ।" অর্থ—হরি নিতান্ত অপদার্থ !

হিন্দু রাজগণ যে একেবারে পররাজ্যে লোভশূন্য ছিলেন, এমত আমরা বলি না। তাঁহারা পরস্পরকে আক্রমণ করিতে কখন ত্রুটি করিতেন না। কিন্তু ভারতবর্ষ, হিন্দুরাজ্যকালে ক্ষুদ্রং মণ্ডলে বিভক্ত ছিল। ভারতবর্ষ এতাদৃশ বিস্তৃত প্রদেশ যে, ক্ষুদ্র মণ্ডলাধিকারী রাজগণ কখন কেহ তাহার বাহিরে দেশ জয়ে যাইবার বাসনা করিতেন না;—কোন হিন্দু রাজা কস্মিন্‌কালে সমগ্র ভারত স্বরাজ্য-ভুক্ত করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দুরা যবন ম্লেচ্ছ প্রভৃতি অপর ধর্ম্মাবলম্বী জাতিগণকে বিশেষ ঘৃণা করিতেন ; তাহাদিগের উপর প্রভুত্ব করিবার কোন প্রয়াস করিতেন, এমত সম্ভাবনা নহে ; বরং তদ্দেশ-জয়ে যাত্রা করিলে আপন জাতি-ধর্ম্ম বিনাশের শঙ্কা করিবারই সম্ভাবনা। অতএব সক্ষম হইলেও হিন্দুরা ভারতবর্ষের বাহিরে বিজয়াকাঙ্ক্ষায় যাইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সত্য বটে, এক্ষণকার কাবুল রাজ্যের অধিকাংশ পূর্ব্বকালে হিন্দুরাজ্য ভুক্ত ছিল, কিন্তু সে প্রদেশ তৎকালে ভারতবর্ষের একাংশ বলিয়া গণ্য হইত।

প্রাচীন হিন্দুদিগের এ কলঙ্কের তৃতীয় কারণ,—হিন্দুরা বহু দিন হইতে পরাধীন। যে জাতি বহুকাল পরাধীন তাহাদিগের আবার বীর-গৌরব কি ? কিন্তু এক্ষণকার হিন্দুদিগের বীর্য্য-লাঘব, প্রাচীন হিন্দুদিগের অবমাননার উপযুক্ত কারণ নহে। প্রায় অনেক দেশেই দেখা যায় যে, প্রাচীন এবং আধুনিক লোকের মধ্যে চরিত্রগত সাদৃশ্য অধিক নহে। ইটালি ও গ্রীস, ভারতবর্ষের ন্যায় এই কথার উদাহরণ স্থল। মধ্য-কালিক ইটালীয়, এবং বর্ত্তমান গ্রীকদিগের চরিত্র হইতে প্রাচীন রোমক ও যুনানীদিগের কাপুরুষ বলিয়া

সিদ্ধ করা যাদৃশ অন্যায়, আধুনিক ভারতবর্ষীয়দিগের পরাধীনতা হইতে প্রাচীনদিগের বললাঘব সিদ্ধ করা তাদৃশ অন্যায়।

আমরা এমতও বলি না যে, আধুনিক ভারতবর্ষীয়েরা নিতান্ত কাপুরুষ, এবং সেই জন্য এত কাল পরাধীন। এ পরাধীনতার অন্য কারণ আছে। আমরা তাহার দুইটি কারণ সবিস্তারে এ স্থলে নির্দ্দিষ্ট করি।

প্রথম, ভারতবর্ষীয়েরা স্বভাবতই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা রহিত। স্বদেশীয়, স্বজাতীয় লোকে আমাদিগের শাসিত করুক, পরজাতীয়দিগের শাসনাধীন হইব না, এরূপ অভিপ্রায় ভারতবর্ষীয়দিগের মনে আইসে না। স্বজাতীয়ের রাজশাসন মঙ্গলকর, বা সুখের আকর, পরজাতীয়ের রাজদণ্ড পীড়াদায়ক বা লাঘবের কারণ, এ কথা তাহাদের বড় হৃদয়ঙ্গত নহে। পরতন্ত্রতা অপেক্ষা স্বতন্ত্রতা ভাল, এ রূপ একটা তাহাদিগের বোধ থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু সেটী বোধমাত্র—সে জ্ঞান আকাঙ্ক্ষায় পরিণত নহে। অনেক বস্তু আমাদিগের ভাল বলিয়া জ্ঞান থাকিতে পারে, কিন্তু সে জ্ঞানে তৎপ্রতি সকল স্থানে আকাঙ্ক্ষা জন্মে না। কে না হরিশ্চন্দ্রের দাতৃত্ব বা কার্শিয়সের দেশবাৎসল্য প্রশংসা করে? কিন্তু তাহার মধ্যে কয় জন হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় সর্ব্বত্যাগী বা কার্শিয়সের ন্যায় আত্মঘাতী হইতে প্রস্তুত? প্রাচীন বা আধুনিক ইউরোপীয় জাতীয়দিগের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তা বলবতী আকাঙ্ক্ষায় পরিণত। তাঁহাদিগের বিশ্বাস যে স্বতন্ত্রতা ত্যাগের অগ্রে প্রাণ এবং অন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ কর্ত্তব্য। হিন্দুদিগের মধ্যে তাহা নহে। তাঁহাদের বিবেচনা "যে ইচ্ছা রাজা হউক, আমাদের কি?" স্বজাতীয় রাজা, পরজাতীয় রাজা, উভয় সমান। স্বজাতীয় হউক, পরজাতীয় হউক, সুশাসন করিলে দুই সমান। স্বজাতীয় রাজা সুশাসন করিবে—পরজাতীয় সুশাসন করিবে না, তাহার স্থিরতা কি? যদি তাহার স্থিরতা নাই, তবে কি জন্য স্বজাতীয় রাজার জন্য প্রাণ দিব? রাজ্য রাজার সম্পত্তি। তিনি রাখিতে পারেন রাখুন। আমাদিগের পক্ষে উভয় সমান। কেহই আমাদিগের ষষ্ঠ ভাগ ছাড়িবে না, কেহই চোরকে পুরস্কৃত করিবে না। যে রাজা হয় হউক, আমরা কাহারও জন্য অঙ্গুলি ক্ষত করিব না।*

আমরা এক্ষণে স্বাতন্ত্র্যপর ইংরাজদিগের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া এই সকল কথার ভ্রম দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু ইহা অস্বাভাবিক নহে, এবং ইহার ভ্রান্তি সহজে অনুমেয়ও নহে। স্বভাববশতঃ কোন জাতি অসভ্যকাল হইতেই

* আমরা এমত বলি না, যে ভারতবর্ষে কখন কোন স্বাতন্ত্র্যভক্ত জাতি ছিল না। মীবার-রাজপুতদিগের অপূর্ব্ব কাহিনী যাঁহারা টডের গ্রন্থে অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা জানেন, যে ঐ রাজপুতগণ হইতে স্বাতন্ত্র্যোন্মত্ত জাতি কখন পৃথিবীতে দেখা দেয় নাই। সেই স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তার ফলও চমৎকার। মীবার ক্ষুদ্র রাজ্য হইয়াও ছয় শত বৎসর পর্য্যন্ত মুসলমান সাম্রাজ্যের মধ্য স্থলে স্বাধীন হিন্দু রাজপতাকা উড়াইয়াছে। আকবর বাদশাহের বাহুবলও মীবার ধ্বংসে সক্ষম হয় নাই। অদ্যাপিও উদয়পুরের রাজবংশ পৃথিবী মধ্যে প্রচীন রাজবংশ বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু এক্ষণে আর সে দিন নাই। সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই। উপরে আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহা সাধারণ হিন্দু সম্বন্ধে যথার্থ।

স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়; স্বভাববশতঃ কোন জাতি সুসভ্য হইয়াও তৎপ্রতি আস্থাশূন্য। এই সংসারে অনেক গুলিন স্পৃহনীয় বস্তু আছে; তন্মধ্যে সকলেই সকল বস্তুর জন্য যত্নবান্ হয় না। ধন এবং যশঃ উভয়েই স্পৃহনীয়। কিন্তু আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, এক ব্যক্তি ধন সঞ্চয়েই রত, যশের প্রতি তাহার অনাদর; অন্য ব্যক্তি যশোলিপ্সু, ধনে হতাদর। রাম, ধন সঞ্চয়ে একব্রত হইয়া, কার্পণ্য, নীচাশয়তা প্রভৃতি দোষে যশোহানি করিতেছে; যদু, অমিত ধনরাশি নষ্ট করিয়া, দাতৃত্বাদি গুণে যশঃ সঞ্চয় করিতেছে। রাম ভ্রান্ত কি যদু ভ্রান্ত, তাহার মীমাংসা নিতান্ত সহজ নহে। অন্ততঃ ইহা স্থির যে উভয় মধ্যে, কাহারও কার্য্য স্বভাব বিরুদ্ধ নহে। সেইরূপ য়ুনানীয়েরা স্বাধীনতাপ্রিয়; হিন্দুরা স্বাধীনতাপ্রিয় নহে, শান্তিসুখের অভিলাষী, ইহা কেবল জাতি-গত স্বভাব বৈচিত্রের ফল, বিস্ময়ের বিষয় নহে।

কিন্তু অনেকে এ কথা মনে করেন না। হিন্দুরা যে পরাধীন, স্বাধীনতা লাভের জন্য উৎসুক নহে, ইহাতে তাঁহারা তর্ক করেন যে হিন্দুরা দুর্ব্বল, রণভীরু, স্বাধীনতা লাভে অক্ষম; এ কথা তাঁহাদের মনে পড়ে না যে, হিন্দুরা সাধারণতঃ স্বাধীনতা লাভে অভিলাষী বা যত্নবান্ নহে। অভিলাষী বা যত্নবান্ হইলেই লাভ করিতে পারে।

স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থা,কেবল আধুনিক হিন্দুদিগের স্বভাব এমত আমরা বলি না; ইহা হিন্দু জাতির চিরস্বভাব বোধ হয়। যিনি এমত বিবেচনা করেন যে, হিন্দুরা সাত শত বৎসর স্বাতন্ত্র্যহীন হইয়া, এক্ষণে তদ্বিষয়ে আকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়াছে, তিনি অযথার্থ অনুমান করেন। সংস্কৃত সাহিত্যাদিতে কোথাও এমন কিছু পাওয়া যায় না যে,তাহা হইতে পূর্ব্ব হিন্দুগণকে স্বাধীনতাপ্রয়াসী বলিয়া সিদ্ধ করা যাইতে পারে। পুরাণোপপুরাণ কাব্য নাটকাদিতে কোথাও স্বাধীনতার গুণ গান নাই। মীবার ভিন্ন, কোথাও দেখা যায় না যে, কোন হিন্দুসমাজ স্বাতন্ত্র্যের আকাঙ্ক্ষায় কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। রাজার রাজ্যসম্পত্তি রক্ষায় যত্ন, বীরের বীরদর্প, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধপ্রয়াস, এ সকলের ভূরি২ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য লাভাকাঙ্ক্ষা সে সকলের মধ্যগত নহে। স্বাতন্ত্র্য,স্বাধীনতা,এ সকল নূতন কথা।

ভারতবর্ষীয়দিগের এই রূপ স্বভাবসিদ্ধ স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থার কারণানুসন্ধান করিলে তাহাও দুর্জ্ঞেয় নহে। ভারতবর্ষের ভূমির উর্ব্বরতাশক্তি এবং বায়ুর তাপাতিশয্য প্রভৃতি ইহার গৌণ কারণ। ভূমি উর্ব্বরা, দেশ সর্ব্বসামগ্রী—পরিপূর্ণ, অল্পায়াসে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হয়। লোককে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না, এ জন্য অবকাশ যথেষ্ট। শারীরিক পরিশ্রম হইতে অধিক অবকাশ হইলে,সহজই মনের গতি আভ্যন্তরিক হয়; ধ্যানের বাহুল্য ও চিন্তার বাহুল্য হয়। তাহার এক ফল কবিত্ব, জগত্তত্ত্বে পাণ্ডিত্য। এই জন্য হিন্দুরা অল্প কালে অদ্বিতীয় কবি এবং দার্শনিক হইয়াছিলেন। কিন্তু মনের আভ্যন্তরিক গতির দ্বিতীয় ফল বাহ্য সুখে অনাস্থা। বাহ্য সুখে অনাস্থা হইলে সুতরাং নিশ্চেষ্টতা জন্মিবে। স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থা এই স্বাভাবিক নিশ্চেষ্টতার এক অংশ

মাত্র। আর্য্য ধর্ম্মতত্ত্বে, আর্য্য দর্শনশাস্ত্রে এই অচেষ্টা-পরতা, সর্ব্বত্র বিদ্যমান। কি বৈদিক, কি বৌদ্ধ, কি পৌরাণিক ধর্ম্ম, সকলেই এই নিশ্চেষ্টতারই সম্বর্দ্ধনাপরিপূর্ণ। বেদ হইতে বেদান্ত সাংখ্যাদি দর্শনের উৎপত্তি; তদনুসারে লয় বা ভোগক্ষান্তিই মোক্ষ; নিষ্কামত্বই পুণ্য। বৌদ্ধ ধর্ম্মের সার,—নির্ব্বাণই মুক্তি। পৌরাণিক ধর্ম্মের দর্শন ভগবদ্গীতা। তাহার সার মর্ম্ম এই যে,সকল কর্ম্মই বৃথা, কর্ম্মহীনত্বই ভাল। এরূপ নিষ্কর্ম্ম-ধর্ম্ম-দীক্ষিত জাতি, বহু যত্নসাধ্য স্বাতন্ত্র্যের অনুরাগী হইবে কেন?

এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, হিন্দু জাতি যদি চিরকাল স্বাতন্ত্র্যে হতাদর, তবে যবনবিজয়ের পূর্ব্বে সার্দ্ধ সহস্র বৎসর তাহারা কেন যত্ন করিয়া পুনঃ পুনঃ পরজাতিবিমুখ পূর্ব্বক স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল? পরজাতিগণ সহজে কখন বিমুখ হয় নাই, অনেক কষ্টে হইয়া থাকিবে। যে সুখের প্রতি আস্থা নাই, সে সুখের জন্য হিন্দু সমাজ কেন এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছিল?

উত্তর, হিন্দু সমাজ যে কখন শক যোনা যবনপ্রভৃতিকে বিমুখীকরণ জন্য বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ কোথাও নাই। হিন্দু রাজগণ আপনার রাজ্যসম্পত্তি রক্ষার জন্য যত্ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সংগৃহীত সেনায় যুদ্ধ করিত; যখন পারিত শত্রুবিমুখ করিত, তাহাতেই দেশের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা হইত; তদ্ভিন্ন যে "আমাদের দেশে ভিন্ন জাতীয় রাজা হইতে দিব না" বলিয়া সাধারণ জনগণ কখন উৎসাহযুক্ত বা উদ্যমশালী হইয়াছিল, ইহার প্রমাণ কোথাও নাই। বরং তদ্বিপরীতই প্রকৃত বলিয়া বিবেচনা হয়। যখনই সমরলক্ষ্মীর কোপদৃষ্টি প্রভাবে হিন্দু রাজা বা হিন্দু সেনাপতি রণে হত হইয়াছেন,তখনই হিন্দু সেনারা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছে, আর যুদ্ধে সমবেত হয় নাই। কেননা আর কাহার জন্য যুদ্ধ করিবে? যখনই রাজা নিধন প্রাপ্ত,বা অন্য কারণে রাজ্য রক্ষায় নিশ্চেষ্ট হইয়াছেন, তখনই হিন্দু যুদ্ধ সমাধা হইয়াছে। আর কেহ তাহার স্থানীয় হইয়া স্বাতন্ত্র্য পালনের উপায় করে নাই; সাধারণ সমাজ হইতে অরক্ষিত রাজ্য রক্ষার কোন উদ্যম হয় নাই। যখন বিধির বিপাকে যবন বা য়ুনানী, শক বা বাহ্লিক, কোন প্রদেশ খণ্ডের রাজাকে রণে পরাজিত করিয়া তাঁহার সিংহাসনে বসিয়াছে, প্রজাগণ তখনই তাঁহাকে পূর্ব্বপ্রভুর তুল্য সমাদর করিয়াছে, রাজ্যাপহরণে কোন আপত্তি করে নাই। তিন সহস্র বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া, আর্য্যের সঙ্গে আর্য্য জাতীয়, আর্য্য জাতীয়ের সঙ্গে ভিন্ন জাতীয়, ভিন্ন জাতীয়ের সঙ্গে ভিন্ন জাতীয়;—মগধের সঙ্গে কান্যকুব্জ, কান্যকুব্জের সঙ্গে দিল্লী, দিল্লীর সঙ্গে লাহোর, হিন্দুর সঙ্গে পাঠান, পাঠানের সঙ্গে মোগল, মোগলের সঙ্গে ইংরাজ;—সকলের সঙ্গে সকলে বিবাদ করিয়া, চিরপ্রজ্বলিত সমরানলে দেশ দগ্ধ করিয়াছে। কিন্তু সে সকল কেবল রাজায়২ যুদ্ধ; সাধারণ হিন্দু সমাজ কখন কাহারও হইয়া কাহারও সহিত যুদ্ধ করে নাই। হিন্দু রাজগণ অথবা হিন্দুস্থানের রাজগণ, ভূয়োভূয়ঃ ভিন্ন জাতি কর্ত্তৃক জিত হইয়াছে, কিন্তু

সাধারণ হিন্দুসমাজ যে কখন কোন পর-জাতি কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছে, এমত বলা যাইতে পারে না; কেননা সাধারণ হিন্দুসমাজ কখন কোন পরজাতির সঙ্গে যুদ্ধ করে নাই।

এই তর্কে হিন্দু জাতির দীর্ঘকালগত পরাধীনতার দ্বিতীয় কারণ আসিয়া প-ড়িল। সে কারণ,—হিন্দু সমাজের অনৈ-ক্য, সমাজ মধ্যে জাতি-প্রতিষ্ঠার অভাব, জাতি-হিতৈষার অভাব, অথবা অন্য যাহাই বলুন। আমরা সবিস্তারে তাহা বুঝাইতেছি।

আমি হিন্দু, তুমি হিন্দু, রাম হিন্দু, যদু হিন্দু, আরও লক্ষ২ হিন্দু আছে। এই লক্ষ লক্ষ হিন্দুমাত্রেরই যাহাতে মঙ্গল, তা-হাতেই আমার মঙ্গল। যাহাতে তাহা-দের মঙ্গল নাই, আমারও তাহাতে মঙ্গল নাই। অতএব সকল হিন্দুর যাহাতে ম-ঙ্গল হয়, তাহাই আমার কর্ত্তব্য। যা-হাতে কোন হিন্দুর অমঙ্গল হয়, তাহা আমার অকর্ত্তব্য। যেমন আমার এইরূপ কর্ত্তব্য, আর এই রূপ অকর্ত্তব্য, তোমা-রও তদ্রূপ, রামের তদ্রূপ, যদুরও তদ্রূপ, সকল হিন্দুরই তদ্রূপ। সকল হিন্দুরই যদি এক রূপ কার্য্য হইল, তবে সকল হিন্দুর কর্ত্তব্য যে এক পরামর্শী, এক মতাবলম্বী, একত্র-মিলিত হইয়া কার্য্য করে। এই জ্ঞান জাতি প্রতিষ্ঠার প্রথম ভাগ; অ-র্দ্ধাংশ মাত্র।

হিন্দু জাতি ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য অ-নেক জাতি আছে। তাহাদের মঙ্গল মা-ত্রেই আমাদের মঙ্গল হওয়া সম্ভব নহে। অনেক স্থানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল। যেখানে তাহাদের মঙ্গলে আ-মাদের অমঙ্গল, সেখানে তাহাদের মঙ্গল যাহাতে না হয়, আমরা তাহাই করিব। ইহাতে পরজাতিপীড়ন করিতে হয়, করিব। অপিচ, যেমন তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল ঘটিতে পারে, তেম-নি আমাদের মঙ্গলে তাহাদের অমঙ্গল হইতে পারে। হয় হউক, আমরা সে জন্য আত্মজাতির মঙ্গল সাধনে বিরত হ-ইব না; পরজাতির অমঙ্গল সাধন করিয়া আত্মমঙ্গল সাধিতে হয় তাহাও করিব। জাতি প্রতিষ্ঠার এই দ্বিতীয় ভাগ।

দেখা যাইতেছে, যে,এই রূপ মনো-বৃত্তি নিষ্পাপ পরিশুদ্ধ ভাব বলিয়া স্বী-কার করা যাইতে পারে না। ইহার গুরু-তর দোষাবহ বিকার আছে। সেই বিকা-রে, জাতিসাধারণের এরূপ ভ্রান্তি জন্মে যে, পরজাতির মঙ্গল মাত্রেই স্বজাতির অমঙ্গল, পরজাতির অমঙ্গল মাত্রেই স্বজা-তির মঙ্গল বলিয়া বোধ হয়। এই কুসংস্কা-রের বশবর্ত্তী হইয়া ইউরোপীয়েরা অনেক দুঃখ ভোগ করিয়াছে। অনর্থক ইহার জন্যে অনেক বার সমরানলে ইউরোপ দগ্ধ করিয়াছে; বহু-লোক-ক্ষয়কারী "সক্ষেষণ্ যুদ্ধ" এই সামাজিক চিত্তবিকারের ফল। গত বর্ষের ভয়ঙ্কর ফরাসিপ্রুষীয় যুদ্ধ এই বিষরক্ষে জন্মিয়াছিল। অদ্যাপিও ইউ-রোপে অনেক কুসংস্কার এই বিষরক্ষকে অবলম্বন করিয়া বাড়িতেছে। যথা—"প্রোটেক্সন্।"

জাতি-প্রতিষ্ঠা ভালই হউক বা ম-ন্দই হউক, যে জাতি মধ্যে ইহা বলবৎ হয়, সে জাতি অন্য জাতি অপেক্ষা প্র-বলতা লাভ করে। আজি কালি এই জ্ঞান ইউরোপে বিশেষ প্রধান, এবং ইহার

প্রভাবে তথায় অনেক বিষম রাজ্যবিপ্লব ঘটিতেছে। ইহার প্রভাবে ইটালি এক রাজ্য ভুক্ত হইয়াছে। ইহারই প্রভাবে বিষম প্রতাপশালী নূতন জর্ম্মন সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। আরও কি হইবে বলা যায় না।

এমত বলি না যে, ভারতবর্ষে এই জাতি প্রতিষ্ঠা কস্মিন্ কালে ছিল না। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আর্য্য জাতীয়েরা চিরকাল ভারতবর্ষবাসী নহে। অন্যত্র হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া, তদ্দেশ অধিকার করিয়াছিল। প্রথম আর্য্য জয়ের সময়ে বেদাদির সৃষ্টি হয়, এবং সেই সময়কেই পণ্ডিতেরা বৈদিক কাল কহেন। বৈদিক কালে এবং তাহার অব্যবহিত পরেই জাতি প্রতিষ্ঠা যে আর্য্যগণের মধ্যে বিশেষ বলবৎ ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ বৈদিক মন্ত্রাদি মধ্যে পাওয়া যায়। তৎকালিক সমাজ-নিয়ন্তা ব্রাহ্মণেরা যে রূপে সমাজ বিধি-বদ্ধ করিয়াছিল, তাহাও ঐ জ্ঞানের পরিচয় স্থল। আর্য্য বর্ণে এবং শূদ্রে যে বিষম বৈলক্ষণ্য বিধি-বদ্ধ হইয়াছে, তাহাও ইহার ফল। কিন্তু ক্রমে আর্য্যবংশ বিস্তৃত হইয়া পড়িলে আর সে জাতি প্রতিষ্ঠা রহিল না। আর্য্যবংশীয়েরা বিস্তৃত ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ অধিকৃত করিয়া স্থানে২ এক২ খণ্ড সমাজ স্থাপন করিল। ভারতবর্ষ এরূপ বহুসংখ্যক খণ্ডসমাজে বিভক্ত হইল। সমাজ ভেদ, ভাষার ভেদ, আচার ব্যবহারের ভেদ, নানাভেদ শেষে জাতিভেদে পরিণত হইল। বাহ্লিক হইতে পৌণ্ড্র পর্য্যন্ত,কাশ্মীর হইতে চোলা ও পাণ্ড্য পর্য্যন্ত সমস্ত ভারত ভূমি মক্ষিকা সমাকুল মধুচক্রের ন্যায় নানাজাতি, নানা সমাজে পরিপূর্ণ হইল। পরিশেষে, কপিলবাস্তুর রাজকুমার শাক্য সিংহের হস্তে এক অভিনব ধর্ম্মের সৃষ্টি হইলে, অন্যান্য প্রভেদের উপর ধর্ম্ম-ভেদ জন্মিল। ভিন্ন দেশ, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন রাজ্য, ভিন্ন ধর্ম্ম ; আর এক জাতীয়ত্ব কোথায় থাকে? সাগরমধ্যস্থ মীনদলবৎ ভারতবর্ষীয়েরা একতাশূন্য হইল। পরে আবার যবনেরা আসিল। যবন দিগের বংশবৃদ্ধি হইতে লাগিল। কালে, সাগরোর্ম্মির উপর সাগরোর্ম্মিবৎ নূতন নূতন যবন সম্প্রদায়, পাশ্চাত্য পর্ব্বত পার হইতে আসিতে লাগিল। দেশীয় লোকে সহস্রে২ রাজানুকম্পার লোভে বা রাজপীড়ায় যবন হইতে লাগিল। অতএব ভারতবর্ষবাসিগণ যবন হিন্দু মিশ্রিত হইল। হিন্দু মুসলমান, মোগল পাঠান্, রাজপুত মহারাষ্ট্রি, একত্র কর্ম্ম করিতে লাগিল। তখন জাতির ঐক্য কোথায়? ঐক্যজ্ঞান কিসে থাকিবে?

এই ভারতবর্ষে নানা জাতি। বাসস্থানের প্রভেদে, ভাষার প্রভেদে, বংশের প্রভেদে, ধর্ম্মের প্রভেদে, নানা জাতি বাঙ্গালী পঞ্জাবী, তৈলঙ্গী মহারাষ্ট্রী, রাজপুত জাঠ, হিন্দু মুসলমান, ইহার মধ্যে কে কাহার সঙ্গে একতাযুক্ত হইবে? ধর্ম্মগত ঐক্য থাকিলে, বংশগত ঐক্য নাই, বংশগত ঐক্য থাকিলে ভাষাগত ঐক্য নাই, ভাষাগত ঐক্য থাকিলে নিবাসগত ঐক্য নাই। রাজপুত জাঠ, এক ধর্ম্মাবলম্বী হইলে, ভিন্ন বংশীয় বলিয়া ভিন্ন জাতি ; বাঙ্গালী বেহারী এক বংশীয় হইলে ভাষাভেদে ভিন্ন জাতি ; মৈথিলি

কনোজী একভাষী হইলে, নিবাসভেদে ভিন্ন জাতি। কেবল ইহাই নহে। ভারতবর্ষের এমনই অদৃষ্ট, যেখানে কোন প্রদেশীয় লোক সর্ব্বাংশে এক; যাহাদের এক ধর্ম্ম, এক ভাষা, এক জাতি, এক দেশ, তাহাদের মধ্যেও জাতির একতা-জ্ঞান নাই। বাঙ্গালির মধ্যে বাঙ্গালি জাতির একতা বোধ নাই, শীকের মধ্যে শীক জাতির একতা বোধ নাই। ইহারও বিশেষ কারণ আছে। বহু কাল পর্য্যন্ত বহু সংখ্যক ভিন্ন জাতি এক বৃহৎ সাম্রাজ্যভুক্ত হইলে ক্রমে জাতিজ্ঞান লোপ হইতে থাকে। ভিন্ন২ নদীর মুখনির্গত জলরাশি যেমন সমুদ্রে আসিয়া পড়িলে, আর তন্মধ্যে ভেদজ্ঞান করা যায় না, বৃহৎ সাম্রাজ্যভুক্ত ভিন্ন জাতিগণের সেই রূপ ঘটে। তাহাদিগের পার্থক্য যায়, অথচ ঐক্য জন্মে না। রোমক সাম্রাজ্য মধ্যগত জাতিদিগের এই রূপ দশা ঘটিয়াছিল। হিন্দুদিগেরও তাহাই ঘটিয়াছে। জাতি-প্রতিষ্ঠা নানা কারণে ভারত বর্ষে অনেক দিন হইতে লোপ হইয়াছে। লোপ হইয়াছে বলিয়া কখন হিন্দু সমাজ কর্ত্তৃক কোন জাতীয়-কার্য্য সমাধা হয় নাই। লোপ হইয়াছে বলিয়া, সকল জাতীয় রাজাই হিন্দু রাজ্যে বিনা বিবাদে সমাজ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছেন। এই জন্যই স্বাতন্ত্র্য রক্ষার কারণ হিন্দু সমাজ কখন তর্জ্জনীর বিক্ষেপও করে নাই।

ইতিহাস-কীর্ত্তিত কাল মধ্যে কেবল দুই বার হিন্দু সমাজ মধ্যে জাতি-প্রতিষ্ঠার উদয় হইয়াছিল। এক বার, মহারাষ্ট্রে শিবজী এই মহামন্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার সিংহনাদে মহারাষ্ট্র জাগরিত হইয়াছিল। তখন মহারাষ্ট্রীয়ে মহারাষ্ট্রীয়ে ভ্রাতৃভাব হইল। এই আশ্চর্য্য মন্ত্রের বলে অজিতপূর্ব্ব মোগল সাম্রাজ্য মহারাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃক ধ্বংস প্রাপিত হইল। চিরজয়ী যবন হিন্দু কর্ত্তৃক বিজিত হইল। সমুদায় ভারতবর্ষ মহারাষ্ট্রের পদাবনত হইল। অদ্যাপিও মার্হাট্টা, ইংরাজের সঙ্গে ভারতবর্ষ ভাগে ভোগ করিতেছে।

দ্বিতীয় বারের ঐন্দ্রজালিক রণজিৎ সিংহ; ইন্দ্রজাল খাল্‌সা। জাতীয় বন্ধন দৃঢ় হইলে পাঠানদিগের স্বদেশেরও কিয়দংশ হিন্দুর হস্তগত হইল। শতদ্রু পারে সিংহনাদ শুনিয়া, নির্ভীক ইংরাজও কম্পিত হইল। ভাগ্যক্রমে ঐন্দ্রজালিক মরিল। পটুতর ঐন্দ্রজালিক ডালহৌসির হস্তে খাল্‌সা ইন্দ্রজাল ভাঙ্গিল। কিন্তু রামনগর এবং চিলিয়ানওয়ালা ইতিহাসে লেখা রহিল।

যদি কদাচিৎ কোন প্রদেশখণ্ডে জাতি প্রতিষ্ঠার উদয়ে এতদূর ঘটিয়াছিল, তবে সমুদায় ভারত এক জাতীয় বন্ধনে বদ্ধ হইলে কি না হইতে পারিত?

ইংরাজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী। ইংরাজের ধার ভারতবর্ষ কখন শোধিতে পারিবে না। ইংরাজ বাণিজ্য বাড়াইতেছে, রেইলওয়ে বসাইতেছে, টেলিগ্রাফ খাটাইতেছে, শান্তিরক্ষা করিতেছে, সদ্বিধি প্রচার ও সুবিচার বিতরণ করিতেছে, কিন্তু এ সকলের জন্য বলি না। ইংরাজ আমাদিগকে নূতন কথা শিখাইতেছে। যাহা আমরা কখন জানিতাম না, তাহা জানাইতেছে; যাহা কখন দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই, তাহা দেখাইতেছে,

শুনাইতেছে,বুঝাইতেছে; যে পথে কখন চলি নাই সে পথে কেমন করিয়া চলিতে হয়, তাহা দেখাইয়া দিতেছে। সেই সকল শিক্ষার মধ্যে অনেক শিক্ষা অমূল্য। যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরাজের চিত্তভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে দুইটির আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম—স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতিপ্রতিষ্ঠা। ইহা কাহাকে বলে তাহা হিন্দু জানিত না।

কামিনীকুসুম।

১

কে চাহে খাইতে মধু বিনা বঙ্গকুসুমে?—
এমন কোথায় আর
কোমল কুসুম হার,
পরিতে দেখিতে ছুঁতে আছে এ নিখিল ভূমে?
কোথা হেন শতদল,
বুকে করি পরিমল,
থাকে প্রিয়মুখ চেয়ে মধুমাখা শরমে?—
বঙ্গকুলবালা বিনা মধু কোথা কুসুমে?

২

কি ফুলে তুলনা দিব বল চূতমুকুলে?
কোথায় এমন স্থল,
খুঁজিলে এ ধরাতল,
যেখানে এমন মৃদু মধু ঝরে রসালে?
যেখানে এমন বাস
নব রসে পরকাশ,
নবীন যৌবনকালে মধু ওঠে উথুলে—
বঙ্গকুলবালা বিনা মধু কোথা মুকুলে?

৩

মধুর সৌরভময় ভাব দেখি চামেলি—
ঢালে কি অতুল বাস
মুখে তুলি মৃদু হাস,
তরুকোলে তনু রেখে, অলিকুলে আকুলি!
কি জাতি বিদেশী ফুল
আছে এর সমতুল,
রাখিতে হৃদয় মাঝে করে চিতপুতুলি?—
বঙ্গকুলনারী এর তুলনাই কেবলি!

৪

আছে কি জগতে বেল মল্লিয়ার তুলনা?—
সরল মধুর প্রাণ,
সুধাতে মিশায়ে ঘ্রাণ,
প্রবেশে মুনির মনে নাহি জানে ছলনা;
নাহি পরে বেশবাস,
ফুটে থাকে বার মাস,
অধরে অমিয় ধরে, হৃদে পূরে বাসনা—
বঙ্গের বিধবা সম পাব কোথা ললনা!

৫

কে দেবে বিলাতিফুল লিলি পদ্মে উপমা?
দেশে যে কুমদ আছে
আসুক তাহারি কাছে,
তখন দেখিব বুঝে কার কত গরিমা।
বিধুর কিরণ কোলে
কুমুদ যখন দোলে,
কি মাধুরী শোভে তায় কে বোঝে সে মহিমা—
কে দেবে বিলাতিফুল লিলি পদ্মে উপমা?

৬

কি ফুলে তুলনা তুলি বল দেখি চাঁপাতে?
প্রগাঢ় সুবাস যার
প্রেমের পুলকাগার,
বঙ্গবাসী রঙ্গরসে মত্ত আছে যাহাতে।
কোথায় ঈরানী গুল
এ ফুলের সমতুল?
কোথা ফিঁকে ভায়োলেট্ গন্ধ নাহি তাহাতে—
কি ফুল তুলনা দিতে আছে বল চাঁপাতে?

৭

কতই কুসুম আরো আছে বঙ্গ-আগারে—
মালতী, কেতকী, জাতী
বাঁধুলি, কামিনী, পাঁতি,

টগর মল্লিকা নাগ নিশিগন্ধা শোভা রে।
কে করে গণনা তার—
অশোক, কিংশুক আর,
কত শত ফুলকুল ফোটে নিশিতুষারে—
সুধার লহরীমাখা বঙ্গকুল মাঝারে!

৮

কিবা সে অপরাজিতা নীলিময় মাধুরী!—
লতায় লতার পরে,
ভ্রমরে হৃদয়ে ধরে,
লাজে অবনত-মুখী, তনুখানি আবরি।
তাই এত ভাল বাসি
কালোতে চপলা হাসি—
কে খোঁজে রে প্রজাপতি পেলে হেন ভ্রমরী?—
মরি কি অপরাজিতা নীলিময় মাধুরী।

৯

এ মাধুরী সুধারস পাব কোথা কুসুমে?
এমন কোথায় আর
কোমল কুসুম হার,
পরিতে দেখিতে ছুঁতে আছে এ নিখিল ভুমে?
কোথা হেম শতদল,
বুকে করি পরিমল,
থাকে প্রিয়মুখ চেয়ে মধুমাখা শরমে—
বঙ্গকুলবালা বিনা মধু কোথা কুসুমে?

বিষবৃক্ষ।

উপন্যাস।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নগেন্দ্রের নৌকা যাত্রা।

নগেন্দ্র দত্ত নৌকারোহণে যাইতেছিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাস, তুফানের সময়; ভার্য্যা সূর্য্যমুখী মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, দেখিও নৌকা সাবধানে লইও, তুফান দেখিলে লাগাইও। ঝড়ের সময় কখন নৌকায় থাকিও না। নগেন্দ্র স্বীকৃত হইয়া নৌকারোহণ করিয়াছিলেন; নহিলে সূর্য্যমুখী ছাড়িয়া দেন না। কলিকাতায় না গেলেও নহে, অনেক মোকদ্দমা মামলার তদ্বির করিতে হইবে।

নগেন্দ্রনাথ মহা ধনবান্ ব্যক্তি, জমিদার। তাঁহার বাসস্থান গোবিন্দপুর। যে জেলায় সেই গ্রাম তাহার নাম গোপন রাখিয়া, হরিপুর বলিয়া তাহার উল্লেখ করিব। নগেন্দ্র বাবু যুবা পুরুষ, বয়ঃক্রম ত্রিংশৎ বর্ষ মাত্র। নগেন্দ্রনাথ আপনার বজরায় যাইতেছিলেন। প্রথম দুই এক দিন নির্ব্বিঘ্নে গেল। নগেন্দ্র দেখিতে২ গেলেন, নদীর জল অবিরল চল্ চল্ চলিতেছে—ছুটিতেছে—নাচিতেছে—হাসিতেছে—ডাকিতেছে। জল অশ্রান্ত—অনন্ত—ক্রীড়াময়। জলের ধারে তীরে তীরে মাঠে মাঠে রাখালেরা গোরু চরাইতেছে, কেহ বা বৃক্ষের তলায় বসিয়া গান করিতেছে, কেহ তামাকু খাইতেছে, কেহ বা মারামারি করিতেছে, কেহ ভুজা খাইতেছে। কৃষকে লাঙ্গল চষিতেছে, গোরু ঠেঙ্গাইতেছে, গোরুকে

মানুষের অধিক করিয়া গালি দিতেছে, কৃষাণকেও কিছু কিছু ভাগ দিতেছে। মাঠে মাঠে কলসী, ছেঁড়া কাঁথা, পচা মাছুর লইয়া কৃষকের মহিষীরা, রূপার তাবিজ, নাকছাবি, পিতলের পৈছে, দুই মাসের ময়লা পরিধেয় বস্ত্র, মসীনিন্দিত গায়ের বর্ণ, রুক্ষ কেশ, লইয়া বাজার বসাইতেছেন। তাহার মধ্যে কোন সুন্দরী মাতায় কাদা মাখিয়া মাতা ঘসিতেছেন, কেহ ছেলে ঠেঙ্গাইতেছেন, কেহ কোন অনুদ্দিষ্টা, অব্যক্তনাম্নী, প্রতিবাসিনীর সঙ্গে উদ্দেশে কোন্দল করিতেছেন, কেহ কাষ্ঠে কাপড় আছড়াইতেছেন। কোন কোন ভদ্রগ্রামের ঘাটে কুলকামিনীরা ঘাট আলো করিতেছেন। প্রাচীনারা বক্তৃতা করিতেছেন,—মধ্যমবয়স্কারা শিবপূজা করিতে ছেন—যুবতীরা ঘোমটা দিয়া ডুব দিতে ছেন—আর বালক বালিকারা চেঁচাইতেছে, কাদা মাখিতেছে,পূজার ফুল কুড়াইতেছে, সাঁতার দিতেছে, সকলের গায়ে জল দিতেছে, কখন কখন ধ্যানে মগ্না মুদিতনয়না কোন গৃহিনীর সম্মুখস্থ কাদার শিব লইয়া পলাইতেছে। ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা নিরীহ ভাল মানুষের মত আপন মনে গঙ্গার স্তব পড়িতেছেন, পূজা করিতেছেন, এক একবার আগ্রীবা নিমজ্জিতা কোন যুবতীর প্রতি অলক্ষ্যেতে চাহিয়া লইতেছেন। আকাশে সাদা মেঘ; রৌদ্র তপ্ত হইয়া ছুটিতেছে, তাহার নীচে কৃষ্ণবিন্দুবৎ পাখী উড়িতেছে, নারিকেলগাছে চীল বসিয়া, রাজমন্ত্রীর মত চারি দিক্ দেখিতেছে, কাহার কিসে ছোঁ মারিবে। বক ছোট লোক, কাদা ঘাঁটিয়া বেড়াইতেছে। ডাহুক রসিক লোক, ডুব মারিতেছে। আর আর পাখী হাল্কা লোক, কেবল উড়িয়া বেড়াইতেছে। হাটুরিয়া নৌকা হটর হটর করিয়া যাইতেছে,—আপনার প্রয়োজনে। ক্ষেয়া নৌকা গজেন্দ্র গমনে যাইতেছে,—পরের প্রয়োজনে। বোঝাই নৌকা যাইতেছে না,—তাহাদের প্রভুর প্রয়োজন মাত্র।

নগেন্দ্র প্রথম দুই এক দিন দেখিতে দেখিতে গেলেন। পরে এক দিন আকাশে মেঘ উঠিল, মেঘ আকাশ ঢাকিল, নদীর জল কাল হইল, গাছের মাথা কটা হইল, মেঘের কোলে বক উড়িল, নদী নিস্পন্দ হইল। নগেন্দ্র নাবিকদিগকে আজ্ঞা করিলেন, "নৌকাটা কিনারায় বাঁধিও।" রহমত মোল্লা মাঝি তখন নেমাজ করিতেছিল, কথার উত্তর দিল না। রহমত আর কখন মাঝিগিরি করে নাই—তাহার নানার ফুফু মাঝির মেয়ে ছিল, তিনি সেই গর্ব্বে মাঝিগিরির উমেদার হইয়াছিলেন, কপালক্রমে সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। রহমত হাঁকে ডাকে খাটো নন্, নেমাজ সমাপ্ত হইলে বাবুর দিকে ফিরিয়া বলিল "ভয় কি হজুর! আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া থাকুন্।" রহমত মোল্লার এত সাহসের কারণ এই যে, কিনারা অতি নিকট, অবিলম্বেই কিনারায় নৌকা লাগিল। তখন নাবিকেরা নামিয়া নৌকা কাছি করিল।

বোধ হয় রহমত মোল্লার সঙ্গে দেবতার কিছু বিবাদ ছিল, ঝড় কিছু গুরুতর বেগে আসিল। ঝড় আগে আসিল। ঝড় ক্ষণেক কাল গাছপালার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ

National Library. Acc, no. G 3633.

করিয়া সহোদর বৃষ্টিকে ডাকিয়া আনিল। তখন দুই ভাই বড় মাতামাতি আরম্ভ করিল। ভাই বৃষ্টি, ভাই ঝড়ের কাঁধে চড়িয়া উড়িতে লাগিল। দুই ভাই গাছের মাথা ধরিয়া নোয়ায়, ডাল ভাঙ্গে, লতা ছেঁড়ে, ফুল লোপে, নদীর জল উড়ায়, নানা উৎপাত করে। এক ভাই রহমত মোল্লার টুপি উড়াইয়া লইয়া গেল, আর এক ভাই তাহার দাড়িতে প্রস্রবণের সৃজন করিল। মাল্লারা পাল মুড়ি দিয়া বসিল। বাবু সব সাসী ফেলিয়া দিলেন। ভৃত্যেরা নৌকাসজ্জা সকল রক্ষা করিতে লাগিল।

নগেন্দ্র বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। নৌকা হইতে ঝড়ের ভয়ে নামিলে, নাবিকেরা কাপুরুষ মনে করিবে—না নামিলে সূর্য্যমুখীর কাছে মিথ্যাবাদী হইতে হয়। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন 'তাহাতেই বা ক্ষতি কি?' ক্ষতি কি আমরা জানি না, কিন্তু নগেন্দ্র ক্ষতি বিবেচনা করিতেছিলেন। এমত সময়ে রহমত মোল্লা স্বয়ং বলিল যে "হুজুর? পুরাতন কাছি কি জানি কি হয়, ঝড় বড় বাড়িল, নৌকা হইতে নামিলে ভাল হইত।" সুতরাং নগেন্দ্র নামিলেন।

নিরাশ্রয়ে, নদীতীরে ঝড় বৃষ্টিতে দাঁড়ান কাহার সাধ্য নহে। বিশেষ সন্ধ্যা হইল, ঝড় থামিল না, সুতরাং আশ্রয়ানুসন্ধানে যাওয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া নগেন্দ্র গ্রামাভিমুখে চলিলেন। নদীতীর হইতে গ্রাম কিছু দূরবর্ত্তী, নগেন্দ্র পদব্রজে কর্দ্দমময় পথে চলিলেন। বৃষ্টি থামিল, ঝড়ও অল্পমাত্র রহিল, কিন্তু আকাশ মেঘ-পরিপূর্ণ; সুতরাং রাত্রে আবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। নগেন্দ্র চলিলেন, ফিরিলেন না।

আকাশের মেঘাড়ম্বর কারণ, রাত্রি প্রদোষ কালেই ঘনান্ধ তমোময়ী হইল। গ্রাম, গৃহ, প্রান্তর, পথ, নদী, কিছুই লক্ষ্য হয় না। কেবলমাত্র, বনবিটপী সকল, সহস্র সহস্র খদ্যোতমালা-পরিমণ্ডিত হইয়া হীরক-খচিত কৃত্রিম বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। কেবলমাত্র গর্জ্জনবিরত শ্বেত-কৃষ্ণাভ মেঘমালার মধ্যে হ্রস্বদীপ্তি সৌদামিনী মধ্যে মধ্যে চমকিতেছিল—স্ত্রীলোকের ক্রোধ একেবারে হ্রাস প্রাপ্ত হয় না। কেবলমাত্র নব-বারি-সমাগম-প্রফুল্ল ভেকেরা উৎসব করিতেছিল, ঝিল্লীরব মনোযোগ পূর্ব্বক লক্ষ্য করিলে শুনা যায়, রাবণের চিতার ন্যায় অশ্রান্তরব করিতেছে, কিন্তু বিশেষ মনোযোগ না করিলে লক্ষ্য হয় না। শব্দের মধ্যে বৃক্ষাগ্র হইতে বৃক্ষপত্রের উপর বর্ষাবশিষ্ট বারিবিন্দুর পতনশব্দ, বৃক্ষতলস্থ বর্ষাজলে পত্রচ্যুত জলবিন্দুর পতন শব্দ, পথিস্থ অনিঃসৃত জলে শৃগালের পদসঞ্চার শব্দ, কদাচিৎ বৃক্ষারূঢ় পক্ষীর আর্দ্র পক্ষের জল মোচনার্থ পক্ষবিধুনন-শব্দ। মধ্যে মধ্যে শমিতপ্রায় বায়ুর ক্ষণিক গর্জ্জন, তৎসঙ্গে বৃক্ষপত্রচ্যুত বারিবিন্দু সকলের এককালীন পতন শব্দ। ক্রমে নগেন্দ্র দূরে একটা আলো দেখিতে পাইলেন। জলপ্লাবিত ভূমি অতিক্রম করিয়া, বৃক্ষচ্যুত-বারি কর্ত্তৃক সিক্ত হইয়া, বৃক্ষতলস্থ শৃগালের ভীতি-বিধান করিয়া, নগেন্দ্র সেই আলোকাভিমুখে চলিলেন। বহু কষ্টে আলোক সন্নিধি উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন এক ইষ্টক নির্ম্মিত

প্রাচীন বাসগৃহ হইতে আলো নির্গত হইতেছে। গৃহের দ্বার মুক্ত। নগেন্দ্র ভৃত্যকে বাহিরে রাখিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, গৃহের অবস্থা ভয়ানক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।
দীপ নির্ব্বাণ।

গৃহটী নিতান্ত সামান্য নহে। কিন্তু এখন তাহাতে সম্পদ লক্ষণ কিছুই নাই। প্রকোষ্ঠ সকল ভগ্ন, মলিন, মনুষ্য-সমাগম-চিহ্ন-বিরহিত। কেবলমাত্র পেচক মূষিক ও নানাবিধ কীট পতঙ্গাদি সমাকীর্ণ। একটীমাত্র কক্ষে আলো জ্বলিতেছিল। সেই কক্ষমধ্যে নগেন্দ্র প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, কক্ষমধ্যে মনুষ্যজীবনোপযোগী দুই একটা সামগ্রী আছে মাত্র, কিন্তু সে সকল সামগ্রীই দারিদ্র্যব্যঞ্জক। দুই একটা হাঁড়ি—একটা ভাঙ্গা উনান—তিন চারি খানি তৈজস—ইহাই কক্ষালঙ্কার। দেওয়ালে কালি, কোণে ঝুল; চারি দিকে আরশুলা, মাকড়সা, টিক্‌টিকি, ইন্দুর বেড়াইতেছে। এক ছিন্ন শয্যায় এক জন প্রাচীন শয়ন করিয়া আছেন। দেখিয়া বোধ হয়, তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত। চক্ষু ম্লান, নিশ্বাস প্রখর, ওষ্ঠ কম্পিত। শয্যাপার্শ্বে গৃহচ্যুত ইষ্টক খণ্ডের উপর একটী মৃণ্ময় প্রদীপ, তাহাতে তৈলাভাব; শয্যোপরিস্থিত নরদেহেও তাই। আর শয্যাপার্শ্বে আরও এক প্রদীপ ছিল,—এক অনিন্দিত-গৌরকান্তি স্নিগ্ধ-জ্যোতির্ম্ময়-রূপিণী বালিকা।

তৈলহীন প্রদীপের জ্যোতিঃ অপ্রখর বলিয়াই হউক, অথবা গৃহবাসী দুই জন আশুভাবী বিরহের চিন্তায় প্রগাঢ়তর বিমনা থাকার কারণেই হউক, নগেন্দ্রের প্রবেশ কালে, কেহই তাঁহাকে দেখিল না। তখন নগেন্দ্র দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া সেই প্রাচীনের মুখনির্গত চরমকালিক দুঃখের কথা সকল শুনিতে লাগিলেন। এই দুই জন, প্রাচীন এবং বালিকা এই বহুলোক-পূর্ণ লোকালয়ে নিঃসহায়। এক দিন ইহাদিগের সম্পদ ছিল, লোকজন দাস দাসী সহায় সৌষ্ঠব সব ছিল। কিন্তু চঞ্চলা কমলার কৃপার সঙ্গে সঙ্গে একে একে সকলই গিয়াছিল। সদ্য-সমাগত দারিদ্র্যের পীড়নে পুত্র কন্যার মুখমণ্ডল, হিমানীসিক্ত পদ্মবৎ দিন দিন ম্লান দেখিয়া, অগ্রেই গৃহিণী নদী-সৈকত শয্যায় শয়ন করিলেন। আর সকল তারাগুলিনও সেই চাঁদের সঙ্গে সঙ্গে নিবিল। এক বংশধর পুত্র, মাতার চক্ষের মণি, পিতার বার্দ্ধক্যের ভরসা, সেও পিতৃ সমক্ষে চিতারোহণ করিল। কেহ রহিল না, কেবল প্রাচীন আর এই লোকমনোমোহিনী বালিকা সেই বিজন বনবেষ্টিত ভগ্ন গৃহে বাস করিতে লাগিল। পরস্পরে পরস্পরের এক মাত্র উপায়। কুন্দ-নন্দিনী, বিবাহের বয়স অতিক্রম করিয়াছিল, কিন্তু কুন্দ পিতার অন্ধের যষ্টি, এই সংসার বন্ধনের এখন একমাত্র গ্রন্থি; বৃদ্ধ প্রাণ ধরিয়া তাহাকে পরহস্তে সমর্পণ করিতে পারিলেন না। "আর কিছু দিন যাক্, কুন্দকে বিলাইয়া দিয়া কোথায় থাকিব? কি লইয়া থাকিব?" বিবাহের কথা মনে হইলে, বৃদ্ধ এই রূপ ভাবিতেন। এ কথা তাঁহার মনে হইত না যে, যে দিন তাঁহার ডাক পড়িবে,

সে দিন কুন্দকে কোথায় রাখিয়া যাইবেন? আজি অকস্মাৎ যমদূত আসিয়া শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইল। তিনি ত চলিলেন। কুন্দনন্দিনী কালি কোথায় দাঁড়াইবে?

এই গভীর, অনিবার্য্য যন্ত্রণা মুমূর্ষুর প্রতি নিশ্বাসে ব্যক্ত হইতেছিল। অবিরল মুদিতোন্মুখনেত্রে বারিধারা পড়িতেছিল। আর শিরোদেশে প্রস্তরময়ী মূর্ত্তির ন্যায় সেই ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা স্থিরদৃষ্টে মৃত্যুমেঘাচ্ছন্ন পিতৃমুখ প্রতি চাহিয়াছিল। আপনা ভুলিয়া, কালি কোথা যাইবে তাহা ভুলিয়া, কেবল গমনোন্মুখের মুখ প্রতি চাহিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধের বাক্যস্ফূর্ত্তি অস্পষ্টতর হইতে লাগিল। নিশ্বাস কণ্ঠাগত হইল, চক্ষু নিস্তেজ হইল, ব্যথিত প্রাণ ব্যথা হইতে নিষ্কৃতি পাইল। সেই নিভৃত কক্ষে, স্তিমিত প্রদীপে, কুন্দ নন্দিনী একাকিনী, পিতার মৃত দেহ ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া রহিলেন। নিশা ঘনান্ধকারা; বাহিরে এখনও বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছিল, বৃক্ষপত্রে তাহার শব্দ হইতেছিল, বায়ু রহিয়া রহিয়া গর্জ্জন করিতেছিল, ভগ্ন গৃহের কপাট সকল শব্দিত হইতেছিল। গৃহমধ্যে নির্ব্বাণোন্মুখ চঞ্চল ক্ষীণ প্রদীপালোক, ক্ষণে ক্ষণে শব মুখে পড়িয়া আবার ক্ষণে ক্ষণে অন্ধকারবৎ হইতেছিল। সে প্রদীপে অনেকক্ষণ তৈলসেক হয় নাই। এই সময়ে দুই চারি বার উজ্জ্বলতর হইয়া প্রদীপ নিবিয়া গেল।

তখন নগেন্দ্র নিঃশব্দ পদসঞ্চারে গৃহ দ্বার হইতে অপসৃত হইলেন!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ছায়া পূর্ব্বগামিনী।

নিশীথ সময়! ভগ্ন গৃহমধ্যে কুন্দনন্দিনী ও তাহার পিতার শব! কুন্দ ডাকিল, "বাবা"। কেহ উত্তর দিল না। কুন্দ এক বার মনে করিল পিতা ঘুমাইলেন, আবার মনে করিল, বুঝি মৃত্যু— কুন্দ সে কথা স্পষ্ট মনে আনিতে পারিল না। শেষে, কুন্দ আর ডাকিতেও পারিল না, ভাবিতেও পারিল না। অন্ধকারে ব্যজন হস্তে যেখানে তাহার পিতা জীবিতাবস্থায় শয়ান ছিলেন, এক্ষণে যেখানে তাঁহার শব পড়িয়া ছিল, সেই স্থানে বায়ু সঞ্চালন করিতে লাগিল। নিদ্রাই শেষে স্থির করিল, কেননা মরিলে কুন্দের দশা কি হইবে? দিবা রাত্র জাগরণে এবং এক্ষণকার ক্লেশে বালিকার তন্দ্রা আসিল। কুন্দনন্দিনী রাত্রি দিবা জাগিয়া পিতৃসেবা করিতেছিল। নিদ্রাকর্ষণ হইলে কুন্দনন্দিনী তালবৃন্ত হস্তে সেই অনাবৃত কঠিন শীতল হর্ম্মতলে আপন মৃণালনিন্দিত বাহূপরি মস্তক রক্ষা করিয়া নিদ্রা গেল।

তখন কুন্দনন্দিনী স্বপ্ন দেখিল। দেখিল যেন রাত্রি অতি পরিষ্কার জ্যোৎস্নাময়ী। আকাশ উজ্জ্বল নীল, সেই প্রভাময় নীল আকাশ মণ্ডলে যেন বৃহচ্চন্দ্রমণ্ডলের বিকাশ হইয়াছে। এত বড় চন্দ্রমণ্ডল কুন্দ কখন দেখে নাই। তাহার দীপ্তিও অতিশয় ভাস্বর, অথচ নয়ন-স্নিগ্ধকর। কিন্তু সেই রমণীয় প্রকাণ্ড চন্দ্রমণ্ডল মধ্যে চন্দ্র নাই; তৎপরিবর্ত্তে কুন্দ মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তিনী এক অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় দৈবী মূর্ত্তি দেখিল। সেই জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি-সনাথ

চন্দ্রমণ্ডল যেন উচ্চ গগন পরিত্যাগ করিয়া, ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে নীচে নামিতেছিল। ক্রমে সেই চন্দ্রমণ্ডল, সহস্র শীতলরশ্মি চ্ছুরিত করিয়া, কুন্দনন্দিনীর মস্তকের উপর আসিল। তখন কুন্দ দেখিল যে, সেই মণ্ডল-মধ্যশোভিনী, আলোকময় কিরীট-কুণ্ডলাদি ভূষণালঙ্কৃতা মূর্ত্তি স্ত্রীলোকের আকৃতি। রমণীয় কারুণ্য পরিপূর্ণ মুখমণ্ডলে, স্নেহ পরিপূর্ণ হাস্যে অধর স্ফুরিত হইতেছে। তখন কুন্দ সভয়ে,সানন্দে চিনিল, যে সেই করুণাময়ী তাহার বহুকাল-মৃতা প্রসূতির অবয়ব ধারণ করিয়াছে। আলোকময়ী সস্নেহাননে কুন্দকে ভূতল হইতে উত্থিতা করিয়া ক্রোড়ে লইলেন। এবং মাতৃহীনা কুন্দ বহু কাল পরে "মা" কথা মুখে আনিয়া যেন চরিতার্থ হইল। পরে,জ্যোতির্ম্মণ্ডল-মধ্যস্থা কুন্দের মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন "বাছা! তুই বিস্তর দুঃখ পাইতেছিস্। আমি জানিতেছি যে, বিস্তর দুঃখ পাইবি। তোর এই বালিকা বয়ঃ, এই কুসুমকোমল শরীর, তোর শরীরে সে দুঃখ সহিবে না। অতএব তুই আর এখানে থাকিস্ না। পৃথিবী ত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে আয়।" কুন্দ যেন ইহাতে উত্তর করিল যে, "কোথায় যাইব?" তখন কুন্দের জননী ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা উজ্জ্বল প্রজ্জ্বলিত নক্ষত্র-লোক দেখাইয়া দিয়া কহিলেন, যে "ঐ দেশে।" কুন্দ তখন যেন বহু দূরবর্ত্তী, বেলাবিহীন অনন্তসাগরপারস্থবৎ, অপরিজ্ঞাত নক্ষত্র লোক দৃষ্টি করিয়া কহিল,"আমি অত দূর যাইতে পারিব না; আমার বল নাই।" তখন ইহা শুনিয়া জননীর কারুণ্য-প্রফুল্ল অথচ গম্ভীর মুখমণ্ডলে ঈষৎ অনাহ্লাদ-জনিতবৎ ভ্রূকুটী বিকাশ হইল. এবং তিনি মৃদুগম্ভীর স্বরে কহিলেন, "বাছা যাহা তোমার ইচ্ছা তাহা কর। কিন্তু আমার সঙ্গে আসিলে ভাল করিতে। ইহার পর তুমি ঐ নক্ষত্র-লোক প্রতি চাহিয়া তথায় আসিবার জন্য কাতর হইবে। আমি আর এক বার তোমাকে দেখা দিব। যখন তুমি মনঃপীড়ায় ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া, আমাকে মনে করিয়া, আমার কাছে আসিবার জন্য কাঁদিবে,তখন আমি আবার আসিয়া দেখা দিব, তখন আমার সঙ্গে আসিও। এখন তুমি আমার অঙ্গুলি সঙ্কেত-নীতনয়নে, আকাশ প্রান্তে চাহিয়া দেখ। আমি তোমাকে দুইটী মনুষ্য মূর্ত্তি দেখাইতেছি। এই দুই মনুষ্যই ইহলোকে তোমার শুভাশুভের কারণ হইবে। যদি পার তবে ইহাদিগকে দেখিলে বিষধরবৎ প্রত্যাখ্যান করিও। তাহারা যে পথে যাইবে, সে পথে যাইও না।"

তখন জ্যোতির্ম্ময়ী, অঙ্গুলি সঙ্কেতের দ্বারা গগনোপান্ত দেখাইলেন। কুন্দ তৎসঙ্কেতানুসারে দেখিল, নীল গগন-পটে এক দেবনিন্দিত পুরুষমূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে। তাহার উন্নত, প্রশস্ত, প্রশান্ত-ললাট ; সরল, সকরুণ, কটাক্ষ্য ; তাহার মরালবৎ দীর্ঘ, ঈষৎ বঙ্কিম গ্রীবা, এবং অন্যান্য মহাপুরুষ লক্ষণ দেখিয়া, কাহারও বিশ্বাস হইতে পারে না যে, ইঁহা হইতে আশঙ্কা সম্ভবে। তখন ক্রমে২ সে প্রতিমূর্ত্তি জলবুদ্বুদবৎ গগনপটে বিলীন হইলে, জননী কুন্দকে কহিলেন ; "ইহার দেবকান্ত রূপ দেখিয়া ভুলিও না।

ইনি মহদাশয় হইলেও, তোমার অমঙ্গলের কারণ। অতএব বিষধর বোধে ইঁহাকে ত্যাগ করিও।" পরে আলোকময়ী পুনশ্চ "ঐ দেখ" বলিয়া গগনপ্রান্তে নির্দ্দেশ করিলে, কুন্দ দ্বিতীয় মূর্ত্তি আকাশের নীলপটে চিত্রিত দেখিল। কিন্তু এবার পুরুষ মূর্ত্তি নহে। কুন্দ তথায় এক উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গিনী, পদ্মপলাশ-নয়নী, যুবতী দেখিল। তাহাকে দেখিয়াও কুন্দ ভীতা হইল না। জননী কহিলেন, "এই শ্যামাঙ্গিনী নারী বেশে রাক্ষসী। ইহাকে দেখিলে পলায়ন করিও।"

ইহা বলিতে২ সহসা আকাশ অন্ধকারময় হইল, বৃহচ্চন্দ্রমণ্ডল আকাশে অন্তর্হিত হইল, এবং তৎসহিত তন্মধ্যসম্বর্ত্তিনী তেজোময়ীও অন্তর্হিতা হইলেন। তখন কুন্দের নিদ্রাভঙ্গ হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এই সেই।

নগেন্দ্র গ্রাম মধ্যে গমন করিলেন। শুনিলেন গ্রামের নাম ঝুমঝুমপুর। তাঁহার অনুরোধে এবং অর্থানুকূল্যে গ্রামস্থ কেহ২ আসিয়া মৃতের সৎকারের আয়োজন করিতে লাগিল। এক জন প্রতিবাসিনী কুন্দনন্দিনীর নিকটে রহিল। কুন্দ যখন দেখিল যে, তাহার পিতাকে সৎকারের জন্য লইয়া গেল, তখন তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া, অবিরত রোদন করিতে লাগিল।

প্রভাতে প্রতিবেশিনী আপন গৃহকার্য্যে গেল। কুন্দনন্দিনীর সান্ত্বনার্থ আপন কন্যা চাঁপাকে পাঠাইয়া দিল। চাঁপা কুন্দের সমবয়স্কা এবং সঙ্গিনী। চাঁপা আসিয়া কুন্দের সঙ্গে নানাবিধ কথা কহিয়া তাহার সান্ত্বনা করিতে লাগিল। কিন্তু দেখিল যে কুন্দ কোন কথাই শুনিতেছে না, রোদন করিতেছে এবং মধ্যে২ প্রত্যাশাপন্নাবৎ আকাশ পানে চাহিয়া দেখিতেছে। চাঁপা কৌতুহল প্রযুক্ত জিজ্ঞাসা করিল, "এক শ বার আকাশ পানে চাহিয়া কি দেখিতেছ?"

কুন্দ তখন কহিল, "আকাশ থেকে কাল্ মা আসিয়াছিলেন। তিনি আমাকে ডাকিলেন, 'আমার সঙ্গে আয়।' আমার কেমন দুর্ব্বুদ্ধি হইল, আমি ভয় পাইলাম, মার সঙ্গে গেলাম না। এখন ভাবিতেছি কেন গেলাম না। এখন আর যদি তিনি আসেন তবে আমি যাই। তাই ঘন২ আকাশ পানে চাহিয়া দেখিতেছি।"

চাঁপা কহিল, "হাঁ! মরা মানুষ নাকি আবার আসিয়া থাকে!"

তখন কুন্দ স্বপ্ন বৃত্তান্ত সকল বলিল। শুনিয়া চাঁপা বিস্মিতা হইয়া কহিল, "সেই আকাশের গায়ে যে পুরুষ আর মেয়ে মানুষ দেখিয়াছিলে, তাহাদের চেন?"

কুন্দ। "না, তাহাদের আর কখন দেখি নাই। সেই পুরুষের মত সুন্দর পুরুষ যেন কোথাও নাই। এমন রূপ কখন দেখি নাই।"

এ দিগে নগেন্দ্র প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া গ্রামস্থ সকলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই মৃত ব্যক্তির কন্যার কি হইবে? সে কোথায় থাকিবে? তাহার কে আছে?" ইহাতে সকলেই উত্তর করিল যে উহার থাকিবার স্থান নাই, উহার কেহ নাই। তখন নগেন্দ্র কহি-

লেন, "তবে তোমরা কেহ উহাকে গ্রহণ কর। উহার বিবাহ দিও। তাহার ব্যয় আমি দিব। আর যত দিন সে তোমাদিগের বাড়ীতে থাকিবে, তত দিন আমি তাহার ভরণপোষণের ব্যয়ের জন্য মাসিক কিছু টাকা দিব।"

নগেন্দ্র যদি নগদ টাকা ফেলিয়া দিতেন, তাহা হইলে অনেকেই তাঁহার কথায় স্বীকৃত হইতে পারিত। পরে নগেন্দ্র চলিয়া গেলে কুন্দকে বিদায় করিয়া দিত, অথবা দাস্যবৃত্তিতে নিযুক্ত করিত। কিন্তু নগেন্দ্র সেরূপ মূঢ়তার কার্য্য করিলেন না। সুতরাং নগদ টাকা না দেখিয়া কেহই তাঁহার কথায় স্বীকৃত হইল না।

তখন নগেন্দ্রকে নিরুপায় দেখিয়া এক জন বলিল, "শ্যামবাজারে ইহার এক মাসীর বাড়ী আছে। বিনোদ ঘোষ ইহার মেসো। আপনি কলিকাতায় যাইতেছেন, যদি ইহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া সেই খানে রাখিয়া আসেন, তবেই এই কায়স্থ কন্যার উপায় হয় এবং আপনারও স্বজাতির কাজ করা হয়।"

অগত্যা নগেন্দ্র এই কথায় স্বীকৃত হইলেন। এবং কুন্দকে এই কথা বলিবার জন্য, তাহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন। চাঁপা কুন্দকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল।

আসিতেং দূরে হইতে নগেন্দ্রকে দেখিয়া,কুন্দ অকস্মাৎ স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইল। তাহার আর পা সরিল না। সে বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে বিমূঢ়ার ন্যায় নগেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া রহিল।

চাঁপা কহিল, "ও কি দাঁড়ালি যে?"

কুন্দ অঙ্গুলি নির্দ্দেশের দ্বারা দেখাইয়া কহিল, "এই সেই।"

চাঁপা কহিল, "ওই কে?" কুন্দ কহিল, "যাহাকে মা কাল্ রাত্রে আকাশের গায়ে দেখাইয়াছিলেন।"

তখন চাঁপাও বিস্মিতা ও শঙ্কিতা হইয়া দাঁড়াইল। বালিকাদিগকে অগ্রসর হইতে সঙ্কুচিতা দেখিয়া নগেন্দ্র তাহাদিগের নিকট আসিলেন এবং কুন্দকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিলেন। কুন্দ কোন উত্তর করিতে পারিল না; কেবল বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে নগেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া রহিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অনেক প্রকারের কথা।

অগত্যা নগেন্দ্রনাথ কুন্দকে কলিকাতায় আত্মসমভিব্যাহারে লইয়া আসিলেন। প্রথমে তাহার মাতৃষ্বসৃপতির অনেক সন্ধান করিলেন। শ্যামবাজারে বিনোদ ঘোষ নামে কাহাকেও পাওয়া গেল না। এক বিনোদ দাস পাওয়া গেল—সে সম্বন্ধ অস্বীকার করিল। সুতরাং কুন্দ নগেন্দ্রের গলায় পড়িল।

নগেন্দ্রের এক সহোদরা ভগিনী ছিলেন। তিনি নগেন্দ্রের অনুজা। তাঁহার নাম কমলমণি। তাঁহার শ্বশুরালয় কলিকাতায়। শ্রীশচন্দ্র মিত্র তাঁহার স্বামী। শ্রীশ বাবু প্লুণ্ডর ফেয়ার্লির বাড়ীর মুতসুদ্দি। হৌস বড় ভারি—শ্রীশচন্দ্র বড় ধনবান্। নগেন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ সম্প্রীতি। কুন্দনন্দিনীকে নগেন্দ্র সেই খানে লইয়া গেলেন। কমলকে ডাকিয়া কুন্দের সবিশেষ পরিচয় দিলেন।

কমলের বয়স অষ্টাদশ বৎসর। মুখাবয়ব নগেন্দ্রের ন্যায়। ভ্রাতা ভগিনী উভয়েই পরম সুন্দর। কিন্তু কমলের সৌন্দর্য্য গৌরবের সঙ্গে২ বিদ্যার খ্যাতিও ছিল। নগেন্দ্রের পিতা, মিস্ টেম্পল্ নাম্নী এক জন শিক্ষাদাত্রী নিযুক্ত রাখিয়া কমলমণিকে এবং সূর্য্যমুখীকে বিশেষ যত্নে লেখা পড়া শিখাইয়াছিলেন। কমলের শ্বশ্রূ বর্ত্তমান। কিন্তু তিনি শ্রীশচন্দ্রের পৈতৃক বাসস্থানেই থাকিতেন। কলিকাতায় কমলই গৃহিণী।

নগেন্দ্র কুন্দের পরিচয় দিয়া কহিলেন "এখন তুমি ইহাকে না রাখিলে আর রাখিবার স্থান নাই। পরে আমি যখন বাড়ী যাইব—উহাকে গোবিন্দপুরে লইয়া যাইব।"

কমল বড় দুষ্ট। নগেন্দ্র এই কথা বলিয়া পশ্চাৎ ফিরিলেই কমল কুন্দকে কোলে তুলিয়া লইয়া দৌড়াইল। একটা টবে কতকটা অনতি তপ্ত জল ছিল, অকস্মাৎ কুন্দকে তাহার ভিতরে ফেলিল। কুন্দ মহাভীতা হইল। কমল তখন হাসিতে২ স্নিগ্ধ সৌরভযুক্ত সোপ হস্তে লইয়া স্বয়ং তাহার গাত্র ধৌত করিতে আরম্ভ করিলেন। এক জন পরিচারিকা স্বয়ং কমলকে এই রূপ কাজে ব্যাপৃতা দেখিয়া, তাড়াতাড়ি "আমি দিতেছি। আমি দিতেছি," বলিয়া দৌড়াইয়া আসিতেছিল—কমল সেই তপ্ত জল ছিটাইয়া পরিচারিকার গায়ে দিল, পরিচারিকা পালাইল।

কমল স্বহস্তে কুন্দকে মার্জ্জিত এবং স্নাত করাইলে—কুন্দ শিশির-ধৌত পদ্মবৎ শোভা পাইতে লাগিল। তখন কমল, তাহাকে অমল শ্বেত চারু বস্ত্র পরাইয়া, গন্ধতৈল সহিত তাহার কেশ রচনা করিয়াদিল; এবং কতক গুলিন অলঙ্কার পরাইয়া দিয়া, বলিল, "যা, এখন দাদা বাবুকে প্রণাম করিয়া আয়। আর দেখিস্—যেন এ বাড়ীর বাবুকে প্রণাম করে ফেলিস্ না—এ বাড়ীর বাবু দেখিলেই বিয়ে করে ফেলিবে।"

নগেন্দ্রনাথ, কুন্দের সকল কথা সূর্য্যমুখীকে লিখিলেন। হরদেব ঘোষাল নামে তাঁহার এক প্রিয় সুহৃৎ দূর দেশে বাস করিতেন—নগেন্দ্র তাঁহাকেও পত্র লেখার কালে কুন্দনন্দিনীর উল্লেখ করিলেন,—যথা,—

"বল দেখি কোন্ বয়সে স্ত্রীলোক সুন্দরী? তুমি বলিবে চল্লিশ পরে, কেন না তোমার ব্রাহ্মণীর আরও দুই এক বৎসর হইয়াছে। কুন্দ নামে যে, কন্যার পরিচয় দিলাম—তাহার বয়স তের বৎসর। তাহাকে দেখিয়া বোধ হয়, যে এই সৌন্দর্য্যের সময়। প্রথম যৌবনসঞ্চারের অব্যবহিত পূর্ব্বেই যেরূপ মাধুর্য্য এবং সরলতা থাকে, পরে তত থাকে না। এই কুন্দের সরলতা চমৎকারা; সে কিছুই বুঝে না। আজিও রাস্তার বালকদিগের সহিত খেলা করিতে ছুটে; আবার বারন করিলেই ভীতা হইয়া প্রতিনিবৃত্তা হয়। কমল তাহাকে লেখা পড়া শিখাইতেছে। কমল বলে, লেখা পড়ায় তাহার দিব্য বুদ্ধি। কিন্তু অন্য কোন কথাই বুঝে না। বলিলে, বৃহৎ, নীল দুইটী চক্ষু—চক্ষু দুইটী শরতের পদ্মের মত সর্ব্বদাই স্বচ্ছ জলে ভাসিতেছে—সেই দুইটী চক্ষু আমার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া চাহিয়া

থাকে; কিছু বলে না—আমি সে চক্ষু দেখিতে২ অন্য-মনস্ক হই, আর বুঝাইতে পারি না। তুমি আমার মতিস্থৈর্য্যের এই পরিচয় শুনিয়া হাসিবে, বিশেষ তুমি বাতিকের গুণে গাছ কয় চুল পাকাইয়া ব্যঙ্গ করিবার পরওয়ানা হাসিল করিয়াছ; কিন্তু যদি তোমাকে সেই দুটী চক্ষের সমুখে দাঁড় করাইতে পারি, তবে তোমারও মতিস্থৈর্য্যের পরিচয় পাই। চক্ষু দুইটী যে কিরূপ,তাহা আমি এ পর্য্যন্ত স্থির করিতে পারিলাম না। তাহা দুইবার এক রকম দেখিলাম না; আমার বোধ হয় যেন এ পৃথিবীর সে চোখ্ নয়; এ পৃথিবীর সামগ্রী যেন ভাল করিয়া দেখে না; অন্তরীক্ষে যেন কি দেখিয়া তাহাতে নিযুক্ত আছে। কুন্দ যে নির্দ্দোষ সুন্দরী তাহা নহে। অনেকের সঙ্গে তুলনায় তাহার মুখাবয়ব অপেক্ষাকৃত অপ্রসংশনীয় বোধ হয়, অথচ আমার বোধ হয়, এমন সুন্দরী কখন দেখি নাই। বোধ হয় যেন,কুন্দনন্দিনীতে পৃথিবী ছাড়া কিছু আছে, রক্ত মাংসের যেন গঠন নয়; যেন চন্দ্রকর কি পুষ্পসৌরভকে শরীরী করিয়া তাহাকে গড়িয়াছে। তাহার সঙ্গে তুলনা করিবার সামগ্রী হঠাৎ মনে হয় না। অতুল্য পদার্থটী; তাহার সর্ব্বাঙ্গীন শান্তভাব-ব্যক্তি—যদি স্বচ্ছ সরোবরে শরচ্চন্দ্রের কিরণ সম্পাতে যে ভাব-ব্যক্তি তাহা বিশেষ করিয়া দেখ, তবে ইহার সদৃশ কতক অনুভূত করিতে পারিবে। তুলনার অন্য সামগ্রী পাইলাম না।

নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, কিছু দিন পরে তাহার উত্তর আসিল। উত্তর এই রূপ;—

"দাসী শ্রীচরণে কি অপরাধ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কলিকাতায় যদি তোমার এত দিন থাকিতে হইবে, তবে আমি কেনই বা নিকটে গিয়া পদসেবা না করি? এ বিষয়ে আমার বিশেষ মিনতি; হুকুম পাইলেই ছুটিব।

একটী বালিকা কুড়াইয়া পাইয়া কি আমাকে ভুলিলে? অনেক জিনিসের কাঁচারই আদর। কাঁচা পেয়ারা, কাঁচা শশা, লোকে ভাল বাসে, নারিকেলের ডাবই শীতল। এ অধম স্ত্রীজাতিও বুঝি কেবল কাঁচা মিঠে? নহিলে বালিকাটি পাইয়া আমায় ভুলিবে কেন?

তামাসা যাউক, তুমি কি মেয়েটিকে একেবারে স্বত্বত্যাগ করিয়া বিলাইয়া দিয়াছ? নহিলে আমি সেটি তোমার কাছে ভিক্ষা করিয়া লইতাম। মেয়েটিতে আমার কাজ আছে। তুমি কোন সামগ্রী পাইলে তাহাতে আমার অধিকার হওয়াই উচিত, কিন্তু আজি কালি দেখিতেছি, তোমার ভগিনীরই পুরা অধিকার। কমল যদি আমায় বেদখল করে, আমি বড় দুঃখিত হইব না।

মেয়েটিতে আমার কি কাজ? আমি তারাচরণের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিব। তারাচরণের জন্য একটী ভাল মেয়ে আমি কত খুঁজিতেছি তাত জান। যদি একটী ভাল মেয়ে বিধাতা মিলাইয়াছেন, তবে আমাকে নিরাশ করিও না। কমল যদি ছাড়িয়া দেয়, তবে কুন্দনন্দিনীকে আসিবার সময়ে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিও। আমি কমলকেও অনুরোধ করিয়া লিখিলাম। আমি গহনা গড়াইতে ও বিবাহের আরং উদ্যোগ

করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কলিকাতায় বিলম্ব করিও না, কলিকাতায় নাকি ছয় মাস থাকিলে মানুষ ভেড়া হয়। আর যদি কুন্দকে স্বয়ং বিবাহ করিবার অভিপ্রায় না করিয়া থাক, তবে সঙ্গে লইয়া আসিও, তুমি আসিলেই বিবাহ দিব। যদি নিজে বিবাহ করিবার অভিপ্রায় করিয়া থাক তবে বল, আমি বরণ ডালা সাজাইতে বসি।"

তারাচরণ কে তাহা পরে প্রকাশ করিব। কিন্তু সে যেই হউক, সূর্য্যমুখীর প্রস্তাবে নগেন্দ্র এবং কমলমণি উভয়ে সম্মত হইলেন। সুতরাং স্থির হইল যে, নগেন্দ্র যখন বাড়ী যাইবেন, তখন কুন্দকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন। সকলে আহ্লাদ পূর্ব্বক সম্মত হইয়াছিলেন, কমলও কুন্দের জন্য কিছু গহনা গড়াইতে দিলেন। কিন্তু মনুষ্য ত চিরান্ধ! কয়েক বৎসর পরে এমত এক দিন আইল, যখন কমলমণি ও নগেন্দ্র ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া কপালে করাঘাত করিয়া ভাবিলেন যে, কি কু ক্ষণে কুন্দনন্দিনীকে পাইয়াছিলাম? কি কু ক্ষণে সূর্য্যমুখীর পত্রে সম্মত হইয়াছিলাম।

এখন কমলমণি, সূর্য্যমুখী, নগেন্দ্রে তিন জনে মিলিত হইয়া বিষবীজ রোপণ করিলেন। পরে তিন জনেই হাহাকার করিবেন।

এখন বজ্‌রা সাজাইয়া, নগেন্দ্র কুন্দকে লইয়া গোবিন্দপুরে যাত্রা করিলেন।

কুন্দ স্বপ্ন প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল। নগেন্দ্রের সঙ্গে যাত্রা কালে এক বার তাহা স্মরণ পথে আসিল। কিন্তু নগেন্দ্রের কারুণ্যপূর্ণ মুখকান্তি এবং লোকবৎসল চরিত্র মনে করিয়া কুন্দ কিছুতেই বিশ্বাস করিল না যে, ইহাঁ হইতে তাহার অনিষ্ট হইবে। অথবা কেহ২ এমন পতঙ্গ-বৃত্ত যে, জ্বলন্ত বহ্নিরাশি দেখিয়াও তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়।

আমরা বড় লোক।

পৃথিবীর সকল দেশেই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, জাতিভেদে মনুষ্যের পরিচ্ছদ-প্রণালীর এক একটী স্বতন্ত্র নিয়ম আছে এবং মনুষ্যের অবস্থার উন্নতির সহিত বস্ত্রাদি ব্যবহারের নিয়মও উৎকৃষ্ট হইয়া আইসে। এই প্রথাটী এত সাধারণ যে, মনুষ্য জাতির মধ্যে কে সভ্য, কে অসভ্য, পরিচ্ছদ দৃষ্টি মাত্রেই বলা যাইতে পারে; এবং তদ্দ্বারা কে কোন্ দেশের বা কোন্ জাতির লোক, প্রায়ই বুঝিতে পারা যায়। এমন কি, বন্য অসভ্য জাতিরাও যে সর্ব্বাঙ্গে উল্‌কি ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহাতেও পরস্পরের মধ্যে প্রভেদ আছে; দেখিলে বুঝা যায়, কে কোন্ জাতীয় বন্য।

কিন্তু আমরা "বড় লোক।" আমাদিগের পরিচ্ছদ দৃষ্টে আমরা কোন্ জাতীয়—বন্য কি সভ্য—তাহা বিচার করিয়া উঠা বিধাতারও অসাধ্য। কেহ যদি এ দেশের কোন সভামণ্ডলী অথবা জনতার প্রতি একবার নিরীক্ষণ করিয়া দেখেন, তবে বুঝিতে পারিবেন, সেটী কি দুরূহ

ব্যাপার। আমরা যে কত বার কত দিন অবাক্ হইয়া এই রহস্য দেখিয়াছি,বলিতে পারি না। অপরসাধারণের কথা থাক; ভদ্রলোকের কথাই মনে কর। যখন টাউন্‌হলে কোন সভা হয়, তখন বড়২ চেরেট্, ক্রুহম্, ফেটিন্,আপিস্‌জান, এবং পাল্কিগাড়ী চড়িয়া সুসজ্জিত বাবুরা সমবেত হইতে থাকেন। কিন্তু বেশবিন্যাস দেখিয়া উহাঁরা যে, কোন্ জাতীয় লোক, এক জাতীয় কি না, এবং কোথা হইতে উপস্থিত হইলেন, স্থির করিয়া উঠে কাহার সাধ্য। সূর্য্যলোক কি চন্দ্রলোক হইতে নামিতেছেন, অথবা ভূলোকবাসী ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া মনুষ্য জাতিকে বঞ্চনা করিতেছেন, নিরূপণ করা বুদ্ধির অগম্য। কেহ বা অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের আমলের পুচ্ছবিশিষ্ট জামাজোড়া, কেহ বা বুক্‌কাটা কাবা, কেহ বা ঝক্‌মকে সাটিন্ মক্‌মলের চোস্ত চাপকান, কেহ বা দোদুল্যমান চোগা, লবেদা,কেহ বা আল্‌পাকা পাইনাপেলের আদ্‌সাহেবি চায়না কোট্, কেহ বা বুক্‌ফোলান পুরোসাহেবী কামিজ্ কোট্, কেহ বা ইজের চাপকানের উপর পাটকরা অথবা কোঁচান চাদর, কেহ বা সুধু ধুতি চাদর পরেই আসিয়াছেন। তাহাতে আবার সাদা, কালো, গোলাপী, বেগুনে, জরদা, সবুজ, নীল রঙ্গের বিচিত্র শোভা। মধ্যে২ ফুট্‌কি, ফুলকাটাও দেখিতে পাওয়া যায়। মস্তকের সজ্জা আরো অদ্ভুত। মরেশা, মোগ্‌লাই, আমামা, সামলা, ক্যাপ্, টোপর, টুপি, তাজ্—কত শত প্রকার, তাহার সীমা পরিসীমা নাই।

পাঠকগণ স্মরণ করিও এ সকল ইংরাজী ধরণের সভায় সভাস্থ হইবার পোষাক্। দেশীয় সামাজিক কার্য্যোপলক্ষে সভাস্থ হইবার পরিচ্ছদপদ্ধতি অন্যরূপ। তখন, দুএকটী শিশু ও বৃদ্ধ বালক ছাড়া, প্রায় সকলেই বিলাতি—মিশনো দেশি-চেলে সজ্জা করিয়া আইসেন। ধুতিচাদর, হাফ্ মোজা, ফুল মোজা এবং সুছব্য পিরানেরই ধুম পড়ে যায়। কালাপেড়ে, লালপেড়ে, নরুনপেড়ে, খড়কেপেড়ে, বিদ্যাসাগরপেড়ে অথবা সাদাপেড়ে—ফিন্‌ফিনে ঢাকাই, শান্তিপুরে, সিমলের ধুতি এবং তদপযুক্ত মীহি মল্‌মল্, ঢাকাই বা কেরেপের উড়ানীতে দালান্, উঠান্, বৈঠক্‌খানা, বারাণ্ডা ফর্‌ফর্ কর্‌তে থাকে। পিরানের ত কথাই নাই, কতই রকমের, কতই রঙ্গের, কতই ফেসিয়নের চিত্রবিচিত্র করা; দেখিলে দুচারদণ্ড অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়। ফলে, পোশাকের চাক্‌চক্য এবং অসমদৃশ্যতার সম্বন্ধে পৃথিবীর কোন জাতিই আমাদিগের সহিত তুলনা দিতে পারেন না। এ বিষয়ে আমাদিগেরও রুচি এবং প্রবৃত্তির সীমা নাই। বোধ হয়, নিউজিলণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর অপর প্রান্তভাগ গ্রীনলণ্ড পর্য্যন্ত খুঁজিয়া সকল জাতীয় এক একটী মনুষ্য অথবা দ্বিপদ বন্য একত্র করিলে যত প্রকার পরিচ্ছদের সমাবেশ হয়, আমাদিগের মধ্যে তত্তাবতেরই অনুরূপ আছে। সুতরাং আমরা "বড় লোক!"

অনেক দিন আমরা মনে মনে ভাবিয়াছি যে, পৃথিবীর মধ্যে আমরা একটী প্রধান জাতি—অতি সভ্য,বুদ্ধিমান,বিদ্বান, ও বিচক্ষণ, তত্রাপি এপর্য্যন্ত এই একটী সামান্য বিষয়ের কিনারা করিয়া উঠিতে

পারিতেছি না কেন? যে যখন আসিয়া আমাদিগকে পদানত করে, তখনি তাহাদের বস্ত্রাদির অনুকরণ করি। অনুকরণ ভিন্ন কি আমাদিগের উপায় নাই? অথবা যে কোন রকম হউক, এমন একটা পোশাক অনুকরণ করিতে পারা যায় না, যাহা সকল সময়ে, সকলের জন্য, সর্ব্ব বিধায়ে উপযোগী হইতে পারে? আমাদিগের পিতৃপৈতামহিক যে বস্ত্রাদি আছে, বিস্তর বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে সকল দিক্ রক্ষা হয় না। ধুতি আর চাদর বড় আরামের জিনিস্ বটে, এবং তাহা পরিধান করিয়া সর্ব্বাঙ্গে বায়ুসেবন করা অপেক্ষা, বোধ হয়, উপাদেয় আর কিছুই নাই। কিন্তু ভব্যতা রক্ষা এবং লজ্জা নিবারণের পক্ষে তাহাতে সময়ে সময়ে মহা গোলোযোগ উপস্থিত হয়। বলিতে পারি না, এ বিষয়ে, মহাশয় ব্যক্তিরা কি স্থির করিয়াছেন, কিন্তু আমাদিগের সামান্য বুদ্ধিতে, থান্‌ধুতিই হউক আর দিশি মীহি ধুতিই হউক, ব্যবহারের বিরুদ্ধে একটী বিশেষ প্রতিবন্ধক আছে। আমরা বাঙ্গালী জাতি —অতি সাবধানী—বিবেচক—বিপদ অথবা উৎপাতের উদ্যমেই পলায়ন করিতে অতিশয় পটু, সুতরাং সেই কার্য্যটি যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হয়, তদুপযোগী বস্ত্রাদি ব্যবহার করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য। ধুতিচাদরে সেই অতি প্রয়োজনীয় কার্য্যের অতিশয় ব্যাঘাত জন্মে। ছুটিবার সময়, বিশেষতঃ ছুটিয়া পলাইবার সময়, কাছা কি কোঁচা খুলিয়া গেলে, লোকের নিকট অসম্ভ্রম এবং হাস্যাস্পদ হইতে হয়। নতুবা ধুতিচাদর মন্দ নয়। আমাদের দেশের লোক সুশ্রী, সুপুরুষ বটে, বিবস্ত্র হইলে ক্ষতি নাই, বরং অঙ্গসৌষ্ঠব সুচারুরূপে প্রকাশ পায়; সুতরাং যত অল্প এবং পাতলা কাপড় ব্যবহার করা যায় ততই ভাল; এবং তজ্জন্য আমরাও পাতলা কাপড় ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু পলাবার উপায় কি? সেইটিই আমাদের পক্ষে বিষম সমস্যা। অনেক সময়ে ইহাও ভাবিয়াছি যে, হিন্দুস্থানী কিম্বা মহারাষ্ট্রীয়দিগের ন্যায় মালকোঁচা করিয়া ধুতি পরাই আমাদিগের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর। কিন্তু তাহাতেও, গুরুতর না হউক, একটী আপত্তি আছে। আমরা যে জোরোয়ার জাতি এবং যেরূপ দীর্ঘকায়, ঐ প্রকার মল্লবেশ ধারণ করিলে পাছে তাল্‌পাতার সিপাহির মত দেখায়—আমাদিগের এই আশঙ্কা। যাহা হউক, সে বিষয়ের ইতিকর্ত্তব্যতা কর্ত্তারাই স্থির করিবেন, আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে পরিচ্ছদ সম্বন্ধে আমাদের রুচির কিঞ্চিৎ খর্ব্বতা এবং সমতা করিলেই ভাল হয়। অতঃপর গিন্নীপক্ষে কিরূপ একবার দেখা আবশ্যক।

ঘরের লক্ষ্মীদের বেশভূষার কথা উত্থাপন করা বড় বালাই। বিন্দুমাত্র অমর্য্যাদার কথা বলিলে কর্ত্তা গিন্নি উভয়েরই নিকটে লাঞ্ছনার ভাজন হইতে হয়, এবং ঘরে বাহিরে ভাল করে মাথা তুলে মুখ দেখান ভার হইয়া উঠে। কিন্তু আমাদের সে ভয় নাই; কারণ এ দেশের স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ সম্বন্ধে যদ্যপি নিন্দা করিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা থাকিত তাহা হইলে এ কঠিন বিষয়ে আমরা হস্ত ক্ষেপণ করিতাম না। ছিদ্রা-

নুসন্ধানের তিলার্দ্ধমাত্র স্থল নাই বলিয়াই আমরা ইহার উল্লেখ করিতেছি। স্ত্রীজাতি জগতের শ্রেষ্ঠ—সকল সৌন্দর্য্যের চরম সীমা। তাহাদিগের অঙ্গ অবয়ব এবং লাবণ্যমাধুরী যতই প্রকাশ পায় ততই জগতের শোভাবৃদ্ধি হয়। চক্ষুরিন্দ্রিয় তৃপ্ত করিবার নিমিত্ত স্ত্রীলোকের অঙ্গসৌষ্ঠবের তুল্য আর কি পদার্থ আছে? তবে যে বর্ব্বরজাতীয় বিবস্ত্রা স্ত্রীলোক দেখিয়া আমাদিগের মনে অত্যন্ত ঘৃণা এবং বিতৃষ্ণার উদ্রেক হয়, তাহাদিগের কদর্য্যতাই তাহার একমাত্র কারণ। বিবস্ত্রা স্ত্রীলোক বলিয়া নয়, বোধ হয় বিকটমূর্ত্তি রাক্ষসী বলিয়াই আমরা তাহাদিগকে অশ্রদ্ধা এবং ঘৃণা করি। কিন্তু এ দেশের স্ত্রীলোকেরা অপ্সরার ন্যায় সুন্দরী, মুখশ্রী ও অঙ্গসৌষ্ঠব অতি চমৎকার। এতাদৃশ অপ্সরাদিগের অঙ্গ অবয়ব অনাবৃত না রাখিয়া কোন্ সুরসিক পুরুষ প্রাণধারণ করিতে পারে। আমাদিগের দেশের লোক অতিশয় রসজ্ঞ, তজ্জন্যই এ দেশের মোহিনীগণকে এক খানি দশহাত কাপড়ের সাড়ী পরাইয়া রাখিয়াছেন। স্ত্রীলোকদিগের লজ্জানিবারণ এবং সৌন্দর্য্য প্রকাশের এমন কৌশল বোধ হয়, কোন দেশে, কস্মিন কালে, কোন জাতিতেই উদ্ভাবন করিতে পারে নাই। অন্তজ অসভ্য জাতিরা স্ত্রীলোকদিগকে কৌপীন অথবা পত্রাচ্ছাদন পরাইয়া রাখে, কিন্তু সভ্য বাঙ্গালীরা একখানি প্রমাণ সাড়ী পরাইয়াছেন। ইহাতে দৃষ্টিকঠোরও হয় না, অথচ অনায়াসে সর্ব্বাঙ্গের শোভা দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা যখন কোন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী বাঙ্গালী স্ত্রীলোককে বেশভুষা করিয়া যাইতে দেখি তখন মনে মনে আমাদের দেশের লোকের বিচক্ষণতা ও অগাধ বুদ্ধির যে কত প্রশংসা করি তাহা এক মুখে ব্যাখ্যা করিতে পারি না। কিন্তু স্বপরিবারস্থ কাহাকেও দেখিলেই কিঞ্চিৎ জড়সড় হইতে হয়।

কালক্রমে সভ্যতার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে, সুতরাং এ দেশের স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদও ক্রমশঃ আরো উৎকৃষ্ট হইয়া উঠিতেছে। পূর্ব্বে সাড়ীখানি পূরো দশ হাত না হউক, মোটা গোচের ছিল। ক্রমে চক্রবেড়, চন্দ্রকোনা, শান্তিপুর, কল্‌মে, সিম্‌লে, ঢাকাই ঢপে, সুক্ষ্ম, অতিসুক্ষ্ম হইয়া আসিয়া এক্ষণে কেরেপে দাঁড়াইয়াছে। বোধ হয় আর কিছু দিন পরেই মাকড়সার জালে পরিণত হইবে, অথবা এ দেশের স্ত্রীলোকেরা পুনর্ব্বার স্বভাবের সরল ভাব ধারণ করিবে। তাহাতেও আমরা ক্ষতি বোধ করি না; কারণ আমাদের দেশের গৃহিণীরা অন্তঃপুরবাসিনী এবং তাহাদের ন্যায় পতিপরায়ণা সতী কুত্রাপি নাই। ইহারা পরপুরুষের নয়নগোচর হইবার সম্ভাবনা নাই, এবং নয়নগোচর হইলেই বা লজ্জার বিষয় কি? কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, এক্ষণকার স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অনেকে অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। কিন্তু আমরা কত ভদ্র, মাতব্বর লোককে তাহাদিগের পরিবারগণকে একখানি সাড়ী পরাইয়া রেলওয়ের গাড়ী এবং সভাস্থলে লইয়া যাইতে দেখিয়াছি; তাহাতে তাহাদিগের মনে কিছুমাত্র মালিন্য জন্মে নাই, এবং সেই সকল যো-

যাদিগের মনেও কিছুমাত্র লজ্জা হয় না। ফলে আমাদিগের বিবেচনায় এমন সু-রূপা সতী লক্ষ্মীদিগকে বিবস্ত্রা করিয়া লোকালয়ে পাঠাইতে কোন আপত্তি হ-ইতে পারে না। আমাদিগের ঘরের গিন্নী যদ্যপি লোকালয়ে বাহির করিবার যোগ্য হইতেন, তবে আমরাও তাহাই করিতাম; কিন্তু সঙ্গে যাইতে লজ্জা বোধ হইত।

পূর্ব্বে আমরা কখন কখন মনে করি-তাম যে, আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদি-গকে ইহুদি স্ত্রীলোকদিগের পোশাক দিব্য সাজে এবং উহাদিগকে কখন লোকালয়ে আনিতে হইলে ঐরূপ পোশাক পরাইয়া বাহির করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু এক্ষণে দেখি-তেছি আমাদিগের সেটি ভ্রম—যদি এক প্রমাণ সাড়ীতেই ঘরে বাহিরে অনা-য়াসে চলে, তবে এমন মনোহারিণী সা-ড়ীকে পরিত্যাগ করিতে কে উপদেশ দিতে পারে? পরন্তু যতই দেখিতেছি, ততই আমাদিগের প্রতীতি জন্মিতেছে যে,আমরা অতি সুবোধ,বিজ্ঞ, রসজ্ঞ এবং যথার্থই বিচক্ষণ লোক; সংক্ষেপে—"আমরা বড় লোক।"

সঙ্গীত।

সঙ্গীত কাহাকে বলে? সকলেই জা-নেন যে, সুরবিশিষ্ট শব্দই সঙ্গীত, কিন্তু সুর কি?

কোন বস্তুতে অপর বস্তুর আঘাত হইলে, শব্দ জন্মে; এবং আহত পদার্থের পরমাণু মধ্যে কম্পন জন্মে। সেই কম্পনে, তাহার চারি পার্শ্বস্থ বায়ুও কম্পিত হয়। যেমন সরোবরমধ্যে জলের উপরি ইষ্টক-খণ্ড নিক্ষিপ্ত করিলে, ক্ষুদ্র২ তরঙ্গমালা সমুদ্ভূত হইয়া চারি দিগে মণ্ডলাকারে ধাবিত হয়, সেই রূপ কম্পিত বায়ুর ত-রঙ্গ চারি দিগে ধাবিত হইতে থাকে। সেই সকল তরঙ্গ কর্ণমধ্যে প্রবিষ্ট হয়; কর্ণমধ্যে এক খানি সূক্ষ্ম চর্ম্ম আছে। ঐ সকল বায়বীয় তরঙ্গ পরম্পরা সেই চর্ম্মোপরি প্রহৃত হয়; পরে তৎসংলগ্ন অস্থি প্রভৃতি দ্বারা শ্রাবণ ধমনীতে নীত হইয়া মস্তিষ্ক মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। তাহাতে আমরা শব্দানুভব করি।

অতএব বায়ুর প্রকম্প শব্দ জ্ঞানের মুখ্য কারণ। দার্শনিকেরা স্থির করিয়া-ছেন যে,যে শব্দে প্রতি সেকণ্ডে ৪৮,০০০ বার বায়ুর প্রকম্প হয়, তাহা আমরা শু-নিতে পাই, তাহার অধিক হইলে শুনিতে পাই না। মসুর সাবর্তি অবধারিত করিয়াছেন যে, প্রতি সেকেণ্ডে ১৪ বা-রের ন্যূনসংখ্যক প্রকম্প যে শব্দে, সে শব্দ আমরা শুনিতে পাই না। এই প্র-কম্পের সমান মাত্রা সুরের কারণ। দুইটি প্রকম্পের মধ্যে যে সময় গত হয়, তাহা যদি সকল বারে সমান থাকে,তাহা হইলেই সুর জন্মে। গীতে তাল যেরূপ, মাত্রার সমতা মাত্র—শব্দপ্রকম্পে সেই রূপ থাকিলেই সুর জন্মে। যে শব্দে সেই সমতা নাই, তাহা সুর রূপে পরি-ণত হয় না। সে শব্দ "বেসুর"-অর্থাৎ গণ্ডগোল মাত্র। তালই সঙ্গীতের সার।

এই সুরের একতা বা বহুত্বই সঙ্গীত। বাহ্য নিসর্গ তত্ত্বে সঙ্গীত এই রূপ, কিন্তু তাহাতে মানসিক সুখ জন্মে কেন? তাহা বলি।

সংসারে কিছুই সম্পূর্ণ উৎকৃষ্ট হয় না। সকলেরই উৎকর্ষের কোন অংশে অভাব, বা কোন দোষ আছে। কিন্তু নির্দ্দোষ উৎকর্ষ আমরা মনে কল্পনা করিয়া লইতে পারি—এবং এক বার মনোমধ্যে তাহার প্রতিমা স্থাপিত করিতে পারিলে, তাহার প্রতিমূর্ত্তির সৃজন করিতে পারি। যথা, সংসারে কখন নির্দ্দোষ সুন্দর মনুষ্য পাওয়া যায় না; যত মনুষ্য দেখি, সকলেরই কোন না কোন দোষ আছে; কিন্তু সে সকল দোষ ত্যাগ করিয়া, আমরা সুন্দর কান্তি মাত্রেরই সৌন্দর্য্য মনে রাখিয়া, এক নির্দ্দোষ মূর্ত্তির কল্পনা করিতে পারি। এবং তাহা মনে কল্পনা করিয়া নির্দ্দোষ প্রতিমা প্রস্তরে গঠিত করা যায়। এই রূপ উৎকর্ষের চরম সৃষ্টিই, কাব্য, চিত্রাদির উদ্দেশ্য।

যেমন সকল বস্তুরই উৎকর্ষের একটা চরম সীমা আছে, শব্দেরও তদ্রূপ। বালকের কথা মিষ্ট লাগে; যুবতীর কণ্ঠস্বর মুগ্ধকর; বক্তার স্বরভঙ্গীই বক্তৃতার সার। বক্তৃতা শুনিয়া যত ভাল লাগে, পাঠ করিয়া তত ভাল লাগে না, কেননা সে স্বরভঙ্গী নাই। যে কথা সহজে বলিলে তাহাতে কোন রস পাওয়া যায় না, রসিকের কণ্ঠভঙ্গীতে তাহা অত্যন্ত সরস হয়। কখনং একটি মাত্র সামান্য কথায়, এত শোক, এত প্রেম, বা এত আহ্লাদ ব্যক্ত হইতে শুনা গিয়াছে যে, শোক বা প্রেম বা আহ্লাদ জানাইবার জন্য রচিত সুদীর্ঘ বক্তৃতায় তাহার শতাংশ পাওয়া যায় না। কিসে এরূপ হয়? কণ্ঠভঙ্গীর গুণে। সেই কণ্ঠভঙ্গীর অবশ্য একটা চরমোৎকর্ষ আছে। সে চরমোৎকর্ষ অত্যন্ত সুখকর হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? কেন না সামান্য কণ্ঠভঙ্গীতেও মনকে চঞ্চল করে। কণ্ঠভঙ্গীর সেই চরমোৎকর্ষই সঙ্গীত। কণ্ঠভঙ্গী মনের ভাবের চিহ্ন। অতএব সঙ্গীতের দ্বারা সকল প্রকার মনের ভাব প্রকাশ করা যায়।

ভক্তি, প্রেম ও আহ্লাদ বাচক সঙ্গীত, সকল সময়ে, সকল দেশে, সর্ব্ব লোক মধ্যে আছে। কেবল খলতা-ব্যঞ্জক সঙ্গীত নাই। যাহাতে রাগ দ্বেষাদি প্রকাশ পায়, সে সকল শব্দ গীত-মধ্যে নহে। রণবাদ্য প্রভৃতি আছে সত্য, কিন্তু ঐ সকল বাদ্য হিংসা-প্রবাচক নহে; কেবল উৎসাহ-বর্দ্ধক মাত্র। কল্পনার দ্বারা আমরা রাগ অহঙ্কার প্রভৃতি খলভাবের বর্ণনা গীতে ভাবসিদ্ধ করিতে চেষ্টা করি, কিন্তু সে বর্ণনা কল্পনা প্রতিষ্ঠিত মাত্র; বুঝাইয়া না দিলে, বুঝা যায় না। অতএব এ সকল গীত স্বভাবসঙ্গত নহে। শোকপ্রকাশক গীত আছে, গীত মধ্যে তাহা অতি মনোহর। কিন্তু শোক ক্রূরভাব নহে; ভক্তি ও প্রেম বাচক।

সকল দেশে সকল জাতি মধ্যে সকল কালে সঙ্গীত আছে। এবং সকল দেশে সকল কালে সর্ব্ব লোকেই ইহা আদরণীয়। কিন্তু সর্ব্ব স্থানে ইহার উৎকর্ষ সমরূপ নহে; অনেক দেশের ও জাতির গীত উৎকৃষ্ট নহে। বুদ্ধি-সভ্যতা-তারতম্যে ও কালপ্রভাবে ভাল, মন্দ, মধ্যম ইত্যাদি হইয়াছে। বংশ ভেদে সঙ্গীতেরও প্রভেদ

দেখা যায়। কাফ্রিদিগের, প্রাচীন আমেরিকান অর্থাৎ ইণ্ডিয়ানদের, ইহুদী বংশের ও আর্য্যবংশের গীতপ্রণালীতে অনেক বিভিন্নতা দেখা যায়। মনুষ্য সমুহ এক স্বভাবাপন্ন; সঙ্গীত স্বভাবপ্রবাচক শব্দ; বংশভেদে নিতান্ত ভিন্ন হইবেক, এমত নহে। কিন্তু সকল জাতি সমশক্তিবিশিষ্ট নহে, এই কারণে সঙ্গীতেরও তারতম্য হইয়াছে। সকল জাতিমধ্যে আর্য্য জাতি শ্রেষ্ঠ; এ জন্য আর্য্য জাতির গীতপ্রণালীও শ্রেষ্ঠ।

উত্তরাঞ্চলে আর্য্য বংশের আদি বাসস্থান। তথা হইতে তাহারা সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে বসতি করিয়াছে। কোন কোন শাখা অতি পূর্ব্বকালে,কোন কোন শাখা তৎপরে, কোন২ শাখা অন্য শাখার সহিত একত্রে দেশ ত্যাগ করে। কিন্তু সকলের ভাষার ও প্রাচীন ধর্ম্মের এবং ব্যবহারের সাদৃশ্য দেখা যায়। সঙ্গীতের প্রণালীতেও তদ্রূপ; দেশ কাল পাত্র ও অবস্থা ভেদে এই সাদৃশ্যের অনেক বৈলক্ষণ্য হইয়াছে। কিন্তু মূল সকলেরি এক। সকলেরই সপ্ত স্বর,হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত ভেদে উচ্চারণ ও সময়ের নির্দ্দেশ; একত্রিত স্বর সমূহের ধ্বনি ও গাম্ভীর্য্যে আস্থা এবং স্বরের নাম ও গ্রামের ঐক্য এক রূপ। এ সকল বিষয় ক্রমে প্রস্তাবের নিম্নভাগে বোধ হয় সপ্রমাণ হইবেক।

স্বরের এবং সময়ের একমাত্র মিলন দ্বারা একে একে অথবা অনেকে একত্রিত হইয়া বেদধ্বনি করা আমাদের আদি সঙ্গীত। অপর২ সঙ্গীতও ছিল। কালে সে সকল পরিমার্জ্জিত ও পরিশোধিত হইয়া পুরাণাদিতে বিন্যস্ত হইয়াছে। সঙ্গীত দুই প্রকার; গীতও বাদ্য। কোন বিদ্যাই প্রথমোৎপত্তি-কালে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় না, ক্রমে তাহার উন্নতি হয় বাদ্যও তৎপ্রথাগত। পিনাক, তানপুরা প্রভৃতি সামান্য যন্ত্র সকল ইহার উদাহরণ। মৃদঙ্গ, বোধ হয় দেশীয় যন্ত্র; সাঁওতাল হইতে প্রাপ্ত। সেতার এই মত নহে।

যেমন প্রাচীন কবিগণই উৎকৃষ্ট কবি,তেমনি প্রাচীন হিন্দু-গীত-প্রণালীও আশ্চর্য্য। গীতে কেবল বুদ্ধির প্রাখর্য্য, কল্পনা, ভাব ও মনোযোগ আবশ্যক। প্রাচীনেরা এই সকল বিষয়ে মহাবলবিশিষ্ট ছিলেন,সহজেই গীতের অসাধারণ উন্নতি করিয়াছিলেন।

নাভি, কণ্ঠ এবং তালু, স্বরের তিন স্থান পৌরাণিকেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এক২ স্থলসমুৎপন্ন স্বরকে এক২ গ্রাম কহে। এক২ গ্রামে সাত২ স্বর অর্থাৎ সা রি গা মা পা ধা নী। প্রথম পঞ্চম ও সপ্তম স্বর ব্যতীত অপর সকল স্বরের তীব্রতা ও কোমলতা থাকাতে, সে সকলকে অর্দ্ধ স্বর বলিয়া গণনা করা হইয়াছে। সহজেই সংলগ্ন স্বরের সংখ্যা ১২ টী মাত্র। প্রাচীনেরা তীব্র ও কোমল অর্থাৎ অর্দ্ধ স্বর সকলকে এত ভাগে২ বিভাগ করিয়াছেন যে, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য বোধ করিতে হয়। ইহা তাঁহাদের বুদ্ধি ও মনোযোগের এবং বিচার শক্তির পরিচয় বটে, কিন্তু বারটী স্বরই সহজসাধ্য এবং সামান্যতঃ আবশ্যক।

সকল গীতে সকল স্বরের আবশ্যক হয় না; কোন গীতে সাত, কোন গীতে তিন, কোন গীতে পাঁচ ইত্যাদি আবশ্যক হয়। অতএব সকল গীতকে ভাগে২ বি-

ন্যস্ত করিয়া কোন২ গীতকে সম্পূর্ণ, কোন২ গীতকে সঙ্কীর্ণ, কোন২ গীতকে খাড় ওড় বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিবিধ বিভাগের গীত সকল পুনশ্চ সময়, ভাব এবং লাবণ্য অনুসারে রাগ রাগিণী আখ্যায় শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। প্রাচীন হিন্দুদিগের এক অদ্ভুত ক্ষমতা এই দেখা যায় যে, অসীম বুদ্ধি ও তর্ক কৌশলে তাঁহারা কি ধর্ম্মশাস্ত্র, কি তর্কশাস্ত্র কি অপর বিদ্যা, সকলকেই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার পূর্ব্বক প্রণালীবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; আবার প্রত্যেক ভাগকে দেহবিশিষ্ট ও পরিচ্ছদবিশিষ্ট করিয়া শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। সঙ্গীতেরও তদ্রূপ। যেমন ভাষার দ্বারা কথা কহিয়া ভাব প্রকাশ করা যায়, চিত্রকর্ম্মের দ্বারা চিত্তের ভাবকে অবয়ব দেওয়া যায়, নিরর্থ-শব্দময় স্বরের দ্বারাও সেই রূপ হইতে পারে। তজ্জন্য অতি চমৎকার নিয়ম সকলের বিধান হইয়াছে। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, স্বর কণ্ঠভঙ্গীর চরমোৎকর্ষ। কণ্ঠভঙ্গী বিশেষে মনের কোন বিশেষ ভাব ব্যক্ত হয়। এমত অবস্থায় সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, কতক গুলিন স্বর বাছিয়া২ একত্রিত করিলে কোন একটি বিশেষ মানসিক ভাব সুস্পষ্ট হইয়া ব্যক্ত হইবে। এই রূপ স্বর সমূহের সমষ্টিকে রাগ রাগিণী কহে। একএকটী রাগ বা রাগিণীর দ্বারা একএকটী পৃথক চিত্তবিকার বা নৈসর্গিক দৃশ্য অনুকৃত হয়। বসন্ত সময়ের অনুরূপ বসন্ত রাগ, বর্ষার অনুরূপ মেঘ রাগ, শোকের অনুরূপ জয় জয়ন্তী, বিরহের অনুরূপ ললিত ইত্যাদি।

কোন২ ইউরোপীয় পণ্ডিত বলেন যে, প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে লিপি বিদ্যা ছিল না, * বেদ ও মানবাদি ধর্ম্মশাস্ত্র সকলই গোত্র ও প্রবরের প্রমুখাৎ মুখে মুখে আসিতেছিল। সঙ্গীতের বিষয়ও সেই মত। সঙ্গীতে ভরত ও হনুমানের মত প্রধান। আমরা স্মরণ শক্তি প্রভাবে মুখে মুখে প্রাচীন সঙ্গীত সকল প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু অনেক প্রাচীন রাগ রাগিনী বিলুপ্ত হইয়াছে, এবং আরও অনেকের এখনও বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা। দেশহিতৈষীরা সম্প্রতি লেখার দ্বারা রাগ রাগিণীগণকে চিরস্থায়ী করিতে আরম্ভ করিতেছেন; ইহা পরম সুখের বিষয়। যে২ মহোদয় ইহা করিতেছেন, সকল বাঙ্গালীর নিকট তাঁহারা ধন্যবাদ ও প্রেমের ভাজন।

মুসলমানদিগের দ্বারা ভারতবর্ষ অধিকৃত হইলে তাহারা এদেশে বসতি করে। মুসলমানের আগমনে ভারতবর্ষের অনেক লাভ হইয়াছে। সঙ্গীত বিষয়েও তাহা দেখা যায়।

মুসলমানেরা হিন্দুদিগের অনেক আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছে এবং সঙ্গীত শাস্ত্র আদ্যোপান্ত গ্রহণপূর্ব্বক তাহারা নানা উন্নতি সাধন করিয়াছে। অর্থব্যয় ও উৎসাহের দ্বারা সঙ্গীত অনুশীলন প্রবল রাখিয়াছিল, এবং যন্ত্রের দ্বারা তাহার উন্নতিসাধন করিয়াছে। আশ্চর্য্য এই যে, প্রাচীন হিন্দু সঙ্গীত প্রণালী কোন অংশেই ভিন্নজাতি সংসর্গে অপভ্রংশ প্রাপ্ত হয় নাই। স্বভাবেই রহিয়াছে। আরবী, তুরকী প্রভৃতি বিদেশীয় গীতপ্রথা ভারতবর্ষে নাই।

* মাক্ষ মূলর এই কথা বলেন। গোল্ড ষ্টুকর তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

আমাদের গীতি রীতি মাত্রেই দেশীয়। আমির খসরুর দ্বারা ৮টী দেশী গীতে বিদেশী ভাগ কিয়দংশ মিশ্রিত হইয়া সরফরদা, দেওগিরি প্রভৃতি ৮টী রাগিনী প্রস্তুত হয়। কিন্তু দেশীয়ের ভাগ এই সকল রাগিণীতে এত প্রবল যে, সে সকলকে বিদেশীয় বলিয়া জ্ঞান করা যায় না। বোধ হয় যে, দেশীয় সঙ্গীতপ্রথা উৎকৃষ্ট বলিয়া বিদেশীয় গীতপ্রথা তাহার বিকৃতি সাধন করিতে সক্ষম হয় নাই।

মুসলমানদের দ্বারা বাদ্যের অনেক উন্নতি সাধন হইয়াছে। সেতার এসরার সারঙ্গ ইত্যাদি সকল যন্ত্র নব্য। গীতেরও অনেক উপকার দেখা যায়। ধ্রুপদ ব্যতীত খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি ইত্যাদি মুসলমানদের প্রযত্নে প্রকাশ হইয়াছে। রাগ রাগিণী অনেক বাড়িয়াছে এবং তালের নূতন পদ্ধতি ও তাহার চমৎকার পারিপাট্য ইহাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

বাঙ্গালায় বহু কাল হইতে সঙ্গীতচর্চার আদর ও মর্য্যাদা আছে, এবং বাঙ্গালীদের বুদ্ধি ও উৎসাহের প্রবলতায় সঙ্গীতের কয়েক নূতন প্রণালী এদেশে প্রচলিত হইয়াছে। কবি, আখড়া, হাফ আখড়া, সঙ্কীর্ত্তন, যাত্রা, পাঁচালি এবং আড়খেমটা সম্যক্‌রূপে বাঙ্গালীদের সামগ্রী।

দুঃখের বিষয় এই যে, পূর্ব্ব সঞ্চিত ধন সকল আমাদের বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। ইউরোপীয় বিদ্যাপ্রভাবে নব্য সম্প্রদায়ের দ্বারা এই দুর্ভাবনা দুর হইবার আশা হওয়াতে যে, কিরূপ আহ্লাদ হয় তাহা বলা বাহুল্য।

ইউরোপীয়েরা বহুকষ্টে সঙ্গীত লেখন-প্রণালী চালনা করিয়াছেন। তাঁহারা যাহা বহুকষ্টে প্রস্তুত করিয়াছেন, আমাদের তাহা সহজে গ্রহণ করামাত্র। ইহা বাঙ্গালিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।

খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম ইউরোপে প্রচলিত হইলে, প্রাচীন খ্রীষ্টিয়ানেরা আপনাপন ধর্ম্মমন্দিরে হিব্রু গীত গান করিতেন। এই সকল গীত কখন লেখা হয় নাই; স্মরণ দ্বারা প্রচলিত থাকে। বাস্তবিক ইউরোপীয় সঙ্গীত গ্রীক্‌দিগের সঙ্গীত হইতে উত্থিত ও প্রাপ্ত। গ্রীকদের গামা হইতে স্বরের উত্থান, এজন্য গ্রামের নাম "গমট", যাহাকে আমরা "গমক" কহিয়া থাকি। দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত, স্বরের সময় ও হ্রস্বতা দীর্ঘতা, যেমন বেদে হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত চিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত, সেই মত "নিউএস" দ্বারা ইউরোপেও চিহ্নিত হইত। একাদশ শতাব্দীতে আরিজো নগরের গে নামক মহোদয়ের দ্বারা গীত লেখার প্রথম প্রণালী প্রচার হয়। গে সাহেব চতুষ্কোণ অঙ্কের দ্বারা চারি স্তম্ভে সপ্ত স্বর বিন্যস্ত করিয়া গীত সকল লিখিতে আরম্ভ করেন।

ক্রমে চতুষ্কোণ অপেক্ষা গোল চিহ্ন সহজসাধ্য বলিয়া ইউরোপে প্রচলিত হইয়াছে। গালিন নামক এক জন ফ্রেঞ্চম্যান অঙ্কের দ্বারা অর্থাৎ ১,২,৩ ইত্যাদি চিহ্নের দ্বারা সঙ্গীতলিপি সমাধা করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কেহ২ অক্ষরের দ্বারা কেহ বা স্বর ও হলের দ্বারা মিশ্রিত গ্রাম ও সময় উভয় এক বারে চিহ্নিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। সে যাহা

হউক, এক্ষণে যে প্রথা প্রচলিত, তাহাতে আবশ্যক বিষয় সকল সমাধা হইতেছে। তবে ১,২ স্বরের ইত্যাদি চিহ্ন স্বভাবতঃ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বোধ হয়।

গীতের স্বর, তাল ও ভাব যেমত আবশ্যক, সম, লয়ও সেইরূপ আবশ্যক। ইউরোপীয় গীতের সহিত উক্ত সকল বিষয়ে আমাদের সাদৃশ্য আছে। কেবল আমাদের বহুমিলন নাই, অর্থাৎ আমাদের গীতপ্রথায় গ্রামে২ মিলন আছে, কিন্তু এক গ্রামের মধ্যে পৃথক২ স্বরের একত্র মিলন নাই। তানপুরাতে জুড়ির সহিত পঞ্চম ও খরজের মিল এবং এসরার প্রভৃতিতে তিন গ্রামের তারের মিল আছে কিন্তু এই সকল মিল গ্রামানুযায়ী মাত্র। ভিন্ন স্বরের একত্র মিলন নাই। ইউরোপেও এই প্রকার মিলন ছিল না। কেবল এক মিলনমাত্র ছিল। দুই তিন শত বৎসর গত হইল, ইহার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ইউরোপীয় বিজ্ঞান দ্বারা আমাদের নানা বিষয়ে উন্নতিসাধন হইতেছে, সঙ্গীতেও তদ্রূপ হওয়া আবশ্যক। ভরসা করি যে, ইউরোপীয় লেখা প্রণালী যেমত গৃহীত হইতেছে, তদ্দেশীয় সঙ্গীত শাস্ত্র সেই মত গৃহীত হইয়া আমাদের সঙ্গীতের যাহা২ অভাব আছে, তাহা পরিপূরিত করিবেক।

ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গূল।

একদা সুন্দরবন-মধ্যে ব্যাঘ্রদিগের মহাসভা সমবেত হইয়াছিল। নিবিড় বনমধ্যে প্রশস্ত ভূমি খণ্ডে ভীমাকৃতি বহুতর ব্যাঘ্র লাঙ্গূলে ভর করিয়া, দংষ্ট্রাপ্রভায় অরণ্য প্রদেশ আলোকময় করিয়া, সারি সারি উপবেশন করিয়াছিল। সকলে একমত হইয়া অমিতোদর নামে এক অতি প্রাচীন ব্যাঘ্রকে সভাপতি করিলেন। অমিতোদর মহাশয় লাঙ্গূলাসন গ্রহণ পূর্ব্বক, সভার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তিনি সভ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন;—

"অদ্য আমাদিগের কি শুভ দিন!- অদ্য আমরা যত অরণ্যবাসী মাংসাভিলাষী ব্যাঘ্রকুলতিলক সকল পরস্পরের মঙ্গল সাধনার্থ, এই অরণ্যমধ্যে একত্রিত হইয়াছি। আহা! কুৎসাকারী খল স্বভাব অন্যান্য পশুবর্গে রটনা করিয়া থাকে যে, আমরা বড় অসামাজিক, একা এক বনেই বাস করিতে ভাল বাসি, আমাদের মধ্যে ঐক্য নাই। কিন্তু অদ্য আমরা সমস্ত সুসভ্য ব্যাঘ্রমণ্ডলী একত্রিত হইয়া সেই অমূলক নিন্দাবাদের নিরাকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি! এক্ষণে সভ্যতার যেরূপ দিন২ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ আশা আছে যে, শীঘ্রই ব্যাঘ্রেরা সভ্যজাতির অগ্রগণ্য হইয়া উঠিবে। এক্ষণে বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি যে, আপনারা দিন২ এই রূপ জাতি-হিতৈষিতা প্রকাশ পূর্ব্বক পরম সুখে নানাবিধ পশুহনন করিতে থাকুন!" (সভা মধ্যে লাঙ্গূল চট্‌চটারব)।

"এক্ষণে হে ভ্রাতৃবৃন্দ! আমরা যে প্রয়োজন সম্পাদনার্থ সমবেত হইয়াছি,তাহা সংক্ষেপে বিবরিত করি। আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে,এই সুন্দর-বনের ব্যাঘ্র সমাজে বিদ্যার চর্চ্চা ক্রমে লোপ পাইতেছে। আমাদিগের বিশেষ অভিলাষ হইয়াছে, আমরা বিদ্বান হইব। কেননা আজি কালি সকলেই বিদ্বান হইতেছে। আমরাও হইব। বিদ্যার আলোচনার জন্য এই ব্যাঘ্রসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে, আমার বক্তব্য এই যে, আপনারা ইহার অনুমোদন করুন।"

সভাপতির এই বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে,সভ্যগণ হাউ মাউ শব্দে এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিল। তখন যথারীতি কয়েকটী প্রস্তাব পঠিত এবং অনুমোদিত হইয়া সভ্যগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইল। প্রস্তাবের সঙ্গে২ দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা হইল, তাহা ব্যাকরণশুদ্ধ এবং অলঙ্কার বিশিষ্ট বটে। তাহাতে শব্দ বিন্যাসের ছটা বড় ভয়ঙ্কর; বক্তৃতার চোটে সুন্দরবন কাঁপিয়া গেল।

পরে সভার অন্যান্য কার্য্য হইলে, সভাপতি বলিলেন, "আপনারা জানেন, যে, এই সুন্দরবনে বৃহল্লাঙ্গূল নামে এক অতি পণ্ডিত ব্যাঘ্র বাস করেন। অদ্য রাত্রে তিনি আমাদিগের অনুরোধে মনুষ্য চরিত্র সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিতে স্বীকার করিয়াছেন।"

মনুষ্যের নাম শুনিয়া কোন২ নবীন সভ্য ক্ষুধা বোধ করিলেন। কিন্তু তৎকালে পব্লিক ডিনরের সূচনা না দেখিয়া তাঁহারা নীরব হইয়া রহিলেন। ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গূল মহাশয় সভাপতি কর্ত্তৃক আহূত হইয়া, গর্জ্জন পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিলেন। এবং পথিকের ভীতিবিধায়ক স্বরে নিম্নলিখিত প্রবন্ধটী পাঠ করিলেন;—

সভাপতি মহাশয়! বাঘিনীগণ! এবং ভদ্র ব্যাঘ্রগণ!

"মনুষ্য এক প্রকার দ্বিপদ জন্তু। তাহারা পক্ষবিশিষ্ট নহে, সুতরাং তাহাদিগকে পাখী বলা যায় না। বরং চতুষ্পদগণের সঙ্গে তাহাদিগের সাদৃশ্য আছে। চতুষ্পদগণের যে২ অঙ্গ যে২ অস্থি আছে, মনুষ্যেরও সেই রূপ আছে। অতএব মনুষ্যদিগকে এক প্রকার চতুষ্পদ বলা যায়। প্রভেদ এই যে, চতুষ্পদের যেরূপ গঠনের পারিপাট্য,মনুষ্যের তাদৃশ নাই। কেবল মাত্র ঈদৃশ প্রভেদের জন্য আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে যে, আমরা মনুষ্যকে দ্বিপদ বলিয়া ঘৃণা করি।

চতুষ্পদমধ্যে বানরদিগের সঙ্গে মনুষ্যগণের বিশেষ সাদৃশ্য। পণ্ডিতেরা বলেন যে, কালক্রমে পশুদিগের অবয়বের উৎকর্ষ জন্মিতে থাকে; এক অবয়বের পশু ক্রমে অন্য উৎকৃষ্টতর পশুর আকার প্রাপ্ত হয়। আমাদিগের ভরসা আছে যে,মনুষ্য-পশুও কালপ্রভাবে লাঙ্গূলাদি বিশিষ্ট হইয়া ক্রমে বানর হইয়া উঠিবে।

মনুষ্য-পশু যে অত্যন্ত সুস্বাদু এবং সুভোক্ষ্য তাহা আপনারা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। (শুনিয়া সভ্যগণ সকলে আপন২ মুখ চাটিলেন।) তাহারা সচরাচর অনায়াসেই মারা পড়ে। মৃগাদির ন্যায় তাহারা দ্রুত পলায়নে সক্ষম নহে, অথচ মহিষাদির ন্যায় বলবান্ বা শৃঙ্গাদি আয়ুধ-যুক্ত নহে। জগদীশ্বর এই

জগৎ সংসার ব্যাঘ্র জাতির সুখের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন সন্দেহ নাই। সেই জন্য ব্যাঘ্রের উপাদেয় ভোজ্য পশুকে পলায়নের বা রক্ষার ক্ষমতা পর্য্যন্ত দেন নাই। বাস্তবিক মনুষ্য জাতি যেরূপ অরক্ষিত—নখ দন্ত শৃঙ্গাদি বর্জ্জিত, গমনে-মন্থর এবং কোমল প্রকৃতি, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয় যে, কি জন্য ঈশ্বর ইহাদিগকে সৃষ্ট করিয়াছেন। ব্যাঘ্র জাতির সেবা ভিন্ন ইহাদিগের জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য দেখা যায় না।

এই সকল কারণে, বিশেষ তাহাদিগের মাংসের কোমলতা হেতু, আমরা মনুষ্য জাতিকে বড় ভাল বাসি। দৃষ্টি মাত্রেই ধরিয়া খাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহারাও বড় ব্যাঘ্রভক্ত। এই কথায় যদি আপনারা বিশ্বাস না করেন, তবে তাহার উদাহরন স্বরূপ আমার যাহা ঘটিয়াছিল, তদ্বৃত্তান্ত বলি। আপনারা অবগত আছেন আমি বহুকালাবধি দেশ ভ্রমণ করিয়া বহুদর্শী হইয়াছি। আমি যে দেশে প্রবাসে ছিলাম, সে দেশ এই ব্যাঘ্র-ভূমি সুন্দরবনের উত্তরে আছে। তথায় গো মনুষ্যাদি ক্ষুদ্রাশয় অহিংস্র পশুগণেই বাস করে। তথাকার মনুষ্য দ্বিবিধ। এক জাতি কৃষ্ণবর্ণ, এক জাতি শ্বেতবর্ণ। একদা আমি সেই দেশে বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে গমন করিয়াছিলাম।"

শুনিয়া মহাদংষ্ট্রা নামে এক জন উদ্ধতস্বভাব ব্যাঘ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"বিষয় কর্ম্মটা কি?"

বৃহলাঙ্গূল মহাশয় কহিলেন, "বিষয় কর্ম্ম, আহারান্বেষণ। এখন সভ্যলোকে আহারান্বেষণকে বিষয় কর্ম্ম বলে। ফলে সকলেই যে আহারান্বেষণকে বিষয় কর্ম্ম বলে এমত নহে। সম্ভ্রান্তলোকের আহারান্বেষণের নাম বিষয় কর্ম্ম; অসম্ভ্রান্তের আহারান্বেষণের নাম জুয়াচুরি, উঞ্ছবৃত্তি এবং ভিক্ষা। ধূর্ত্তের আহারান্বেষণের নাম চুরি; বলবানের আহারান্বেষণ দস্যুতা; লোকবিশেষে দস্যুতা শব্দ ব্যবহার হয় না; তৎপরিবর্ত্তে বীরত্ব বলিতে হয়। যে দস্যুর দণ্ডপ্রণেতা আছে, সেই দস্যুর কার্য্যের নাম দস্যুতা; যে দস্যুর দণ্ডপ্রণেতা নাই, তাহার দস্যুতার নাম বীরত্ব। আপনারা যখন সভ্য সমাজে অধিষ্ঠিত হইবেন, তখন এই সকল নাম বৈচিত্র স্মরণ রাখিবেন, নচেৎ লোকে অসভ্য বলিবে। বস্তুতঃ আমার বিবেচনায় এত বৈচিত্রের প্রয়োজন নাই; এক উদর-পূজা নাম রাখিলেই বীরত্বাদি সকলই বুঝাইতে পারে।

সে যাহাই হউক, যাহা বলিতেছিলাম শ্রবণ করুন। মনুষ্যেরা বড় ব্যাঘ্রভক্ত। আমি একদা মনুষ্যবসতি মধ্যে বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে গিয়াছিলাম। শুনিয়াছ যে, কয়েক বৎসর হইল এই সুন্দরবনে পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি, স্থাপিত হইয়াছিল!"

মহাদংষ্ট্রা পুনরপি বক্তৃতা বন্ধ করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি কিরূপ জন্তু?"

বৃহল্লাঙ্গূল কহিলেন, "তাহা আমি সবিশেষ অবগত নহি। ঐ জন্তুর আকার হস্তপদাদি কিরূপ, জিঘাংসাই বা কেমন ছিল, ঐ সকল আমরা অবগত নহি। শুনিয়াছি ঐ জন্তু মনুষ্যের প্রতিষ্ঠিত; মনুষ্যদিগেরই হৃদয়শোণিত পান করিত; এবং তাহাতে বড় মোটা হইয়া মরিয়া

গিয়াছে। মনুষ্যজাতি অত্যন্ত অপরিণামদর্শী। আপনং বধোপায় সর্ব্বদা আপনারাই সৃজন করিয়া থাকে। মনুষ্যেরা যে সকল অস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকে, সেই সকল অস্ত্রই এ কথার প্রমাণ। মনুষ্য বধই ঐ সকল অস্ত্রের উদ্দেশ্য। শুনিয়াছি যে,কখনং সহস্রং মনুষ্য প্রান্তরমধ্যে সমবেত হইয়া ঐ সকল অস্ত্রাদির দ্বারা পরস্পর প্রহার করিয়া বধ করে। আমার বোধ হয়, মনুষ্যগণ পরস্পরের বিনাশার্থ এই পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি নামক রাক্ষসের সৃজন করিয়াছিল। সে যাহাই হউক, আপনারা স্থির হইয়া এই মনুষ্য-বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। মধ্যেং রসভঙ্গ করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে বক্তৃতা হয় না। সভ্যজাতিদিগের এরূপ নিয়ম নহে। আমরা এক্ষণে সভ্য হইয়াছি,সকল কাজে সভ্যদিগের নিয়মানুসারে চলা ভাল।

আমি একদা সেই পোর্ট ক্যানিং কোম্পানির বাসস্থান মাতলায় বিষয়-কর্ম্মোপলক্ষে গিয়াছিলাম। তথায় এক বংশমণ্ডপ-মধ্যে একটী কোমল মাংসযুক্ত নৃত্যশীল ছাগবৎস দৃষ্টি করিয়া তদাস্বাদনার্থ মণ্ডপমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। ঐ মণ্ডপ ভৌতিক—পশ্চাৎ জানিয়াছি মনুষ্যেরা উহাকে ফাঁদ বলে। আমার প্রবেশমাত্র আপনা হইতে তাহার দ্বার রুদ্ধ হইল। কতক গুলি মনুষ্য তৎপরে সেই খানে উপস্থিত হইল। তাহারা আমার দর্শন পাইয়া পরমানন্দিত হইল, এবং আহ্লাদসূচক চীৎকার, হাস্য,পরিহাসাদি করিতে লাগিল। তাহারা যে আমার ভূরসী প্রশংসা করিতেছিল, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কেহ আমার আকারের প্রশংসা করিতেছিল, কেহ আমার দন্তের, কেহ নখের, কেহ লাঙ্গূলের গুণগান করিতে লাগিল। এবং অনেকে আমার উপর প্রীত হইয়া, পত্নীর সহোদরকে যে সম্বোধন করে, আমাকে সেই প্রিয় সম্বোধন করিল। পরে তাহারা ভক্তিভাবে আমাকে মণ্ডপ সমেত স্কন্ধে বহন করিয়া, এক শকটের উপর উঠাইল। দুই অমলশ্বেতকান্তি বলদ ঐ শকট বহন করিতেছিল। তাহাদিগের দেখিয়া আমার বড় ক্ষুধার উদ্রেক হইল। কিন্তু তৎকালে ভৌতিক মণ্ডপ হইতে বাহির হইবার উপায় ছিল না, এ জন্য অর্দ্ধভুক্ত ছাগে তাহা পরিতৃপ্ত করিলাম। আমি সুখে শকটারোহণ করিয়া, ছাগ মাংস ভক্ষণ করিতেং এক নগরবাসী শ্বেতবর্ণ মনুষ্যের আবাসে উপস্থিত হইলাম। সে আমার সম্মানার্থ স্বয়ং দ্বারদেশে আসিয়া আমার অভ্যর্থনা করিল। এবং লৌহ দণ্ডাদি ভূষিত এক সুরম্য গৃহ মধ্যে আমার আবাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিল। তথায় সজীব বা সদ্য হত ছাগ মেষ গবাদির উপাদেয় মাংস শোণিতের দ্বারা আমার সেবা করিত। অন্যান্য দেশ বিদেশীয় বহুতর মনুষ্য আমাকে দর্শন করিতে আসিত, আমিও বুঝিতে পারিতাম যে, উহারা আমাকে দেখিয়া চরিতার্থ হইত।

আমি বহু কাল ঐ লৌহজালাবৃত প্রকোষ্ঠে বাস করিলাম। ইচ্ছা ছিল না যে, সে সুখ ত্যাগ করিয়া আর ফিরিয়া আসি। কিন্তু স্বদেশ-বাৎসল্য প্রযুক্ত থাকিতে পারিলাম না। আহা! যখন এই জন্ম-

তুমি আমার মনে পড়িত, তখন আমি হাউ হাউ করিয়া ডাকিতে থাকিতাম! হে মাতঃ সুন্দরবন! আমি কি তোমাকে কখন ভুলিতে পারিব! আহা! তোমাকে যখন মনে পড়িত, তখন আমি ছাগ মাংস ত্যাগ করিতাম, মেষ মাংস ত্যাগ করিতাম! (অর্থাৎ অস্থি এবং চর্ম্মমাত্র ত্যাগ করিতাম)—এবং সর্ব্বদা লাঙ্গুলাঘাতের দ্বারা আপনার অন্তঃকরণের চিন্তা লোককে জানাইতাম। হে জন্মভূমি! যত দিন আমি তোমাকে দেখি নাই, তত দিন আমি ক্ষুধা না পাইলে খাই নাই! নিদ্রা না আসিলে নিদ্রা যাই নাই। দুঃখের অধিক পরিচয় আর কি দিব, পেটে যাহা ধরিত, তাহাই খাইতাম, তাহার উপর আর দুই চারি সের মাত্র মাংস খাইতাম। আর খাইতাম না।”

তখন বৃহল্লাঙ্গূল মহাশয়, জন্মভূমির প্রেমে অভিভূত হইয়া অনেক ক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। বোধ হইল, তিনি অশ্রুপাত করিতেছিলেন এবং দুই এক বিন্দু স্বচ্ছ ধারা পতনের চিহ্ন ভূতলে দেখা গিয়াছিল। কিন্তু কতিপয় যুবা ব্যাঘ্র তর্ক করেন যে, সে বৃহল্লাঙ্গূলের অশ্রু পতনের চিহ্ন নহে। মনুষ্যালয়ের প্রচুর আহারের কথা স্মরণ হইয়া সেই ব্যাঘ্রের মুখে লাল পড়িয়াছিল।

লেক্‌চরর তখন ধৈর্য্য প্রাপ্ত হইয়া পুনরপি বলিতে আরম্ভ করিলেন। “কি প্রকারে আমি সেই স্থান ত্যাগ করিলাম তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। আমার অভিপ্রায় বুঝিয়াই হউক, আর ভুলক্রমেই হউক, আমার ভৃত্য এক দিন আমার মন্দির-মার্জ্জনান্তে, দ্বার মুক্ত রাখিয়া গিয়াছিল। আমি সেই দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া উদ্যানরক্ষককে মুখে করিয়া লইয়া চলিয়া আসিলাম।

এই সকল বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলার কারণ এই যে, আমি বহুকাল মনুষ্যালয়ে বাস করিয়া আসিয়াছি—মনুষ্য চরিত্র সবিশেষ অবগত আছি—শুনিয়া আপনারা আমার কথায় বিশেষ আস্থা করিবেন সন্দেহ নাই। আমি যাহা দেখিয়াছি তাহাই বলিব। অন্যান্য পর্য্যটক দিগের ন্যায় অমূলক উপন্যাস বলা আমার অভ্যাস নাই। বিশেষ, মনুষ্য সম্বন্ধে, অনেক উপন্যাস আমরা চির কাল শুনিয়া আসিতেছি; আমি সে সকল কথায় বিশ্বাস করি না। আমরা পূর্ব্বাপর শুনিয়া আসিতেছি যে, মনুষ্যেরা ক্ষুদ্র জীবী হইয়াও পর্ব্বতাকার বিচিত্র গৃহ নির্ম্মাণ করে। ঐ রূপ পর্ব্বতাকার গৃহে তাহারা বাস করে বটে, কিন্তু কখন তাহাদিগকে ঐ রূপ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আমি চক্ষে দেখি নাই। সুতরাং তাহারা যে ঐ রূপ গৃহ স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, ইহার প্রমাণাভাব। আমার বোধ হয় যে, তাহারা যে সকল গৃহে বাস করে, তাহা প্রকৃত পর্ব্বত বটে, স্বভাবের সৃষ্টি; তবে তাহা বহু গুহাবিশিষ্ট দেখিয়া বুদ্ধিজীবী মনুষ্যজাতি তাহাতে আশ্রয় করিয়াছে।*

* পাঠক মহাশয় বৃহল্লাঙ্গূলের তর্ক শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইবেন না। এই রূপ তর্কে, মাক্‌স মূলর স্থির করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা লিখিতে জানিতেন না। এই রূপ তর্কে জেম্‌স মিল স্থির করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা অসভ্য জাতি, এবং সংস্কৃত ভাষা রূঢ় ভাষা। বস্তুত এই ব্যাঘ্র পণ্ডিতে এবং মনুষ্য পণ্ডিতে অধিক বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। সম্পাদক।

মনুষ্য-জন্তু উভয়াহারী। তাহারা মাংসভোজী; এবং ফলমূলও আহার করে। বড়২ গাছ খাইতে পারে না; ছোট২ গাছ সমূলে আহার করে। মনুষ্যেরা ছোট গাছ এত ভাল বাসে যে, আপনারা তাহার চাস করিয়া ঘেরিয়া রাখে। ঐ রূপ রক্ষিত ভূমিকে ক্ষেত বা বাগান বলে। এক মনুষ্যের বাগানে অন্য মনুষ্য চরিতে পায় না।

মনুষ্যেরা,ফল মূল লতা গুল্মাদি ভোজন করে বটে, কিন্তু ঘাস খায় কি না বলিতে পারি না। কখন কোন মনুষ্যকে ঘাস খাইতে দেখি নাই। কিন্তু এ বিষয়ে আমার কিছু সংশয় আছে। শ্বেতবর্ণ মনুষ্যেরাএবং কৃষ্ণবর্ণ ধনবান্ মনুষ্যেরা বহুযত্নে আপনা২ উদ্যানে ঘাস তৈয়ার করে। আমার বিবেচনায় উহারা ঐ ঘাস খাইয়া থাকে। নহিলে ঘাসে তাহাদের এত যত্ন কেন? এরূপ আমি এক জন কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্যের মুখেও শুনিয়াছিলাম। সে বলিতেছিল, 'দেশটা উচ্ছিন্ন গেল—যত সাহেব সুবো বড় মানুষে বসে বসে ঘাস খাইতেছে।' সুতরাং প্রধান মনুষ্যেরা যে ঘাস খায়, তাহা এক প্রকার নিশ্চয়।

কোন মনুষ্য বড় ক্রুদ্ধ হইলে বলিয়া থাকে, 'আমি কি ঘাস খাই?' আমি জানি যে,মনুষ্যদিগের স্বভাব যে,তাহারা যে কাজ করে, অতি যত্নে তাহা গোপন করে। অতএব যেখানে তাহারা ঘাস খাওয়ার কথায় রাগ করে, তখন অবশ্য সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, তাহারা ঘাস খাইয়া থাকে।

মনুষ্যেরা পশু পূজা করে। আমার যে প্রকার পূজা করিয়াছিল, তাহা বলিয়াছি। অশ্বদিগেরও উহারা ঐরূপ পূজা করিয়া থাকে; অশ্বদিগকে আশ্রয় দান করে, আহার যোগায়, গাত্র ধৌত ও মার্জ্জনাদি করিয়া দেয়। বোধ হয়, অশ্ব মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ পশু বলিয়াই তাহার পূজা করে।

মনুষ্যেরা ছাগ, মেষ, গবাদিও পালন করে। গো সম্বন্ধে তাহাদের এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা গিয়াছে, তাহারা গোরুর দুগ্ধ পান করে। ইহাতে পূর্ব্বকালের ব্যাঘ্র পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মনুষ্যেরা কোন কালে গোরুর বৎস ছিল। আমি তত দুর বলি না, কিন্তু এই কারণেই বোধ করি গোরুর সঙ্গে মানুষের বুদ্ধিগত সাদৃশ্য দেখা যায়।

সে যাহাই হউক, মনুষ্যেরা আহারের সুবিধার জন্য, গোরু, ছাগল এবং মেষ পালন করিয়া থাকে। ইহা এক সুরীতি সন্দেহ নাই। আমি মানস করিয়াছি প্রস্তাব করিব যে, আমরাও মানুষের গোহাল প্রস্তুত করিয়া মনুষ্য পালন করিব।

গো, অশ্ব, ছাগ, মেষের কথা বলিলাম। ইহা ভিন্ন, হস্তী, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, কুক্কুর, বিড়াল, এমন কি পক্ষী পর্য্যন্ত তাহাদের কাছে সেবা প্রাপ্ত হয়। অতএব মনুষ্য জাতিকে সকল পশুর ভৃত্য বলিলেও বলা যায়।

মনুষ্যালয়ে অনেক বানরও দেখিলাম। সে সকল বানর দ্বিবিধ; এক সলাঙ্গূল, অপর লাঙ্গূলশূন্য। সলাঙ্গূল বানরেরা প্রায় ছাদের উপর,না হয় গাছের উপর থাকে। নীচেও অনেক বানর আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ, বানরই উচ্চপদস্থ।

বোধ হয় ইহার কারণ বংশমর্য্যাদা বা জাতিগৌরব।

মনুষ্য চরিত্র অতি বিচিত্র। তাহাদের মধ্যে বিবাহের যে রীতি আছে, তাহা অত্যন্ত কৌতুকাবহ। তদ্ভিন্ন,তাহাদিগের রাজনীতিও অত্যন্ত মনোহর। ক্রমে২ তাহা বিবরিত করিতেছি।"

এই পর্য্যন্ত প্রবন্ধ পঠিত হইলে, সভাপতি অমিতোদর, দূরে একটী হরিণ শিশু দেখিতে পাইয়া, চেয়ার হইতে লাফ দিয়া তদনুসরণে ধাবিত হইলেন। অমিতোদর এইরূপ দূরদর্শী বলিয়াই সভাপতি হইয়াছিলেন। সভাপতিকে অকস্মাৎ বিদ্যালোচনায় বিমুখ দেখিয়া, প্রবন্ধপাঠক কিছু ক্ষুণ্ণ হইলেন। তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া এক জন বিজ্ঞ সভ্য তাঁহাকে কহিলেন, "আপনি ক্ষুব্ধ হইবেন না. সভাপতি মহাশয় বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে দৌড়াইয়াছেন। হরিণের পাল আসিয়াছে, আমি ঘ্রাণ পাইতেছি।"

এই কথা শুনিবামাত্র মহাবিজ্ঞ সভ্যেরা লাঙ্গূলোত্থিত করিয়া, যে যে দিগে পারিলেন,সে সেই দিগে বিষয় কর্ম্মের চেষ্টায় ধাবিত হইলেন। লেক্চররও এই বিদ্যার্থীদিগের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইলেন। এই রূপে সে দিন ব্যাঘ্রদিগের মহাসভা অকালে ভঙ্গ হইল।

পরে তাঁহারা অন্য এক দিন, সকলে পরামর্শ করিয়া আহারান্তে সভার অধিবেশন করিলেন। সে দিন নির্ব্বিঘ্নে সভার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশ পঠিত হইল। তাহার বিজ্ঞাপনী প্রাপ্ত হইলে, আমরা তাহা প্রকাশ করিব।

উদ্দীপনা।

সমাজ-সমালোচন।

ভারতবর্ষে অনেক ভাল বস্তু ছিল; তাহার অনেক একেবারে লুপ্ত হইয়াছে; অনেক লুপ্তপ্রায়, অনেক নির্জ্জীব ও মরণাপন্ন,ও অনেক বিকৃত ভাবাপন্ন। আবার অনেক ভাল বস্তু ছিল না। কিম্বা মধ্যে মধ্যে হইয়াছিল মাত্র। যা ছিল তা আবার হইবে। কিন্তু যা ছিল না, না থাকাতেই এত সর্ব্বনাশ; অথবা যা ছিল, থাকাতেই এত সর্ব্বনাশ, তাহারই অনুসন্ধান আমাদিগের কর্ত্তব্য। অনুসন্ধান করিয়া যে ভাল বস্তুটি ছিল না, তাহা কিসে সমাজে প্রবিষ্ট হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা, যদি প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, তবে অতি যত্ন পূর্ব্বক তাহার পোষণ করা, অতি কর্ত্তব্য। যে মন্দ বস্তুটি ছিল, তাহা যদি এখন আর না থাকে, তবে যাহাতে সেটি আর পুনঃ প্রবেশ করিতে না পারে, এমন সাবধান হওয়া উচিত, এবং যে মন্দ বস্তু গুলি এখনও জীবিত রহিয়াছে,সে গুলি যাহাতে সমাজ হইতে একেবারে উৎপাটিত হইয়া যায়, তাহার জন্য বিশেষ যত্ন করা যুক্তিযুক্ত।

এই একটি ভাল বস্তু ছিল না। এটি সমাজের স্বাস্থ্য জন্য থাকা অত্যন্ত আব-

শাক। 'ছিল না' এই শব্দটি ন্যায় মতের অভাব পদার্থ জ্ঞাপক বোধ করিতে হইবেনা। "আমার রোগে রোগে আর শরীরে কিছু মাত্র বল নাই" বলিলে বলের নিরবচ্ছিন্ন অভাব বুঝায় না। যত টুকু বল শরীরের সহজ অবস্থায় থাকা নিতান্ত আবশ্যক, সে টুকু নাই বুঝিতে হইবে। সেই রূপ সমাজ সম্বন্ধেও বুঝিতে হয়।

আমাদের এই একটি ভাল বস্তু ছিল না। উদ্দীপনা শক্তি ছিল না। ডিমস্থিনিস, কাইকিরো, আমাদের এক জনও ছিল না। যে বাক্‌শক্তি ইউরোপে এলোকৌয়েন্‌স্‌ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত তাহা আমাদের ছিল না। অলঙ্কারকারেরা উদ্দীপন বিভাবের বর্ণন ও লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উদ্দীপন বিভাবকে তাঁহারা রসের একটি অঙ্গ বলেন। রসকে কাব্যের সারভূত পদার্থ বলেন। "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং।" কিন্তু কবিতাশক্তি ও উদ্দীপনাশক্তি,দুটি যে ভিন্ন এ কথা সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা বলেন না। যেমন কাব্যের সার রস, তেমনি উদ্দীপনার সারও রস। কাব্যসার রস যেমন করুণ, বীর, প্রভৃতি নানা ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, উদ্দীপনার সার রসও ঠিক সেই রূপ নানা ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। কাব্য রস বর্ণনে যেমন আলম্বন, উদ্দীপন প্রভৃতি বিভাবের আবশ্যকতা ও যেমন স্থায়ী ও সঞ্চারী ভাব নানা প্রকার উদিত হয়, সেইরূপ উদ্দীপনা রসেও আলম্বন উদ্দীপন প্রভৃতি নানা বিভাবের আবশ্যকতা ও তাহাতেও সেইরূপ নানা প্রকার স্থায়ী ও সঞ্চারী ভাব উদ্ভূত হয়। আপাততঃ দৃষ্টিতে কবিতা ও উদ্দীপনা এক বোধ হইতে পারে, কিন্তু তাঁহারা সহোদরা মাত্র। এক গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়া দুই জনে কালে দুই বিভিন্ন গোত্রে পরিণীতা হইয়াছেন। এক্ষণে দুই জনের বিভিন্ন গোত্র বলিতে হইবে। উদাহরণে শীঘ্র বুঝা যাইবে। একই বিষয়, উদ্দীপনা কিরূপ ভাবে বলেন, শুনুন; আর কবিতাই বা কি রূপে বলেন, পরে শুনিবেন।

উদ্দীপনা বলিতেছেন।

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরে গলায় হে,
কে পরে গলায়॥
যবনের দাস হয়ে ক্ষত্রিয় তনয় হে,
ক্ষত্রিয় তনয়।
এ কথা যখন হয় মনেতে উদয় হে,
মনেতে উদয়।
ঐ শুন ঐ শুন ভেরির আওয়াজ হে,
ভেরির আওয়াজ।
সাজ সাজ বলে সাজ সাজ সাজ হে,
সাজ সাজ সাজ।"
(পদ্মিনী উপাখ্যান।)

সেই স্বাধীনতা বিষয়েই আবার কবিতা কি বলেন, শুনুন;—

"সেই দিন রাত্রিকালে মহাবন হইতে বিংশতি সহস্র যবন আসিয়া নবদ্বীপ প্লাবিত করিল। বঙ্গজয় সম্পন্ন হইল। যে সূর্য্য সেই দিন অস্তে গিয়াছে, আর তাহার উদয় হইল না। আর কি উদয় হইবে না? উদয় অস্ত উভয়ই ত স্বাভাবিক নিয়ম। আকাশের সামান্য নক্ষত্রটীও অস্ত গেলে পুনরুদিত হয়।"

(মৃণালিনী।)

দুইটিই রসাত্মক বাক্য। কিন্তু প্রথমটি কখনই আপনা আপনি বলা যাইতে পারে না। কোন এক বিশেষ ব্যক্তি ইহার উদ্দেশ্য, তাহার আর সংশয় নাই। রসাত্মক বাক্য বটে, কিন্তু বক্তার সম্মুখে এক জন শ্রোতা থাকা নিতান্ত আবশ্যক। দ্বিতীয়টি স্বতঃস্খলিত রসাত্মক বাক্যমাত্র। হইতে পারে, কবি যখন ঐ কথা গুলি কণ্ঠ হইতে বহির্গত করিতেছিলেন, তখন অনেক লোক তাঁহার নিকটে ছিল, ও সেই কথা শুনিতে পাইয়াছিল, কিন্তু তিনি কখনই তাহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া সে কথা গুলি উচ্চারণ করেন নাই। তিনি আপনি আপনার মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, কেহ শুনিল কি না, তাহাতে তাঁহার মনোযোগ নাই।

কিন্তু উদ্দীপনা সর্ব্বদাই লোককে ডেকে কথা কন। পরের মনোবৃত্তি সঞ্চালন, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি উত্তেজন, অন্যের মনে রস উদ্ভাবন, অন্যকে কোন কার্য্যে লওয়ান, এই রূপ একটি না একটি তাঁর চির উদ্দেশ্য। তিনি সর্ব্বদাই ডাকিতেছেন। নিজ মন হইতে একটু রস তোমার মনে ঢালিয়া দিলেন, তুমি হয়ত সাহসে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলে, কখন বা ভয়ে কাঁপিতে লাগিলে, কখন বা তুমি ক্রন্দন করিয়া উঠিলে। উদ্দীপনা চরিতার্থ হইলেন। তিনি যে রস তোমার মনে উদ্দীপন করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা করিলেন; সুতরাং চরিতার্থ হইলেন। কবিতা সেই প্রকৃতির নহেন। তিনি কাহাকে ডাকেনও না, নিজে হাত তুলে কাহাকে কিছু ঢালিয়াও দেন না। তিনি কখন বসন্ত-সন্ধ্যা-বাতান্দোলিতা, প্রস্ফুটিতা, ভূরি প্রস্ফুটিতা, সদ্যঃজল-সিঞ্চিতা, ক্বচিৎ ভ্রমর-ভর-স্পন্দিতা, যূথিকা লতা রূপে বন আলো করিয়া বসিয়া আছেন, কাহাকে ডাকেনও না, কাহাকে কিছু ঢালিয়াও দেন না। চতুর্দ্দিক গন্ধে আমোদিত হইতেছে; তিনি সেই গন্ধ বিস্তার করিয়াই সুখানুভব করিতেছেন। তাহাতেই চরিতার্থ হইতেছেন। সে গন্ধ কেহ ঘ্রাণ লইল কি না, সে শোভা কেহ দেখিল কি না, তাহাতে তাঁর ভ্রূক্ষেপও নাই। তুমি নিকটে যাইবামাত্র গন্ধে ভোর হইলে, সেই অতুল শোভা দেখিয়া তোমার নয়ন তৃপ্ত হইল, তোমার মানস মোহিত হইল, তুমি চরিতার্থ হইলে; লতার তাহাতে কিছু মাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। লতা ফুটিয়াই চরিতার্থ হইয়াছে। কবিতা কখন বা জ্বলন্ত অনল রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। ধূউ ধূউ করিয়া অগ্নি জ্বলিতেছে; শোঁ শোঁ করিয়া শব্দ হইতেছে; মধ্যে মধ্যে চট্ চট্ শব্দে কর্ণকূহর বধির হইয়া যাইতেছে। সহস্র শিখা গগন স্পর্শ করিয়াছে। চারিদিকে স্ফুলিঙ্গ ছুটিতেছে। তেজে দিঙ্মণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। উত্তাপ ক্রমেই চারি পার্শ্বে বিস্তার করিতেছে। কবিতা রূপ ধারণ করিয়াই চরিতার্থ হইতেছেন। তুমি দূর হইতে ব্রহ্মমূর্ত্তি দেখিতে পাইলে, ঝঞ্ঝা-প্রধাবিত লক্ষণবাহী শব্দ সদৃশ সেই তুমুল আরাব শুনিতে পাইলে, ভয়বিস্ময়ে তোমার চিত্ত পরিপূরিত হইল, তুমি নিকটে গেলে, উদ্দী-

রিত উত্তাপে তোমার গাত্র অভিষিক্ত হইল। যদি তুমি শীতার্ত্ত হও তোমার সুখস্পর্শ হইল। পতঙ্গবৎ অতি নিকটে যাও, তুমিই অবিলম্বে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। কিন্তু প্রচণ্ড অগ্নির তাহাতে কিছুই এসে যায় না। কখন বা কবিতা প্রেতভূমিরূপ ধারণ করিয়া নদীকূলে শয়ন করিয়া থাকেন। রাশিং অঙ্গার বিকীর্ণ রহিয়াছে; অঙ্গারে অর্দ্ধ পুরিত চুল্লী; অর্দ্ধ দগ্ধ বংশখণ্ড; অর্দ্ধভঙ্গ, অল্প ভঙ্গ, সছিদ্র,অছিদ্র, মৃৎকলস, কত গড়াগড়ি যাইতেছে; কোন কোনটার ভিতর সন্ধ্যাবায়ু প্রবেশ করাতে হোহো করিয়া শব্দিত হইতেছে; সমস্ত স্থান, অস্থি কপাল কঙ্কাল কেশ পরিপূরিত। দক্ষিণে জলসমীপে একটী চিতা জ্বলিতেছে। এক ব্যক্তি একটা বাঁশ লইয়া একটী চিতাস্থিত শবের উদরে বেগে আঘাত করিল। শব দক্ষিণ বাহু উত্তোলন করিল; তোমার বোধ হইল যেন হাত নাড়িয়া বারণই করিল। তুমি পলায়নপর হইয়া বাম দিকে দেখিলে; দেখিলে ভগ্ন ঘাটের উপরি প্রৌঢ়া মাতা অপোগণ্ড নব কুমার শিশুকে বটতলায় শোয়াইয়া ছন্দে বন্ধে ক্রন্দন করিতেছেন। দূরে, বোধ হইল এক জন লোক বসিয়া আছে। নিকটে গেলে। এ কি! সদ্য মরা শব হেলান্ দিয়া বসান রহিয়াছে। তুমি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শিহরিয়া উঠিলে। একটা কৃষ্ণকায় কুকুর তোমার সেই চাহনি দেখিল; ঐ শবের দিকে দেখিল; উভয়ে কি প্রভেদ যেন কিছুই না বুঝিতে পারিয়া বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল। সন্ধ্যা সমীরণ সঞ্চালনে তোমার কর্ণমূলে কে যেন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল; কলসের হো হো শব্দে কে যেন হোহোহো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তুমি আড়ষ্ট, আতুষ্ক, নিস্পন্দ, তুষ্ণীম্ভূত,চকিত ও স্তগিতনেত্র। দূরে একটি শিবারব তোমার কর্ণে প্রবেশ করিল। তুমি চারি দিকে দেখিয়া ভয়, বিস্ময়, বিরাগ, জুগুপ্সা পরিপূরিত মনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলে। তোমার এত ভাবান্তর হইল, শ্মশানের কি হইল? কিছুই নহে।

কবিতা রসাত্মিকা আত্মগতা কথা। উদ্দীপনা রসাত্মিকা অন্যোদ্দিষ্টা কথা। সুতরাং নির্জ্জনে বিরলে চিন্তাই কবিতার প্রসূতি; এবং অনেক লোকের সহিত আলাপে ও কথোপকথনেই উদ্দীপনার জন্ম হইয়া থাকে। কেন পূর্ব্বতন কালে আমাদের কবি,—পুঞ্জং কবি ছিল,ও এক জনও উদ্দীপক ছিল না, তাহা এখন সহজেই বুঝা যাইতে পারে। ভারতবর্ষীয়দের মত বোধ হয় এমন নির্জনস্পৃহ জাতি,—এমন নির্জনচিন্তাস্পৃহ জাতি, পৃথিবীতে আর ছিল না, এখনও বোধ হয় আর নাই। বোধ হয় এই জন্যই এত কবি,—প্রকৃত কবিপদ বাচ্য কবি,এক দেশে এত আর কখনই জন্মে নাই। আজিও কোথাও জন্মিতেছে না।

সংসার ভাল মন্দ মিশ্রিত; সুখ দুঃখ জড়িত। যেখানে গুণ আছে, তার সঙ্গেং দোষ আছে; নিরবচ্ছিন্নতা, পূর্ণতা, অত্যন্তাভাব, এগুলি আধ্যাত্মিক পদার্থবাচক, সাংসারিক অবস্থাজ্ঞাপক নহে। এক দিকে কিছু বেশী লাভ হইয়াছে কি, অন্য দিকে সেই পরিমাণে ঠিক না হউক, কতক ক্ষতি অবশ্যই হইয়াছে। জগতের

জমাখরচ সকল সময় ঠিক মিল থাকে কি না, তা বলা যায় না। কিন্তু চল্‌তি কারবার। কোন কুঠিতে আজ মাল আমদানি হইল, জমার অঙ্ক দেখিতে খরচের অঙ্ক হইতে অনেক বেশী বোধ হইতেছে, অন্য কুঠিতে সেই সময় এত বিলাত-বাকি যে সে কুঠি চালান ভার। কিন্তু সমস্ত জগতের কারবার চিরকালই চল্‌তি। সামান্য খণ্ড সমাজেও সেই রূপ। যাঁহার উপর লক্ষ্মীর কৃপা হইয়াছে, সপত্নী সরস্বতী তাঁর দিকে প্রায় চেয়ে দেখেন না; লক্ষ্মী আবার তেমনি সপত্নী বরপুত্রদের পল্লীতেও পদার্পণ করেন না। যশোরাশি মানধন পণ্ডিতপ্রবর অপ্রিয়বাদিনী ভার্য্যা লইয়া বিব্রত; দাসদাসী পরিবেষ্টিতা রূপযৌবনসম্পন্না সুশীলা সতী মাদকসেবনশীল উদ্ধত স্বামী নিগ্রহে দিন২ ম্রিয়মাণা হইতেছে। কেহ বা লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া, আয়াসসাধ্য যজ্ঞ করিয়া একটী পুত্রের কামনা করিতেছে, অন্য এক ব্যক্তি সোণার চাঁদ ছেলেদিগকে, ননীর পুতলি মেয়ে গুলিকে, দু বেলা দুটো মাছে ভাতে, পূজার সময়ে এক২ খানি নীলে ছোবান কোরা কাপড় দিতে পারিতেছে না। এই জন্যই কেহ শীঘ্র আপনার অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে চায় না। কিন্তু তবু যদি উচ্চরবে জিজ্ঞাসা করি, "আপনার অবস্থায় কে অসন্তুষ্ট" প্রতিধ্বনি অমনি তখনি মুখের উপর উত্তরচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিবে, "হায়! কে সন্তুষ্ট?" সকলেই অসন্তুষ্ট, সকলেই সন্তুষ্ট। জগতের একটী বিচিত্র কৌশলই এই, যদি এক দিকে কিছু কম থাকে, নিশ্চয় আর এক দিকে কিছু বেশী আছে।

আমাদের অনেক কবি ছিলেন, অনেক কাব্য ছিল, সেই জন্যই আমাদের দেশে এক জনও উদ্দীপক ছিলেন না, উদ্দীপনা ছিল না। যে নিভৃত চিন্তা কবিতা থাকার কারণ, সেই নির্জনস্পৃহাই উদ্দীপনা না থাকার কারণ। সেই নিভৃত চিন্তাই এখনও আমাদের বাঙ্গালি জাতিকে গুমরে গুমরে পোড়াইতেছে। এই যে সমস্ত বঙ্গজাতি টপ্পাগান প্রিয়, তাহাতে কি বুঝায়? বুঝায়, এ দেশে এখনও উদ্দীপনার বীজও অঙ্কুরিত হয় নাই; আপনার কথা আপনি বলিয়াই আমরা ক্ষান্ত, তাই যথেষ্ট; এবং তাহাতেই আমাদের চরিতার্থতা।

ভারতবর্ষীয়েরা যেমন নির্জনস্পৃহ ছিলেন, তেমনি স্বতঃসন্তুষ্ট ছিলেন। ভাল মন্দ উভয়ই প্রয়োজনের অনুচর। সংসারে, সমাজে, গৃহে, আচরণে সকল বিষয়েই প্রয়োজন একা শাসনকর্ত্তা।

বাস্তবিক প্রয়োজনের নিকট ধর্ম্মশাস্ত্রকেও পরাজিত হইতে হয়, প্রয়োজনশাসন সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়ান্। এই জন্যই আমাদের সামান্য কথায় বলে যে গরজের উপর আইন নাই। এই জন্যই সামান্য কথায় বলে যে "অরে দুই প্রহর বেলা সিঁধ কাটিতেছিস যে—না আমার গরজ।" কিন্তু প্রয়োজনে যেমন মন্দ বস্তু হয়, তেমনি ভাল বস্তুও হয়। ভারতবর্ষীয়েরা স্বতঃ সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহাদের কিছুরই আর নূতন প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং অনেক মন্দ বস্তুও জন্মে নাই, অনেক ভাল বস্তুও জন্মে নাই। উদ্দীপনাও জন্মে নাই।

—◆—

উদ্দীপনা।

সমাজ সমালোচন।

দ্বিতীয়ভাগ।

ভারতবর্ষীয়েরা যে স্বতঃ সন্তুষ্ট জাতি ছিলেন, তাহা ভারতের যাহা কিছু পর্য্যালোচনা করিবেন, তাহাতেই প্রকাশ পাইবে। ভারতের সমাজ ভাগ দেখুন। ব্রাহ্মণে নিভৃতে চিন্তা করিলেন, বিবেচনা করিলেন, পরামর্শ দিলেন, ব্যবস্থা করিলেন। ক্ষত্রিয় বিদেশীয় শত্রুর বাহ্য আক্রমণ নিবারণ করিলেন, দস্যু হইতে আভ্যন্তরিক রক্ষা করিলেন। বৈশ্য বাণিজ্যে কৃষিকার্য্যে জীবন যাপন করিলেন। শূদ্র দাস। সমাজের ভাগ যেন ভূগোলের ভাগ। চারিটী খণ্ড দেশ লইয়া যেমন একটী দেশ, তেমনি চারিটী জাতি লইয়া একটী হিন্দু জাতি হইল। ঠিক যন্ত্রের মত সমুদায়। প্রয়োজন নাই, অভাবও নাই, কষ্টও নাই। কে কাহার মনে কি উদ্দীপন করিতে যাইবে? প্রয়োজন কি? জীবনে দেখুন। ব্রাহ্মণ শিশু আট বৎসর বা দশ বৎসর পর্য্যন্ত পিতামাতার ক্রোড়ে বর্দ্ধিত হইলেন। উপনয়ন হইল। সেইটী তাঁহার বিদ্যারম্ভ। তিনি তখন ব্রহ্মচারী। [বোর্ডিং ইউনিবর্সিটির বোর্ডর।] কেহ বার বৎসর, কেহ ষোল, কেহ বিংশতি বৎসর পরে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলেন, বিবাহ করিলেন। ক্রমে স্থবির বয়সে বনে গেলেন। নদীস্রোতের ন্যায় জীবনস্রোতঃ। পিতামাতার অনুকরণ করিলেই, শাস্ত্রানুযায়ী কার্য্য করা হইল। যুক্তি ও শাস্ত্রও তাহার বিপরীত কিছুই বলিতে পারিত না। সুতরাং যুক্তিও শাস্ত্র সঙ্গতও হইল; সমাজ সুশৃঙ্খল হইয়া চলিতে লাগিল। এ দিকে দেখুন বসুন্ধরা ভূরি শস্যপ্রসূতি; খনি রত্নগর্ভা; ফল ফুলের উদ্যান বলিলেই হয়। কথায় বলে, পৃথিবীর সকল জিনিষের নমুনা ভারতে আছে। পূর্ব্বকালে যে সেই রূপ ছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। কিছুরই অভাব নাই। প্রয়োজন নাই। সুতরাং কাহাকে কিছুই বলিতে হইল না। যাহার কাহাকেও কিছুই বলিতে হয় না, তাহার উদ্দীপনা কোথা হইতে হইবে? তিনি কবি হইলে হইতে পারেন। হায়! রোগশোকদুঃখজরামরণসঙ্কুল পৃথিবীতে কবি নয় কে? সকলেই এক সময়ে না এক সময়ে কবি। যাঁহার লেখা পড়া বোধ আছে, যিনি আপনার মনের ভাব, ভাষায় সুন্দর রূপে গাঁথনি করিতে পারেন, তিনিই প্রকাশ্য কবি। কিন্তু অন্তরে অন্তরে সকলেই কবি। যিনি মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া, অশ্রুপূর্ণ লোচনে "হায় বুঝি হারাইলাম!" বলিয়াছেন, তিনি অন্তরে কবি। এক্ষণে অন্তরে কবি নয় কে? তাহাতেই বলি, হায়! রোগশোকদুঃখজরামরণসঙ্কুল পৃথিবীতে কবি নয় কে? আবার এ দিকেও বলি—ও হো হো! সুখশান্তিসৌন্দর্য্যশোভাপ্রীতিপূরিত মজার সংসারে কবি নয় কে? আমরা সকলেই অন্তরে কবি। কোন নারীর স্নেহ, আদর বা

প্রীতিতে গলিয়া গিয়া, যিনি মা, দিদী বা প্রেয়সী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, তিনিই অন্তরে কবি। যে হাসে নাই, কাঁদে নাই,সে মনুষ্য নয়; জীবন্ত পুতুল। মনুষ্যমাত্রেই অন্তরে অন্তরে কবি। সংসারে নানা রস ছড়ান রহিয়াছে, অবস্থানুসারে তিক্ত মিষ্ট লবণ আস্বাদন করিতে হইতেছে। মানব যদি কুশিক্ষায় অরসিক, অভাবুক না হইয়া থাকে,তাহাকে কবি হইতেই হইবে। কবিত্ব মনুষ্যের স্বভাবধর্ম্ম। উদ্দীপনা সে রূপ নহে, ইহা বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ রূপে পরিণত, বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হয়।

প্রাচীন ভারতের একগতিস্রোতে ইহার বীজ মৃত্তিকা আশ্রয় করিতে পারে নাই। স্রোতের বলে কয়বার চরে লাগিয়াছিল,ও সেই কয়বারি বীজ অঙ্কুরিত, লতা পল্লবিতা ও পুষ্পিতা এবং বোধ হয়, ফল ভরেও অবনতা হইয়াছিল। পুরাবৃত্তের কোন্ কোন্ স্থানে এইরূপ ঘটনা হয়, তাহাও আমাদের দেখা বিশেষ কর্ত্তব্য। কিরূপ মৃত্তিকায়, কিরূপ জল বায়ুতে বীজ অঙ্কুরিত ও লতা বর্দ্ধিতা হয়, তাহা না জানিলে,কখনই আমরা কৃষিকার্য্যে সফলতা লাভ করিতে পারি না; সেই কৃষিকার্য্যও এখন বিশেষ আবশ্যক।

প্রাচীন ভারতের একগতিস্রোতো বাহিনীতে আমরা বড় অধিক দিন বা অধিক বার সঞ্চরণ করি নাই। ভারত নদী বিপুলা; চর দেখিয়াই, আমরা আমাদের ক্ষুদ্র তরী সেই প্রবাহে বিসর্জ্জন করিতে ভরসা পাই। নাবিক পাই নাই, পাইলট পাই নাই, সুতরাং কয়টি বৃহৎ বৃহৎ চরে লাগাইয়া,সেই কয়টি দেখিয়াই, প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইয়াছে। ক্ষুদ্র দ্বীপ প্রায় কখনই লক্ষ্যে পড়ে নাই। যদি কখন দূরে একটী কাল মেঘের মত মধ্যে মধ্যে দেখিয়া থাকি,ভরসা করিয়া যাইতে পারি নাই। আর পাঁচ জন সঙ্গী পাইলেও বা ভরসা হয়। তা কে কোথায়, কাহাকেও দেখি না। তখন ভয়ে বিষাদে বাগশ্রীতে বলিতে হয়,—

"তরি নাহি দেখি আর,চারিদিকে অন্ধকার।
বুঝি প্রাণ যায় এবার, ঘূর্ণিত জলে।"

এই রূপ অবস্থায় এক বার একজন বিলাতি পাইলটের সঙ্গে দেখা হয়। তাহাকে দেখিয়া মনে কিছু ভরসা হয়। সাহেবেরা নৌবিদ্যায় কিছু পটু, তাহাতে জাতিতে ইংরেজ,সাহসও বিলক্ষণ আছে। পাইলট অগ্রে অগ্রে চলিলেন, আমরা সঙ্গেং চলিলাম। স্রোতের বিপরীত দিকে যাওয়াই, আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। সাহেব আমাদিগকে বলিলেন, ঐ যে দূরে চর দেখিতে পাইতেছ, ঐটি মহাভারত, আর তার এদিকে এই যে দেখিতেছ, এইটি রামায়ণ। আমরা সিহরিয়া উঠিলাম। দ্বাপরের পর ত্রেতা যুগ হইল, এ যে ঘোর কলি! সাহেবের প্রতি একে বারে অশ্রদ্ধা জন্মিল। তখন সেই পূর্ব্বের গানের মোহাড়াটি গাইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

"কোথা আনিলে হে—
পথ ভুলালে হে—॥—"

সেই অবধি আর কাহারো সঙ্গে ভারত নদীতে যাই না।

পরশুরামের ক্ষত্রিয়প্রাদুর্ভাবদমনসম্বন্ধে আমরা পৌরানিক আখ্যায়িকা ব্যতীত আর কিছুই জানি না। কিন্তু

তাহার পর রাম অবতার। দক্ষিণবিজয়ই রামায়ণযুদ্ধ। যখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় মধ্যে, আর রাজ্য লইয়া বিবাদ ছিল না; যখন সমুদায় আর্য্যাবর্ত্তে আর্য্যসন্তানেরাই বাস করিতেছিল, তখনই রামায়ণের ঘটনা সমস্ত ঘটে।

তখন দাক্ষিণাত্য অনার্য্য ভূমি; রামচন্দ্র, যে উদ্দেশেই হউক, এই অনার্য্য ভূমিতে প্রবেশ করিয়া, ইহার সীমান্তবর্ত্তী লঙ্কাদ্বীপ পর্য্যন্ত বিজয় করেন। আর্য্যাবর্ত্তের সীমা ছাড়াইয়াই, নির্জনস্পৃহ আর্য্য মুনিগণের তপোবন ছাড়াইয়াই, রাম এক জাতি দেখেন। এ জাতি অতি প্রাচীন; আর্য্যেরা ইহাদিগকে জানিতেন। আর্য্যগণের পীড়নে ইহারা বহিষ্কৃত হইয়া,—উত্ত্যক্ত হইয়া, দক্ষিণে বাস করিতেছিল। আর্য্যেরা ইহাদিগকে মাংসপ্রলোভী জানিয়া, ঘৃণা করিত ও চণ্ডাল বলিয়া, হেয় অভিধান দিয়াছিল। শ্রীরামকে স্বকার্য্য উদ্ধার জন্য এই জাতির সহিত বন্ধুত্ব করিতে হইয়াছিল। রামায়ণে এই ঘটনাই গুহক চণ্ডালের সহিত মৈত্রনিবন্ধন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পরে এক অত্যন্ত অসভ্য জাতির মধ্যে যাইয়া, কোন দলের সহিত যুদ্ধ করিয়া, সেই দলকে পরাজয় এবং কোন দলের সহিত বা সন্ধিবন্ধন করিয়াছিলেন। ইহাই রামায়ণে বালিবানর বধ ও সুগ্রীবসহ বন্ধুত্ব বলিয়া বর্ণিত। চণ্ডালেরা হিন্দুসমাজবহিষ্কৃত বটে, কিন্তু বানরগণের ন্যায় অসভ্য নহে। কিন্তু বানরগণ চণ্ডালগণ অপেক্ষা বিশেষ সমৃদ্ধিশালী। কেননা তাহারা দাক্ষিণাত্যের আদিম বাসী; চণ্ডালগণের ন্যায় আর্য্যনির্ব্বাসিত জাতি নহে। পরে রামচন্দ্র নরমাংসলোভী, নরমাংসভোজী বিকৃতাকার এক জাতিকে প্রায় একেবারে লোপ করেন। ইহাই রাবণের সবংশে বধ। ইহারা অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী। যেমন আমেরিকার নরকপালসংগ্রহকারী, নরবলিপ্রতিষ্ঠাকারী অজতেকজাতির মধ্যে অনার্য্য সমৃদ্ধির বিশেষ পুষ্টি হইয়াছিল, রাক্ষসদিগেরও ঠিক সেইরূপ হইয়াছিল। আর্য্যগণের ন্যায় তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রবিভাগ ছিল না। সকলেই যোদ্ধা ও ধনুর্ধারী, বেদাচারবহির্ভূত, অথচ বিশেষ সমৃদ্ধিশালী। রামায়ণ ঘটনার স্থূল মর্ম্ম এই, কিন্তু এ গুলি গুরুতর ঘটনা। বৈদিক একগতির রোধকারী। ইহাতেই বৃহৎ চর উৎপন্ন হয়। রামকে (তিনি একজনই হউন, আর অনেক জনই হউন,) একটী অসাধারণ বিপ্লব করিতে হইয়াছিল। যে চণ্ডালকে দর্শন করিতে নাই, তাহার সহিত বন্ধুত্ব। সামান্য বর্ণনে বলে, গুহক চণ্ডালের সহিত কোলাকুলি। কন্দমূলফলাশী বানর সদৃশ জীবের হৃদয়ে বীররসের উদ্ভাবনা; পৃথক পৃথক নানা অসভ্য দলের একত্রকরণ। সেই সামান্য অসভ্য জাতির সাহায্যে আমমাংসলোভী, অতিবিক্রমশালী জাতিকে একেবারে উচ্ছিন্ন করা, শ্রীরামচন্দ্রের কার্য্য। পরের চিত্তবৃত্তির উপর, পরের সাহায্যের উপর, লোকের শ্রদ্ধার উপর, তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইয়াছিল। নিভৃত চিন্তা, নির্জ্জনে তারস্বরে বেদপাঠ, আচার্য্য নিকটে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করিয়া, বর্ষে২ এক বার নিজ পরিজন সমভিব্যাহারে অযোধ্যাসং-

লগ্ন শালতালবনে মৃগয়া প্রভৃতি নিয়মিত কার্য্য করিয়াই, তাঁহার জীবন পর্য্যবসিত হয় নাই। তিনি স্বীয় অসীম ক্ষমতা প্রভাবে আর্য্যবৈরী, প্রভুতবিক্রমশালী (যে বিক্রম বর্ণন জন্য আর্য্যমুনি আর্য্যদেবগণকে সেই জাতির দাসত্বে নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন,) সেই জাতিকে একেবারে ভারতবর্ষ নিকটস্থ দ্বীপ হইতেও নির্ম্মূল করিয়াছেন। আর্য্যসন্তানেরা তাঁহার সেই কীর্ত্তি মনে করিয়া, অদ্যাপি তাঁহাকে সপ্তমাবতার বলিয়া শ্রদ্ধা করে। অদ্যাপি তাঁহার নাম মহান্ ঈশ্বর শব্দের প্রতিশব্দ। অদ্যাপি রামজি হিন্দুস্থানে একমেবাদ্বিতীয়ং।

কিন্তু এই ত্রেতাবতার রামচন্দ্র মানবীয় উপায় অবলম্বন করিয়াই কৃতকার্য্য হয়েন। তাঁহার চরিত্র অসাধারণ, অলৌকিক নহে। মনুষ্য যে উপায় অবলম্বন করিয়া, পরের সাহায্য প্রাপ্ত হয়, রামচন্দ্র তাহাই করিয়াছিলেন। পরের সাহায্য না হইলে, কখনই মহৎকার্য্য সুসাধিত হয় না; এবং অন্যে কর্ত্তার মনোভাবে সমভাবী না হইলে, প্রাণপণে সাহায্য করে না। আন্তরিক সাহায্য নহিলে, সাহায্যই নহে। এক ব্যক্তির মনোভাবে আর এক ব্যক্তিকে বা ব্যক্তিগণকে সমভাবী কে করে? রস ঢালিয়া দিয়া পান করিতে, কে বলে? কেবল রস অনুভব করিয়াই ক্ষান্ত না হইয়া, রস উদ্দীপন করিতে চায় কে? উদ্দীপনা। প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়াই, এই রামায়ণ চরে, দক্ষিণ বিজয় চরে, রাবণ বধ চরে, রাক্ষস ধ্বংস চরে, যাহাই নাম দিউন, এই স্থানে, প্রয়োজন, বিপদুদ্ধার, মহৎকার্য্য সাধন, এই সকল জল বায়ুর গুণে উদ্দীপনার বীজ অঙ্কুরিত হয়। সে লতা বহু পল্লবিতা, ভূরিমনোহরকুসুমশোভিতা হইয়াছিল। সে ফুলের মালা এখনও রামায়ণের পাতে পাতে সাজান রহিয়াছে। রামায়ণ গ্রন্থ রামের সমকালিক। রামায়ণ কাব্য স্থানে২ উদ্দীপনাপূর্ণ। রামোপ্তা উদ্দীপনা লতা তাবৎ ভারত ব্যাপিয়াছিল, কবিগুরু বাল্মীকি তাহারি গুটিকত অক্ষয় কুসুম তুলিয়া গাঁথিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই লতা কত দিন জীবিতা ছিল? তাহা কে বলিতে পারে। যে দেশে মৌনব্রতাবলম্বী মুনিগণকে দেবসদৃশ ভক্তি করে; সে দেশে উদ্দীপনা কত দিন জীবিতা থাকিবে? কিন্তু আমরা এ সময়ের কিছুই জানি না। রাবণ নিপাতকারী রাঘব বংশের, সেই সূর্য্য বংশের, প্রাদুর্ভাব কিসে হ্রস্ব হইয়া, চন্দ্র বংশের শ্রীবৃদ্ধি হইল, তা কে বলিতে পারে? কিন্তু ভারত নদীতে আর সহস্রৈক বৎসর এদিকে বাহিয়া আসিয়া, আমরা আর একটী বৃহৎ চর দেখিতে পাই। চর দেখিলেই আশা হয়। অবশ্য নানা তরুলতা আছে। হয় ত উদ্দীপনার লতা আছে। এ চরটী ভারতযুদ্ধ চর।

এই সময়ে বিস্তীর্ণ আর্য্যাবর্ত্তে নানা জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। আর্য্যক্ষেত্রে সুত, মাগধ, বল্লব, গোপ, সুপকার প্রভৃতি নানা আগাছা পরগাছা জন্মিয়াছে। সৈরিন্ধ্রী, নাগকন্যা, আভীরী প্রভৃতি কত জঙ্গলী লতা উদ্ভূতা হইয়াছে, আর্য্যক্ষেত্রের চতুষ্পার্শ্বে শক, খশ, দরদ, বাহ্লীক, চীন, যবন প্রভৃতি নানা অনার্য্য

জাতি দিন২ বিক্রম বিস্তার করিয়া, আপনাদের আয়তন বৃদ্ধি করিতেছে। ভারত রাজ্য, খণ্ড রাজ্য, উপরাজ্য, মণ্ডল, ছত্র, নগর, গ্রাম বিভেদে একেবারে চূর্ণীকৃত হইয়াছে। চোল, কোল, চোর, মণ্ডল, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড়, মথুরা, ত্রিগর্ত্ত, মৎস্য, সৌরাষ্ট্র, মরুকচ্ছ, সিন্ধু, সৌবীর প্রভৃতি নানা দেশ, নানা রাজা। পরস্পরে একতা নাই; সৌহার্দ্দ নাই। এই সময়ে অষ্টম যমলাবতার কৃষ্ণার্জ্জুন জন্ম পরিগ্রহ করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার চিরবৈরী বেদদ্বেষী কংসরাজকে বিনষ্ট করিয়া, যে জরাসন্ধ স্বীয় কারাগারে ভারতের বীরগণকে অন্ধকারে বিনষ্ট করিতেছিলেন, যে শিশুপাল স্বীয় দম্ভে ধর্ম্মের অবমাননা করিতেছিল, তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবার জন্য, যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চ ভ্রাতার সাহায্য লইলেন। সেই পঞ্চ ভ্রাতা আবার আপনাদের চিরজ্ঞাতিশত্রু দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। স্বার্থে দুই বিভিন্ন রাজাকে একত্র করিল। শ্রীকৃষ্ণের অর্থ সুসাধিত হইল, কিন্তু তৎপরেই জ্ঞাতিবৈরযুদ্ধে সমস্ত ভারত দুই দলে বিভক্ত হইল এবং কুরুক্ষেত্রে তুমুল সংগ্রাম হইল। চূর্ণীকৃত ভারত অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য এক না হউক, দুই দল হইয়াছিল। এ গৃহবিবাদে আর কি মহৎ ফল ফলিয়াছিল,তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু অশ্বমেধ পর্ব্বের বর্ণনে বোধ হয় যে, সমস্ত সাম্রাজ্য একীকরণের চেষ্টা হইয়াছিল। যাহা হউক, এই মহৎ কার্য্যের উদ্যমের কর্ত্তৃগণকেও আমরা দেবত্বে অভিষিক্ত করিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণাবতার,অর্জ্জুন নরনারায়ণ। তাঁহার ভ্রাতৃগণ সকলেই দেবরূপী। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ঘটনা সমস্ত মহাভারত প্রণয়নের সমকালিক বৃত্তান্ত। বেদব্যাসের গ্রন্থ মহাভারত, রামায়ণের ন্যায় সেই কালের উদ্দীপনা শক্তির প্রাচুর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। মহোদ্দীপক বেদব্যাসের গ্রন্থোক্ত শকুন্তলা উপাখ্যানের সহিত মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকের লেখার একবার তুলনা করুন। ভারতোক্তা নায়িকা শকুন্তলার চরিত্রের সহিত নাটকের শকুন্তলাচরিত্রের একবার তুলনা করুন। উভয়েই সতী সাধ্বী পতিব্রতা, মানবমোহিনী শক্তিতে ভূষিতা। উভয়েই আশৈশব মুনিগৃহে পালিতা, মাধবীলতার সহিত উভয়েই বর্দ্ধিতা, উটজপর্য্যন্তচারিণী হরিণী উভয়েরই সঙ্গিনী। উভয়কেই দুষ্মন্ত গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ করিয়া,ইচ্ছাপূর্ব্বকই হউক, আর বিস্মৃতি ক্রমেই হউক, বর্জ্জন করিলেন, অর্দ্ধাঙ্গের ভাগিনী করিলেন না,সহধর্ম্মিণী আখ্যা দিয়া মান বৃদ্ধি করিলেন না। কিন্তু এই আচরণে দেখুন, কবির শকুন্তলা কিরূপ ব্যবহার করেন। কবির শকুন্তলা রাজার গোপন ব্যবহার দুইবার স্মরণ করিয়া দিতে গিয়া, পরে লজ্জাতে ঘৃণাতে নিবারিত হইয়া, আপনার দুঃখ আপনিই প্রকাশ করিলেন। যথা,—রাজা। আর্য্যে কথ্যতাম্।

গৌত। ণাবেক্খিদো গুরুঅণো ইমিএ,
তুএবি ণ পুচ্ছিদো বন্ধূ।
একক্ককস্‌সঅ চরিএ,
কিং ভণ্ণদু একক একস্‌সিং॥

শকু। (আত্মগতম) কিং ক্‌খু অজ্জউত্তো

ভণিস্‌সদি ?

রাজা। (সাশঙ্কমাকর্ণ্য) অয়ে ! কিমিদমুপন্যস্তং।

শকু। (আত্মগতম্‌) হদ্ধী হদ্ধী ! সাবলেবো সে বঅণাবক্‌খেবো।

* * * *

রাজা। কিমত্রভবতী ময়া পরিণীতপূর্ব্বা।

শকু। (সবিষাদমাত্মগতম্‌) হিঅঅ সংপদং সংবুত্তা দে আসঙ্কা।

* * * *

রাজা। ভো স্তপস্বিনশ্চিন্তয়ন্নপি ন খলু স্বীকরণমত্রভবত্যাঃস্মরামি তৎ কথমিমামভিব্যক্তসত্ত্বলক্ষণামাত্মানমক্ষত্রিয়ং মন্যমানঃ প্রতিপৎস্যে।

শকু। (স্বগতম্‌) হদ্ধী হদ্ধী! কধং পরিণএজ্জেব সন্দেহো ভগ্‌গা দাণিং দূরারোহিণী আসালদা।

* * * *

শকু। (স্বগতম্‌) ইমং অবথন্তরং গদে তাদিসে অণুরাএ কিম্বা সুমরাবিদেণ, অধবা অত্তা দাণিং মে সোধনীও হোদুত্তি কিঞ্চি বদিস্সং। (প্রকাশম্‌) অজ্জউত্ত ! (ইত্যর্দ্ধোক্তে) অধবা সংসইদো দাণিং এসো সমুদাচারো। পৌরব ! জুত্তং ণাম তুহ, পুরা অস্‌সমপদে সত্তাবুত্তাণহিঅঅং ইমংজণং তধাসমঅপুব্বঅং সম্ভাবিঅ সম্পদং ইদিসেহিং অক্‌খরেহিং পচ্চক্‌খাদুং।

* * * *

শকু। ভোদু জই পরমথদো পরপরিগ্গহসঙ্কিণা তুএ এব্বং পউত্তং তা অহিণ্নাণেণ কেণবি তুহ আসঙ্কং অবণইস্সং।

রাজা। প্রথমঃ কল্পঃ।

শকু। (মুদ্রাস্থানং পরামৃশ্য) হদ্ধী হদ্ধী! অঙ্গুলীঅসুণ্ণা মে অঙ্গুলী ! (ইতি সবিষাদং গৌতমীমুখমীক্ষতে) * * * *

রাজা। (সস্মিতম্‌) ইদং তাবৎ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বং স্ত্রীণাম্‌।

শকু। এত্থ দাব বিহিণা দংসিদং পউত্তণং অবরং দে কধইস্সং।

রাজা। শ্রোতব্যমিদানীম্‌।

শকু। ণংএক্ক দিঅহে বেদসলদামণ্ডবে ণলিণীবত্তভাঅণগদং উদঅং তুহ হত্থে সণ্ণিহিদং আসী।

রাজা। শৃণুমস্তাবৎ।

শকু। তক্‌খণং সো মে পুত্তকিদও দীহাপঙ্গোণাম মিঅপোদও উপট্‌ঠিদো,তদো তুএ অঅং দাব পঢ়মং পিঅদুত্তি অণুকম্পিণা উবচ্ছন্দিদো উদএণ, ণ উণ সো অপরিচিদস্স দে হত্থাদো উদঅং উবগদো পাদুং, পচ্চা তস্সিং জ্জেব উদএ মএ গহিদে কিদো তেণ পণও, এত্থন্তরে বিহসিঅ তুএ ভণিদং সব্বো সগণে বীসসদি, জদো দুবেবি তুহ্মে আরণ্ণকা ত্থি।

রাজা। আভিস্তাবদাত্মকার্য্যপ্রবর্ত্তিনীভির্মধুরাভিরনৃতবাগ্‌ভিরাকৃষ্যন্তে বিষয়িণঃ।

গৌতমী। মহাভাঅ ! ণারিহসি এব্বং মস্তিদুং, তবোবণসংবড্‌টিদো ক্‌খু অঅং জণো অণভিণ্ণোকইদবস্স।

রাজা ! অয়ি তাপসবৃদ্ধে।

স্ত্রীণামশিক্ষিতপটুত্বমমানুষীণাং,

সংদৃশ্যতে কিমুত যাঃ পরিবোধবত্যাঃ। প্রাগন্তরীক্ষগমনাৎ স্বমপত্যজাতমন্যৈর্দ্বিজৈঃপরভৃতাঃ কিল পোষয়ন্তি।

শকু। (সরোষম্) অণজ্জ ! অত্তণো হিঅআণুমাণেণ কিল সব্বং পেক্‌খসি ; কোণাম অণ্ণো ধম্মকঞ্চুঅব্যবদেসিণো তিণচ্ছন্নকূবোবমস্‌স তুহ অনুআরী ভবিস্‌সদি।

* * * *

রাজা। ভদ্রে প্রথিতং দুষ্মন্তস্য চরিতং, প্রজাস্বপীদং ন দৃশ্যতে।

শকু। তুম্হে জ্জেব পমাণং,
জাণধ ধম্মত্থিদিঞ্চ লোঅস্স।
লজ্জাবিনিজ্জিদাও
জাণন্তি ণ কিম্পি মহিলাও॥
সুট্‌ঠুদাব অত্তচ্ছন্দাণুচারিণী গণিআ সমুবট্‌ঠিদা।

গৌতমী। জাদে ইমস্স পুরুবংসপচ্চয়েণ মুহমহুণো হিঅঅবিসস্‌স হত্থং সমুবগদাসি।

শকু। (পটান্তেন মুখমাচ্ছাদ্য রোদিতি।)

* * * *

শার্ঙ্গরব। * * * গৌতমি গচ্ছাগ্রতঃ। (ইতিসর্ব্বে প্রস্থিতাঃ।)

শকু। অহংদাণিং ইমিণা কিদবেণ বিপ্পলদ্ধা, তুম্হেবি মংপরিচ্চঅধ। (ইত্যনুপ্রস্থিতা)

* * * *

শার্ঙ্গ। (সরোষং প্রতিনিবৃত্য)আঃ পুরোভাগিনি ! কিমিদং স্বাতন্ত্র্যমবলম্বসে।

শকু। (ভীতা বেপতে)

শার্ঙ্গ। শকুন্তলে ! শৃণোতু ভবতী।

যদি যথা বদতি ক্ষিতিপস্তথা
ত্বমসি কিংপুনরুৎকুলয়া ত্বয়া।
অথ তু বেৎসি শুচিব্রতমাত্মনঃ
পতিগৃহে তব দাস্যমপি ক্ষমং॥

* * * *

পুরোধাঃ। (বিচার্য্য) যদি তাবদেবং ক্রিয়তাং—।

রাজা। অনুশাস্তু মাং গুরুঃ।

পুরোধাঃ। অত্রভবতী তাবদাপ্রসবাদস্মদ্‌গৃহে তিষ্ঠতু।

রাজা। কুত ইদম্ ?

পুরো। ত্বংসাধুনৈমিত্তিকৈরুপদিষ্টপূর্ব্বঃ প্রথমমেব চক্রবর্ত্তিনং পুত্রং জনয়িষ্যসীতি। সচেন্মুনিদৌহিত্রস্তল্লক্ষণোপপন্নো ভবিষ্যতি ততোঽভিনন্দ্য শুদ্ধান্তমেনাং প্রবেশয়িষ্যসি, বিপর্য্যয়েত্বস্যাঃ পিতুঃ সমীপগমনং স্থিতমেব।

রাজা। যথা গুরুভ্যো রোচতে।

পুরো। (উত্থায়) বৎসে ইত ইতোঽনুগচ্ছ মাম্।

শকু। ভঅবদি বসুন্ধরে ! দেহি মে অন্তরং। (ইতি সহ পুরোধসা গৌতমীতপস্বিভিশ্চ রুদতী নিষ্ক্রান্তা।)*

* রাজা। আর্য্যে বলুন।

গৌত। এও গুরু জনের অপেক্ষা করে নাই, তুমিও বন্ধু জনকে জিজ্ঞাসা কর নাই। একলা একলার কার্য্যে অপরে কে কি বলিতে পারে ?

শকু। (আত্মগত) না জানি আর্য্য পুত্র কি বলেন ?

রাজা। (শুনিয়া সভয়ে) কি গা ? উপন্যাস আরম্ভ করিলে নাকি ?

শকু। (আত্মগতা) আ ছি ছি ! এঁর বচনভঙ্গী যে কেমন কেমন !

ব্যাসের শকুন্তলা সে প্রকৃতির নহেন, তিনি দুষ্মন্তকর্ত্তৃক পরিবর্জ্জিতা হইয়া, ম্লান বদনে, ছল ছল নয়নে, দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে আশ্বাসকে বিসর্জনদিয়া, প্রত্যাগমন করিবার মহিলা নহেন। তিনি লাঙ্গূলস্পৃষ্টা কালভুজঙ্গিনীর ন্যায় মুখ

* * * *

রাজা। কি আমি এঁকে বিবাহ করিয়াছিলাম নাকি?

শকু। (সবিষাদে আত্মগত) হা হৃদয়! যা ভয় করেছিলে,এখন তাই হলো!!

* * * *

রাজা। হে তপস্বিগণ! ভাবিয়াও ত ইঁহাকে পরিগ্রহ করা, আমি মনে করিতে পারিতেছি না। তবে কুক্ষত্রিয়ের ন্যায় কেমন করে, এই স্পষ্টগর্ব্ভলক্ষণাকে গ্রহণ করি?

শকু। (আত্মগত) ছি ছি! বিবাহেতেই সন্দেহ! এত দিনে আমার দূরারোহিণী আশালতা ভগ্ন হইল।

* * * *

শকু। তেমন অনুরাগই যদি এমন অবস্থান্তর গত হইল, তবে আর মনে পাড়াইবার চেষ্টা করিলেই বা কি হবে? তথাপি আপনাকে দোষমুক্ত করিবার জন্য কিছু বলি। (প্রকাশ)
আর্য্যপুত্র! (এই অর্দ্ধোক্তি করিয়া) অথবা এখন এ সম্বোধন যুক্ত হইতেছে না।
পৌরব! পূর্ব্বে আশ্রমপদে প্রণয়-প্রফুল্ল-হৃদয়া আমাকে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক আদর করিয়া, এখন এই রূপে প্রত্যাখ্যান করা কি, তোমার উপযুক্ত?

* * * *

শকু। ভাল যদি যথার্থই পরস্ত্রীগ্রহণ শঙ্কা করিয়া,তুমি এরূপ করিতেছ,তবে আমি কোন অভিজ্ঞান দ্বারা তোমার আশঙ্কা দূর করি।

রাজা। উত্তম কথা।

শকু। (অঙ্গুলি দেখিয়া) হায় হায়! অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয় নাই যে! (সবিষাদে গৌতমীর মুখ দর্শন।)

রাজা। (হাস্য করিয়া) একেই বলে, স্ত্রীদিগের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব।

শকু। এ স্থলে এখন বিধাতাই প্রভুত্ব দেখাইলেন, ভাল আমি তোমাকে আর কিছু বলিতেছি।

রাজা। বল শুনিতেছি।

শকু। এক দিন বেতসলতামণ্ডপে তোমার হস্তে পদ্মপত্রে জল ছিল?

রাজা। তার পর বল শুনি।

শকু। সেই সময়ে সেই দীর্ঘাপাঙ্গ নামে আমার কৃতকপুত্র মৃগশাবক আসিল? এই আগে পান করুক, এই কথা বলিয়া, তুমি আদর করিয়া, তাহাকে জল পান করিতে ডাকিলে; কিন্তু সে অপরিচিত বলিয়া,তোমার হস্ত হইতে জল খাইতে আসিল না। তার পর আমি সেই জল লইলে, সে ভাল বাসিয়া খাইল। তাহাতে তুমি হাসিয়া বলিলে, সকলেই সজাতিকে বিশ্বাস করে। তোমরা দুজনেই বন্য।

রাজা। স্ত্রী লোকে আপন কার্য্য সাধন জন্য এইরূপ অমৃতমধুর মিথ্যা বচন দ্বারাই বিষয়ী লোকদিগকে আকর্ষণ করে।

গৌত। মহারাজ! এরূপ মনে করিবেন না। তপোবনে পালিত এই সকল লোকেরা কৈতব জানে না।

রাজা। অয়ি তাপসবৃদ্ধে! পশু পক্ষীর মধ্যেও স্ত্রীজাতির অশিক্ষিতপটুত্ব দেখা যায়, তবে পরিবোধবতীদিগের কথা আর কি বলিব! দেখ, কোকিলাগণ আকাশে উড়িতে পারিবার পূর্ব্বে আপনার শাবকদিগকে অন্য পক্ষী দ্বারা প্রতিপালিত করিয়া লয়।

ফিরাইয়া, গর্জন করিয়া উঠিলেন। গর্জন করিয়াই প্রত্যাবৃত্তা হইবেন? তাহলে ত

শকু। অনার্য্য! এ কি আপনার হৃদয় অনুমানে সকলকে দেখিতেছ নাকি? তুমি ধর্ম্মচ্ছদ্মবেশী, তৃণাচ্ছাদিত কূপের মত! অন্যে কে তোমার অনুকরণ করিবে?

রাজা। ভদ্রে! দুষ্মন্তের চরিত্র প্রসিদ্ধ; আমার প্রজাদের মধ্যেও এমত দেখা যায় না।

শকু। তোমাদের কথাই প্রমাণ, লোকের ধর্ম্মস্থিতি ও তোমরাই জান, লজ্জাজিতা মহিলারা কিছুই জানে না। ভাল জিজ্ঞাসা করি, তবে কি আমি স্বেচ্ছাচারিণী গণিকা হইয়া, আসিয়াছি?

গৌত। বাছা পুরুবংশে বিশ্বাস করিয়া মধুমুখ গরলহৃদয় জনের হাতে পড়েছ।

শকু। (মুখে অঞ্চল দিয়া ক্রন্দন।)

* * * *

শার্ঙ্গ। গৌতমি! অগ্রসরা হউন, (সকলে যাইতে লাগিলেন।)

শকু। এখন এই শঠ আমায় ত্যাগ করিল, তোমরাও আমাকে পরিত্যাগ করিবে? (এই বলিয়া সঙ্গে২ গমন।)

শার্ঙ্গ। (ক্রোধে ফিরিয়া) দুষ্টশীলে! স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন করিতেছিস্।

শকু। (ভয়ে কম্পান্বিতা।)

শার। শকুন্তলে! তুমি শুন, রাজা যাহা বলিলেছেন, তাই যদি হয়, তাহা হইলে তুমি কুলটা, তোমায় লইয়া কি হইবে? আর যদি আপনাকে তুমি শুচিব্রতা বলিয়া জান, তাহা হইলে পতিগৃহে দাস্যবৃত্তি ও তোমার ভাল।

পুরোধা। (চিন্তা করিয়া) যদি এরূপ করেন—

রাজা। মহাশয় উপদেশ দিন।

পুরোধা। ইনি প্রসবকাল পর্য্যন্ত আমার গৃহে থাকুন।

রাজা। কেন?

কবির সৃষ্টা বীর-রস-প্রবলা নায়িকা হইলেন মাত্র। তা নয়, তিনি উদ্দীপনাকে স্মরণ করিয়া রাজাকে সম্বোধনপূর্ব্বক নিজ মনোভাব তাঁহার কর্ণকুহর দিয়া, তাঁহার হৃদয়ে বেগে ঢালিয়া দিলেন। তিনি সফলাও হইলেন।

রাজন্ সর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্যসি।
আত্মনো বিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি নপশ্যসি॥
মেনকা ত্রিদশেষ্বেব ত্রিদশাশ্চানুমেনকাম্!
মমৈবোদ্রিচ্যতে জন্ম দুষ্মন্ত তব জন্মতঃ॥
ক্ষিতাবটসি রাজেন্দ্র অন্তরীক্ষে চরাম্যহং।
আবয়োরন্তরং পশ্য মেরুসর্ষপয়োরিব॥
মহেন্দ্রস্য কুবেরস্য যমস্য বরুণস্য চ।
ভবনান্যনুসংযামি প্রভাবং পশ্য মে নৃপ॥
সত্যশ্চাপি প্রবাদোয়ং যংপ্রবক্ষ্যামি তে হনঘ!
নিদর্শনার্থং নদ্বেষাৎ শ্রুত্বা ত্বং ক্ষন্তুমর্হসি।
বিরূপো যাবদাদর্শে নাত্মনঃ পশ্যতে মুখং।
মন্যতে তাবদাত্মানমন্যেভ্যো রূপবত্তমং।
যদা তু মুখমাদর্শে বিকৃতংসোঽভিবীক্ষতে
তদেতরং বিজানাতি আত্মানং নেতরংজনং॥
অতীব রূপসম্পন্নো ন কিঞ্চিদবমন্যতে।
অতীব জল্পন্ দুর্ব্বাচো ভবতীহ বিহেঠকঃ॥
মূর্খোহি জল্পতাংপুংসাংশ্রুত্বা বাচঃ শুভাশুভাঃ
অশুভং বাক্যমাদত্তে পুরীষমিব শূকরঃ॥

পুরোধা। সাধুনৈমিত্তিকেরা বলিয়াছেন, যে আপনার প্রথম পুত্র চক্রবর্ত্তী হইবে। যদি মুনিদৌহিত্র সেই রূপ লক্ষণযুক্ত হয়, তাহা হইলে ইঁহাকে সমাদরে অন্তঃপুরে লইয়া যাইবেন, তা যদি না হয়, তবে ইঁহার বাপের বাড়ী যাওয়াই স্থির।

রাজা। গুরুর যাহা অভিরুচি।

পুরো। (উঠিয়া) বাছা আমার সঙ্গে এই দিকে আইস।

শকু। ভগবতি বসুন্ধরে! আমাকে অন্তরে স্থান দেও। (পুরোধা ও গৌতমীর সহিত কাঁদিতে২ নিষ্ক্রান্তা।)

প্রাজ্ঞস্তু জল্পতাং পুংসাং শ্রুত্বা বাচঃ শুভাশুভাঃ।
গুণবদ্বাক্যমাদত্তে হংসঃ ক্ষীরমিবাম্ভসঃ ॥
অন্যান্ পরিবদন্ সাধুর্যথা হি পরিতপ্যতে।
তথা পরিবদন্নন্যান্ হৃষ্টো ভবতি দুর্জনঃ ॥
অভিবাদ্য যথা বৃদ্ধান্ সন্তো গচ্ছন্তি নির্বৃতিং।
এবং সজ্জনমাক্রুশ্য মুর্খো ভবতি নির্বৃতঃ ॥
সুখং জীবন্ত্যদোষজ্ঞা মুর্খা দোষানুদর্শিনঃ।
যত্র বাচ্যাঃ পরে সন্তঃ পরানাহুস্তথাবিধান্ ॥
ততো হাস্যতরং লোকে কিঞ্চিদন্যন্নবিদ্যতে।
যত্র দুর্জন ইত্যাহ দুর্জনঃ সজ্জনং স্বয়ং ॥
সত্যধর্ম্মচ্যুতাৎ পুংসঃ ক্রুদ্ধাদাশীবিষাদিব।
অনাস্তিকো হপ্যুদ্বিজতে জনঃ কিং পুনরাস্তিকঃ ॥
স্বয়মুৎপাদ্য বৈ পুত্রং সদৃশং যো ন মন্যতে।
তস্য দেবাঃ শ্রিযং ঘ্নন্তি ন স লোকানুপাশ্নুতে ॥
কুলবংশপ্রতিষ্ঠাং হি পিতরঃ পুত্রমব্রুবন্ ।।
উত্তমং সর্ব্বধর্ম্মাণাং তস্মাৎ পুত্রং ন সংত্যজেৎ ॥
স্বপত্নীপ্রভবান্ পঞ্চ লব্ধান্ ক্রীতান্ বিবর্দ্ধিতান্
কৃতানন্যাসু চোৎপন্নান্ পুত্রান্ বৈ মনুরব্রবীৎ ॥
ধর্ম্মকীর্ত্ত্যাবহা নৃণাং মনঃসংপ্রীতিবর্দ্ধনাঃ।
ত্রায়ন্তে নরকাজ্জাতাঃ পুত্রা ধর্ম্মপ্লবাঃ পিতৄন্ ॥
স ত্বং নৃপতিশার্দ্দূল পুত্রং ন ত্যক্তুমর্হসি।
আত্মানং সত্যধর্ম্মৌ চ পালয়ন্ পৃথিবীপতে ॥
নরেন্দ্রসিংহ কপটং ন বোঢ়ুং ত্বমিহার্হসি।
বরং কুপশতাদ্বাপী বরং বাপীশতাৎ ক্রতুঃ ।।
বরং ক্রতুশতাৎ পুত্রঃ সত্যং পুত্রশতাদ্বরং।
অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতং ।।
অশ্বমেধ সহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে।
সর্ব্ববেদাধিগমনং সর্ব্বতীর্থাবগাহনং ।।
সত্যঞ্চ বচনং রাজন্ সমং বা স্যান্নবা সমং।
নাস্তি সত্যসমো ধর্ম্মো ন সত্যাদ্বিদ্যতে পরং ।।
নহি তীব্রতরং কিঞ্চিদনৃতাদিহ বিদ্যতে।
রাজন্ সত্যং পরং ব্রহ্ম সত্যঞ্চ সময়ঃ পরঃ ।।
মা ত্যাক্ষীঃ সময়ং রাজন্ সত্যং সঙ্গতমস্তু তে।
অনৃতে চেৎ প্রসঙ্গস্তে শ্রদ্দধাসি নচেৎ স্বয়ং ।।
আত্মনা হন্ত গচ্ছামি ত্বাদৃশে নাস্তি সঙ্গতং।
ত্বামৃতেপি হি দুষ্মন্ত শৈলরাজাবতংসিকাং।
চতুরন্তামিমামুর্ব্বীং পুত্রোমে পালয়িষ্যতি ।।

মহাভারতে আদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বাধ্যায়ে শকুন্তলোপাখ্যানে চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়ে।*

* মহারাজ! সর্ষপপ্রমাণ পরদোষ নিরীক্ষণ কর, কিন্তু বিল্বপরিমিত আত্মদোষ দেখিতে পাওনা? মেনকা দেবগণের মধ্যে গণনীয়া ও আদরণীয়া, অতএব তোমার জন্ম হইতে আমার জন্ম যে উৎকৃষ্ট, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আরও দেখ, তুমি কেবল পৃথিবীতে ভ্রমণ কর, আমি পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ উভয় স্থলেই গতায়াত করিতে পারি। অতএব আমার ও তোমার প্রভেদ সুমেরু ও সর্ষপের প্রভেদের ন্যায়। আমার এরূপ প্রভাব আছে, আমি ইন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ প্রভৃতি দেবগণের ভবনেও অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারি। হে মহারাজ! আমি এ স্থলে এক লৌকিক সত্য দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি, শ্রবণ কর, রুষ্ট হইও না। দেখ কুরূপ ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত আদর্শমণ্ডলে আপন মুখমণ্ডল না দেখে, তত ক্ষণ আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা রূপবান্ বোধ করে। কিন্তু যখন আপনার মুখশ্রী নিরীক্ষণ করে, তখন আপনার ও অন্যের রূপের প্রভেদ জানিতে পারে। যে ব্যক্তি অত্যন্ত সুশ্রী, সে কখন অন্যকে অবজ্ঞা করে না। যে অধিক বাক্য ব্যয় করে, লোকে তাহাকে মিথ্যাবাদী ও বাচাল কহে। যেমন শূকর নানাবিধ সুখাদ্য মিষ্টান্ন পরিত্যাগ করিয়া পুরীষমাত্র গ্রহণ. করে; সেই রূপ মুর্খ লোকেরা শুভাশুভ বাক্য শ্রবণ করিলে, শুভ কথা পরিত্যাগপূর্ব্বক অশুভই গ্রহণ করিয়া থাকে। আর হংস যেমন সজল দুগ্ধ হইতে অসার জলীয়াংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক দুগ্ধরূপ সারাংশই গ্রহণ করে, সেই রূপ পণ্ডিত ব্যক্তিরা লোকের শুভাশুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া, শুভই গ্রহণ করেন! সজ্জনেরা পরের অপবাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিষণ্ণ হয়েন; কিন্তু দুর্জ্জনেরা পরের নিন্দা করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হয়। সাধু ব্যক্তিরা মান্য লোকদিগকে সম্বর্দ্ধন করিয়া যাদৃশ সুখী হন, অসাধুগণ সজ্জনগণের অপমান করিয়া ততোধিক সন্তোষ লাভ করে। অদোষদর্শী সাধু ও

এই রূপ জ্বলন্ত উদ্দীপনা মহাভারতের নানা স্থানে আছে। এখানেও দেখুন প্রয়োজন হইয়াছিল। জরাসন্ধের কারাগার হইতে ভারতের বীরগণকে উদ্ধার করা, ভারতের সীমান্তপ্রদেশে নূতন দ্বারকা নগর স্থাপন করা, এক বার রাজসূয় যজ্ঞকালে সমস্ত ভারতের মিলন, আবার কুরুক্ষেত্রে সেই সমস্ত ভারতের সসৈন্যে আগমন ও বল পরীক্ষা, শেষে অশ্বমেধ উদ্দেশে সমস্ত ভারত বিজয় করা প্রভৃতি নানা মহৎকার্য্য সাধন, প্রয়োজন। যেখানে বহু লোকের প্রবৃত্তিচালন প্রয়োজন, সেই খানেই উদ্দীপনার আবশ্যক, এবং প্রয়োজনই প্রয়োজনীয় পদার্থের প্রসূতি। তৎকালিক উদ্দীপনা তৎকালিক মহাকাব্য গ্রন্থে অবশ্যই প্রকাশিত হইবে। ভারতপল্লবিতা উদ্দীপনা লতার পুষ্প ভারত গ্রন্থে রাশি২ রহিয়াছে ;—শকুন্তলোপাখ্যানে, নলোপাখ্যানে,ভীষ্মের বচনে,ভীমের ভৎ´সনে, খাণ্ডবদাহনে,˚দ্রৌপদীর রোদনে, ভূরি২ বচনে, সেই পুষ্প, এবার মালার মত নয়, স্তূপে স্তূপে রাশীকৃত রহিয়াছে। মহা-

দোষৈকদর্শী অসাধু উভয়েই সুখে কালাতিপাত করে ; কারণ অসাধু সাধু ব্যক্তির নিন্দা করে, কিন্তু সাধু ব্যক্তি অসাধু কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়াও, তাহার নিন্দা করেন না। যে ব্যক্তি স্বয়ং দুর্জ্জন, সে সজ্জনকে দুর্জ্জন বলে, ইহা হইতে হাস্যকর আর কি আছে? ক্রুদ্ধ কালসর্পরূপী সত্যধর্ম্মচ্যুত পুরুষ হইতে যখন নাস্তিকেরাও বিরক্ত হয়, তখন মাদৃশ আস্তিকেরা কোথায় আছেন। যে ব্যক্তি স্বয়ং স্বসদৃশ পুত্র উৎপাদন করিয়া তাহার সমাদর না করে, দেবতারা তাহাকে শ্রীভ্রষ্ট করেন, এবং সে অভীষ্ট লোক প্রাপ্ত হইতে পারে না। পিতৃগণ পুত্রকে কুল ও বংশের প্রতিষ্ঠা এবং সর্ব্বধর্ম্মোত্তম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, অতএব পুত্রকে পরিত্যাগ করা অত্যন্ত অবিধেয়। ভগবান্ মনু কহিয়াছেন ঔরস, লব্ধ, ক্রীত, পালিত, এবং ক্ষেত্রজ এই পঞ্চবিধ পুত্র মনুষ্যের ইহকালের ধর্ম্ম, কীর্ত্তি ও মনঃপ্রীতি বর্দ্ধন করে, এবং পরকালে নরক হইতে পরিত্রাণ করে। অতএব হে নরনাথ! তুমি পুত্রকে পরিত্যাগ করিও না। হে ধরাপতে, আত্মকৃত সত্যধর্ম্ম প্রতিপালন কর। হে নরেন্দ্র! কপটতা পরিত্যাগ কর। দেখ শত শত কূপ খনন অপেক্ষা এক পুষ্করিণী প্রস্তুত করা শ্রেষ্ঠ, শত শত পুষ্করিণী খনন করা অপেক্ষা এক যজ্ঞানুষ্ঠান করা শ্রেষ্ঠ ; শত শত যজ্ঞানুষ্ঠান করা অপেক্ষা এক পুত্র উৎপাদন করা শ্রেষ্ঠ ; এবং শত শত পুত্র উৎপাদন অপেক্ষা এক সত্য প্রতিপালন করা শ্রেষ্ঠ। এক দিকে সহস্র অশ্বমেধ ও অন্য দিকে এক সত্য রাখিয়া তুলা করিলে, সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষাও এক সত্যের গুরুত্ব অধিক হয়। হে মহারাজ! সমুদায় বেদ অধ্যয়ন ও সর্ব্ব তীর্থে অবগাহন করিলে, সত্যের সমান হয় কি না সন্দেহ। যেমন সত্যের সমান ধর্ম্ম নাই, এবং সত্যের সমান উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই,তদ্রূপ মিথ্যার তুল্য অপকৃষ্টও আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। হে রাজন্! সত্যই পরব্রহ্ম, সত্য প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করাই পরমোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, অতএব তুমি সত্য পরিত্যাগ করিও না। আর যদি তুমি মিথ্যানুরাগী হইয়া আমাকে অশ্রদ্ধা কর, তবে আমি আপনিই এ স্থান হইতে প্রস্থান করিব। তোমার সহিত আর কদাচ আলাপ করিব না, কিন্তু হে দুষ্মন্ত! তোমার অবিদ্যমানে এই পুত্র এই গিরিরাজবিরাজিতা সসাগরা বসুন্ধরা অবশ্যই প্রতিপালন করিবে, সন্দেহ নাই।

কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত
১ ম খণ্ড, ১২৪—১২৬,

ভারতের পর্ব্বে পর্ব্বে রস। কবিতার রস, উদ্দীপনার রস, দুই রস সমভাবে থাকাতে, মহাভারত এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ হইয়া উঠিয়াছে। এই জন্যই ইহাকে মহাপুরাণ বলে, পঞ্চম বেদ বলে।

অতি প্রবল ঝড়ের পর স্বভাব অত্যন্ত শান্ত ভাব ধারণ করে। দুষ্ট ছেলে গুলি খানিক ক্ষণ মাতামাতি করিয়া, প্রায়ই মায়ের কোলে গিয়া অকাতরে অগাধ নিদ্রা যায়। অতি আয়াসসাধ্য কার্য্য করিলে পরই,একটু বিশ্রাম করিতে হয়। পর্ব্বাহে, পূজায়, উৎসবে, ব্রতনিয়মে, নামসংকীর্ত্তনে, চান্দ্র আশ্বিন, চান্দ্র কার্ত্তিক যাপিত করিয়া, বঙ্গ সমাজ একবার চান্দ্র অগ্রহায়ণ, চান্দ্র পৌষ বিশ্রাম করেন। মহরমে দুই প্রহরে মাতনের পর দিন, জিরেন। ইহুদিবিবরণে এমন কি সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরকেও ছয় দিন জগৎ সৃষ্টি ব্যাপারে নিযুক্ত থাকিয়া, রবিবারে বিশ্রাম করিতে হইয়াছিল। ভারত ঘটনার পর হিন্দু সমাজ যে দিন কত বিশ্রাম করিবে, তার আর বৈচিত্র কি? একে প্রাচীন কালের হিন্দু সমাজ, তাহাতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। হিন্দু জাতি অদ্যাপি সেই ভয়ানক ব্যাপার স্মরণ করিয়া রাখিয়াছে। আজ প্রায় সাড়ে তিন হাজার বৎসর হইল, এই ঘটনা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখন আমরা পাঁচ জনকে একত্র হইয়া, গোলমাল করিতে দেখিলে বলিয়া থাকি, ওখানে ভারি কুরুক্ষেত্র হইতেছে, এই কুরুক্ষেত্র ব্যাপারে বহু সংখ্যক সৈন্যনাশ হইয়া গেল এখন যে হিন্দু সমাজ কতকাল নিদ্রা যাইবে, তাহা কে বলিতে পারে? যে হিন্দু জাতি, কাষ্ঠ আহরণকারী ছেদকের শিরেও নিপীড্যমান বৃক্ষ, ছায়া দান করিতে বিরত হয় না, ইত্যাদি উদাহরণ দিয়া "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" বচনের ব্যাখ্যা করিয়াছে, যে হিন্দু জাতি সুখ অপেক্ষা স্বস্তি ভাল বলিয়া অদ্যাপি উপরতস্পৃহতার উদাহরণ কথায় কথায় দেয়, যে হিন্দু জাতি দৌড়ান চেয়ে দাঁড়ান ভাল, দাঁড়ান অপেক্ষা বসা ভাল, বসা চেয়ে শোয়া ভাল, শোয়া চেয়ে ঘুমান ভাল, ইত্যাদি ধারাবাহিক বচন নিচয় সৃষ্টি করিয়া, আপনাদের আলস্য পরতন্ত্রতার ভূয়োভূয়ঃ পরিচয় প্রদান করিয়াছে,যে হিন্দু জাতি পৌরাণিক শাসন প্রমাণ বিরতি জন্য, কেহ বাল্যক্রীড়াকালে কৌতুকপ্রিয়তাবশতঃ শলভপুচ্ছে শলাকা প্রদান করিয়াছিল বলিয়া, তাহার শত জন্ম পরে শত পুত্রের মৃত্যু প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়া, নিষ্ঠুরতার শাস্তি অবশ্যম্ভাবী এবং অতিশয় গুরুতর বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে, যে হিন্দু জাতি অতি সামান্য রক্তপাতকে মহাপাপ বলিয়া গণনা করিয়া গিয়াছে; সেই হিন্দু জাতি এই ভয়ানক ব্যাপার দেখিল। ভারত বীর্য্যহীন, ভারত বীরশূন্য, কুরুবংশ লুপ্তপ্রায়, যদুবংশ লুপ্ত, গৃহবিচ্ছেদে গৃহ দগ্ধ। নির্জ্জীব ভারত ঘুমাইতে লাগিল। সহস্র বর্ষ এই রূপ নিদ্রাভঙ্গ হয় না। পরশুরাম একবিংশতি বার চেষ্টা করিয়া যে কর্ম্ম করিতে পারেন নাই, ক্ষত্রিয়েরা গৃহবিবাদে সেই কর্ম্ম সম্পন্ন করিল। পৃথিবী প্রায় নিঃক্ষত্রিয়া। নিঃক্ষত্রিয় ভারতে ব্রাহ্মণেরা একাধিপত্য বিস্তার করিলেন। এখন আর ব্রাহ্মণগণ কেবল তোতাপোতা,

দীক্ষা-শিক্ষা দাতা, শাস্ত্রপ্রণেতা নহেন, তাঁহারা ক্রমে২ সকল কার্য্যেই হস্তার্পণ করিলেন, তাঁহারাই এখন সমাজের কর্ত্তা, তাঁহারাই এখন শাসনবিধাতা। সে কঠোর শাসনভাবও আমরা এখন মনঃক্ষেত্রে চিত্রিত করিতে পারি না। নিঃক্ষত্রিয়, ক্লান্ত ভারত সেই কঠোর শাসনে অবসন্ন হইয়া রহিল।

হিন্দু সমাজ পূর্ব্ব হইতেই যন্ত্রের ন্যায় চলিতেছিল। এখন সেই সমাজের এক দল পৃথক হইয়া যন্ত্রচালক হইল। বিপ্র বর্ণ যন্ত্রচালকের কর্ম্মে অভিষিক্ত হইয়া, কেবল যন্ত্রচালনাতেই সময় যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্বের সেই শান্তভাব, সেই বিশুদ্ধভাব, একটু অপূর্ব্ব পারলৌকিকভাব, ঐহিক চিন্তা অবিচলিত ভাব, হারাইলেন। কলচালনেই ব্যস্ত, কঠোর নিয়ম সমস্ত প্রচার করিলেন। ছায়াবাজীর পুতুলের যে স্বাধীনতা আছে, হিন্দু সমাজের সে স্বাধীনতাটুকুও রহিল না। ছায়াবাজীর পুতুলের আকর্ষণী রজ্জু ক্ষণমাত্রের জন্যও ছিন্ন হইলে, পুতুল তখন আর চালকের আয়ত্তাধীন নহে। কিন্তু এ শাসন, এ ব্যবস্থা এমনি সুকৌশলযুক্ত, যে যদি একটীর আকর্ষণী রজ্জু ছিঁড়িল, আর একটী আসিয়া তাহা বাঁধিয়া দিল।

প্রত্যেক দিনের রাত্রির শেষ ছয় দণ্ড হইতে পর দিন রাত্রি প্রহরৈক পর্য্যন্ত এক নিয়ম; প্রত্যেক চান্দ্র মাসের অমাবস্যা হইতে পূর্ণিমা, পূর্ণিমা হইতে চতুর্দ্দশী তিথি নিয়ম; সপ্তাহের প্রত্যেক বারের এই২ ক্রিয়া; সূর্য্য-সংক্রমণে এই নিয়ম; উত্তরায়ণে এই; দক্ষিণায়নে এই; বিশেষ চতুর্মাসে এই; মলমাসে এই; বর্ষগতিতে এই রূপ; মাতৃগর্ভে অঙ্কুরসংস্থাপন অবধি, শবদাহের পর বর্ষৈক কাল পর্য্যন্ত, শুদ্ধ যাবজ্জীবন নয়, যাবজ্জীবনের মাথায় একটী চূড়া, পায়ে পাদুকা, এই আগা পিছা বাড়ান যাবজ্জীবনে এই২ সংস্কার, এই বর্ষক্রিয়া, ঋতুকলাপ, মাসবিধি, দৈনিক কর্ম্ম; প্রতি প্রহরের পদ্ধতি, প্রতিক্ষণে এই করিতে হইবে, এই গুলি দেশাচার, এই গুলি কুলাচার, এইটী এই বংশের রীতি, এটী গোত্রের পদ্ধতি, এ শাখার এইটী ধর্ম্মশাস্ত্র, এই রূপে জন্ম লইতে হবে, এই ভাবে জন্ম দিতে হবে। এই প্রকার কাঁদিতে হবে, এই রূপে মরিতে হবে, এটী খাবে, এটী খাবে না, এখানে এই ভাবে বসিবে, এতক্ষণ ধ্যান করিবে, হিন্দু শাস্ত্র পালনের জন্য হিন্দু সমাজ, হিন্দু সমাজের রক্ষা বা উন্নতির জন্য হিন্দু শাস্ত্র নহে। তোমার প্রত্যহ পঞ্চ অতিথি ব্রাহ্মণ সেবা করা কর্ত্তব্য, তুমি চারি জনের অধিকের সেবা করিতে পাবিলে না, তোমার প্রায়শ্চিত্ত মাঘী পূর্ণিমাতে পাঁচটী তুষারধবল বৎস, পঞ্চ ব্রাহ্মণে দান করা। পাঁচটী বৎসই তুষারধবল হয় নাই উত্তম, ইহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত শতৈক বার গায়ত্রী জপ করিয়া, অষ্টোত্তর শত নিষ্ক ব্রাহ্মণে দান। গায়ত্রীজপকালে ছন্দোভঙ্গ হইয়াছে, বেশ, ইহার প্রায়শ্চিত্ত ত্র্যহ উপবাসপূর্ব্বক গোদাবরী নদীতে স্নাত হইয়া অষ্টাবিংশ স্নাতক বিপ্রে শুভ্র বস্ত্র দান; গোদাবরী স্নানকালে জীবিত শম্বূকপৃষ্ঠে তোমার পদ স্পর্শ করিয়াছে, ভাল ইহার জন্য প্রা-

য়শ্চিত্ত দক্ষিণারণ্যে অষ্টাশীতি ব্রাহ্মণ ভোজন। ২৩ নম্বরের পুতুলের দক্ষিণ হস্তের তার ছিঁড়িয়া গেল, ৫৭ নম্বরের পুতুল আসিয়া বাঁধিয়া দিতেছে। সে বাঁধিতেছে, তাহার ঘর্ম্ম হইতেছে, ২৬৪ সংখ্যার পুতুল বাতাস করিতেছে; ৩ নং পুত্তলিকা সেই বাতাস করা ভাল করে হইতেছে কি না, তাহাই দেখিতেছিল, ঐ ২৩ নম্বরের হাতের তার বাঁধা হইবামাত্র তাহাকে বিবাহ করিয়া লইয়া গেল। এই রূপে ঋষিদিগের, শাখাকর্ত্তাদিগের কাল্পনিক গাঁথনির উপর গাঁথনিতে এক বৃহৎ মায়াময় অট্টালিকা হইল। উপবাসে, জপে, জাগরণে, নিত্য কর্ম্ম পালনে, কঠোর শাসনে লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। যাজনক্রিয়ার একায়ত্তকারী ব্রাহ্মণ জাতির উপর সাধারণের দিন২ অশ্রদ্ধা হইতে লাগিল। বিপ্রজাতির মধ্যবর্ত্তিতা অবহেলা করিয়া, লোকে যে ভক্তিতে ভগবানকে ভজিয়া চরিতার্থতা লাভ করিবে, তাহারও উপায় ছিল না। শাস্ত্রবিচ্যুত জাতিদিগকে স্পর্শন বা শুদ্ধ দর্শন করিলেও মহাপাপ, এই সংস্কার অনেকের মনে হওয়াতে তাহারা ঘৃণিত হইয়া, কদর্য্য বিষাক্ত সরীসৃপের ন্যায়, ধরণীবিবরে, পর্ব্বতগহ্বরে, বাস করিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণগণ শাসনরজ্জু ক্রমেই পেঁচাও করিয়া, অসংখ্য ফাঁশ, লোকের গলে, বক্ষে, হস্তপদে, করাঙ্গুলিতে, পদাঙ্গুলিতে দিয়া, দুজনে২ ফাঁশ জড়াইয়া, দশ জনে দশ জনে ফাঁশ জড়াইয়া, জাতিতে২ ফাঁশ জড়াইয়া, সমস্ত হিন্দু সমাজ এক বড় ফাঁশে জড়াইয়া, রজ্জুর দুই মুখ একত্র করিয়া, আপনারা ধরিয়া বসিয়া, কেবল দড়ি পাকাইতে লাগিলেন; একটু টান পড়ে, আর তৈয়ারি দড়ি গেরো দিয়ে বাড়াইয়া দেন। কুরুক্ষেত্রের পর ভারতের একে বিশ্রামপ্রবৃত্তি হইয়াছিল, তাহাতে দৃঢ় নিয়মবিষ সমাজের শাখায়, পাতায়, শিরে২ প্রবেশ করিয়া, লোকের মস্তকে, মস্তিষ্কে, কেশে, অস্থির মধ্যগত মজ্জাতে প্রবেশ করিয়া, সব একবারে জ্বর জ্বর করিয়া রাখিল।

এই সময়ে নবমাবতার বুদ্ধদেব জন্ম গ্রহণ করিলেন। তাঁহাকে ঐ সমস্ত বিপদ জঞ্জাল দূরীকরণ করিতে হইবে। এক এক গাছি করিয়া তার ছিঁড়িলে এ কার্য্য হইবে না। আর এক জন আসিয়া বাঁধিয়া দিবে, অৰ্দ্ধেকের চেয়ে বেশী দড়ি একবারে ছিঁড়া চাই। ফাঁশের দড়িতে একটু একটু করিয়া টান, দিলে ত হইবে না। মাঝ খানে এমন একটী আঘাত করা চাই, যে সেই আঘাতে লোক এমন বেগে ছড়াইয়া পড়িবে, যে ব্রাহ্মণের হাত হইতে বাঁধনের দুই মুখ খুলিয়া যাইবে, সে মুখ তাঁহারা আর ধরিতেও পারিবেন না, এবং নূতন দড়ি পাকাইয়া, জোড়া দিয়াও, আর বাঁধন রাখিতে পারিবেন না।

বুদ্ধদেব তাহাই করিয়াছিলেন; তিনি এক বিরাট আঘাতে সমস্ত তার খণ্ড২ করিয়াছিলেন, তিনি এই অবসন্ন, দিন২ জড়ীভূত সমাজকেন্দ্রে এমনি একটী গুরুতর কেন্দ্রবিয়োজক বল প্রয়োগ করিলেন, যে ব্রাহ্মণদের কঠোর শাসন এক বারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। সেই বেগ

প্রাচীন হিন্দু সমাজের বন্ধন ছিন্ন করিয়াই, পর্য্যবসিত হইল না; ভারত সাগরের ঊর্ম্মিসঙ্কুল নীলজলরাশি তাহার গতি রোধ করিতে পারিল না, হিমালয়ের তুষারাবৃত শুভ্র শিখরশ্রেণী সেই বেগের প্রতিবন্ধক হইতে পারিল না। বাহ্লীক, লাডক, তিব্বৎ, তাতার, চীন, মহাচীনে; ব্রহ্ম, সুহ্ম, মলয়ক, কোচিনে; যব, বলি, সুমাত্রা, সিংহলদ্বীপে সেই বেগ চালিত হইল; সমস্ত পূর্ব্ব আসিয়া জীবিত হইল। নব বর্ষের মধ্যে পঞ্চ বর্ষ নব ভাব ধারণ করিল। শাক্য মুনি ব্রাহ্মণদিগের সেই মায়াময় অট্টালিকা চূর্ণীকৃত ও ভূমিসাৎ করিয়াই, ক্ষান্ত হয়েন নাই। তিনি সেই চূর্ণীকৃত অট্টালিকার উপকরণ লইয়া, একটী অপূর্ব্ব সুদৃশ্য হর্ম্ম্য প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তিনি রবসপিয়ায়ের ন্যায় হিন্দু সমাজকে একেবারে অধঃপাতে দিয়া, অতলে ডুবাইয়া, গভীর রসাতলে সমাজের সমস্ত কলঙ্ক কচলাইয়া ধুইয়া, সেই খানে তাহার দোষ ক্ষালন করিয়া, আবার নেপোলিয়নের ন্যায় হিন্দু সমাজকে উন্নত পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সামান্য কথায় বলে, ভাঙ্গা সহজ, কিন্তু গড়া কঠিন। বাস্তবিক ভাঙ্গা তত সহজ নহে; ভাল পাকা মজবুদ গাঁথনি ভাঙ্গা অত্যন্ত কষ্টকর, অতীব আয়াসসাধ্য এবং সময়ে সময়ে হয়ত একেবারেই দুঃসাধ্য। অতি কাঁচা গাঁথনি ভাঙ্গা আবার যেমন সহজ, তেমনি বিপদ পরিপূর্ণ, অনেকে ভাঙ্গিতে গিয়া, চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে। আবার এমন গাঁথনি আছে যে, খানিক অত্যন্ত শিথিল, খানিক অত্যন্ত দৃঢ় বদ্ধ। সে গুলি ভাঙ্গা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কার্য্য। শাক্য সিংহ হিন্দু সমাজের গাঁথনি যেমন ভাঙ্গিয়াছিলেন, অচিরাৎ তেমনি একটী পাকা গাঁথনির সুবৃহৎ সমাজ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই কার্য্যটী যেমন সুমহৎ, তেমনি সুকঠিন। সিদ্ধার্থ উদ্দীপনার সাহায্যেই সমাজ সংস্করণে সফলার্থ হয়েন। তাঁহার জীবনবৃত্তান্তে আমরা তাহা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই। তিনি ভারতবর্ষের আর্য্যাবর্ত্তের নানা স্থান পর্য্যটন করেন, সকল স্থানেই তাঁহার উদ্দীপনাতে মাতিয়া উঠে। শাক্য সিংহ মগধরাজ অজাতশত্রু, কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ও কাশীরাজ এই তিন জন অতি প্রতাপশালী নরপতিকে স্বীয় মতাবলম্বী করেন। তিনি কালান্তক ধর্ম্মশালায় কয়েক বৎসর ক্রমাগত স্বীয় মত বিস্তার করেন। তিনি এক জীবনে লক্ষ লক্ষ লোককে স্বীয় মতাবলম্বী করিয়া, লোকযাত্রা সম্বরণ করেন। আর্য্যধর্ম্মধ্বংসকারী নিজ অসীম ক্ষমতাবলে পৌরাণিক অবতার হইলেন। পৃথিবীর (ক) অর্দ্ধেক লোক তাঁহাকে দেবতা বলিয়া ভক্তি করে।

অদ্যাপি পৃথিবীর তিন ভাগের এক ভাগ লোক তাঁহাকে ফো, বোধ, গড়ামা মহৎ লামা, বুদ্ধ প্রভৃতি নানা অভিধানে ঈশ্বরত্বে অভিষিক্ত রাখিয়াছে। অদ্যাপি হিন্দুরা তাঁহাকে নবমাবতার জানিয়া ভক্তি করিতেছে। অদ্যাপি শ্রীক্ষেত্রে তিনিই জগন্নাথ মূর্ত্তিতে বিরাজিত থাকিয়া, ব্রাহ্মণপ্রতিষ্ঠিত হিন্দুয়ানির সার

(ক) পৃথিবীর লোক সংখ্যা ১০০ বলিলে, প্রায় ১৬ জন হিন্দু ও ৩২ জন বৌদ্ধ হয়, সুতরাং ১০০ র মধ্যে ৪৮ জন বুদ্ধের দেবত্ব স্বীকার করে।

স্বরূপ জাতিভেদ-সংঘটিত অন্নবিচার লোপ করিয়া, হিন্দুয়ানির সার হরণ করিতেছেন। অদ্যাপি তৎপ্রচারিত ধর্ম্ম-পদ কঠোর নাস্তিকের পর্য্যন্ত হৃদয় আকর্ষণ করিতেছে। পৃথিবীর মধ্যে দুজন মনুষ মানুষের নাম করিতে হইলে, যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে তাঁহারি নাম করিতে হয়।

স্বার্য্যচরিত এত দূর পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া, আমরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, যে ভারতবর্ষে উদ্দীপনা মহাসাগরে চরের ন্যায় মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। তিন সহস্র বৎসর মধ্যে আমরা উদ্দীপনা বিস্তারিত হইতে তিন বার দেখিয়াছি মাত্র। কিন্তু বুদ্ধদেব যে লতা বর্দ্ধিতা করেন, তাহা অনেক দিন পর্য্যন্ত জীবিতা ছিল। বুদ্ধের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই দেখিতে পাওয়া যায়, যে মৌদগলায়ন সারি পুত্র প্রভৃতি তাঁহার শিষ্যগণ ভারতের নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া, হিমালয় প্রদেশ পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতেছিলেন। নানা বৌদ্ধ গ্রন্থে তাঁহাদের উপদেশ বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।

শাক্য সিংহের মৃত্যুর পর সহস্র বৎসর ভারতবর্ষ অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল। ভারতসৌভাগ্য, চতুষ্পাদ পরিমিত হইয়াছিল। সে সৌভাগ্যসূর্য্য কি রূপে অস্তগত হয়; শঙ্কর দিগ্বিজয়ে আমাদের কত ক্ষতি হইয়াছে; কতই বা লাভ হইয়াছে; তাহা বর্ণন করা এ প্রবন্ধের অভিপ্রেত নহে। প্রাচীন ভারতে উদ্দীপনা ছিল না; ইহাই দেখান আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। আমরা তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। মহাসাগর যেমন জলময়, ভারত তেমনি কবিতাময়। মহাসাগরে দ্বীপ আছে, ভারতেও সেইরূপ উদ্দীপনা ছিল। এক্ষণে প্রবন্ধের সার কথা গুলি সংহত ভাবে প্রদর্শন করিয়া; কোন মহাত্মা যদি এতদূর পাঠ করিয়া থাকেন, তবে আমরা তাঁহাকে তজ্জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া, উপসংহার করিতেছি।

আমাদের কি ছিল না, তাহা দেখা উচিত। প্রাচীন ভারতে উদ্দীপনা ছিল না। যদ্দারা পরের মনোবৃত্তি সঞ্চালন, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি উত্তেজন, অন্যের মনে রস উদ্ভাবন করা, বা অন্যকে কার্য্যে লওয়ান যায়, তাহাকে উদ্দীপনা শক্তি বলে। উদ্দীপনা, কবিতা হইতে পৃথক্। কবিতা রসাত্মিকা আত্মগতা কথা। উদ্দীপনা অন্যোদ্দেশ্য। রসাত্মিকা কথা। নির্জ্জনে চিন্তাই কবিতার প্রসূতি; অন্য লোকের সহিত আলাপেই উদ্দীপনার জন্ম হয়। ভাল থাকিলেই মন্দ আছে; নির্জ্জনে চিন্তায় অধিক কবিতা হইল; উদ্দীপনা অতি অল্পমাত্র হইল; তাহাতে ভারতবর্ষীয়েরা স্বতঃসন্তুষ্ট জাতি। ভারতের সমাজভাগ ভূগোল ভাগের মত। ভারতবর্ষীয়ের জীবন, স্রোতের ন্যায়; আবার তাহাতে স্বভাবজ কোন পদার্থেরই অভাব নাই। কাহারও বিশেষ সাহায্যের আবশ্যকতা নাই, সুতরাং উদ্দীপনা কোথা হইতে হইবে? অভাব না থাকিলেও, মানুষ কবি হইতে পারে, সাধারণ সুখ দুঃখ বোধ থাকিলেই কবি। কিন্তু উদ্দীপনা বিশেষ ঘটনায় বিশেষ রূপে পরিবর্দ্ধিতা হয়। প্রাচীন ভারতে তিন সহস্র বৎসরের

মধ্যে আমরা দ্বীপের ন্যায় উদ্দীপনা-প্রবল কাল তিনবার মাত্র দেখিতে পাই। পরের ঘটনাবলি আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। এত বিস্তৃত ভাবে পুরাবৃত্ত আলোচনার উদ্দেশ্য এই যে, কিরূপ মৃত্তিকায়, কিরূপ জল বায়ুতে উদ্দীপনা লতা বৰ্দ্ধিতা হইয়াছিল, তাহা না জানিলে আমরা কখনই উদ্দীপনারোপণী কৃষি-বৃত্তিতে সফলতা লাভ করিতে পারিব না। সেই উদ্দীপনা রোপণ করাও সময়ে বিশেষ আবশ্যক।

বিষবৃক্ষ।

উপন্যাস।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

তারাচরণ।

কবি কালিদাসের এক মালিনী ছিল, ফুল যোগাইত। কবি কালিদাস দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ফুলের দাম দিতে পারিতেন না—তৎ পরিবর্ত্তে স্বরচিত কাব্য গুলিন মালিনীকে পড়িয়া শুনাইতেন। একদিন মালিনীর পুকুরে একটী অপূর্ব্ব পদ্ম ফুটিয়াছিল, মালিনী তাহা আনিয়া কালিদাসকে উপহার দিল। কবি তাহার পুরস্কার স্বরূপ মেঘদূত পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন। মেঘদূত কাব্য রসের সাগর, কিন্তু সকলেই জানেন, যে তাহার প্রথম কবিতা কয়টী কিছু নীরস। মালিনীর ভাল লাগিল না—সে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া চলিল। কবি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মালিনি সখি! চলিলে যে?"

মালিনি বলিল, "তোমার কবিতায় রস কই?"

কবি। "মালিনি! তুমি কখন স্বর্গে যাইতে পারিবে না।"

মালিনী। "কেন?"

কবি। "স্বর্গের সিঁড়ি আছে। লক্ষযোজন সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া স্বর্গে উঠিতে হয়। আমার এই মেঘদূত কাব্য স্বর্গেরও সিঁড়ি আছে—এই নীরস কবিতা গুলিন সেই সিঁড়ি। তুমি এই সামান্য সিঁড়ি ভাঙ্গিতে পারিলে না—তবে লক্ষ যোজন সিঁড়ি ভাঙ্গিবে কি প্রকারে?"

মালিনী তখন ব্রহ্মশাপে স্বর্গ হারাইবার ভয়ে ভীতা হইয়া, আদ্যোপান্ত মেঘদূত শ্রবণ করিল। শ্রবণান্তে প্রীতা হইয়া, পর দিন মদনমোহিনী নামে বিচিত্র মালা গাঁথিয়া আনিয়া কবিশিরে পরাইয়া গেল।

আমার এই সামান্য কাব্য স্বর্গও নয়—ইহার লক্ষ যোজন সিঁড়িও নাই। রসও অল্প, সিঁড়িও ছোট। এই নীরস পরিচ্ছেদ কয়টি সেই সিঁড়ি। যদি পাঠকশ্রেণী মধ্যে কেহ মালিনীচরিত্র থাকেন, তবে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিই, যে তিনি এ সিঁড়ি না ভাঙ্গিলে, সে রসমধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবেন না।

সূর্য্যমুখীর পিত্রালয় কোন্নগর। তাঁহার পিতা এক জন ভদ্র কায়স্থ; কলিকাতার কোন হৌসে কেশিয়ারি করিতেন।

সূর্য্যমুখী তাঁহার একমাত্র সন্তান। শিশুকালে শ্রীমতী নামে এক বিধবা কায়স্থ কন্যা দাসীভাবে তাঁহার গৃহে থাকিয়া সূর্য্যমুখীকে লালন পালন করিত। শ্রীমতীর একটি শিশুসন্তান ছিল, তাহারই নাম তারাচরণ। সে সূর্য্যমুখীর সমবয়স্ক। সূর্য্যমুখী তাহার সহিত বাল্যকালে খেলা করিতেন এবং বালসখিত্ব প্রযুক্ত তাহার প্রতি তাঁহার ভ্রাতৃবৎ স্নেহ জন্মিয়াছিল।

শ্রীমতী বিশেষ রূপবতী ছিল, সুতরাং অচিরাৎ বিপদে পতিত হইল। গ্রামস্থ এক জন দুশ্চরিত্র ধনী ব্যক্তির চক্ষে পড়িয়া সে সূর্য্যমুখীর পিতার গৃহ ত্যাগ করিয়া গেল। কোথায় গেল, তাহা কেহ বিশেষ জানিতে পারিল না। কিন্তু শ্রীমতী আর ফিরিয়া আসিল না।

শ্রীমতী, তারাচরণকে ফেলিয়া গিয়াছিল। তারাচরণ সূর্য্যমুখীর পিতৃগৃহে রহিল। সূর্য্যমুখীর পিতা অতি দয়ালুচিত্ত ছিলেন। তিনি ঐ অনাথ বালককে আত্মসন্তানবৎ প্রতিপালন করিলেন, এবং তাহাকে দাসত্বাদি কোন হীন বৃত্তিতে প্রবর্ত্তিত না করিয়া, লেখা পড়া শিক্ষায় নিযুক্ত করিলেন। তারাচরণ এক অবৈতনিক মিশনরি স্কুলে ইংরাজি শিখিতে লাগিল।

পরে সূর্য্যমুখীর বিবাহ হইল। তাহার কয়েক বৎসর পরে তাঁহার পিতার পরলোক হইল। তখন তারাচরণ এক প্রকার মোটামুটি ইংরাজি শিখিয়াছিলেন, কিন্তু কোন কর্ম্মকার্য্যের সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সূর্য্যমুখীর পিতৃপরলোকের পর নিরাশ্রয় হইয়া, তিনি সূর্য্যমুখীর কাছে গেলেন। সূর্য্যমুখী, নগেন্দ্রকে প্রবৃত্তি দিয়া গ্রামে একটি স্কুল সংস্থাপিত করাইলেন। তারাচরণ তাহাতে মাষ্টর নিযুক্ত হইলেন। এক্ষণে, গ্রাণ্ট্ ইন্ এডের প্রভাবে, গ্রামে২ তেড়িকাটা, টপ্পাবাজ, নিরীহ ভাল মানুষ মাষ্টর বাবুরা বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু তৎকালে সচরাচর "মাষ্টর বাবু" দেখা যাইত না। সুতরাং তারাচরণ এক জন গ্রাম্য দেবতার মধ্যে হইয়া উঠিলেন। বিশেষত তিনি Citizen of the World এবং Spectator পড়িয়াছিলেন, এবং তিন বুক জিওমেট্রি তাঁহার পঠিত থাকার কথাও বাজারে রাষ্ট ছিল। এই সকল গুণে তিনি দেবীপুরনিবাসী জমীদার দেবেন্দ্র বাবুর ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত হইলেন, এবং বাবুর পারিষদ মধ্যে গণ্য হইলেন। সমাজে, তারাচরণ বিধবাবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা এবং পৌত্তলিক বিদ্বেষাদি সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়া, প্রতি সপ্তাহে পাঠ করিতেন, এবং "হে পরমকারুনিক পরমেশ্বর!" এই বলিয়া আরম্ভ করিয়া দীর্ঘ২ বক্তৃতা করিতেন। তাহার কোনটা বা তত্ত্ববোধিনী হইতে নকল করিয়া লইতেন, কোনটা বা স্কুলের পণ্ডিতের দ্বারা লেখাইয়া লইতেন। মুখে সর্ব্বদা বলিতেন "তোমরা ইঁট পাটখেলের পূজা ছাড়, খুড়ী জেটায়ের বিবাহ দাও, মেয়েদের লেখাপড়া শিখাও, তাদের পিঁজরায় পুরিয়া রাখ কেন? মেয়েদের বাহির কর।" স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এতটা লিবরালিটির একটা বিশেষ কারণ ছিল, তাঁহার নিজের গৃহ স্ত্রীলোকশূন্য। এ পর্য্যন্ত তাঁহার বিবাহ হয়

নাই। সূর্য্যমুখী তাঁহার বিবাহের জন্য অনেক যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মাতার কুলত্যাগের কথা গোবিন্দপুরে প্রচার হওয়ায়, কোন ভদ্র কায়স্থ তাঁহাকে কন্যা দিতে সম্মত হয় নাই। অনেক ইতর কায়স্থের কালো কুৎসিত কন্যা পাওয়া গেল। কিন্তু সূর্য্যমুখী তারাচরণকে ভ্রাতৃবৎ ভাবিতেন, কিপ্রকারে ইতর লোকের কন্যাকে ভাইজ বলিবেন, এই ভাবিয়া তাহাতে সম্মত হন নাই। কোন ভদ্র কায়স্থের স্বরূপা কন্যার সন্ধানে ছিলেন, এমত কালে নগেন্দ্রের পত্রে কুন্দনন্দিনীর রূপগুণের কথা জানিয়া, তাহারই সঙ্গে তারাচরণের বিবাহ দিবেন, স্থির করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পদ্মপলাশলোচনে! তুমি কে?

কুন্দ, নগেন্দ্র দত্তের সঙ্গে গোবিন্দপুরে আইল। কুন্দ, নগেন্দ্রের বাড়ী দেখিয়া অবাক হইল, এতবড় বাড়ী সে কখন দেখে নাই। তাহার বাহিরে তিন মহল, ভিতরে তিন মহল। এক একটী মহল এক একটী বৃহৎ পুরী। প্রথমে, যে সদর মহল, তাহাতে এক লোহার ফটক দিয়া প্রবেশ করিতে হয়, তাহার চতুঃপার্শ্বে বিচিত্র উচ্চ লোহার রেইল। ফটক দিয়া তৃণশূন্য, প্রশস্ত, রক্তবর্ণ, সুনির্ম্মিত পথে যাইতে হয়। পথের দুই পার্শ্বে, গোগণের মনোরঞ্জন, কোমল নবতৃণবিশিষ্ট দুই খণ্ড ভূমি। তাহাতে মধ্যে২ মণ্ডলাকারে রোপিত, সকুসুম পুষ্পবৃক্ষ সকল বিচিত্র পুষ্পপল্লবে শোভা পাইতেছে। সম্মুখে, বড় উচ্চ দেড় তালা বৈঠকখানা। অতি প্রশস্ত সোপানারোহণ করিয়া তাহাতে উঠিতে হয়। তাহার বারেণ্ডায়,বড়২ মোটা ফ্লুটেড থাম ; হর্ম্ম্যতল মর্ম্মরপ্রস্তরাবৃত। আলিশার উপরে, মধ্যস্থলে এক মৃণ্ময় বিশাল সিংহ, জটা বিলম্বিত করিয়া, লোল জিহ্বা বাহির করিয়াছে। এইটি নগেন্দ্রের বৈঠকখানা। তৃণপুষ্পময় ভূমিখণ্ডদ্বয়ের দুই পার্শ্বে, অর্থাৎ বামে ও দক্ষিণে দুই সারি এক তালা কোঠা। এক সারিতে দপ্তরখানা ও কাছারি। আর এক সারিতে তোষাখানা এবং ভৃত্যবর্গের বাসস্থান। ফটকের দুই পার্শ্বে দ্বাররক্ষকদিগের থাকিবার ঘর। এই প্রথম মহলের নাম "কাছারি বাড়ী।" উহার পাশে "পূজার বাড়ী।" পূজার বাড়ীতে রীতিমত বড় পূজার দালান ; আর তিন পার্শ্বে প্রথামত দোতালা চক বা চত্তর। মধ্যে বড় উঠান। এমহলে কেহ বাস করে না। দুর্গোৎসবের সময়ে বড় ধুমধাম হয়, কিন্তু এখন উঠানে টালির পাশ দিয়া ঘাস গজাইতেছে। দালান, দর দালান পায়রায় পূরিয়া পড়িয়াছে, কুঠারি সকল আসবাবে ভরা—চাবি বন্ধ। তাহার পাশে ঠাকুরবাড়ী। সেখানে বিচিত্র দেবমন্দির ; সুন্দর প্রস্তরবিশিষ্ট, "নাটমন্দির," তিন পাশে দেবতাদিগের পাকশালা, পূজারিদিগের থাকিবার ঘর, এক অতিথিশালা। সে মহলে লোকের অভাব নাই। গলায় মালা চন্দনতিলকবিশিষ্ট পূজারির দল, পাচকের দল, কেহ ফুলের সাজি লইয়া আসিতেছে, কেহ ঠাকুর স্নান করাইতেছে, কেহ ঘন্টা নাড়িতেছে, কেহ বকাবকি করিতেছে,

কেহ চন্দন ঘসিতেছে, কেহ পাক করিতেছে। দাস দাসীরা, কেহ জলের ভার আনিতেছে, কেহ ঘর ধুইতেছে, কেহ চাল ধুইয়া আনিতেছে, কেহ ব্রাহ্মণদিগের সঙ্গে কলহ করিতেছে। অতিথিশালায় কোথাও ভস্মমাখা সন্ন্যাসী ঠাকুর জটা এলাইয়া, চিত হইয়া শুইয়া আছেন। কোথাও, ঊর্দ্ধবাহু এক হাত উচ্চ করিয়া, দত্তবাড়ীর দাসী মহলে ঔষধ বিতরণ করিতেছে। কোথাও শ্বেত শ্মশ্রুবিশিষ্ট, গৈরিক বসনধারী ব্রহ্মচারী রুদ্রাক্ষ মালা দোলাইয়া, নাগরী অক্ষরে হাতে লেখা ভগবদ্গীতা পাঠ করিতেছেন। কোথাও, কোন উদরপরায়ণ "সাধু" ঘি-ময়দার পরিমাণ লইয়া, গণ্ডগোল বাধাইতেছে। কোথাও, বৈরাগীর দল শুষ্ক-কণ্ঠে তুলসীর মালা আঁটিয়া, কপাল জুড়িয়া তিলক করিয়া মৃদঙ্গ বাজাইতেছে, মাতায় আর্কফলা নাড়িতেছে, এবং নাসিকা দোলাইয়া "কথায় কইতে যে পেলেম না, —দাদা বলাই সঙ্গে ছিল—কথা কইতে যে" বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছে। কোথাও, বৈষ্ণবীরা বৈরাগিরঞ্জন রস-বলি কাটিয়া, খঞ্জনীর তালে, "মধো কানের" কি গোবিন্দ অধিকারীর গীত গায়িতেছে। কোথাও কিশোরবয়স্কা নবীনা বৈষ্ণবী প্রাচীনার সঙ্গে গায়িতেছে, কোথাও অর্দ্ধ বয়সী বুড়া বৈরাগীর সঙ্গে গলা মিলাইতেছে। নাট মন্দিরের মাঝখানে পাড়ার নিষ্কর্ম্মা ছেলেরা লড়াই, ঝকড়া, মারামারি করিতেছে এবং পরস্পর মাতা পিতার উদ্দেশে নানা প্রকার সুসভ্য গালাগালি করিতেছে।

এই তিনটি, তিন মহল সদর। এই তিন মহলের পশ্চাতে তিন মহল অন্দর। কাছারি বাড়ীর পশ্চাতে যে অন্দর মহল, তাহা নগেন্দ্রের নিজ ব্যবহার্য্য। তন্মধ্যে কেবল তিনি, তাঁহার ভার্য্যা ও তাঁহাদের নিজ পরিচর্য্যায় নিযুক্ত দাসীরা থাকিত। এবং তাঁহাদের নিজ ব্যবহার্য্য দ্রব্য সামগ্রী থাকিত। এই মহল নূতন, নগেন্দ্রের নিজের প্রস্তুত; এবং তাহার নির্ম্মাণ অতি পরিপাটি। তাহার পাশে পূজার বাড়ীর পশ্চাতে সাবেক অন্দর। তাহা পুরাতন, কুনির্ম্মিত; ঘর সকল অনুচ্চ, ক্ষুদ্র এবং অপরিষ্কার। এই পুরী বহুসংখ্যক আত্মীয় কুটুম্বকন্যা, মাসী মাসীত ভগিনী, পিসী পিসীত ভগিনী, বিধবা মাসী, সধবা ভাগিনেয়ী, পিসীত ভাইয়ের স্ত্রী, মাসীত ভাইয়ের মেয়ে, ইত্যাদি নানাবিধ কুটুম্বিনীতে কাকসমাকুল বট বৃক্ষের ন্যায়, রাত্রি দিবা কল কল করিত। এবং অনুক্ষণ নানা প্রকার চীৎকার, হাস্য পরিহাস, কলহ, কুতর্ক, গল্প, পরনিন্দা, বালকের হুড়াহুড়ী, বালিকার রোদন, "জল আন" "কাপড় দে" "ভাত রাঁধলে না," "ছেলে খায় নাই" "দুধ কই" ইত্যাদি শব্দে সংক্ষুব্ধ সাগরবৎ শব্দিত হইত। তাহার পাশে, ঠাকুর বাড়ীর পশ্চাতে, রন্ধন শালা। সে খানে আরো জাঁক। কোথাও কোন পাচিকা ভাতের হাঁড়িতে জালদিয়া, পা গোটো করিয়া, প্রতিবাসিনীর সঙ্গে তাহার ছেলের বিবাহের ঘটার গল্প করিতেছেন। কোন পাচিকা বা কাঁচা কাঠে ফুঁ দিতেং ধুঁয়ায় বিগলিতলোচনা হইয়া, বাড়ীর গোমস্তার নিন্দা করিতেছেন, এবং সে যে টাকা চুরি করিবার মানসেই ভিজা কাঠ কাটাইয়াছে, তদ্বিষয়ে বহু-

বিধ প্রমাণ প্রয়োগ করিতেছেন। কোন সুন্দরী তপ্ত তৈলে মাছ দিয়া চক্ষু মুদিয়া, দশনাবলী বিকট করিয়া, মুখভঙ্গি করিয়া আছেন,কেননা তপ্ত তেল ছিট্‌কাইয়া তাঁহার গায়ে লাগিয়াছে। কেহ বা স্নানকালে বহু তৈলাক্ত,অসংযমিত কেশরাশি, চূড়ার আকারে সীমন্ত দেশে বাঁধিয়া ডালে কাটি দিতেছেন—যেন শ্রীকৃষ্ণ, পাচনী হস্তে গোরু ঠেঙ্গাইতেছেন। কোথাও বা বড় বঁটি পাতিয়া বামী, ক্ষেমী, গোপালের মা, নেপালের মা, লাউ, কুমড়া বার্ত্তাকু, পটল, শাক কুটিতেছে; হাতে ঘস্২, কচ২ শব্দ হইতেছে, মুখে পাড়ার নিন্দা,মুনিবের নিন্দা,পরস্পরকে গালাগালি করিতেছে। এবং গোলাপী অল্প বয়সে বিধবা হইল, চাঁদীর স্বামী বড় মাতাল, কৈলাসীর জামাইয়ের বড় চাকরি হইয়াছে, সে দারোগার মুহুরি, গোপালে উড়ের যাত্রার মত, পৃথিবীতে এমন আর কিছুই নাই, পার্ব্বতীর ছেলের মত দুষ্ট ছেলে আর বিশ্ববাঙ্গালায় নাই, ইংরাজেরা নাকি রাবণের বংশ, ভগীরথ গঙ্গা এনেছিলেন, ভট্টাচার্য্যদের মেয়ের উপপতি শ্যাম বিশ্বাস, এই রূপ নানা বিষয়ের সমালোচন হইতেছে। কোন কৃষ্ণবর্ণা স্থূলাঙ্গী, প্রাঙ্গনে এক মহাস্ত্ররূপী বঁটি, ছাইয়ের উপর সংস্থাপিত করিয়া, মৎস্যজাতির সদ্য প্রাণ সংহার করিতেছেন, চিলেরা বিপুলাঙ্গীর শরীরগৌরব এবং হস্তলাঘব দেখিয়া ভয়ে আগু হইতেছে না, কিন্তু দুই একবার ছোঁ মারিতেও ছাড়িতেছে না। কোন পক্ককেশা জল আনিতেছে, কোন ভীমদশনা বাটনা বাটিতেছে। কোথাও বা ভাণ্ডারমধ্যে, দাসী, পাচিকা এবং ভাণ্ডারের রক্ষাকারিণী এই তিন জনে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত। ভাণ্ডারকর্ত্রী তর্ক করিতেছেন যে, যে ঘৃত দিয়াছি, তাহাই ন্যায্য খরচ—পাচিকা তর্ক করিতেছে যে, ন্যায্য খরচে কুলাইবে কি প্রকারে? দাসী তর্ক করিতেছে, যে যদি ভাণ্ডারের চাবি খোলা থাকে, তাহা হইলে আমরা কোন রূপে কুলাইয়া দিতে পারি। ভাতের উমেদারীতে অনেক গুলি ছেলে মেয়ে, কাঙ্গালী, সকুক্কুর বসিয়া আছে। বিড়ালেরা উমেদারী করে না—তাহারা অবকাশ মতে দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশ করত বিনা অনুমতিতেই খাদ্য লইয়া যাইতেছে। কোথাও অনধিকারপ্রবিষ্টা কোন গাভী লাউয়ের খোলা, বেগুনের ও পটলের বোঁটা এক্ কলার পাত অমৃত বোধে চক্ষু বুজিয়া চর্ব্বণ করিতেছ।

এই তিন মহল অন্দর মহলের পরে, পুষ্পোদ্যান। পুষ্পোদ্যান পরে, নীলমেঘ খণ্ড তুল্য প্রশস্ত দীর্ঘিকা। দীর্ঘিকা প্রাচীরবেষ্টিত। ভিতর বাটীর তিনমহল, ও পুষ্পোদ্যানের মধ্যে খিড়কীর পথ। তাহার দুই মুখে দুই দ্বার। সেই দুই খিড়কী। ঐ পথ দিয়া অন্দরের তিন মহলেই প্রবেশ করা যায়।

বাড়ীর বাহিরে, আস্তবল, হাতিখানা, কুক্কুরের ঘর, গোশালা, চিড়িয়াখানা, ইত্যাদি স্থান ছিল।

কুন্দনন্দিনী, বিস্মিতনেত্রে নগেন্দ্রের অপরিমিত ঐশ্বর্য্য দেখিতে২ শিবিকারোহণে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তিনি সূর্য্যমুখীর নিকটে আনীত হইয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। সূর্য্যমুখী

তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

নগেন্দ্র সঙ্গে, স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষরূপের সাদৃশ্য অনুভূত করিয়া, কুন্দনন্দিনীর মনে২ এমত সন্দেহ জন্মিয়াছিল, যে তাঁহার পত্নী অবশ্য তৎপরদৃষ্টা স্ত্রীমূর্ত্তির সদৃশরূপা হইবেন, কিন্তু সূর্য্যমুখীকে দেখিয়া সে সন্দেহ দূর হইল। কুন্দ দেখিল যে, সূর্য্যমুখী আকাশপটে দৃষ্টা নারীর ন্যায় শ্যামাঙ্গী নহে। সূর্য্যমুখী, পূর্ণচন্দ্র তুল্য তপ্তকাঞ্চনবর্ণিনী। তাঁহার চক্ষু সুন্দর বটে, কিন্তু যে প্রকৃতির চক্ষু কুন্দ স্বপ্নে দেখিয়াছিল, এ সে চক্ষু নহে। সূর্য্যমুখীর চক্ষু সুদীর্ঘ, অলকস্পর্শী ভ্রূযুগসমাশ্রিত, কমনীয় বঙ্কিম পল্লবরেখার মধ্যস্থ, স্থূলকৃষ্ণ। তারাসনাথ, মণ্ডলাংশের আকারে ঈষৎস্ফীত। উজ্জ্বল অথচ মন্দগতিবিশিষ্ট। স্বপ্নদৃষ্টা শ্যামাঙ্গীর চক্ষুর, এরূপ অলৌকিক মনোহারিত্ব ছিল না। সূর্য্যমুখীর অবয়বও সেরূপ নহে। স্বপ্নদৃষ্টা খর্ব্বাকৃতি। সূর্য্যমুখীর আকার কিঞ্চিৎ দীর্ঘ, বাতান্দোলিত মাধবীলতার ন্যায় সৌন্দর্য্যভরে দুলিতেছে। স্বপ্নদৃষ্টা স্ত্রীমূর্ত্তি সুন্দরী, কিন্তু সূর্য্যমুখী তাহার অপেক্ষা শতগুণে সুন্দরী। আর স্বপ্নদৃষ্টার বয়স বিংশতির অধিক বোধ হয় নাই—সূর্য্যমুখীর বয়স প্রায় ষড়্বিংশতি। সূর্য্যমুখীর সঙ্গে সেই মূর্ত্তির কোন সাদৃশ্য নাই দেখিয়া, কুন্দ সচ্ছন্দচিত্ত হইল।

সূর্য্যমুখী কুন্দকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া, তাঁহার পরিচর্য্যার্থ দাসীদিগকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন। এবং তন্মধ্যে যে প্রধান, তাহাকে কহিলেন, "যে এই কুন্দের সঙ্গে আমি তারাচরণের বিবাহ দিব। অতএব ইহাকে তুমি আমার ভাইজের মত যত্ন করিবে।"

দাসী স্বীকৃতা হইল। কুন্দকে সে সঙ্গে করিয়া কক্ষান্তরে লইয়া চলিল। কুন্দ এতক্ষণে তাহার প্রতি চাহিয়া দেখিল। দেখিয়া, কুন্দের শরীর কণ্টকিত, এবং আপাদ মস্তক স্বেদাক্ত হইল। যে স্ত্রীমূর্ত্তি কুন্দ স্বপ্নে মাতার অঙ্গুলিনির্দ্দেশক্রমে আকাশপটে দেখিয়াছিল, এই দাসীই ত সেই পদ্মপলাশলোচনা শ্যামাঙ্গী।

কুন্দ ভীতিবিহ্বলা হইয়া, মৃদু নিক্ষিপ্ত শ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে গা?"

দাসী কহিল, "আমার নাম হিরা।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পাঠক মহাশয়ের বড় রাগের কারণ।

এই খানে পাঠক মহাশয় বড় বিরক্ত হইবেন। আখ্যায়িকা গ্রন্থের প্রথা আছে, যে বিবাহটা শেষে হয়, আমরা আগেই কুন্দনন্দিনীর বিবাহ দিতে বসিলাম। আরও চিরকালের প্রথা আছে, যে নায়িকার সঙ্গে যাহার পরিণয় হয়, সে পরম সুন্দর হইবে, সর্ব্বগুণে ভূষিত, বড় বীরপুরুষ হইবে, এবং নায়িকার প্রণয়ে ঢলু২ করিবে। গরিব তারাচরণেরত এ সকল কিছুই নাই—সৌন্দর্য্যের মধ্যে তামাটে বর্ণ, আর খাঁদা নাক—বীর্য্য কেবল স্কুলের ছেলে মহলে প্রকাশ—আর প্রণয়ের বিষয়টা কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে তাঁহার কতদূর ছিল, বলিতে পারি না, কিন্তু একটা পোষা বানরীর সঙ্গে একটু২ ছিল।

সে যাহা হউক, কুন্দনন্দিনীকে নগেন্দ্র বাটী লইয়া আসিলে, তারাচরণের সঙ্গে

তাহার বিবাহ হইল। তারাচরণ সুন্দরী স্ত্রী ঘরে লইয়া গেলেন। কিন্তু সুন্দরী স্ত্রী লইয়া,তিনি এক বিপদে পড়িলেন। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিবে,যে তারাচরণের স্ত্রীশিক্ষা ও জেনানা ভাঙ্গার প্রবন্ধ সকল প্রায় দেবেন্দ্র বাবুর বৈঠক খানাতেই পড়া হইত। তৎ সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক কালে মাষ্টর সর্ব্বদাই দম্ভ করিয়া বলিত যে, "কখন যদি আমার সময় হয়, তবে এ বিষয়ে প্রথম রিফরম্ করার দৃষ্টান্ত দেখাইব। আমার বিবাহ হইলে আমার স্ত্রীকে সকলের সম্মুখে বাহির করিব।" এখন ত বিবাহ হইল—কুন্দনন্দিনীর সৌন্দর্য্যের খ্যাতি ইয়ার মহলে প্রচার হইল। সকলে প্রাচীন গীত কোট করিয়া বলিল, "কোথা রহিল সে পণ?" দেবেন্দ্র বলিলেন, "কই হে তুমি ও কি ওল্ড ফুলেদের দলে? স্ত্রীর সহিত আমাদিগের আলাপ করিয়া দাও না কেন?" তারাচরণ বড় লজ্জিত হইলেন। দেবেন্দ্র বাবুর অনুরোধ ও বাক্যযন্ত্রণা এড়াইতে পারিলেন না। দেবেন্দ্রের সঙ্গে কুন্দনন্দিনীর সাক্ষাৎ করাইতে সম্মত হইলেন। কিন্তু ভয়, পাছে সূর্য্যমুখী শুনিয়া রাগ করে। এই মত টালমাটাল করিয়া বৎসরাবধি গেল। তাহার পর আর টালমাটালে চলে না দেখিয়া, কুন্দকে বাড়ী মেরামতের ওজর করিয়া নগেন্দ্রের গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। বাড়ী মেরামত হইল। আবার আনিতে হইল। তখন দেবেন্দ্র এক দিন স্বয়ং দলবলে তাবাচরণের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। এবং তারাচরণকে মিথ্যা দাম্ভিকতার জন্য ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন। তখন অগত্যা তারাচরণ কুন্দনন্দিনীকে সাজাইয়া আনিয়া, দেবেন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করিয়া দিলেন। কুন্দনন্দিনী দেবেন্দ্রের সঙ্গে কি আলাপ করিলেন? ক্ষণকাল ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া কাঁদিয়া পলাইয়া গেলেন। কিন্তু দেবেন্দ্র তাঁহার নবযৌবন সঞ্চারের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া, মুগ্ধ হইলেন। সে শোভা আর ভুলিলেন না।

ইহার কিছুদিন পরে, দেবেন্দ্রের বাটীতে কোন ক্রিয়া উপস্থিত। তাঁহার বাটী হইতে একটী বালিকা কুন্দকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিল। কিন্তু সূর্য্যমুখী তাহা শুনিতে পাইয়া, নিমন্ত্রণে যাওয়া নিষেধ করিল। সুতরাং যাওয়া হইল না।

ইহার পর আর একবার দেবেন্দ্র, তারাচরণের গৃহে আসিয়া, কুন্দের সঙ্গে পুনরালাপ করিয়া গেলেন। লোকমুখে, সূর্য্যমুখী তাহাও শুনিলেন। শুনিয়া তারাচরণকে এমত ভর্ৎসনা করিলেন, যে সেই পর্য্যন্ত কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে দেবেন্দ্রের আলাপ বন্ধ হইল।

বিবাহের পর এইরূপে তিন বৎসরকাল কাটিল। তাহার পর—কুন্দনন্দিনী বিধবা হইলেন! জ্বরবিকারে তারাচরণের মৃত্যু হইল। সূর্য্যমুখী কুন্দকে আপন বাড়ীতে আনিয়া রাখিলেন। তারাচরণকে যে বাড়ী করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা বেচিয়া কুন্দকে কাগজ করিয়া দিলেন।

পাঠক মহাশয় বড় বিরক্ত হইলেন, সত্য, কিন্তু এতদূরে আখ্যায়িকা সমাপ্ত হইল। এতদূরে বিষবৃক্ষের বীজ বপন হইল।

বিজ্ঞান-কৌতুক।

১। সর উইলিয়ম টমসনকৃত জীবসৃষ্টির ব্যাখ্যা।

সকলেই দেখিয়াছেন, যে আকাশ হইতে নক্ষত্র খসিয়া পড়ে। অনেকেই জানেন, যে বাস্তবিক সে সকল নক্ষত্র নহে, নক্ষত্র কখন খসে না। ভূপতিত হইলে পর,দেখা গিয়াছে যে, উহা লৌহ বা প্রস্তর বা তদ্রূপ অন্য কোন পদার্থ। এই রূপ ধাতু বা অন্য দ্রব্যাত্মক অসংখ্য বস্তু আকাশপথে বিচরণ করিতেছে। উহাকে ইংরাজিতে মিটিয়র বলে। বাঙ্গালা-ভাষায় যে সকল নাম প্রচলিত আছে, তাহা ভ্রমাত্মক। কিন্তু উল্কাপিণ্ড নাম ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া তাহা আমরা গ্রহণ করিলাম। ইহা সিদ্ধ হইয়াছে, যে উল্কাপিণ্ড সকল, সূর্য্যাদির ন্যায় মাধ্যাকর্ষণী শক্তি বলে, গ্রহগণের ন্যায় আকাশমণ্ডলে নিয়মিত বর্ত্মে পরিভ্রমণ করিতেছে। যখন কোন উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর আকর্ষণ পথে পড়ে, তখন তদ্বলে ভূপৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত হয়। প্রপাতকালে পৃথিবীর উপরিস্থ বায়ুস্তরে বেগে প্রহত হওয়ায়, বায়ু এবং উল্কাপিণ্ডের সংঘর্ষণে অগ্ন্যুৎপত্তি হয়। আলো সেই জন্য।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, উল্কাপিণ্ড সকলকে ক্ষুদ্র২ গ্রহ বলিলেও বলা যায়। উল্কাপিণ্ডের দুইটি মণ্ডল বিশেষ লক্ষিত। ঐ দুই মণ্ডল পার হইয়া পৃথিবীর পথ। এক মণ্ডলের ভিতর দিয়া ১০ই ১১ই আগষ্ট তারিখে, অর্থাৎ শ্রাবণের শেষ ভাগে, পৃথিবীকে চলিতে হয়। আর এক মণ্ডল লঙ্ঘন করিবার সময় ১২ ই ১৩ ই নবেম্বর, অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসের শেষ ভাগ। অন্য সময় অপেক্ষা ঐ২ সময়ে উল্কাপিণ্ডের অত্যন্ত আধিক্য দেখা যায়। এই দুই উল্কাপিণ্ডিক মণ্ডলের আয়তন অর্থাৎ তদন্তর্ব্বর্ত্তী উল্কাপিণ্ডের পথ, পণ্ডিতেরা গণনার দ্বারা স্থির করিয়াছেন। একটী ইউরেন্স নামক অতি দূরবর্ত্তী গ্রহের পথ হইতেও বিস্তৃত। দ্বিতীয় উল্কাপিণ্ড সমষ্টির পথ আরও ভয়ানক। লেপ্‌চুন-নামক সৌর জগদন্ত-স্থিত গ্রহের পথ হইতেও বহুদূর। ইহাও সামান্য কথা। জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, যে অনেক উল্কাপিণ্ড অন্য সৌর-জগৎ হইতে আগত; অন্য সৌরজগতেও যাইতে পারে।

কেহ২ বলেন যে,এই সকল উল্কাপিণ্ড কোন জগতের বিপ্লবে চূর্ণিত গ্রহগণের ভগ্নাংশ। এ কথার কোন প্রমাণ নাই, এবং অনেকে এক্ষণে এ কথায় শ্রদ্ধা করেন না। কিন্তু ভুবনবিখ্যাত বিলাতীয় ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের সভাপতি সর উইলিয়ম টম্‌সন তন্মতাবলম্বন করিয়া, এক কৌতুকাবহ তর্ক উপস্থিত করিয়াছেন।

পৃথিবীতে চিরকাল জীব ছিল না, এ কথা ভূতত্ত্বের দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে। বহু কোটি বৎসর পৃথিবী জীবশূন্য ছিল : পরে জীবের অধিষ্ঠান হইল কি প্রকারে? বহু কাল হইতে ইউরোপে এই তর্ক হইতেছে। দেখা যায় যে, জীব ভিন্ন জীবের জন্ম নাই। অনেকে বলিতেন, অণ্ডাদি ব্যতীতও জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সে সকল ভ্রম দূর হইয়াছে। যে সকল জীব পূর্ব্বে "স্বেদজ" অথবা "মলজ" অথবা

"স্বতঃসৃষ্ট" বলিয়া স্থির ছিল, তাহাও অশুদ্ধ বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে। যদি জীব ভিন্ন জীবোৎপত্তি নাই, তবে প্রথম জীব জন্মিল কি প্রকারে? পূর্ব্বে জীব ছিল না, পরে জীব আসিল কোথা হইতে?

এ প্রশ্নের উত্তরে অনেকে বলেন "ঈশ্বরের ইচ্ছা।" এই কথা,সকলে উত্তর বলিয়া গ্রাহ্য করেন না। তাঁহারা বলেন, "ঈশ্বরের ইচ্ছা মানি। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা নিয়মে পরিণত। নিয়ম ভিন্ন ঐশী ক্রিয়া কোথাও দেখা যায় না। জগদীশ্বর, সকল কার্য্যই চির-প্রচলিত, অলঙ্ঘ্য নিয়মের দ্বারা সম্পন্ন করেন, নিয়মবিরুদ্ধ কোন কার্য্য করেন না। জীব হইতে জীবের জন্ম এই নিয়ম। তবে বিনা জীবে জীব হইল কি প্রকারে?

উল্কাপিণ্ড যে বিনষ্ট গ্রহের ভগ্নাংশ, এই কথা মনে করিয়া, সর উইলিয়ম টম্সন প্রাগুক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। তিনি কহেন যে,অনেক উল্কাপিণ্ড বীজবাহী। অন্য গ্রহ হইতে বীজ আনিয়া এই পৃথিবীতে বপন করিয়াছে।"

তিনি বলিয়াছেন, "পৃথিবীতে জীবের সৃষ্টি হইল কি প্রকারে? পৃথিবীর ভূতপূর্ব্ব বৃত্তান্ত অনুসন্ধান করিতে২ প্রকাশ পায়, যে এক কালে পৃথিবী অগ্নি-দ্রব, তাপ-লোহিত গোলকমাত্র ছিল, তদুপরি জীবের অধিষ্ঠান সম্ভবে না। অতএব যখন পৃথিবী প্রথমে জীবাধিষ্ঠান-যোগ্য হইল,তখন তদুপরি যে কোন জীব ছিল না ইহা নিশ্চিত। তখন পর্ব্বত, জল, বায়ু ইত্যাদি ছিল, সূর্য্য তাবৎকে সন্তপ্ত এবং আলোকোজ্জ্বল করিতেন, তখন পৃথিবী উদ্যানবৎ হইবার উপযুক্ত হইয়াছিল। তখন কি, কেবল ঈশ্বরের আজ্ঞা পাইয়া, আপনা হইতে বৃক্ষ, পুষ্প, তৃণাদি, একবারে পূর্ণ শোভা ধারন করিয়া উঠিয়াছিল? না, উক্ত বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়া বৃক্ষাদি ক্রমে পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়াছিল?"

এই প্রশ্নের উত্তরে সর উইলিয়ম, আগ্নেয় পর্ব্বতের উদাহরণ দিয়া বলিয়াছেন, যে"বিসিউ বিয়স বা এট্না পর্ব্বতনিঃসৃত অগ্নি-দ্রব পদার্থের স্রোত তৎসানুবাহী হইয়া নামিলে, অচিরাৎ তাহা শীতল হইয়া জমিয়া যায়। কতিপয় সপ্তাহ বা বৎসর পরে, অন্য স্থান হইতে বায়ুাদি-বাহিত ডিম্ব এবং বীজের কারণ, অথবা অন্য স্থান হইতে স্বয়মাগত জীবের প্রসাদে, তাহা বৃক্ষ জীবাদিতে পরিপূরিত হয়। যখন আমরা দেখি, যে সমুদ্রমধ্যে অগ্নিবিপ্লব সমুৎপন্ন কোন দ্বীপ, কতিপয় বর্ষমধ্যে বৃক্ষাদিতে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে, তখন তাহা যে বায়ুবাহিত, বা জলচর জীবাদি দ্বারা আনীত বীজ হইতে ঐরূপ হইয়াছে, এ প্রকার সিদ্ধান্ত করিতে পরাঙ্মুখ হই না।"

তিনি বলেন, যে পৃথিবীতে সেই রূপ জীব-সর্গ। আকাশে, লক্ষ২ সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহাদি অনবরত বিচরণ করিতেছে। যদি সমুদ্রমধ্যে লক্ষ২ জাহাজ, সহস্র বৎসর বিনা নাবিকে বিচরণ করে, তবে অবশ্য মধ্যে২ জাহাজে২ আঘাত হইবে। আকাশ সমুদ্রেও তদ্রূপ, পৃথিবীতে পৃথিবীতে কখন কখন অবশ্য প্রহৃত হইবে। হইলে, তৎক্ষণাৎ প্রঘাত-জনিত তাপে প্রহৃত গ্রহাদির অধিকাংশ দ্রব

হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু কোন২ ভাগ দ্রবীভূত না হইয়া উল্কাপিণ্ড ভাবে, আকাশপথে বিচরণ করিবে। ভগ্ন গ্রহে যে সকল ডিম্ব, জীব ও রক্ষাদি ছিল, তাহার কিছু না কিছু বীজ, গ্রহখণ্ডে অবশ্য থাকিবে। কালে তদ্রূপ কোন সবীজ গ্রহাংশ উল্কাপিণ্ড স্বরূপে পৃথিবীতলে পতিত হইয়া, তদ্বাহিত বীজে পৃথিবীকে প্রথমে উদ্ভিজ্জপূর্ণা, পরে জীবময়ী করিয়াছে।

এই মত, অন্যান্য পণ্ডিতের নিকট অদ্যাপি গ্রাহ্য হয় নাই, এবং তাহার প্রতিবাদ করিবার বিশেষ কারণ আছে। ভাল,ইহার যাথার্থ্য স্বীকার করা যাউক। তাহাহইলে কি হইল? জীবসৃষ্টির ত কিছুই বুঝা গেল না। বুঝিলাম, এই পৃথিবী,অন্যগ্রহপ্রেরিত বীজে,উদ্ভিজ্জ ও জীবাদিসৃষ্টিবিশিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সে গ্রহেই বা প্রথম জীব কোথা হইতে আসিল। আবার বলিবেন, "অন্য গ্রহ হইতে।" আমরাও আবার জিজ্ঞাসা করিব, সেই অন্য গ্রহেই বা বীজ আসিল কোথা হইতে? এইরূপ পারম্পর্য্যের আদি নাই। প্রথম বীজোৎপত্তির কথা যে অন্ধকারে ছিল, সেই অন্ধকারেই রহিল।

—০—

২। আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত।

গত সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকানিবাসী অদ্বিতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ ইয়ঙ্ সাহেব যে আশ্চয্য সৌরোৎপাত দৃষ্টি করিয়াছিলেন, এরূপ প্রকাণ্ড কাণ্ড মনুষ্য চক্ষে প্রায় আর কখন পড়ে নাই। তত্তুলনায় এট্না বা বিসিউবিয়সের অগ্নিবিপ্লব, যেরূপ সমুদ্রোচ্ছ্বাসের তুলনায় দুগ্ধকটাহে দুধ উছলান, সেইরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে।

যাঁহারা আধুনিক ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্যার সবিশেষ অনুশীলন করেন নাই, এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার তাঁহাদের বোধগম্য করার জন্য, সূর্য্যের প্রকৃতিসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক।

সূর্য্য অতি বৃহৎ তেজোময় গোলক। এই গোলক, আমরা অতি ক্ষুদ্র দেখি, কিন্তু উহা বাস্তবিক কত বৃহৎ, তাহা পৃথিবীর পরিমাণ না বুঝিলে বুঝা যাইবে না। সকলে জানেন যে, পৃথিবীর ব্যাস ৭০৯১ মাইল। যদি পৃথিবীকে এক মাইল দীর্ঘ এক মাইল প্রস্থ এমত খণ্ড২ ভাগ করা যায়,তাহা হইলে,উনিশ কোটি,ছয়ষট্টি লক্ষ ছাব্বিশ হাজার এইরূপ বর্গ মাইল পাওয়া যায়। এক মাইল দীর্ঘ, এক মাইল প্রস্থে, এবং এক মাইল উর্দ্ধে, এরূপ ২৫৯, ৮০০০০০,০০০ ভাগ পাওয়া যায়। আশ্চর্য্য বিজ্ঞানবলে পৃথিবীকে ওজন করাও গিয়াছে। ওজনে পৃথিবী যত টন হইয়াছে তাহা নিম্নে অঙ্কের দ্বারা লিখিলাম। ৬,০৬৯, ০০০, ০০০, ০০০,০০০, ০০০,০০০। এক টন সাতাশ মনের অধিক।

এই সকল অঙ্ক দেখিয়া মন অস্থির হয়; পৃথিবী যে কত বৃহৎ, পদার্থ তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এক্ষণে যদি বলি যে, এমত অন্য কোন গ্রহ বা নক্ষত্র আছে, যে তাহা পৃথিবী অপেক্ষা, এয়োদশ লক্ষ গুণে বৃহৎ, তবে কে না বিস্মিত হইবে? কিন্তু বাস্তবিক সূর্য্য পৃথিবী হইতে ত্রয়োদশ লক্ষগুণে বৃহৎ। ত্রয়োদশ লক্ষ টি পৃথিবী চূর্ণ করিয়া একত্র করি-

লে সুর্য্যের আয়তনের সমান হয়।

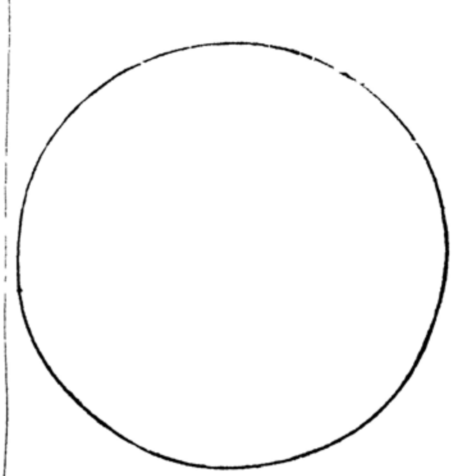
তবে আমরা সুর্য্যকে এত ক্ষুদ্র দেখি কেন? উহার দুরতাবশতঃ। পূর্ব্বতন গণনা অনুসারে সুর্য্য পৃথিবী হইতে সার্দ্ধ নয় কোটি মাইল দূরে স্থিত বলিয়া জানা ছিল। আধুনিক গণনায় স্থির হইয়াছে, যে ৯১, ৬৭৮০০০ মাইল অর্থাৎ এক কোটি, চতুর্দ্দশ লক্ষ, ঊনষষ্টি সহস্র সার্দ্ধ সপ্তশত যোজন, পৃথিবী হইতে সুর্য্যের দুরতা। এই ভয়ঙ্কর দূরতা অনুমেয় নহে। দ্বাদশ সহস্র পৃথিবী শ্রেণীপরম্পরায় বিন্যস্ত হইলে, পৃথিবী হইতে সুর্য্য পর্য্যন্ত পায় না।

এই দূরতা অনুভূত করিবার জন্য একটি উদাহরণ দিই। অস্মদাদির দেশে রেলওয়ে ট্রেন ঘন্টায় ২০ মাইল যায়। যদি পৃথিবী হইতে সুর্য্য পর্য্যন্ত রেইলওয়ে হইত, তবে কতকালে সুর্য্য লোকে যাইতে পারিতাম? উত্তর—যদি দিনরাত্রি, ট্রেন অবিরত, ঘন্টায় বিশ মাইল চলে, তবে ৫২০ বৎসর ৬ মাস ১৬ দিনে সুর্য্য লোকে পৌছান যায়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ট্রেনে চড়িবে, তাহার সপ্তদশ পুরুষ ঐ ট্রেনেই গত হইবে।

এক্ষণে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, যে সুর্য্যমণ্ডলমধ্যে অণুবৎ ক্ষুদ্রাকৃতি পদার্থও বাস্তবিক অতি বৃহৎ। যদি সুর্য্য মধ্যে আমরা একটি বালির মত বিন্দুও দেখিতে পাই, তবে তাহাও লক্ষ ক্রোশ বিস্তার হইতে পারে।

কিন্তু সুর্য্য এমনি প্রচণ্ড রশ্মিময়, যে তাহার গায়ে বিন্দু বিসর্গ কিছু দেখিবার সম্ভাবনা নাই। সুর্য্যের প্রতি চাহিয়া দেখিলেও অন্ধ হইতে হয়। কেবল সুর্য্যগ্রহণের সময়ে সুর্য্যতেজঃ চন্দ্রান্তরালে লুক্কায়িত হইলে, তৎপ্রতি দৃষ্টি করা যায়। তখনও সাধারণ লোকে চক্ষের উপর কালিমাখা কাঁচ না ধরিয়া, হৃততেজা সুর্য্য প্রতিও চাহিতে পারে না।

সেই সময়ে যদি কালিমাখা কাঁচ ত্যাগ করিয়া, উত্তম দুরবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা সুর্য্য প্রতি দৃষ্টি করা যায়, তবে কতক গুলি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যায়। পূর্ণ গ্রাসের সময়ে, অর্থাৎ যখন চন্দ্রান্তরালে সুর্য্যমণ্ডল লুক্কায়িত হয়, সেই সময়ে দেখা যাইবে, যে লুক্কায়িত মণ্ডলের চারিপার্শ্বে, অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় কিরীটী মণ্ডল তাহাকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ইহাকে “করোনা” বলেন। কিন্তু এই কিরীটী মণ্ডল ভিন্ন, আর এক অদ্ভুত বস্তু কখন২ দেখা যায়। কিরীটিমুলে, ছায়ারত সুর্য্যের অঙ্গের



উপরে সংলগ্ন, অথচ তাহার বাহিরে, কোন দুর্জ্জেয় পদার্থ উদগত দেখা

যায়। যথা (ক)। ঐ সকল উদগত পদার্থ দেখিতে এত ক্ষুদ্র, যে তাহা দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতিরেকে দেখা যায় না। কিন্তু দূরবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় বলিয়াই, তাহা বৃহৎ অনুমান করিতে হইতেছে। উহা কখন২ অর্দ্ধ লক্ষ মাইল উচ্চ দেখা গিয়াছে। ছয়টি পৃথিবী উপর্য্যুপরি সাজাইলে এত উচ্চ হয় না।

এই সকল উদ্‌গত পদার্থের আকার কখন পর্ব্বত শৃঙ্গবৎ, কখন অন্যপ্রকার, কখন সূর্য্য হইতে বিযুক্ত দেখা গিয়াছে। তাহার বর্ণ কখন উজ্জ্বলরক্ত, কখন গোলাপী, কখন নীলকপিশ।

পণ্ডিতেরা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, এ সকল সূর্য্যের অংশ। প্রথমে কেহ ২ বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, এ সকল সৌর পর্ব্বত। পরে সূর্য্য হইতে তাহার বিয়োগ দেখিয়া, সে মত ত্যাগ করিলেন।

এক্ষণে নিঃসংশয় প্রমাণ হইয়াছে যে, এই সকল বৃহৎ পদার্থ সূর্য্যগর্ভ হইতে উৎক্ষিপ্ত। যেরূপ পার্থিব আগ্নেয় গিরি হইতে দ্রব বা বায়বীয় পদার্থ সকল উৎপতিত হইয়া, গিরিশৃঙ্গের উপরে মেঘাকারে দৃষ্ট হইতে পারে, এই সকল সৌরমেঘও তদ্রূপ। উৎক্ষিপ্ত বস্তু যতক্ষণ না সূর্য্যোপরি পুনঃপতিত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্তূপাকারে পৃথিবী হইতে লক্ষ্য হইতে থাকে।

এক্ষণে পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, এইরূপ একখানি সৌরমেঘ বা স্তূপ দূরবীক্ষণে দেখিলে কি বুঝিতে হয়। বুঝিতে হয় যে, এক প্রকাণ্ড প্রদেশ লইয়া এক বিষম বিপ্লব্ উপস্থিত হইয়াছে। সেই সকল উৎপাতকালে সূর্য্যগর্ভনিক্ষিপ্ত পদার্থরাশি, এতাদৃশ বহুদূরব্যাপী হয়, যে তন্মধ্যে এই পৃথিবীর ন্যায় অনেক গুলিন পৃথিবী ডুবিয়া থাকিতে পারে।

এইরূপ সৌরোৎপাত, অনেকেই প্রফেসর ইয়ঙের পূর্ব্বে দেখিয়াছেন, কিন্তু প্রফেসর ইয়ঙ্ যাহা দেখিয়াছেন, তাহা আবার বিশেষ বিস্ময়কর। গত ৭ই সেপ্টেম্বরে, বেলা দুই প্রহরের সময়ে তিনি সূর্য্যমণ্ডল দূরবীক্ষণ দ্বারা অবেক্ষণ করিতেছিলেন। তৎকালে গ্রহণাদি কিছু ছিল না। পূর্ব্বে গ্রহণের সাহায্য ব্যতীত কেহ কখন এই সকল ব্যাপার নয়নগোচর করে নাই, কিন্তু ডাক্তার হাগিন্‌স্ প্রথমে বিনা গ্রহণে এ সকল ব্যাপার দেখিবার উপায় প্রদর্শন করেন। প্রফেসর ইয়ঙ্ এরূপ বিজ্ঞানকুশলী, যে তিনি সূর্য্যের প্রচণ্ড তেজের সময়েও ঐ সকল সৌরস্তূপের আতপচিত্র পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

কথিত সময়ে প্রফেসর ইয়ঙ্ দূরবীক্ষণে দেখিতেছিলেন, যে সূর্য্যের উপরিভাগে একখানি মেঘবৎ পদার্থ দেখা যাইতেছে। অন্যান্য উপায় দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে, যে পৃথিবী যেরূপ বায়বীয় আবরণে বেষ্টিত, সূর্য্যমণ্ডলও তদ্রূপ। ঐ মেঘবৎ পদার্থ, সৌরবায়ুর উপরে ভাসিতেছিল। পাঁচটি স্তম্ভের ন্যায় আধারের উপরে উহা আরূঢ় দেখা যাইতেছিল। প্রফেসর ইয়ঙ্ পূর্ব্বদিন বেলা দুই প্রহর হইতে ঐ রূপই দেখিতেছিলেন। তদবধি তাহার পরিবর্ত্তনের কোন লক্ষণই দেখেন নাই। স্তম্ভ গুলিন উজ্জ্বল, মেঘখানিও বৃহৎ—তদ্ভিন্ন মেঘের নিবি-

ড়তা বা উজ্জ্বলতা কিছুই ছিল না। সূক্ষ্ম২ সূত্রাকার কতকগুলি পদার্থের সমষ্টির ন্যায় দেখাইতেছিল। এই অপূর্ব্ব মেঘ সৌরবায়ুব উপরে পঞ্চদশ সহস্র মাইল ঊর্দ্ধে ভাসিতেছিল। ইহা বলা বাহুল্য, যে প্রফেসর ইয়ঙ্ ইহার দৈর্ঘ প্রস্থও মাপিয়াছিলেন। তাহার দৈর্ঘ লক্ষ মাইল—প্রস্থ ৫৪০০০ মাইল। বারটি পৃথিবী সারি২ সাজাইলে, তাহার দৈর্ঘের সমান হয় না—ছয়টী পৃথিবী সারি২ সাজাইলে, তাহার প্রস্থের সমান হয় না।

দুই প্রহর বাজিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা হইলে, মেঘ এবং তন্মূলস্বরূপ স্তম্ভগুলির অবস্থাপরিবর্ত্তনেব কিছু২ লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল। সেই সময়ে প্রফেসরইয়ঙ্ সাহেবকে দূরবীক্ষণ রাখিয়া স্থানান্তরে যাইতে হইল। একটা বাজিতে পাঁচ মিনিট থাকিতে, যখন তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন দেখিলেন,যে চমৎকাব! নিম্ন হইতে উৎক্ষিপ্ত কোন ভয়ঙ্কর বলের বেগে মেঘখণ্ড ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, তৎপবিবর্ত্তে সৌর গগন ব্যাপিয়া ঘনবিকীর্ণ উজ্জ্বল সূত্রাকার পদার্থ সকল ঊর্দ্ধে ধাবিত হইতেছে। ঐ সুত্রাকার পদার্থ সকল অতি প্রবল বেগে ঊর্দ্ধে ধাবিত হইতেছিল।

সর্ব্বাপেক্ষা এই বেগই চমৎকাব। আলোক, বা বৈদ্যুতীয় শক্তি প্রভৃতি ভিন্ন, গুরুত্ববিশিষ্ট পদার্থের এরূপ বেগ শ্রুতিগোচর হয় না। ইয়ঙ্ সাহেব যখন প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, তখন ঐ সকল উজ্জ্বল সুত্রাকার পদার্থ লক্ষ মাইলের ঊর্দ্ধে উঠে নাই। পরে দশ মিনিটের মধ্যে যাহা লক্ষ মাইলে ছিল, তাহা দুই লক্ষ মাইলে উঠিল। দশ মিনিটে লক্ষ মাইল গতি হইলে, প্রতি সেকেণ্ডে ১৬৬ মাইল গতি হয়। অতএব উৎক্ষিপ্ত পদার্থের দৃষ্ট গতি এই।

এই গতি কি ভয়ঙ্কর, তাহা মনেরও অচিন্ত্য। কামানের গোলা অতিবেগবান হইলেও কখন এক সেকেণ্ডে অর্দ্ধ মাইল যাইতে পারে না। সচরাচর কামানের গোলার বেগের বহুশত গুণ এই সৌর পদার্থের বেগ, এ কথা বলিলে, অত্যুক্তি হইবে না।

দুই লক্ষ মাইল ঊর্দ্ধেত এই বেগ দেখা গিয়াছিল। যে উৎক্ষিপ্ত পদার্থ দুই লক্ষ মাইল ঊর্দ্ধে এত বেগবান্, নির্গমনকালে তাহার বেগ কিরূপ ছিল? সকলেই জানে যে, যদি আমরা একটা ইষ্টক খণ্ড ঊর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত করি, তাহা হইলে যে বেগে তাহা নিক্ষিপ্ত হয়, সেই বেগ শেষ পর্য্যন্ত থাকে না, ক্রমে মন্দীভূত হইয়া, পরিশেষে একবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, ইষ্টক খণ্ডও ভূপতিত হয়। ইষ্টকবেগের হ্রাসের দুই কারণ; প্রথম পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণী শক্তি, দ্বিতীয় বায়ুজনিত প্রতিবন্ধকতা। এই দুই কারণই সূর্য্যলোকে বর্ত্তমান। যে বস্তু যত গুরু তাহার মাধ্যাকর্ষণী শক্তি তত বলবতী। পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণী শক্তি সূর্য্যের নাড়ীমণ্ডলে ২৮ গুণ অধিক। তদুল্লঙ্ঘন করিয়া লক্ষ ক্রোশ পর্য্যন্ত যদি কোন পদার্থ উত্থিত হয়, তবে তাহা যখন সূর্য্যকে ত্যাগ করে, তৎকালে তাহার গতি প্রতি সেকেণ্ডে অবশ্যই ২১০ মাইল ছিল। ইহা গণনা দ্বারা সিদ্ধ। কিন্তু যদিও এই বেগে উৎক্ষিপ্ত হইলে,

ক্ষিপ্ত বস্তু লক্ষ ক্রোশ উঠিতে পারিবে, তাহা যে ঐ লক্ষ ক্রোশের শেষার্দ্ধলঙ্ঘনকালে প্রতি সেকেণ্ডে ১৬৬ মাইল ছুটিবে, এমত নহে। শেষার্দ্ধে বেগ গড়ে ৬৫ মাইল মাত্র হইবে। প্রাক্‌টর সাহেব গুড্‌ ওয়র্ড্‌সে লিখিয়াছেন,যে যদি বিবেচনা করা যায়,যে সূর্য্যলোকে বায়বীয় প্রতিবন্ধকতা নাই, তাহা হইলে এই উৎক্ষিপ্ত পদার্থ সূর্য্যমধ্যহইতে যে বেগে নির্গত হইয়াছিল, তাহা প্রতি সেকেণ্ডে ২৫৫ মাইল। কর্ণহিলের এক জন লেখক বিবেচনা করেন যে,এই পদার্থ প্রতি সেকেণ্ডে ৫০০ মাইলের অধিক বেগে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

কিন্তু সূর্য্যলোকে যে বায়বীয় পদার্থ নাই, এমত কথা বিবেচনা করিতে পারা যায় না। সূর্য্য যে গাঢ় বাষ্পমণ্ডল পরিব্রত, তাহা নিশ্চিত হইয়াছে। প্রাক্টর সাহেব সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবীতে বায়বীয় প্রতিবন্ধকতার যেরূপ বল, সৌর বায়ুর প্রতিবন্ধকতার যদি সেই রূপ বল হয়, তাহা হইলে এই পদার্থ, যখন সূর্য্যহইতে নির্গত হয়, তখন তাহার বেগ প্রতি সেকেণ্ডে আনুমানিক সহস্র মাইল ছিল।

এই বেগ মনের অচিন্ত্য। এরূপ বেগে নিক্ষিপ্ত পদার্থ এক সেকেণ্ডে ভারতবর্ষ পার হইতে পারে—পাঁচ সেকেণ্ডে কলিকাতা হইতে বিলাত পঁহুছিতে পারে এবং ২৪ সেকেণ্ডে, অর্থাৎ অর্দ্ধ মিনিটের কমে, পৃথিবী বেষ্টন করিয়া আসিতে পারে।

আর এক বিচিত্র কথা আছে। আমরা যদি কোন মৃৎপিণ্ড ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করি, তাহা আবার ফিরিয়া আসিয়া পৃথিবীতে পড়ে। তাহার কারণ এই যে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণী শক্তির বলে, এবং বায়বীয় প্রতিবন্ধকতায়, ক্ষেপণীর বেগ ক্রমে বিনষ্ট হইয়া, যখন ক্ষেপণী একবারে বেগহীন হয়, তখন মাধ্যাকর্ষণের বলে পুনর্ব্বার তাহা ভূপতিত হয়। সূর্য্যলোকেও অবশ্য তাহাই হওয়া সম্ভব। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণী শক্তি বা বায়বীয় প্রতিবন্ধকতার শক্তি কখন অসীম নহে। উভয়েরই সীমা আছে। অবশ্য এমত কোন বেগবতী গতি আছে,যে তদ্দ্বারা উভয় শক্তিই পরাভূত হইতে পারে। এই সীমা কোথায়,তাহাও গণনা দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। যে বস্তু নির্গম কালে প্রতি সেকেণ্ডে ৩৮০ মাইল গমন করে,তাহা মাধ্যাকর্ষণী শক্তি এবং বায়বীয় প্রতিবন্ধকতার বল অতিক্রম করিয়া যায়। অতএব ঈদৃশ বেগবান্‌ উৎক্ষিপ্ত পদার্থ, আর সূর্য্যলোকে ফিরিয়া আইসে না। সুতরাং প্রফেসর ইয়ঙ্‌ যে সৌরোৎপাত দৃষ্টি করিয়াছিলেন, তদুৎক্ষিপ্ত পদার্থ আর সূর্য্যলোকে ফিরে নাই। তাহা অনন্ত কাল, অনন্ত আকাশ সাগরে বিচরণ করিয়া, ধূমকেতু বা অন্য কোন খেচর রূপে পরিণত হইবে কি, কি হইবে, তাহা কে বলিতে পারে!

প্রাক্টর সাহেব সিদ্ধান্ত করেন,যে উৎক্ষিপ্ত বস্তু লক্ষ ক্রোশ পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল বটে, কিন্তু অদৃষ্টভাবে যে তদধিক দূর ঊর্দ্ধগত হয় নাই এমত নহে। যতক্ষণ উহা উত্তপ্ত এবং জ্বালাবিশিষ্ট ছিল, ততক্ষণ তাহা দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল,ক্রমে শীতল হইয়া অনুজ্জ্বল হইলে,

আর তাহা দেখা যায় নাই। তিনি স্থির করিয়াছেন যে, উহা সার্দ্ধ তিন লক্ষ মাইল উঠিয়াছিল। অতএব এই সৌরোৎপাতনিক্ষিপ্ত পদার্থ অদ্ভুত বটে—লক্ষযোজনব্যাপী, মনোগতি, এক নূতন সৃষ্টির আদি।

আকাঙ্ক্ষা।

(সুন্দরী।)

কেননা হইলি তুই, যমুনার জল,
রে প্রাণ বল্লভ।
কিবা দিবা কিবা রাতি, কুলেতে আঁচল পাতি,
শুইতাম শুনিবারে, তোর মৃদুরব॥
রে প্রাণ বল্লভ!

২

কেননা হইলি তুই, যমুনাতরঙ্গ,
মোর শ্যামধন।
দিবারাতি জলে পশি, থাকিতাম কালো শশি,
করিবারে নিত্য তোর, নৃত্য দরশন॥
ওহে শ্যামধন!

৩

কেননা হইলি তুই, মলয় পবন,
ওহে ব্রজরাজ।
আমার অঞ্চল ধরি, সতত খেলিতে হরি,
নিশ্বাসে যাইতে মোর, হৃদয়ের মাঝ॥
ওহে ব্রজরাজ।

৪

কেননা হইলি তুই, কানন কুসুম,
রাধা প্রেমাধার।
না ছুঁতেম অন্য ফুলে, বাঁধিতাম তোরে চুলে,
চিকন গাঁথিয়া মালা, পরিতাম হার।
মোর প্রাণাধার!

৫

কেননা হইলে তুমি চাঁদের কিরণ,
ওহে হৃষীকেশ।
বাতায়নে বিষাদিনী, বসিত যবে গোপিনী,
বাতায়ন পথে তুমি, লভিতে প্রবেশ॥
আমার প্রাণেশ!

৬

কেননা হইলে তুমি, চিকন বসন,
পীতাম্বর হরি।
নীলবাস তেয়াগিয়ে, তোমারে পরি কালিয়ে,
রাখিতাম যত্ন করে্য হৃদয় উপরি॥
পীতাম্বর হরি!

৭

কেননা হইলে শ্যাম, যেখানে যা আছে,
সংসারে সুন্দর।
ফিরাতেম আঁখি যথা, দেখিতে পেতেম তথা,
মনোহর এ সংসারে, রাধা মনোহর॥
শ্যামল সুন্দর!

(সুন্দর।)

১

কেননা হইনু আমি, কপালের দোষে,
যমুনার জল!
লইয়া কম কলসী, সে জল মাঝারে পশি,
হাসিয়া ফুটিত আসি, রাধিকা কমল।
যৌবনেতে ঢল ঢল॥

২

কেননা হইনু আমি, তোমার তরঙ্গ,
তপন নন্দিনি!
রাধিকা আসিলে জলে, নাচিয়া হিল্লোল ছলে,
দোলাতেম দেহ তার, নবীন নলিনী।
যমুনা জল হংসিনী॥

৩

কেননা হইনু আমি, তোর অনুরূপী,
মলয় পবন।
ভ্রমিতাম কুতূহলে, রাধার কুন্তল দলে,

কহিতাম কানে কানে, প্রণয় বচন।
সে আমার প্রাণ ধন॥
৪
কেননা হইনু হায়! কুসুমের দাম,
কণ্ঠের ভূষণ।
একনিশা স্বর্গ সুখে, বঞ্চিয়া রাধার বুকে,
ত্যজিতাম নিশি গেলে, জীবন যাতন।
মেখে শ্রীঅঙ্গ চন্দন॥
৫
কেননা হইনু আমি, চন্দ্রকরলেখা,
রাধার বরণ।
রাধার শরীরে থেকে, রাধারে ঢাকিয়ে রেখে,
ভুলাতেম রাধারূপে, অন্য জন মন।
পর ভুলান কেমন?
৬
কেননা হইনু আমি চিকন বসন,
দেহ আবরণ।
তোমার অঙ্গেতে থেকে, অঙ্গের চন্দন মেখে,
অঞ্চল হইয়ে দুলে, ছুঁইয়ে চরণ,—
চুম্বি ও চাঁদ বদন॥
৭
কেননা হইনু আমি, যেখানে যা আছে,
সংসারে সুন্দর।
কে হতে না অভিলাষে, রাধা যাহা ভাল বাসে?
কে মোহিতে নাহি চাহে, রাধার অন্তর—
প্রেম-সুখ রত্নাকর?

মনুষ্য জাতির মহত্ত্ব—কিসে হয়।

মহৎ হইবার ইচ্ছা মনুষ্যজাতির স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। সকল ব্যক্তি এবং সকল জাতিরই অভিলাষ, যে তাহারা জনসমাজে অগ্রগণ্য এবং প্রতিষ্ঠিত হয়। তথাপি সকল জাতিকে অথবা এক জাতিকেই সকল সময়ে মহৎ হইতে দেখা যায় না। কেবল মহৎ হইবার ইচ্ছা থাকিলেই হইতেছে না। যে সমস্ত গুণের সদ্ভাবে লোকে মহৎ হয়, তাহা আয়ত্ত করা আবশ্যক। সেই সকল গুণ এবং উপায়-প্রণালী সর্ব্বদা মনোমধ্যে চিন্তা করা এবং তদনুসারে কার্য্য না করিয়া, কেবল মহত্ত্বলাভের ইচ্ছা করা, বামনের চন্দ্রধারণের আশার ন্যায় নিষ্ফল। অতএব এই সংস্কার, যে জাতির মনে বদ্ধমূল আছে, সেই জাতিই মহত্ত্ব লাভ করে, এবং যত দিন এই সংস্কার অবিচলিত থাকে, তত দিনই তাহাদিগের শ্রীবৃদ্ধি এবং উন্নতি সাধন হয়; ইহার অন্যথা হইলেই পতনদশা আসিয়া উপস্থিত হয়।

আমাদিগের দেশে এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহৎ হইবার বাসনা লোকের অন্তঃকরণকে আশ্রয় করিয়াছে, এবং সুশিক্ষিত যুবা পুরুষদিগের ন্যায় অনেকের মনে সেই বাসনা বলবতী হইয়া উঠিয়াছে। অতএব সেই বাসনাকে পরিণামে, ফলপ্রদ করিবার নিমিত্ত, মনুষ্যজাতি কিসে মহৎ হয়, এই বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য। সেই জন্যই আমরা এই প্রস্তাব লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

মনুষ্যজাতি কিসে মহৎ হয়, এই সমস্যাটী অতি গুরুতর। ইহার শেষ মীমাংসা করিয়া উঠা অনেক পরিশ্রম, বিবেচনা এবং আয়াসসাধ্য। এ বিষয়ের সম্যকরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া উঠি, আমাদিগের তাদৃশ ক্ষমতা নাই, এবং তাহাও আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। ইহার প্রতি

লোকের দৃষ্টি থাকে, তাঁহারা মনোমধ্যে এই চিন্তাকে স্থান দান করেন, এবং ইহার তত্ত্বনির্ণয়ে মনোযোগী হইয়া, প্রকৃত সিদ্ধান্ত করিতে উদ্যোগী হন, ইহাই আমাদিগের অভিপ্রেত। অতএব আমরা এ বিষয়ের যৎকিঞ্চিৎ যাহা স্থির করিতে পারিয়াছি, এস্থানে তাহারই উল্লেখ করিতেছি।

মনুষ্যজাতি কিসে মহৎ হয়, এই কথার মীমাংসা করিবার জন্য ইতিহাসই প্রধান অবলম্বন। পৃথিবীর যে সকল জাতি মহৎ হইয়াছে, কিম্বা এখনও যাহারা মহৎ হইতেছে, তাহাদিগের ইতিহাস আলোচনা করিলে, সর্ব্বত্রই প্রায় একটী সাধারণ নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। কোন একটী প্রবৃত্তির প্রাধান্য করিতে কৃতসঙ্কল্প ও সেই প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া, তদর্থে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করাই সেই নিয়ম। দেশ কাল এবং জাতিভেদে সেই প্রবৃত্তিটী বিভিন্নপ্রকার হইয়া থাকে। কখন বা মাতৃভূমির প্রতি স্নেহ, কখন বা ধর্ম্মানুরাগ, কখন বা জ্ঞানতৃষ্ণা, কখন বা বাহুবলগৌরব, কখন বা অর্জ্জনস্পৃহা ইত্যাকার কোন না কোন একটী প্রবৃত্তি সমাজমণ্ডলীতে প্রাধান্য প্রাপ্ত হয়; কিন্তু ফলাফল সর্ব্বত্রই প্রায় এক রূপ হইয়া থাকে। সমাজের সকল ব্যক্তিই প্রতিষ্ঠিত প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে যত্নবান্ এবং তদর্থ জীবনসর্ব্বস্ব পরিহার করিতে পরাঙ্মুখ না থাকায়, সেই জাতির লোকদিগের মধ্যে একতা, সহিষ্ণুতা, একাগ্রতা এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা সংস্থাপিত হয়। স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম্ম বলিয়া, সকলেরই মনে একটী স্পর্দ্ধা জন্মে, এবং সংকল্পিত কামনা সফল করিবার নিমিত্ত পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস করিয়া, সকলেই কায়মনোবাক্যে তদনুকূল আচরণ করিতে থাকে, এবং অচিরাৎ এই সমস্ত গুণের সহযোগে মহত্ত্ব লাভ করে। প্রাচীন গ্রীস্, রোম, আরব, ভারতবর্ষ এবং বর্ত্তমান ইংলণ্ড ইহার উদাহরণস্থল।

গ্রীস্—প্রাচীন গ্রীকেরা জগতের মধ্যে এক অপূর্ব্ব জাতি ছিল। কোন জাতিই আজি পর্য্যন্তও ইহাদিগের তুল্য মহত্ত্ব লাভ করিতে পারে নাই। বুদ্ধি, বিক্রম, সাহস, বিদ্যা, শিল্প, সাহিত্য এবং দর্শন, সকল বিষয়েই ইহারা অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়া গিয়াছে। ইহাদিগের কীর্ত্তি দেখিয়া, আজি পর্য্যন্তও পৃথিবীর সমস্ত লোক চমৎকৃত হয়। আজ কাল যে সকল ইউরোপীয় জাতিদিগের এত প্রাদুর্ভাব, তাহারাও অনেক বিষয়ে সেই গ্রীকদিগের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। কাব্য, শিল্পনৈপুণ্যপ্রভৃতি অনেক বিষয়ে এখনও উহাদিগের ছায়া অবলম্বন করিয়া চলিতেছে। গ্রীকেরা এই অনুপম মহত্ত্ব অতি অল্প কালের মধ্যেই লাভ করিয়াছিল। খৃষ্টের প্রায় ৪৯০ বৎসর পূর্ব্বে তাহাদিগের উন্নতি আরম্ভ হয়, এবং খৃষ্টের ৩২৩ বৎসর পূর্ব্বে তাহারা সংসারলীলা সম্বরণ করে। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে তাহারা যে সকল কীর্ত্তি করিয়া গিয়াছে, সে সকল ভাবিয়া আথিনীর ধ্যান করিলে, শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে।

গ্রীকদিগের মহানুভাবতা এবং উৎ-

কর্ম্মপ্রিয়তাই এই অপূর্ব্ব উন্নতির প্রধান কারণ। উৎকর্ষজনিত আনন্দই যেন তাহাদিগের একমাত্র বাঞ্ছনীয় পদার্থ ছিল। তাহাদিগের মন ক্ষুদ্র বিষয়ে ধাবিত হইত না এবং যখন যে বিষয়ের প্রতি তাহাদিগের অনুরাগ জন্মিত,তাহার সম্পূর্ণ উৎকর্ষ সম্পাদন না করিয়া, তাহারা তাহা হইতে নিবৃত্ত হইত না। কাব্য, নাটক, শিল্প, দর্শন, ন্যায়, বিজ্ঞান, রাজনীতি এবং যুদ্ধকৌশল, যখন যাহাতে মনোনিবেশ করিয়াছে, তখনি তাহারা তাহার একশেষ করিয়া ছাড়িয়াছে। শিল্পনৈপুণ্যে প্রস্তরের পরুষভাব দূর করিয়া, এরূপ কোমলাভ মূর্ত্তি এবং গৃহাদি প্রস্তুত করিয়াছিল, যে দুই সহস্র বৎসর গত হইল, আজিও সেই সকল প্রস্তরময়ী প্রতিমা এবং গৃহাদির ভগ্নাবশেষ দেখিয়াও, নয়ন মন বিস্ময়রসে মুগ্ধ হইতে থাকে। তাহাদিগের ইতিহাস,দর্শন এবং নাটকাদি আজিও ইউরোপখণ্ডে আদর্শস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। তাহারা নিজে অতি সুশ্রী ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছিল, এবং সকল বিষয়ের সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করাই যেন, তাহাদিগের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তাহাদিগের মধ্যে প্রধান ব্যক্তিরাও সেইরূপ মহাশয় এবং মহানুভব ছিলেন। আলেকজণ্ডরের জড় ব্রহ্মাণ্ড জয় করিবার ইচ্ছা এবং অরিস্ততলের মনোব্রহ্মাণ্ড করতলস্থ করিবার ইচ্ছা, উভয়ই তুল্য এবং তাঁহারা উভয়েই স্ব স্ব অভিপ্রেত বিষয়ে অলোকসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়া গিয়াছেন। তাহাদিগের পণ্ডিতমণ্ডলী জ্ঞানের জ্যোতিতে দিঙ্মণ্ডল আলোকময় করিয়াছিলেন। সে জ্যোতি আজিও অপ্রতিহত হইয়া,ভূমণ্ডলে প্রদীপ্ত রহিয়াছে। যে সক্রেতিস্ জ্ঞানার্জ্জন এবং জ্ঞানবিতরণের জন্য বিষভক্ষণে অপমৃত্যু স্বীকার করিয়াছিলেন, পৃথিবীর সকল লোকে আজিও তাঁহাকে নমস্কার করিতেছে। মহামতি প্লেটোর নিকট আজিও লোকে সমাদরে শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে, এবং পণ্ডিতমণ্ডলী অক্ষয়কীর্ত্তি অরিস্ততলের বাক্য আজিও শিরোধার্য্য করিতেছেন।

গ্রীকদিগের সাহস, বীর্য্য এবং রণনৈপুণ্যও ইহার অনুরূপ ছিল। যে দিন পারসীক সম্রাট গ্রীকদিগের পবিত্র মাতৃভূমিতে পদার্পণ করিয়া, তাহাদের মর্ম্মগ্রন্থিতে দারুণ প্রহার করেন, সেইদিন অবধি উহাদিগের সৌভাগ্য সূর্য্য সহস্র কিরণ বিস্তার করিয়া উদয় হইয়াছিল। কেবল আথিনীয়েরাই দশ হাজার সৈন্য লইয়া, মারাথনক্ষেত্রে দুই লক্ষ পারসীককে পরাজয়, এবং তাহাদিগকে স্বদেশ হইতে দূরীভূত করিয়া, অনতিবিলম্বে তাহাদিগের রাজ্য আক্রমণ করে। থার্ম্মপলির যুদ্ধের কথা স্মরণ হইলে সর্ব্বশরীরে লোমহর্ষণ হয়। সেই প্রাতঃস্মরণীয় গিরিসঙ্কটে কেবল তিন শত জন স্পার্টীয় বীরপুরুষ উদ্বেল সাগরতরঙ্গ সদৃশ বিপক্ষসেনাকে সুদীর্ঘ কাল প্রতিরোধ করিয়া,সম্মুখসমরে শয়ন করে। সেই দিন হইতেই গ্রীকদিগের উন্নতি দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং উহারা বল, বুদ্ধি, বিদ্যা এবং সভ্যতায় অদ্বিতীয় হইয়া, মাতৃভূমিকে নানাবিধ ভূষণে ভূষিত করিয়া, জগতের মধ্যে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

রোম—বাহুবলগৌরব ও অর্জ্জনস্পৃহা

হইতে যে মহত্ত্বের উদয় হয়, প্রাচীন রোমকেরা, তাহারই উদাহরণস্থল। বীরত্ব, সাহস, এবং রাজনীতিকুশলতায়, কি প্রাচীন, কি বর্ত্তমান, কোন জাতিকেই ইহাদিগের তুল্য দেখিতে পাওয়া যায় না। জগতের মধ্যে রোমনগরী অদ্বিতীয় হইবে, রোমনগরবাসীর নাম, আর ক্ষিতিনাথের নাম, অভিন্ন হইবে, লাটিন জাতির বাহুবল ও পরাক্রমে ধরাতল শঙ্কিত হইবে, ইহাই উহাদিগের মহাসঙ্কল্প ছিল। এই সঙ্কল্পের সাধন জন্য, উহারা ধন প্রাণ নষ্ট করিয়া, অর্দ্ধ ভাগেরও অধিক বসুমতী জয় করিয়াছিল। পূর্ব্ব দিকে পারথিয়া, (এক্ষণকার পারস্য এবং কাবুল,) পশ্চিমে হিস্পানী, (এক্ষণকার স্পেন এবং পর্টুগেল,) উত্তরে দানুবাঞ্চল, (এক্ষণকার জর্ম্মণ রাজ্য,) এবং আরো উত্তরে বৃটনদ্বীপ (আধুনিক ইংলণ্ড.) এবং দক্ষিণে সমস্ত উত্তর আফ্রিকা, রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। প্রায় এক সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত এই বিপুল সাম্রাজ্যে রোমকেরা একচ্ছত্রে আধিপত্য করে। উহাদের শাসনপ্রণালী অতি পরিপাটী ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল এবং রাজকার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হইত। এই প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের ভগ্নাবশেষ হইতে, এক্ষণে কত শত প্রধান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহাদিগের ব্যবহারশাস্ত্র এবং ব্যবহারজ্ঞদিগের ব্যবস্থা এক্ষণে সমস্ত ইউরোপ খণ্ডে আলোচিত হয়। রোমকদিগের ঐক্য, একাগ্রতা এবং অধ্যবসায় যে, কিরূপ ছিল, তাহা ইহা দ্বারাই উপলব্ধ হইতে পারে।

আরব—আরবেরা প্রভূত ধর্ম্মানুরাগ হইতেই মহত্ত্ব লাভ করে। খৃঃ ৫৭০ অব্দে মহম্মদের জন্ম হয়। মহম্মদ জন্মিবার পূর্ব্বে আরবেরা অসভ্য, শ্রীভ্রষ্ট ও যাযাবর ছিল। প্রণালীবদ্ধ সমাজের নিয়মাধীন ছিল না। পরস্পর অসম্বদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র দলভুক্ত হইয়া, যাহার যেখানে ইচ্ছা বাস করিত। তাহাদের মধ্যে কোন কোন দল, নগর, গ্রাম কিম্বা পল্লীতে থাকিয়া, বাণিজ্য ব্যবসায় এবং কৃষিকার্য্যদ্বারা দিনপাত করিত, কিন্তু অনেকেই কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বা দেশে স্থায়ী হইয়া, বাস করিত না। বিবাদ, বিসম্বাদ এবং শ্রমশীল জাতিদিগের প্রতি অত্যাচারে রত হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। এই অসভ্য অসম্বদ্ধ মানবদিগকে মহম্মদ, এক অলৌকিক ধর্ম্মসূত্রে বন্ধন করিয়া যান। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিবলে এক খানি অদ্ভুত গ্রন্থের সৃষ্টি করিয়া, তাহাদিগের মধ্যে এরূপ ঐক্য এবং একাগ্রতা সংস্থাপন করেন, যে নিমেষকাল মধ্যে, সেই অসভ্য শ্রীভ্রষ্ট আরবেরা ঘৃতসিক্ত হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া, সমস্ত বসুন্ধরাকে উদরসাৎ করে। পৃথিবীর যাবতীয় রাজ্য প্রায় রণদুর্ম্মদ আরবদিগের হস্তে নিপতিত হয়। এইরূপে বহুকাল উহারা গৌরবের সহিত পৃথিবীতে একাধিপত্য করে। এখনও ইউরোপ, আসিয়া এবং আফ্রিকা-খণ্ডের বহুতর স্থানে মুসলমানদিগের নাম ও আধিপত্য দেদীপ্যমান রহিয়াছে। মহম্মদ যে কোরাণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আজিও তাহা ভূমণ্ডলের কোটি কোটি লোককে শাসন করিতেছে। আর সকল ধর্ম্মই প্রায় অন্তঃসারহীন হইয়া পড়িয়াছে; মুসলমান ধর্ম্ম

এখনও সজীব আছে। পাঠকগণ, এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে,আরবেরা কেবল রণকুশল এবং যুদ্ধপ্রিয় ছিল। তাহাদের মধ্যে সাহিত্য, শিল্প এবং গণিতাদির বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। ফলে কোন একটি প্রবল মনোবৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া, একবার সৌভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসাদ গ্রহণ করিতে পারিলে, সমাজের শ্রীবর্দ্ধক সকল বির্ষয়েই আপনা হইতে উন্নত এবং পরিবর্দ্ধিত হয়। আরব্য ইতিহাস দ্বারা আরো একটি বিষয় প্রতিপন্ন হইতে পারে। কেবল বলিষ্ঠ, তেজস্বী এবং স্বাধীনতাপ্রিয় হইলেই মনুষ্যজাতির মহত্ত্ব হয় না। আরবেরা আজন্ম মহাবলবান্ এবং স্বাধীনতাপ্রিয় ছিল ; আস্সুরীয়, মিদি প্রভৃতি কোন জাতিই বহু আয়াসেও তাহাদিগের স্বাধীনতা লোপ করিতে পারে নাই, তথাপি যতদিন মহম্মদ ধর্ম্মসূত্রে তাহাদিগের একতা বন্ধন না করিয়াছিলেন, এবং অনন্যকাম করিয়া, তাহাদিগকে এক মহাসঙ্কল্পে ব্রতী করিতে না পারিয়াছিলেন, তত দিন তাহারা মহৎ হইতে পারে নাই।

ভারতবর্ষ—প্রাচীনভারতনিবাসীরা যে কিরূপ উন্নত, প্রতিভান্বিত এবং সমৃদ্ধ ছিল, তাহা পাঠকগণকে বিশেষ করিয়া জানাইবার প্রয়োজন নাই। আমরাই সেই প্রতিষ্ঠিত আর্য্যবংশের ধ্বংসাবশেষ। এক্ষণে হেয় অপকৃষ্ট অপদার্থ, অক্ষম, এবং অসার হইয়াছি। তথাপি সেই শ্রেষ্ঠ জগন্মান্য মহামতি পূর্ব্বপুরুষদিগের কথা স্মরণ করিলে, এখনও হৃদয়শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠে। এখনও সেই মহাত্মাদিগের কীর্ত্তি ও গৌরব ভাবিয়া, অনেক সময়ে তাপিত হৃদয়কে শীতল করিতে হয়। কিন্তু সেই মহাপুরুষদিগের মহত্ত্বের কারণ কি, তাহা আমরা কতবার অনুসন্ধান করিয়া থাকি ? ইদানী ব্রাহ্মণদিগকে নিন্দা, এবং তাঁহাদিগকে এদেশ উৎসন্ন করিবার হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করা, একটি প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু কাহাদিগের হইতে ভারতনিবাসী আর্য্যবংশীয়েরা মহত্ত্ব লাভ করিয়াছিল, এবং কাহাদিগের কীর্ত্তিতে ভারত নাম এখনও ভূমণ্ডলে সজীব আছে, সে কথা আমরা একবারও ভাবি না। ভারতের পুরাবৃত্ত নাই ; কিন্তু যৎসামান্য যাহা আছে, নিবিষ্ট চিত্তে তাহারই আলোচনা করিলে, সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ব্রাহ্মণেরাই সেই মহত্ত্বের একমাত্র কারণ ছিলেন। অনিবার্য্য জ্ঞানতৃষ্ণায় অধীর হইয়া, তাঁহারা সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন। সংসারের বিলাসবাসনা সমাজের অন্যান্য জনগণকে সমর্পণ করিয়া, তাঁহারা কেবল জ্ঞানান্বেষণ এবং বিদ্যার উপাসনাকে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য করিয়া, বনে বনে দারুণ কষ্টে কালাতিপাত করিতেন। জ্ঞানের আলোক কিসে পৃথিবীতে দিন দিন সমধিক উজ্জ্বল হইবে, ইহাই তাঁহাদিগের ধ্যান, চিন্তা এবং কামনার বিষয় ছিল। এই অনুপম অধ্যবসায় এবং জিতেন্দ্রিয়তা গুণে তাঁহারা অভিলষিত বিষয়েও অপরিসীম মহত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের বেদ, বেদান্ত, সাহিত্য ও দর্শন এখনও পৃথিবীর পণ্ডিতকুলের বিস্ময়জনক হইয়া রহিয়াছে। এই ব্রাহ্মণমণ্ডলীর প্রতি অবিচলিত ভক্তিই তৎকালীন সমাজ

বন্ধনের একমাত্র দৃঢ় সূত্র ছিল। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র সকলেই একমত, একোদ্যোগী হইয়া, ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণদিগের প্রতিষ্ঠিত পূজ্য শাস্ত্রকলাপকে রক্ষা করিবার জন্য জীবন সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াও আনন্দ অনুভব করিত। এস্থলে আমাদিগের বলিবার এরূপ অভিপ্রায় নহে যে, মাতৃভূমিস্নেহ এবং বাহুবলগৌরব প্রভৃতি অন্যান্য প্রবৃত্তি তৎকালে সমাজমণ্ডলীকে সংস্পর্শ করিত না। সে সকল কারণ যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। কিন্তু যে প্রবৃত্তির প্রাধান্যে তৎকালের জনসমাজ একমত ও একোদ্যোগী হইয়া কার্য্য করিত, আমাদিগের বিবেচনায়, ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অবিচলিত ভক্তিই তাহার মূল হেতু, এবং ব্রাহ্মণদিগের নিরতিশয় জ্ঞানতৃষ্ণাই প্রাচীন ভারতবাসীদিগের মহত্ত্বের অদ্বিতীয় কারণ। কালধর্ম্মে ব্রাহ্মণেরা মতিচ্ছন্ন হইবার পর, এদেশ উৎসন্ন হইয়াছে। কিন্তু যে কোন প্রবৃত্তিরই প্রাধান্যে জাতিবিশেষের মহত্ত্ব হউক না কেন, তাহার হ্রাস হইলেই সেই জাতির অধোগতি হইবে। কি সে যে সেই হ্রাস হয়, তাহা নির্ণয় করা মনুষ্য বুদ্ধির অসাধ্য। কিন্তু কোন একটি প্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার না করিলে,সমাজের যে উন্নতি হয় না, তাহার আর সন্দেহ নাই।

ইংলণ্ড—অর্জ্জনস্পৃহার প্রাধান্য হইতেই এই দেশের মহত্ত্ব হইয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই দেশে অর্জ্জনস্পৃহা উত্তেজিত হইয়া আসিতেছে। প্রথমতঃ পরস্বাপহারী দুর্দ্দান্ত নর্ম্মাণজাতি, ইউরোপের উত্তর খণ্ড হইতে আসিয়া, এদেশের আদিমবাসী সক্সনদিগকে পরাজয় করিয়া, তথায় বাস করে। কালসহকারে নর্ম্মাণ এবং সকসন জাতি মিলিত হইয়া, এক্ষণকার ইংরাজদিগের উৎপত্তি হয়। সহজেই নর্ম্মাণ জাতির দুরন্ত অর্জ্জনস্পৃহা উহাদিগকে অনেকাংশে আশ্রয় করিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ ইংলণ্ড অতি ক্ষুদ্র পার্ব্বতীয় এবং অনুর্ব্বর দ্বীপ। মনুষ্যের জীবিকানির্ব্বাহ এবং সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উপযোগী দ্রব্য সামগ্রী তথায় তাদৃশ সুলভ নহে। সুতরাং তাহার অন্বেষণে, উহাদিগকে পৃথিবীর নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। কিরূপে সংসারযাত্রা স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হইবে, প্রত্যেক ইংরাজেরই মনে আজন্ম এই চিন্তাটী বলবতী হইয়া আসিয়াছিল, এই চিন্তার অনুগামী হইয়া সকলেরই চিত্ত, ক্রমশঃ এক দিকে ধাবিত হইতে লাগিল, সকলেরই বল, বুদ্ধি, যত্ন একপথাবলম্বী হইয়া উঠিল। উহাদের মধ্যে, সমধিক সাহসিক পুরুষেরা অল্পচেষ্টায় দুস্তর পারাবার অতিক্রম ও বিদেশ পর্য্যটনপূর্ব্বক অর্থ সঞ্চয় করিয়া, স্বদেশে প্রত্যাগত হইতে থাকায়, সকলেরই মন ক্রমে বাণিজ্য পথে পরিচালিত হইতে লাগিল। অর্থোপার্জ্জনই উহাদিগের একমাত্র কাম্য এবং উপাস্য হইয়া উঠিল। সকলেই তখন নিরতিশয় উৎসাহের সহিত বাণিজ্য ব্যবসায়ে নিরত হওয়ায়, বাণিজ্যলক্ষ্মী সদয়া হইলেন। সহিষ্ণুতা, সাহস, স্বাবলম্বন, অধ্যবসায় এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞতাপ্রভৃতি যে সকল গুণ বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিকর, তৎসমুদায় ক্রমশঃ ইংলণ্ড-

বাসীদিগের মনে বদ্ধমূল হইয়া উঠিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বজাতিগৌরব এবং স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তার আধিক্য হইয়া আসিতে লাগিল। এই রূপে বাণিজ্য লক্ষ্মীর ঐকান্তিক উপাসনাই ইংলণ্ডের মহত্ত্বের মূলীভূত কারণ। ইংলণ্ডেশ্বরীর অতুল ঐশ্বর্য্যভাণ্ডারমধ্যে অমূল্য রত্ন স্বরূপ যে ভারতভূমি, তাহাও ঐ অর্জ্জনস্পৃহার আনুষঙ্গিক ফলমাত্র। এই রূপে ফরাসী, জর্ম্মাণ, স্পেন প্রভৃতি রাজ্যের ইতিহাস অন্বেষণ করিলে, আরো বহুল উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফলতঃ কোন একটী প্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া, তাহার চরিতার্থতা সাধনে কৃতসঙ্কল্প হওয়াই মনুষ্যজাতির মহত্ত্ব লাভের একমাত্র উপায়। পুরাকালে যে যে জাতি মহত্ত্ব লাভ করিয়াছে, সকলেই এই অপরিহার্য্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াছে, এবং এক্ষণেও তাহাই ঘটিতেছে। কেবল বলিষ্ঠ এবং বুদ্ধিমান্ হইলে অথবা কেবল মহৎ হইবার বাসনা করিলেই, মনুষ্যজাতি কখন মহৎ হয় না, এই কথাটী সর্ব্বদা আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। আমরা মহৎ হইতে বাসনা করিতেছি, কিন্তু যে নিয়মে মনুষ্যজাতি মহৎ হয়, তাহা অবলম্বন না করিলে, সকলই নিষ্ফল হইবে।

পরিশেষে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক। অনেকেই আশঙ্কা করেন যে, ভারতবাসীরা আর কখন মহৎ হইতে পারিবে না। ইহা কত দূর সত্য, তাহার নির্ণয় করা, মনুষ্যবুদ্ধির অসাধ্য। একবার এক জাতির উন্নতি হইয়া গেলে, সেই জাতি আবার সৌভাগ্যশিখরে আরোহণ করিতে পারে কি না, যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা, তিনিই তাহা অবগত আছেন। কিন্তু তাহা না হইবার পক্ষে আপাততঃ কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। যে নিয়মে এক বার মহৎ হইয়াছিল, সেই সকল নিয়মাবলী পুনর্ব্বার সমবেত হইলে, আবার মহৎ হইতে পারে। পরন্তু বর্ত্তমান কালেও ইহার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ দেখা গিয়াছে। প্রাচীন রোমকদিগের কীর্ত্তি মন্দির যে ইতালীদেশ, তাহা বহু কালাবধি হতশ্রী এবং হীনাবস্থ হইয়াছিল; কিন্তু সম্প্রতি পুনরায় সেই দেশের লোকেরা একমত হইয়া, একটী প্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার করায়, পুনরায় সেই দেশ প্রতিভান্বিত হইয়া, জনসমাজে গণনীয় হইয়াছে। ভারতভূমির পুনরুত্থানের পক্ষে অনেক প্রতিবন্ধক আছে সত্য, ইহা বহু বিস্তৃত দেশ এবং ইহার মধ্যে অনেক জাতি, অনেক ভাষা এবং অনেক ধর্ম্ম প্রবল আছে। তথাপি সম্যক্ উপযোগী একটী প্রবৃত্তি, সকলের মনকে আকর্ষণ করিলে, এই সমস্ত লোক যে এক সঙ্কল্পে ব্রতী হইতে পারে না, আমরা এরূপ আশঙ্কা করি না। ভাল, তাহা না হইলেও, ইহার মধ্যে কোন একটী জাতি যে পুনরুত্থিত হইয়া, সমুদায় ভারত ভূমিকে উজ্জ্বল করিতে পারিবেন না, তাহার কোন হেতুই দৃষ্ট হয় না। প্রাচীন গ্রীস অঞ্চলও এইরূপ বহুসংখ্যক নগরীতে পরিপূর্ণ ছিল; তথাপি আথিনীয়েরা গ্রীক নামের সার্থকতার নিমিত্তে কি না করিয়াছে। ভারত ভূমির এক্ষণকার এই সকল বিবিধ জাতির মধ্যে কোন্

জাতির যে পুনর্ব্বার ভাগ্যোদয় হইবে, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। কিন্তু কোন জাতিরই হতাশ হইয়া, নিশ্চেষ্ট থাকা কর্ত্তব্য নহে। সকলেরই প্রকৃতবিধানে স্বীয় স্বীয় উন্নতি সাধন করিতে চেষ্টিত হওয়া আবশ্যক ;—কেবল মহৎ হইবার বাসনা করিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে না।

উত্তরচরিত।*

প্রথম সংখ্যা।

ভবভূতি প্রসিদ্ধ কবি, এবং তাঁহার প্রণীত উত্তরচরিত উৎকৃষ্ট নাটক, ইহা অনেকেই শ্রুত আছেন; কিন্তু অল্প লোকেই তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করেন। শকুন্তলার কথা দূরে থাকুক, অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট নাটক রত্নাবলীর প্রতি এতদ্দেশীয় লোকের যে রূপ অনুরাগ, উত্তরচরিতের প্রতি তাদৃশ নহে। অন্যের কথা দূরে থাকুক, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, ভবভূতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, যে "কবিত্বশক্তি অনুসারে গণনা করিতে হইলে, কালিদাস, মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষ ও বাণভট্টের পর তদীয় নামনির্দ্দেশ বোধ হয় অসঙ্গত বোধ হয় না।" আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং লোকহিতৈষী বলিয়া মান্য করি, কিন্তু তাদৃশ কাব্যরসজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করি না, যাহা হউক, তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির লেখনী হইতে এইরূপ সমালোচনার নিঃসরণ, অস্মদ্দেশে সাধারণতঃ কাব্যরসজ্ঞতার অভাবের চিহ্নস্বরূপ। বিদ্যাসাগরও যদি উত্তরচরিতের মর্য্যাদা বুঝিতে সমর্থ হইলেন না, তবে যদু বাবু, মাধু বাবু তাহার কি বুঝিবেন ?

বাস্তবিক, যত কবি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ভবভূতি তাহার মধ্যে এক জন প্রধান। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সকল কবিদিগের নাম করিযাছেন, তন্মধ্যে শকুন্তলার প্রণেতা ভিন্ন আর কেহই ভবভূতির সমকক্ষ হইতে পারেন না। সাগরাপেক্ষা, ঝিল বিল হ্রদের যে রূপ প্রাধান্য, ভবভূতির অপেক্ষা শ্রীহর্ষ এবং বাণভট্টের সেই রূপ প্রাধান্য। পৃথিবীর নাটক প্রণেতৃগণমধ্যে যে শ্রেণীতে সেক্ষপীয়র, এস্কিলস, সফোক্লস, কাল্‌দেরণ, এবং কালিদাস, ভবভূতি সেই শ্রেণীভুক্ত না হউন, তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী বটে।

সেক্ষপীয়র পৃথিবীমধ্যে অদ্বিতীয় কবি হইলেও, ইউরোপে তাঁহার সমুচিত মর্য্যাদা অল্পকাল হইয়াছে মাত্র। তাঁহার মৃত্যুর পর দুইশত বৎসর পর্য্যন্ত, কেহই তাঁহার প্রণীত আশ্চর্য্য নাটক সকলের মর্ম্ম বুঝিতেন না। ড্রাইডেন্, পোপ, জন্‌সন্, প্রভৃতি সকলে স্বয়ং কবি, এবং সকলেই সযত্নে সেক্ষপীয়রের গ্রন্থের সমা-

* উত্তর চরিত। বাঙ্গালা অনুবাদ। শ্রী নৃসিংহ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম এ, বি এল, কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা, প্রাকৃতযন্ত্র।

লোচনা করিয়াছেন, এবং সাধ্যানুসারে প্রশংসাও করিয়াছেন, কিন্তু কেহই তাঁহার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারেন নাই। বলটের নিজে অতি প্রধান কবি—তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমান্ লোক পৃথিবীতে অতি অল্পই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনিও সেক্ষপীয়রের কিছুই মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারেন নাই। বরং তিনি অনেক নিন্দা এবং উপহাস করিয়াছিলেন। এই ইংলণ্ডীয় কবির যথার্থ মর্য্যাদা প্রথমে ইংলণ্ডে হয় নাই—শ্লেগেল এবং অন্যান্য জর্ম্মানগণ আধুনিক সেক্ষপীয়র-পূজার সৃষ্টিকর্ত্তা।

যদি সেক্ষপীয়রের এইরূপ হইল, তবে ভবভূতিরও যে এতকাল সমুচিত মর্য্যাদা হয় নাই, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। আমরাও যে ভবভূতির সমুচিত প্রশংসা করিতে পারিব, এমত নহে, বিশেষ এই পত্রে স্থান অতি অল্প। কিন্তু এই সময়ে নৃসিংহ বাবু কর্ত্তৃক ইহার একখানি বাঙ্গালা অনুবাদ, এবং টানি সাহেব কর্ত্তৃক একখানি ইংরাজি অনুবাদ প্রচার হইয়াছে, এই উপলক্ষে আমরা উত্তরচরিত সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

উত্তরচরিতের উপাখ্যান ভাগ রামায়ন হইতে গৃহীত। ইহাতে রামকর্ত্তৃক সীতার প্রত্যাখ্যান ও তৎসঙ্গে পুনর্ম্মিলন বর্ণিত হইয়াছে। স্থূল বৃত্তান্ত রামায়ণ হইতে গৃহীত বটে, কিন্তু উপাখ্যানবর্ণন কার্য্যাদি সকল ভবভূতির স্বকপোলকল্পিত। রামায়ণে যেরূপ বাল্মীকির আশ্রমে সীতার বাস, এবং যে রূপ ঘটনায় পুনর্ম্মিলন, এবং মিলনান্তেই সীতার ভূতল প্রবেশ ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে, উত্তরচরিতে সে সকল সেরূপ বর্ণিত হয় নাই। উত্তরচরিতে সীতার রসাতলবাস, লবের যুদ্ধ, এবং তদন্তে সীতার সহিত রামের পুনর্ম্মিলন ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। এই রূপ ভিন্ন পন্থায় গমন করিয়া, ভবভূতি রসজ্ঞতার এবং আত্মশক্তিজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। কেন না যাহা একবার বাল্মীকিকর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, পৃথিবীর কোন্ কবি তাহা পুনর্ব্বর্ণন করিয়া প্রশংসাভাজন হইতে পারেন? ভবভূতি অথবা ভারতবর্ষীয় অন্য কোন কবি ঈদৃশ শক্তিমান্ নহেন, যে তদপেক্ষা সরসতা বিধান করিতে পারিতেন। যেমন ভবভূতি এই উত্তরচরিতের উপাখ্যান অন্য কবির গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, তেমনি সেক্ষপীয়র তাঁহার রচিত প্রায় সকল নাটকেরই উপাখ্যান ভাগ অন্য গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ভবভূতির ন্যায় পূর্ব্ব কবিগণ হইতে ভিন্ন পথে গমন করেন নাই। ইহারও বিশেষ কারণ আছে। সেক্ষপীয়র অদ্বিতীয় কবি। তিনি স্বীয় শক্তির পরিমাণ বিলক্ষণ বুঝিতেন—কোন্ মহাত্মা না বুঝেন? তিনি জানিতেন যে, যে সকল গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ হইতে তিনি আপন নাটকের উপাখ্যান ভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই তাঁহার সঙ্গে কবিত্বশক্তিতে সমকক্ষ নহেন। তিনি যে আকাশে আপন কবিত্বের প্রোজ্জ্বলা কিরণমালা বিস্তার করিবেন, সেখানে পূর্ব্বগামী নক্ষত্রগণের কিরণ লোপ পাইবে। এজন্য ইচ্ছাপূর্ব্বকই পূর্ব্ব লেখকদিগের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। তথাপি ইহাও

বক্তব্য, যে কেবল একখানি নাটকের উপাখ্যান ভাগ তিনি হোমর হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সেই ট্রৈলস্ ও ক্রেসিদা নাটক প্রণয়ন কালে, ভবভূতি যেরূপ রামায়ণ হইতে ভিন্ন পথে গমন করিয়াছেন, তিনিও তেমনি ইলিয়দ হইতে ভিন্ন পথে গিয়াছেন।

ভবভূতিও সেক্ষপীয়রের ন্যায় আপন ক্ষমতার পরিমাণ জানিতেন। তিনি আপনাকে, সীতানির্ব্বাসনবৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া, একখানি অত্যুৎকৃষ্ট নাটক প্রণয়নে সমর্থ বলিয়া, বিলক্ষণ জানিতেন। তিনি ইহাও বুঝিতেন, যে কবিগুরু বাল্মীকির সহিত কদাচ তুলনাকাঙ্ক্ষী হইতে পারেন না। অতএব তিনি কবিগুরু বাল্মীকিকে প্রণাম* করিয়া তাঁহা হইতে দূরে অবস্থিতি করিয়াছেন। ইহাও স্মরণ রাখা উচিত, যে অস্মদ্দেশীয় নাটকে মৃত্যুর প্রয়োগ নিষিদ্ধ † বলিয়া, ভবভূতি স্বীয় নাটকে সীতার পৃথিবী প্রবেশ বা তদ্বৎ শোকাবহ ব্যাপার বিন্যস্ত করিতে পারেন নাই। ইহাতে এই নাটক অসম্পূর্ণগুণ বলিয়া বোধ হয়। কবি যদি সীতার জীবনোপযোগী পরিণাম প্রযুক্ত করিয়া নাটক সমাপ্ত করিতেন, এবং অন্যান্য কয়েকটী দোষের প্রতীকার করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, এই নাটক ভারতভূমিতে অদ্বিতীয় হইত।

উত্তরচরিতের চিত্রদর্শন নামে প্রথমাঙ্ক বঙ্গীয় পাঠকসমীপে বিলক্ষণ পরিচিত, কেননা শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই অঙ্ক অবলম্বন করিয়া, স্বপ্রণীত সীতার বনবাসের প্রথম অধ্যায় লিখিয়াছেন। এই চিত্রদর্শন কবিসুলভকৌশলময়। ইহাতে চিত্রদর্শনোপলক্ষে রামসীতার পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। ইহার উদ্দেশ্য এমত নহে, যে কবি সংক্ষেপে পূর্ব্বঘটনা সকল বর্ণন করেন। রামসীতার অলৌকিক, অসীম, প্রগাঢ় প্রণয় বর্ণন করাই ইহার উদ্দেশ্য। এই প্রণয়ের স্বরূপ অনুভব করিতে না পারিলে, সীতানির্ব্বাসন যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় না। সীতার নির্ব্বাসন সামান্য স্ত্রীবিয়োগ নহে। স্ত্রীবিসর্জ্জনমাত্রই ক্লেশকর—মর্ম্মভেদী। যে কেহ আপন স্ত্রীকে বিসর্জন করে, তাহারই হৃদয়োচ্ছেদ হয়। যে বাল্যকালের ক্রীড়ার সঙ্গিনী, কৈশোরে জীবনসুখের প্রথম শিক্ষাদাত্রী, যৌবনে যে সংসারসৌন্দর্য্যের প্রতিমা, বার্দ্ধক্যে যে জীবনাবলম্বন—ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে? গৃহে যে দাসী, শয়নে যে অপ্সরা; বিপদে যে বন্ধু, রোগে যে বৈদ্য, কার্য্যে যে মন্ত্রী, ব্যসনে যে সখী, বিদ্যায় যে শিষ্য, ধর্ম্মে যে গুরু;—ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসর্জ্জন করিতে পারে? আশ্রমে যে আরাম, প্রবাসে যে চিন্তা,—স্বাস্থ্যে যে সুখ, রোগে যে ঔষধ,—অর্জ্জনে যে লক্ষ্মী, ব্যয়ে যে যশঃ—বিপদে যে বুদ্ধি, সম্পদে যে শোভা—ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসর্জ্জন করিতে পারে? আর যে ভাল বাসে? পত্নী বিসর্জন তাহার পক্ষে কি ভয়ানক দুর্ঘটনা! আবার

* ইদং গুরুভ্যঃ পূর্ব্বেভো নমোবাকং প্রশাস্মহে।
প্রস্তাবনা।

† দূরাহ্বানং বধো যুদ্ধং রাজ্যদেশাদিবিপ্লবঃ।
বিবাহো ভোজনং শাপোৎসর্গৌ মৃত্যুরতস্তথা॥
সাহিত্যদর্পণে।

যে, রামের ন্যায় ভাল বাসে? যে পত্নীর স্পর্শমাত্রে অস্থিরচিত্ত,—জানে না যে,

————————“সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা,
প্রবোধো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু মদঃ।
তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো,
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তি চ॥”*

যাহার পক্ষে,—

“ম্লানস্য জীবকুসুমস্য বিকাশনানি,
সন্তর্পণানি সকলেন্দ্রিয়মোহনানি।
এতানি তানি বচনানি সরোরুহাক্ষ্যাঃ,
কর্ণামৃতানি মনসশ্চ রসায়নানি॥” ‡

যাহার বাহু সীতার চিরকালের উপধান,—

আবিবাহসময়াদ্‌গৃহে বনে,
শৈশবে তদনু যৌবনে পুনঃ।
স্বাপহেতুরনুপাশ্রিতোঽন্যয়া,
রামবাহুরুপধানমেষ তে॥ ” ||

যার পত্নী—

“——গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্ত্তির্নয়নয়োরসাবস্যাঃ স্পর্শো বপুষি বহুলশ্চন্দনরসঃ।
অয়ং কণ্ঠে বাহুঃ শিশিরমসৃণো মৌক্তিকসরঃ*

তাহার কি কষ্ট, কি সর্ব্বনাশ, কি জীবনসর্ব্বস্বধ্বংসাধিক যন্ত্রণা! তৃতীয়াঙ্কে সেই যন্ত্রণার উপযুক্ত চিত্রপ্রণয়নের উদ্যোগেই প্রথমাঙ্কে কবি এই প্রণয় চিত্রিত করিয়াছেন। এই প্রণয় সর্ব্বপ্রফুল্লকর মধ্যাহ্নসূর্য্য—সেই বিরহযন্ত্রণা ইহার ভাবী করালকাদম্বিনী,—যদি সে মেঘের কালিমা অনুভব করিবে, তবে আগে এই সূর্য্যের প্রখরতা দেখ। যদি সেই অনন্ত বিস্তৃত অন্ধকারময় দুঃখসাগরের ভীষণস্বরূপ অনুভব করিবে, তবে এই সুন্দর উপকুল,—প্রাসাদশ্রেণীসমুজ্জ্বল, ফলপুষ্পপরিশোভিতোদ্যানমালামণ্ডিত, এই সর্ব্বসুখময় উপকুল দেখ। এই উপকূলেশ্বরী সীতাকে রামচন্দ্র নিদ্রিতাবস্থায় ঐ অতলস্পর্শী অন্ধকারসাগরে ডুবাইলেন।

আমরা সেই মনোমোহিনী কথার ক্রমশঃ সমালোচনা করিব।

---

* “এক্ষণে আমি সুখভোগ করিতেছি, কি দুঃখ ভোগ করিতেছি; নিদ্রিত আছি, কি জাগরিত আছি; কিম্বা কোন বিষপ্রবাহ দেহে রক্তপ্রবাহের সহিত মিশ্রিত হইয়া, আমার এরূপ অবস্থা ঘটাইয়া দিয়াছে, অথবা মদ (মাদকদ্রব্য সেবন) জনিত মত্ততাবশতঃ এরূপ হইতেছে, ইহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।” নৃসিংহ বাবুর অনুবাদ, ৩০ পৃষ্ঠা।

‡ “কমলনয়নে! তোমার এই বাক্যগুলি, শোকাদিসন্তপ্ত জীবনরূপ কুসুমের বিকাশক, ইন্দ্রিয়গণের মোহন ও সন্তর্পণ স্বরূপ, কর্ণের অমৃত স্বরূপ, এবং মনের গ্লানিপরিহারক (রসায়ন) ঔষধ স্বরূপ।” ঐ ৩১ পৃষ্ঠা।

|| “রামবাহু বিবাহের সময় হইতে, কি গৃহে, কি বনে, সর্ব্বত্রই শৈশবাবস্থায় এবং পরে যৌবনাবস্থাতেও তোমার উপধানের (মাথায় দিবার বালিসের) কার্য্য করিয়াছে।” ঐ—ঐ পৃষ্ঠা।

* “ইনিই আমার গৃহের লক্ষ্মী স্বরূপ, ইনিই আমার নয়নের অমৃত-শলাকাস্বরূপ, ইহাঁরই এই স্পর্শ গাত্রলগ্ন চন্দনরসস্বরূপ সুখপ্রদ, এবং ইহাঁরই এই বাহু আমার কণ্ঠস্থ শীতল এবং কোমল মুক্তাহার স্বরূপ। ঐ—ঐপৃষ্ঠা।

সঙ্গীত।

দ্বিতীয় সংখ্যা।

স্বরের দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ হয়, ইহা সকলেই জানেন, এবং আমরাও বলিয়াছি। উচ্চারণের প্রকরণভেদে, আমরা প্রেম, বাৎসল্য, শোক, সন্তাপ, আহ্লাদ, রাগপ্রভৃতি চিত্তবিকার কণ্ঠ হইতে সহজে প্রকাশ করিয়া থাকি। শব্দের রসব্যক্তি গুনের সম্প্রসারণে গীত। অতএব গীতের দ্বারা প্রেম ও শোকাদির প্রগাঢ় রূপ অভিব্যক্তি অবশ্যই সম্ভব্য। সহজে উচ্চারিত সপ্ত স্বর, সা, রি, গা, মা, পা, ধা, নী, আহ্লাদ বা সুখবাচক; এবং এই সকল সুরের কোমল ও তীব্র শোকবাচক স্বরূপ প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ইউরোপীয়েরা সুরের উক্ত দুই বিভাগই গ্রহণপূর্ব্বক আপনাদিগের "পিয়ানো" "হার্ম্মোনিয়ম্" প্রভৃতি যন্ত্র সকলের, এবং সাধারণতঃ সঙ্গীতপ্রণালীর "মেজর" ও "মাইনর" দুইটি মাত্র শাখা প্রকাশিত করিয়াছেন। বিবেচনা করিলে অবশ্য বলিতে হইবে, যে এ দুই শাখার দ্বারা নানা ভাব প্রকাশিত হইতে পারে। আহ্লাদবাচক শব্দে উৎসাহ, আকাঙ্ক্ষা, সুতরাং প্রেমপ্রভৃতি ভাবও প্রকাশ পায়, এবং শোক বা দুঃখবাচক শব্দে ভক্তি, নৈরাশ, বিরহপ্রভৃতি ব্যক্ত করা যাইতে পারে। বিশেষত এই রূপ বিভাগ সহজসাধ্য।

গীত লিখিত না হইলে তাহার স্থায়িত্ব হয় না। আমরা পদের কথা বলিতেছি না, তাহা সচরাচর লিখিত হইয়াই থাকে। সুরও লিখিত না হইলে, গীতের স্থায়িত্ব হয় না, এবং স্থায়িত্ব না হইলে তাহার সম্যক্ অনুশীলন, ও ক্রমে উৎকর্ষসাধনপক্ষে অনেক বিঘ্ন হয়; বিশেষত বহুমিলনলিপি ব্যতীত সম্ভব নহে। সহজেই ইউরোপে গীত লেখার পরে প্রায় দুইশত বৎসর হইল, বহুমিলন প্রকাশিত হয়। এবং রেমস্ কর্ত্তৃক তাহার বিধি সকল ধার্য্য হইয়াছে।

নির্জ্জনে চক্ষু মুদিয়া ভাব হৃদয়ঙ্গম করা এক ব্যক্তির সাধ্য। কিন্তু এমন অনেক কাজ আছে, যে এক ব্যক্তির দ্বারা তাহা সাধ্য নহে। দুই তিনটি স্বর এক ব্যক্তি দ্বারা এককালে উচ্চারন করা অসাধ্য। সুতরাং বহুমিলনপ্রণালীপক্ষে যন্ত্রই একমাত্র অবলম্বন। তৎপক্ষে, ইউরোপীয় "পিয়ানো" এবং "হার্ম্মোনিয়ম্" চমৎকার পরিপাটী যন্ত্র। দুই বাহু সহজে প্রসারিত করিয়া, যে আয়তন গ্রহন করিতে পারা যায়, তত্তৎ যন্ত্রের আয়তনও তাই। অতএব সুখে সমাসীন হইয়া, দুই হস্তের দশাঙ্গুলি দ্বারা তত্তদ্ যন্ত্র হইতে স্বর সমুদ্ভূত করা যাইতে পারে। আরও, এক একটি সুরের সম্ভবস্থান এক একটি অঙ্গুলিমাত্রপরিমিত। সুতরাং এক এক সুর এক এক অঙ্গুলি দ্বারা বিনা কষ্টে ধ্বনিত হয়। প্রত্যেক যন্ত্রে তিন গ্রাম এবং প্রত্যেক গ্রামে ১২• সুর থাকায়, কাজে কাজেই অনেক ভাবের গীত ঐ ঐ যন্ত্রে সম্পন্ন হইয়া, তাহার বহুমিলনও অল্পায়াসে সাধ্য হয়।

কবিরা আক্ষেপ করেন, যে কমলেও কন্টক আছে। সকল আহ্লাদের বিষয়ে, এবং সকল উন্নতির সূচনায়, কিছু না কিছু অসম্পূর্ণতা থাকে। ইউরোপীয় যন্ত্রেও সেই রূপ। ইউরোপীয় যন্ত্রের স্বরসমুৎপাদিকা শক্তি চমৎকার, সহজেই শিখা যাইতে পারে, এবং বাজাইতেও বড় আরাম। তিন গ্রাম একবারে ধ্বনিত হয় বলিয়া, উহা বহুমিলনেরও আধার। কিন্তু ঐ সকল যন্ত্র অল্প সুরবিশিষ্ট বলিয়া, এ দেশীয় সকল গীত তাহাতে বাদিত হইতে পারে না। ঈশ্বরদত্ত, বিচিত্ররচনারমণীয় আদিযন্ত্র মনুষ্যকণ্ঠের সহিত যেং যন্ত্রের সাদৃশ্য আছে, সেই সকল যন্ত্রেই সকল গীত বাজিতে পারে। মনুষ্যকণ্ঠের সহজ সাত সুর, তাহার কোমল ও তীব্র, এবং সুরাণী সকল গণিলে অভাবতঃ ২৪ টি সুর হয়। শাস্ত্রকারেরা একং সুরের চারি পাঁচ সাতটি স্ত্রী অর্থাৎ সুরাণী এবং সুরাণীদিগেরও পুত্র পৌত্র অবধারিত করিয়াছেন। এপ্রকার কল্পনাপ্রসূত সুর সমুদায় কোন বাঁধা যন্ত্রেরই আয়ত্ত হইতে পারে না। দেশীয় গীতের জন্য হার্ম্মোনিয়ম প্রভৃতি বাঁধা যন্ত্র প্রস্তুত করিতে হইলে, তাহাতে অভাবতঃ ২৪ টি স্বর রাখা উচিত। তাহা হইলে তদ্দ্বারা দেশীয় গীত বাদিত হইবার সম্ভাবনা। ইউরোপীয় যন্ত্রে কেবল ১২ টি মাত্র সুর হয়, অতএব তাহাতে দেশীয় গীতের দশা নারদের ত্রিতন্ত্রীনিঃসৃত ভগ্নাঙ্গ রাগরাগিণীদিগের দশার ন্যায় হইয়া উঠে।*

আমাদের অঙ্গুলি বড় মোটা নহে। প্রত্যেক সুরের স্থান অল্পায়ত করিয়া, তিন গ্রামে ২৪।২৪ টি সুর স্থাপিত করিলে বোধ হয়,দেশীয় গীত ধ্বনিত হইতে পারিবে। যে সকল মহাত্মাগণ সঙ্গীত বিষয়ে এক্ষণে যত্নবান্, তাঁহাদের এই বিষয়ের আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

আমাদের মহাদেবের পিনাক, ভোলা ভূতনাথের আদি যন্ত্র—মোটে, এক ধনুকে এক তার—দুইদিকে দুই লাউ; লাউয়ের গুণেই ধ্বনি। এই ত যন্ত্র,কিন্তু হস্তকৌশলে ইহা হইতে সুরাণী প্রকাশ হইতে পারে, কেন না বাঁধা যন্ত্র নহে,—ইচ্ছানুসারে শব্দ সমুদ্ভূত হয়। এই কারণবশতঃ আমাদের সকল বাদ্যযন্ত্রই হস্তকৌশল দ্বারা, কোমল, তীব্র, সুর, সুরাণী এবং তাহাদের পুত্র পৌত্রাদির প্রকৃতপ্রকাশপূর্ব্বক দেশীয় গীতবাদনের সম্যক রূপে উপযোগী হইয়াছে।

আমাদের বাদ্যযন্ত্র সকল, আমাদের গীতের উপযোগী সত্য বটে, কিন্তু তাহার প্রয়োগ কষ্টসাধ্য। আমাদের অনেক বাদ্যের ধ্বনি উৎকৃষ্ট বলিয়া,কোন মতেই গণ্য হইতে পারে না। আমাদের বাদ্যের মধ্যে কোন যন্ত্রের শব্দই ইউরোপীয় যন্ত্রের শব্দের সমকক্ষ নহে। এ জন্য এ দেশীয় হার্ম্মোনিয়ম্ প্রস্তুত করা আবশ্যক। আমরা ভরসা করি, যাঁহাদের ক্ষমতা আছে, তাঁহারা আমাদের

*কথিত আছে, যে নারদের মনেং বড় স্পর্দ্ধা হইয়াছিল যে, তিনি বড় সঙ্গীত-পটু। দর্পহারী শ্রীকৃষ্ণ একদিন তাঁহাকে দেখাইলেন, যে রাগ রাগিণীগণ ভগ্নহস্তপদাদি হইয়া পড়িয়া আছে। নারদ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাগরাগিণীগণ কহিল যে, "আপনি বাজাইতে জানেন না, আপনিই আমাদিগকে অঙ্গহীন করিয়াছেন।

এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিবেন। তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতের বিশেষ উন্নতি সাধন করা হয়। যেং বিদ্যা কেবল কল্পনাসিদ্ধ, তাহাতে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা সর্ব্বাংশেই অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন; গীতবিদ্যা কল্পনাসিদ্ধ, অতএব পূর্ব্ব পুরুষেরা ইহার অসাধারণ মনোমোহিনী সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। ইহা অদ্যাপি তাঁহাদের কল্পনা, তর্কশক্তি ও পরিশ্রমের পরিচয় দিতেছে। এক মিলন সঙ্গীতের মধ্যে ভারতবর্ষীয় সঙ্গীত অদ্বিতীয় এবং জগৎ পূজ্য। এমন রমনীয় বিদ্যার উন্নতিপক্ষে কোন্ হিন্দু যত্নবান্ না হইবেন, এবং প্রচুর আয়াসসহকারে ইহার উন্নতিসাধন না করিবেন?

অতঃপর রাগ রাগিণী সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। যেমন তেত্রিশটী আদি দেবতা হইতে তেত্রিশকোটি দেবতা হইয়াছেন, সেই রূপ আদিম ছয়রাগ এবং ছত্রিশ রাগিণী হইতে অদ্ভুত কল্পনার প্রভাবে, অসংখ্য উপরাগ উপরাগিণী পুত্র পৌত্রাদি সহিত হিন্দু সঙ্গীতে বিরাজমান হইয়াছে। এ বড় রহস্য। হিন্দুদিগের বুদ্ধি অত্যন্ত কল্পনাকুতূহলিনী। শব্দার্থমাত্রকেই মানব-চরিত্রবিশিষ্ট করিয়া পরিণত করিয়াছে। প্রাকৃতিক বস্তু বা শক্তি মাত্রেরই দেবত্ব। পৃথিবী দেবী; আকাশ, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু সকলেই দেবঃ নদ, নদী, দেব, দেবী। দেব দেবী সকলেই মনুষ্যের ন্যায় রূপবিশিষ্ট; তাঁহাদের সকলেরই স্ত্রী, স্বামী, পুত্র, পৌত্রাদি আছে। তর্ক দ্বারা প্রথম সিদ্ধ হইল, যে এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা এক জন আছেন। তিনি ব্রহ্মা। দেখা যাইতেছে, যে ঘটপটাদির সৃষ্টিকর্ত্তা, সাকার, হস্তপদাদিবিশিষ্ট। সুতরাং ব্রহ্মাও সাকার, হস্তপদাদিবিশিষ্ট, বেশির ভাগ চতুর্ম্মুখ। তবে তাঁহার একটী ব্রহ্মাণীও থাকা চাহি। একটী ব্রহ্মাণীও হইল। ঋষিগণ তাঁহার পুত্র হইলেন। হংস তাঁহার বাহন হইলেন, —নহিলে গতি বিধি হয় কি প্রকারে— ব্রহ্মলোকে গাড়ি পালকির অভাব। কেবল ইহাতেই কল্পনাকারিরা সন্তুষ্ট নহে। মনুষ্যেরা কামক্রোধাদিপরবশ, মহাপাপী। ব্রহ্মাও তাই। তিনি কন্যাহারী।

যেখানে সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভৃতি প্রমেয় পদার্থ; আকাশ, নক্ষত্র, গিরি, নদী প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থ,—অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক ক্রিয়া,—কামাদি মনোবৃত্তি,— এসকল মূর্ত্তিবিশিষ্ট, পুত্র কলত্রাদিযুক্ত, সর্ব্ব বিষয়ে মনুষ্যপ্রকৃতিসম্পন্ন হইলেন, সেখানে স্বরসমষ্টি রাগই বা বাদ পড়ে কেন? সুতরাং তাহারাও সাকার, সংসারী, গৃহী হইল। রাগের সঙ্গেং রাগিণী হইল। কেবল যে এক একটী রাগিণী এমত নহে। রাগেরা কুলীন ব্রাহ্মণ —পলিগেমিষ্ট, এক এক রাগের ছয় ছয় রাগিণী। সঙ্গীতবিদেরা ইহাতেও সন্তুষ্ট নহেন। রাগগুলিকে "বাবু" করিয়া তুলিলেন। তাঁহাদের রাগিণীর উপর উপরাগিণীও হইল। যদি উপরাগিণী হইল, উপরাগ না হয় কেন? তাহাও হইল। তখন রাগ রাগিণী, উপরাগ উপরাগিণী সকলে সুখে ঘরকন্না করিতে লাগিলেন। তাহাদের পুত্র পৌত্রাদি জন্মিল।

কিন্তু এ কেবল রহস্য নহে। এই রহ-

স্যের ভিতর বিশেষ সার আছে। রাগ রাগিণীকে আকারবিশিষ্ট করা, কেবল কল্পনামাত্র নহে। শব্দশক্তি কে না জানে? কোন একটী শব্দবিশেষশ্রবণে মনের একটী বিশেষ ভাব উদয় হইয়া থাকে, ইহা সকলেই জানে। আবার কোন দৃশ্য বস্তু দেখিয়াও, সেই ভাব উদয় হইতে পারে। মনে কর, আমরা কখন কোন পুত্রশোকাতুরা মাতার ক্রন্দনধ্বনি শুনিলাম। মনে কর, এস্থলে আমরা রোদনকারিণীকে দেখিতে পাইতেছি না, কেবল ক্রন্দনধ্বনিই শুনিতে পাইতেছি। সেই ধ্বনি শুনিয়া আমাদিগের মনে শোকের আবির্ভাব হইল। আবার যখন সেই রূপ রোদনানুকারী স্বর শুনিব—আমাদের সেই শোক মনে পড়িবে—সেই রূপ শোকের আবির্ভাব হইবে।

মনে কর, আমরা অন্যত্র দেখিলাম, যে এক পুত্রশোকাতুরা মাতা বসিয়া আছেন। কাঁদিতেছেন না—কিন্তু তাঁহার মুখাবয়ব দেখিয়াই, তাঁহার উৎকট মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করিতে পারিলাম। সেই সন্তাপক্লিষ্ট ম্লান মুখমণ্ডলের আধিব্যক্তি আমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত রহিল। সেই অবধি, যখন আবার সেই রূপ ক্লিষ্ট মুখমণ্ডল দেখিব, তখন আমাদের সেই শোক মনে পড়িবে—হৃদয়ে সেই শোকের আবির্ভাব হইবে।

অতএব সেই ধ্বনি, এবং সেই মুখের ভাব উভয়ই আমাদের মনে শোকের চিহ্নস্বরূপ। সেই ধ্বনিতে সেই শোক মনে পড়ে। মুখকান্তিতেও শোক মনে পড়ে। মানসপ্রকৃতির নিয়মানুসারে ইহার আর একটী চমৎকার ফল জন্মে। শব্দ, এবং মুখকান্তি, উভয়ই শোকের চিহ্ন বলিয়া পরস্পরকে স্মৃতিপথে উদ্দীপ্ত করে। সেইরূপ শব্দ শুনিলেই, সেই রূপ মুখকান্তি মনে পড়ে; সেইরূপ মুখ দেখিলেই,সেই রূপ শব্দ মনে পড়ে। এই রূপ ভূয়োভূয়ঃ উভয়ে একত্র স্মৃতিগত হওয়াতে, উভয়ে উভয়ের প্রতিমা স্বরূপে পরিণত হয়। সেই শোকব্যঞ্জক মুখাবয়বকে সেই শোকসূচক ধ্বনির সাকার প্রতিমা বলিয়া বোধ হয়।

ধ্বনি এবং মূর্ত্তির এই রূপ পরস্পর সম্বন্ধাবলম্বন করিয়াই, প্রাচীনেরা রাগ রাগিণীকে সাকার কল্পনা করিয়া,তাহাদিগের ধ্যান রচনা করিয়াছেন। সেই সকল ধ্যান, প্রাচীন আর্য্যদিগের আশ্চর্য্য কবিত্বশক্তি ও কল্পনাশক্তির পরিচয়স্থল। আমরা পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তি যতই আলোচনা করি, ততই তাঁহাদিগের মহানুভাবিতা দেখিয়া চমৎকৃত হই।

দুই একটী উদাহরণ দিই। অনেকেই টোড়ি রাগিণী শুনিয়াছেন। সহৃদয় ব্যক্তিরা তচ্ছ্রবণে যে একটী অনির্ব্বচনীয় ভাবে অভিভূত হয়েন, তাহা সহজে বক্তব্য নহে। সচরাচর যাহাকে কবিরা "আবেশ" বলিয়া থাকেন, তাহা ঐ ভাবের একাংশ—কিন্তু একাংশমাত্র। তাহার সঙ্গে ভোগাভিলাষ মিলিত কর। সে ভোগাভিলাষ নীচপ্রবৃত্ত নহে। যাহা কিছু নির্ম্মল সুখকর, অন্যজনের অসাপেক্ষ, কেবল আধ্যাত্মিক,সেই ভোগেরই অভিলাষ। কিন্তু সে ভোগাভিলাষের সীমা নাই, তৃপ্তি নাই, রোধ নাই, শাসন

নাই। ভোগে এবং ভোগসুখে অভিলাষ আপনি উছলিয়া উঠিতেছে। আকাঙ্ক্ষা বাড়িতেছে। প্রাচীনেরা এই টোড়ি রাগিণীর মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন, সে পরমসুন্দরী যুবতী, বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা, কিন্তু বিরহিণী। আকাঙ্ক্ষার অনিবৃত্তিহেতুই তাহাকে বিরহিণী কল্পনা করিতে হইয়াছে। এই বিরহিণী সুন্দরী বনবিহারিণী বনমধ্যে নির্জ্জনে একাকিনী বসিয়া, মধুপানে উন্মাদিনী হইয়াছে, বীণা বাজাইয়া গান করিতেছে, তাহার বসন ভূষণ সকল স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, বনহরিণী সকল আসিয়া,তাহার সম্মুখে তটস্থভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

এই চিত্র অনির্ব্বচনীয় সুন্দর—কিন্তু সৌন্দর্য্য ভিন্ন ইহার আর এক চমৎকার গুণ আছে। ইহা টোড়ি রাগিণীর যথার্থ প্রতিমা। টোড়ি রাগিণী শ্রবণে মনে যে ভাবের উদয় হয়, এই প্রতিমা দর্শনে ঠিক সেই ভাব জন্মিবে।

এই রূপ অন্যান্য রাগ রাগিণীর ধ্যান। মুলতানী, দীপক রাগের সহধর্ম্মিণী, দীপকের পার্শ্ববর্ত্তিনী, রক্তবস্ত্রাবৃতা গৌরাঙ্গী সুন্দরী। ভৈরবী শুক্লাম্বরপরিধানা নানালঙ্কারভূষিতা—ইত্যাদি।

এই সকল ধ্যান সম্বন্ধে যে, মতভেদ আছে,তাহার সন্দেহ নাই। যখন বৈজ্ঞানিক বৃত্তান্তেই পণ্ডিতদিগের মতের অনৈক্য, তখন কল্পনামাত্রপ্রসূত ব্যাপারে নানা মুনির নানা মত না হইবে কেন? কেবল চক্ষু মুদিয়া, ভাবিয়া মন হইতে অলঙ্কারের সৃষ্টি করিতে থাকিলে, অলঙ্কারসম্বন্ধে মতভেদ হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? কিন্তু কতকগুলিন শব্দ দ্বারা যে কতকগুলিন ভাবের উদয় হয়, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। তার্কিকেরা বলিতে পারেন, যে কোমল সুরে যদি শোকও বুঝায়, প্রেমও বুঝায়, উন্মাদও বুঝায়, তবে স্বরভেদ দ্বারা একটী ভাবই কি প্রকারে উপলব্ধ হইতে পারে? উত্তর, সে উপলব্ধি কেবল সংস্কারাধীন। আমাদের সঙ্গীতবিদ্যায়. সুরের বাহুল্য এবং প্রভেদ অসীম, কিন্তু কেবল শিক্ষা এবং অভ্যাসেই তাহার তারতম্য উপলব্ধ হইতে পারে। সামান্য অভ্যাসে, বালকেরা সানাই শুনিলে নাচে, হাইলণ্ডরেরা বাগ-পাইপে গা ফুলায়, এবং প্রাচীন হিন্দুরা আগমনী শুনিলে কাঁদেন। এই অভ্যাস বদ্ধমূল এবং সুশিক্ষায় পরিণত হইলে, ভাবসঞ্চয়ের আধিক্য জন্মে, পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ অনুভব করিতে পারা যায়। শিক্ষাহীন মূঢেরা যাহাতে হাসে, ভাবুকেরা তাহাতে কাঁদেন; অতএব লোকের যে সাধারণ সংস্কার আছে, যে সঙ্গীত-সুখানুভব মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ, তাহা ভ্রমাত্মক! কতক দূরমাত্র ইহা সত্য বটে, যে সুস্বর সকলেরই ভাল লাগে—স্বাভাবিক তাল বোধ সকলেরই আছে। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীতের সুখানুভব, শিক্ষা ভিন্ন সম্ভবে না। অভ্যাসশূন্য ব্যক্তি যেমন পলাণ্ডু ভোজনে বিরক্ত, অশিক্ষিত ব্যক্তি তেমনি উৎকৃষ্টতর সঙ্গীতে বিরক্ত। কেননা উভয়ই অভ্যাসাধীন। সংস্কারহীন ব্যক্তি রাগ-রাগিণী পরিপূর্ণ কালোয়াতি গান শুনিতে চাহেন না, এবং বহুমিলনবিশিষ্ট ইউরোপীয় সঙ্গীত বাঙ্গালির কাছে

অরণ্যে রোদন। কিন্তু উভয় স্থানেই, অনাদরটি অসভ্যতার চিহ্ন বলিতে হইবে। যেমন রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি সকল মনুষ্যেরই জানা উচিত, তেমনি শরীরার্থ স্বাস্থ্যকর ব্যায়াম, এবং চিত্তপ্রসাদার্থ মনোমোহিনী সঙ্গীতবিদ্যাও সকল ভদ্রলোকের জানা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে রাজকুমার রাজকুমারীদিগের অভ্যাসোপযোগী বিদ্যার মধ্যে সঙ্গীত প্রধান স্থান পাইয়াছে। বাঙ্গালির মধ্যে ভদ্র পৌরকন্যাদিগের সঙ্গীত শিক্ষা যে নিষিদ্ধ বা নিন্দনীয়,তাহা আমাদিগের অসভ্যতার চিহ্ন। কুলকামিনীরা সঙ্গীতনিপুণা হইলে, গৃহমধ্যে এক অত্যন্ত বিমলানন্দের আকর স্থাপিত হয়। বাবুদের মদ্যাসক্তি এবং বেশ্যাসক্তি অনেক অপনীত হইতে পারে। এতদ্দেশে নির্ম্মল আনন্দের অভাবই অনেকের মদ্যাসক্তির কারণ—সঙ্গীতপ্রিয়তা হইতেই অনেকের লাম্পট্য জন্মে।

রাগ রাগিণী মূর্ত্তিবিশিষ্ট কি প্রকারে হইল, তাহা বলিলাম, এক্ষণে তাহাদিগের পরিবারবৃদ্ধি কি প্রকারে হইল, তাহা বলি। ইহার কারণ প্রাচীন রাগে নূতন স্বরসংযোগ। গোপাল নায়ক, তান সেন, ব্রজ বাওরা প্রভৃতি ব্যুৎপন্ন মহাশয়েরা ও সঙ্গীতকুশল রাজগণ ও হিন্দু মুসলমান জাতীয় অন্যান্য গায়কগণ ঐরূপ নূতন স্বরসংযোজনা দ্বারা নূতন রাগিণীর উৎপত্তি করিয়া, সঙ্গীতবিদ্যা অধিকতর সৌন্দর্য্যসম্পন্না করিয়াছেন। যথা কামদ হইতে মিঞা* কামদ, মহ্লার হইতে মিঞা মহ্লার, কানড়া হইতে দরবারি কানড়া, ভৈরবী হইতে পিলু,কাফি ইত্যাদি। টোড়ি ও কানড়ার যে কত রূপান্তর হইয়াছে, তাহা বলা যায় না।

রাগ রাগিণীর রূপসংস্করণে শাস্ত্রকারদিগের যেমত কল্পনাশক্তির চাতুর্য্য সপ্রমাণ হইয়াছে,সেই প্রকার রাগ রাগিণীর মিশ্র লক্ষণ নিরূপণ দ্বারা তাঁহাদিগের তদ্রূপ বিচারক্ষমতার, এবং যত্ন ও পরিশ্রমের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা উদাহরণ দেখিলেই অনুভব করিতে পারিবেন। যথা,

বারোঁয়া——মুলতানী এবং ভৈরবীযোগে উৎপন্ন।

বাহার——পরজ ও সুহিনীর যোগে উৎপন্ন।

বাগশ্রী——ইমন কানড়া এবং বিলাওলের যোগে উৎপন্ন।

দরবারি কানড়া——কানড়া এবং মহ্লার হইতে উৎপন্ন।

ইত্যাদি।

অনেক রাগ রাগিণী কেবল এক অথবা দুইমাত্র স্বরভেদে নূতন রূপ ধারণ করে। যথা ভীমপলাশী কেবল এক কোমল সংযোগে মুলতানী হইয়াছে।

* তান সেন মুসলমান হইলে তাহার মিঞা উপাধি হইয়াছিল।

বিষবৃক্ষ।

উপন্যাস।

নবমপরিচ্ছেদ।

হরিদাসী বৈষ্ণবী।

বিধবা কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রের গৃহে কিছু দিন কালাতিপাত করিল। একদিন মধ্যাহ্নের পর পৌরস্ত্রীরা, সকলে মিলিত হইয়া পুরাতন অন্তঃপুরে বসিয়াছিল। ঈশ্বরকৃপায় তাঁহারা অনেকগুলি, সকলে স্বং মনোমত গ্রাম্যস্ত্রীসুলভ কার্য্যে ব্যাপৃতা ছিল। তাহাদের মধ্যে, অনতীত বাল্যা কুমারী হইতে পলিতকেশা-বর্ষীয়সী পর্য্যন্ত, সকলেই ছিলেন। কেহ চুল বাঁধাইতেছিল. কেহ চুল বাঁধিয়া দিতেছিল, কেহ মাতা দেখাইতেছিল, কেহ মাতা দেখিতেছিল, এবং "উঁ উঁ" করিয়া উকুন মারিতেছিল। কেহ পাকা চুল তোলাইতেছিল, কেহ ধান্য হস্তে তাহা তুলিতেছিল। কোন সুন্দরী স্বীয় বালকের জন্য বিচিত্র কাঁথা শিয়াইতেছিলেন; কেহ বালককে স্তন্যপান করাইতেছিলেন। কোন সুন্দরী, চুলের দড়ি বিনাইতেছিলেন, কেহ ছেলে ঠেঙ্গাইতেছিলেন; ছেলে মুখব্যাদান করিয়া কোমল তীয়র উভয়বিধি স্বরে রোদন করিতেছিল। কোন রূপসী কারপেট বুনিতেছিলেন, কেহ থাবা পাতিয়া তাহা দেখিতেছিলেন। কোন চিত্রকুশলা কাহারও বিবাহের কথা মনে করিয়া পিঁড়ীতে আলেপনা দিতেছিলেন, কোন সদ্গ্রন্থরসগ্রাহিণী বিদ্যাবতী দাস্তরায়ের পাঁচালি পড়িতেছিলেন। কোন বর্ষীয়সী পুত্রের নিন্দা করিয়া শ্রোত্রী বর্গের কর্ণপরিতৃপ্ত করিতেছিলেন, কোন রসিকা যুবতী অর্দ্ধস্ফুটস্বরে স্বামির রস কৌশলের বিবরণ সখিদিগের কানেং বলিয়া বিরহিণীর মনোবেদনা বাড়াইতেছিলেন। কেহ গৃহিণীর নিন্দা, কেহ কর্ত্তার নিন্দা, কেহ প্রতিবাসীদিগের নিন্দা, করিতেছিলেন; অনেকেই আত্মপ্রশংসা করিতেছিল। যিনি সূর্য্যমুখীকর্ত্তৃক প্রাতে নিজ বুদ্ধিহীনতার জন্য মৃদুভৎসিতা হইয়াছিলেন, তিনি আপনার বুদ্ধির অসাধারণ প্রাখর্য্যের অনেক উদাহরণ প্রযোগ করিতেছিলেন; যাঁহার রন্ধনে প্রায় লবণ সমান হয় না, তিনি আপনার পাকনৈপুণ্য সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিতেছিলেন। যাঁহার স্বামী গ্রামের মধ্যে গণ্ডমুর্খ, তিনি সেই স্বামির অলৌকিক পাণ্ডিত্য কীর্ত্তন করিয়া সঙ্গিনীকে বিস্মিতা করিতেছিলেন। যাঁহার পুত্রকন্যাগুলি এক একটি কৃষ্ণবর্ণ মাংসপিণ্ড, তিনি রত্নগর্ভা বলিয়া আস্ফালন করিতেছিলেন। সূর্য্যমুখী এ সভায় ছিলেন না। তিনি কিছু গর্ব্বিতা; এ সকল সম্প্রদায়ে বড় বসিতেন না এবং তিনি থাকিলে অন্য সকলের আমোদের বিঘ্ন হইত। সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত; তাঁহার নিকট মন খুলিয়া সকল কথা চলিত না। কিন্তু কুন্দনন্দিনী এক্ষণে এই সম্প্রদায়েই থাকিত; এখনও ছিল। সে একটি বালককে তাহার মাতার অনু-

রোধে ক, খ, শিখাইতেছিল। কুন্দ বলিয়া দিতেছিল, তাহার ছাত্র অন্য বালকের করস্থ সন্দেশের প্রতি হাঁ করিয়া চাহিয়াছিল; সুতরাং তাহার বিশেষ বিদ্যালাভ হইতেছিল।

এমত সময়ে সেই নারীসভামণ্ডলে "জয় রাধে" বলিয়া এক বৈষ্ণবী আসিয়া দাঁড়াইল।

নগেন্দ্রের ঠাকুরবাড়ীতে নিত্য অতিথি সেবা হইত, এবং তদ্ব্যতীত সেই খানেই প্রতি রবিবারে তণ্ডুলাদি বিতরণ হইত। ইহা ভিন্ন ভিক্ষার্থ বৈষ্ণবী কি কেহ অন্তঃপুরে আসিতে পাইত না। এই জন্য অন্তঃপুর মধ্যে "জয় রাধে" শুনিয়া একজন পুরবাসিনী বলিতেছিল, "কে রে মাগী বাড়ির ভিতর? ঠাকুর বাড়ী যা।" কিন্তু এই কথা বলিতেং সে মুখ ফিরাইয়া বৈষ্ণবীকে দেখিয়া কথা আর সমাপ্ত করিল না। তৎপরিবর্ত্তে বলিল, "ওমা! এ আবার কোন্ বৈষ্ণমী গো?"

সকলেই বিস্মিত হইয়া দেখিল, যে বৈষ্ণবী যুবতী; তাহার শরীরে তাহার রূপ ধরে না। সেই বহুসুন্দরীশোভিত-রমণীমণ্ডলেও, কুন্দনন্দিনী ব্যতীত তাহা হইতে সমধিক রূপবতী কেহই নহে, তাহার স্ফুরিত বিম্বাধর, সুগঠিত নাসা, বিস্ফারিত ফুল্লেন্দীবরতুল্য চক্ষু, চিত্রেরেখাবৎ ভ্রূযুক্ত নিটোল ললাট, বাহুযুগের মৃণালবৎ গঠন, এবং চম্পকদামবৎ বর্ণ, রমণীকুলদুর্ল্লভ। কিন্তু সেখানে যদি কেহ সৌন্দর্য্যের সদ্বিচারক থাকিত, তবে সে বলিত যে, বৈষ্ণবীর গঠনে কিছু লালিত্যের অভাব। চলন, ফেরন, এসকলও পৌরুষ।

বৈষ্ণবীর নাকে রসকলি, মাতায় পেটে পাড়া পরণে কালাপেড়ে সিমালার ধুতি, হাতে একটি খঞ্জনী। হাতে পিতলের বালা, এবং তাহার উপরে জলতরঙ্গ চুড়ি।

স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে একজন বয়োজ্যেষ্ঠা কহিল, "হাঁ গা, তুমি কে গা?"

বৈষ্ণবী কহিল, "আমার নাম হরিদাসী বৈষ্ণবী। মা ঠাকুরাণীরা গান শুনবে?"

তখন "শুনবো গো শুনবো!" এই ধ্বনি চারিদিকে আবালবৃদ্ধার কণ্ঠ হইতে বাহির হইতে লাগিল। তবে খঞ্জনী হাতে বৈষ্ণবী উঠিয়া গিয়া ঠাকুরাণীদিগের কাছে বসিল। সে যেখানে বসিল, সেই খানে কুন্দ ছেলে পড়াইতেছিল। কুন্দ অত্যন্ত গীতপ্রিয়, বৈষ্ণবী গান করিবে শুনিয়া, সে তাহার আর একটু সন্নিকটে আসিল। তাহার ছাত্র সেই অবকাশে উঠিয়া গিয়া সন্দেশভোজী বালকের হাত হইতে সন্দেশ কাড়িয়া লইয়া আপনি ভক্ষণ করিল।

বৈষ্ণবী জিজ্ঞাসা করিল "কি গায়িব?" তখন শ্রোত্রীগণ নানাবিধ ফরমায়েস আরম্ভ করিলেন। কেহ চাহিলেন "গোবিন্দ অধিকারী"—কেহ "গোপালে উড়ে।" যিনি দাশরথির পাঁচালি পড়িতেছিল, তিনি তাহারই কামনা করিলেন। দুই এক জন প্রাচীনা কৃষ্ণবিষয় হুকুম করিলেন। তাহারই টীকা করিতে গিয়া মধ্যবয়সীরা "সখীসম্বাদ" এবং "বিরহ" বলিয়া মতভেদ প্রচার করিলেন। কেহ চাহিলেন "গোষ্ঠ"—কোন লজ্জাহীনা যুবতী বলিল, "নিধুরটপ্পা

গায়িতে হয় ত গাও—নহিলে শুনিব না।" একটি অস্ফুটবাচা বালিকা বৈষ্ণবীকে শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে গাইয়া দিল, "তোলা দাস্‌নে দাস্‌নে, দাস্‌নে দূতী।"

বৈষ্ণবী সকলের হুকুম শুনিয়া কুন্দের প্রতি বিদ্যুদ্দামতুল্য এক কটাক্ষ করিয়া কহিল, "হাঁ গা—তুমি কিছু ফরমাশ করিলেনা?" কুন্দ তখন লজ্জাবনতমুখী হইয়া অল্প একটু হাসিল, কিছু উত্তর করিল না। কিন্তু তখনই একজন বয়স্যার কাণেং কহিল, "কীর্ত্তন গায়িতে বল না?"

বয়স্যা তখন কহিল "ওগো কুন্দ কীর্ত্তন করিতে বলিতেছে গো?" তাহা শুনিয়া বৈষ্ণবী কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিল। সকলের কথা টালিয়া বৈষ্ণবী তাহার কথা রাখিল দেখিয়া কুন্দ বড় লজ্জিতা হইল।

হরিদাসী বৈষ্ণবী প্রথমে খঞ্জনীতে দুই একবার মৃদুং যেন ক্রীড়াচ্ছলে অঙ্গুলি প্রহার করিল। পরে আপন কণ্ঠ মধ্যে অতি মৃদুং নববসন্তপ্রেরিতা একা ভ্রমরীর গুঞ্জনবৎ স্বরের আলাপ করিতে লাগিল—যেন লজ্জাশীলা বালিকা স্বামির নিকট প্রথম প্রেমব্যক্তি জন্য মুখ ফুটাইতেছে। পরে অকস্মাৎ সেই ক্ষুদ্রপ্রাণ খঞ্জনী হইতে বাদ্যবিদ্যাবিশারদের অঙ্গুলিজনিত শব্দের ন্যায় মেঘগম্ভীর শব্দ বাহির হইল এবং তৎ সঙ্গে, শ্রোত্রীদিগের শরীর কণ্টকিত করিয়া, অপ্সরানিন্দিত কণ্ঠগীতিধ্বনি সমুত্থিত হইল। তখন রমণীমণ্ডল বিস্মিত, বিমোহিতচিত্তে শুনিল যে সেই বৈষ্ণবীর অতুলিত কণ্ঠ, অট্টালিকা পরিপূর্ণ করিয়া আকাশ মার্গে উঠিল। মূঢ়া পৌরস্ত্রীগণ সেই গানের পারিপাট্য কি বুঝিবে? বোদ্ধা থাকিলে বুঝিত যে এই সর্ব্বাঙ্গীনতাললয়স্বরপরিশুদ্ধ গান, কেবল সুকণ্ঠের কার্য্য নহে। বৈষ্ণবী যেই হউক, সে সঙ্গীত বিদ্যায় অসাধারণ সুশিক্ষিত, এবং অল্পবয়সে তাহার পারদর্শী।

বৈষ্ণবী গীত সমাপন করিলে, পৌরস্ত্রীগণ তাহাকে গায়িবার জন্য পুনশ্চ অনুরোধ করিল। তখন হরিদাসী সতৃষ্ণবিলোলনেত্রে কুন্দনন্দিনীর মুখপানে চাহিয়া পুনশ্চ কীর্ত্তন আরম্ভ করিল।

দেখ্‌বো বলো হে,—শ্রীমুখ পঙ্কজ—
তাই এসেছিলাম এ গোকুলে।
আমায় স্থান দিও রাই চরণতলে॥
মানের দায়ে তুই মানিনী।
তাই সেজেছি বিদেশিনী॥
এখন বাঁচাও রাধে কথা কোয়ে!
ঘরে যাই হে চরণ ছুঁয়ে॥
দেখ্‌বো তোমায় নয়ন ভোরে।
তাই বাজাই বাঁশী ঘরে ঘরে॥
যখন রাধে বোলে বাজে বাঁশী।
তখন নয়ন জলে, আপনি ভাসি॥
তুমি যদি না চাও ফিরে,
তবে যাব সেই যমুনা তীরে,
ভাঙ্গব বাঁশী তেজ্‌বো প্রাণ,
এই বেলা তোর ভাঙ্গুক মান,
ব্রজের সুখ রাই দিয়ে জলে,
বিকায়িনু পদতলে,
এখন চরণ নুপুর বেঁধেগলে,
পশিব যমুনা জলে॥

গীত সমাপ্ত হইলে, বৈষ্ণবী কুন্দনন্দিনীর মুখ চাহিয়া বলিল, "গান গাইয়া

আমার মুখ শুকাইতেছে। আমায় একটু জল দাও।"

কুন্দ পাত্রে করিয়া জল আনিল। বৈষ্ণবী কহিল, "তোমাদিগের পাত্র আমি ছুঁইব না। আমার হাতে তুলিয়া দাও আসিয়া, আমি জাত বৈষ্ণব নহি।"

ইহাতে বুঝাইল, বৈষ্ণবী পুর্ব্বে কোন অপবিত্রজাতীয়া ছিল, এক্ষণে বৈষ্ণব হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া, কুন্দ তাহার পশ্চাৎ২ জল ফেলিবার যে স্থান, সেই খানে গেল। যেখানে অন্য স্ত্রীলোকেরা বসিয়া রহিল, সেখান হইতে ঐ স্থান এরূপ ব্যবধান যে, তথায় মৃদুং কথা কহিলে কেহ শুনিতে পায় না। সেই স্থানে গিয়া, কুন্দ বৈষ্ণবীর হাতে জল ঢালিয়া দিতে লাগিল, বৈষ্ণবী হাত মুখ ধুয়িতে লাগিল। ধুয়িতে মৃদুং, অন্যের অশ্রাব্যস্বরে বৈষ্ণবী বলিতে লাগিল,

"তুমি নাকি গা কুন্দ?"

কুন্দ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন গা?"

বৈ। "তোমার শাশুড়ীকে কখন দেখিয়াছ?

কু। "না।" কুন্দ শুনিয়াছিল যে তাহার শাশুড়ী ভ্রষ্টা হইয়া দেশত্যাগিণী হইয়াছিল।

বৈ। "তোমার শাশুড়ী এখানে আসিয়াছেন। তিনি আমার বাড়ীতে আছেন, তোমাকে একবার দেখ্‌বার জন্য বড়ই কাঁদ্‌তেছেন—আহা! হাজার হোক শাশুড়ী। সে ত আর এখানে আসিয়া তোমাদের গিন্নির কাছে সে পোড়ার মুখ দেখাতে পারবেনা—তা তুমি একবার কেন আমার সঙ্গে গিয়া তাকে দেখা দিয়ে এস না?"

কুন্দ সরলা হইলেও, বুঝিল যে, সে শাশুড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ স্বীকারই অকর্ত্তব্য। অতএব বৈষ্ণবীর কথায় কেবল ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিল।

কিন্তু বৈষ্ণবী ছাড়ে না—পুনঃ২ উত্তেজনা করিতে লাগিল। তখন কুন্দ কহিল "আমি গিন্নীকে না বলিয়া যাইতে পারিব না।"

হরিদাসী মানা করিল। বলিল, "গিন্নীকে বলিও না। যাইতে দিবে না। হয়ত তোমার শ্বাশুড়ীকে আনিতে পাঠাইবে। তাহা হইলে তোমার শ্বাশুড়ী দেশ ছাড়া হইয়া পলাইবে।"

বৈষ্ণবী যতই দাঢ্য প্রকাশ করুক, কুন্দ কিছুতেই সুর্য্যমুখীর অনুমতি ব্যতীত যাইতে সম্মত হইল না। তখন অগত্যা হরিদাসী বলিল,

"আচ্ছা তবে তুমি গিন্নীকে ভাল করিয়া বলিয়া রেখ। আমি আর একদিন আসিয়া লইয়া যাইব; কিন্তু দেখো, ভাল করিয়া বলো; আর একটু কাঁদা কাটা করিও, নহিলে হইবে না।"

কুন্দ ইহাও স্বীকৃত হইল না, কিন্তু বৈষ্ণবীকে হাঁ কি না কিছু বলিল না। তখন হরিদাসী হস্তমুখপ্রক্ষালন সমাপ্ত করিয়া অন্য সকলের কাছে ফিরিয়া আসিয়া পুরস্কার চাহিল। এমত সময়ে সেই খানে সুর্য্যমুখী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বাজে কথা একেবারে বন্ধ হইল, অল্প বয়স্কারা সকলেই একটা২ কাজ লইয়া বসিল।

সুর্য্যমুখী হরিদাসীকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "তুমি কে

গা ?" তখন নগেন্দ্রের এক মামী কহিল, "ও এক জন বৈষ্ণবী গান গায়িতে এসেছে। গান যে সুন্দর গায়! এমন গান কখন শুনিনে মা। তুমি একটি শুনিবে? গা ত গা হরিদাসী! একটি ঠাকুরাণ বিষয় গা।"

হরিদাসী এক অপূর্ব্ব শ্যামাবিষয় গায়িলে সূর্য্যমুখী তাহাতে মোহিতা ও প্রীতা হইয়া বৈষ্ণবীকে পুরস্কার পূর্ব্বক বিদায় করিলেন।

বৈষ্ণবী প্রণাম করিয়া এবং কুন্দের প্রতি আর একবার দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বিদায় হইল। সূর্য্যমুখীর চক্ষের আড়ালে গেলেই সে খঞ্জনীতে মৃদুং খেমটা বাজাইয়া মৃদুং গায়িতেং গেল,

"আয় রে চাঁদের কোণা।
তোরে খেতে দিব ফুলের মধু, পরতে দিব সোনা।
আতর দিব সিসি ভোরে,
গোলাপ দিব কার্ব্বা কোরে,
আর আপনি সেজে বাটা ভরে, দিব পানের দোনা।

বৈষ্ণবী গেলে স্ত্রীলোকেরা অনেকক্ষণ কেবল বৈষ্ণবীর প্রসঙ্গ লইয়াই রহিল। প্রথমে তাহার বড় সুখ্যাতি আরম্ভ হইল। পরে ক্রমেং একটুং খুঁত বাহির হইতে লাগিল। বিরাজ বলিল, "তা, হোক সুন্দর, কিন্তু নাকটা একটু চাপা।" তখন বামা বলিল, "রঙ্গ টা বাপু বড় ফেকাসে।" তখন চন্দ্রমুখী বলিল "চুল গুলো যেন শোনের দড়ি।" তখন চাঁপা বলিল, "কপাল টা একটু উচু"—কমলা বলিল, ঠোঁট দুখানা পুরু" হারাণী বলিল, "গড়ন টা বড় কাট কাট।" প্রমদা বলিল "মাগির বুকের কাছটা যেন যাত্রার সখিদের মত; দেখে ঘৃণা করে।" এই রূপে সুন্দরী বৈষ্ণবী শীঘ্রই অদ্বিতীয়া কুৎসিতা বলিয়া প্রতিপন্না হইল। তখন ললিতা বলিল, "তা দেখিতে যেমন হউক, মাগি গায় ভাল।" তাহাতেও নিস্তার নাই। চন্দ্রমুখী বলিল, "তাই বা কি, মাগির গলা মোটা।" মুক্তকেশী বলিল "ঠিক বলেছ—মাগি যেন যাঁড় ডাকে।" অনঙ্গ বলিল, "মাগী গান জানে না, একটাও দাসুরায়ের গান গায়িতে পারিল না।" কনক বলিল, "মাগির তাল বোধ নাই।" ক্রমে প্রতিপন্ন হইল যে, হরিদাসী বৈষ্ণবী কেবল যে যারপর নাই কুৎসিত এমত নহে—তাহার গানও যারপর নাই মন্দ।

দশম পরিচ্ছেদ।

বাবু।

হরিদাসী বৈষ্ণবী দত্তদিগের গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেবীপুরের দিগে গেল। দেবীপুরে বিচিত্র লৌহ রেইল পরিবেষ্টিত এক পুষ্পোদ্যান আছে। তন্মধ্যে নানাবিধ ফল পুষ্পের বৃক্ষ, মধ্যে পুষ্করিণী, তাহার উপরে বৈঠক খানা। হরিদাসী সেই পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিল। এবং বৈঠক খানায় প্রবেশ করিয়া এক নিভৃত কক্ষে গিয়া বেশ পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইল। অকস্মাৎ সেই নিবিড় কেশদামরচিত কবরী মস্তকচ্যুত হইয়া পড়িল, সে ত পরচুলা মাত্র। বক্ষঃহইতে স্তনযুগল খসিল—সে বস্ত্রনির্ম্মিত। বৈষ্ণবী পিতলের বালা ও জলতরঙ্গ চুড়ি খুলিয়া ফেলিল—রসকলি ধুয়িল; তখন উপযুক্ত পরিচ্ছদ পরিধানান্তর, বৈষ্ণ-

বীর স্ত্রীবেশ ঘুচিয়া, এক অপূর্ব্ব সুন্দর যুবা পুরুষ দাঁড়াইল। যুবার বয়স পঞ্চবিংশতি বৎসর, কিন্তু ভাগ্যক্রমে মুখমণ্ডলে রোমাবলীর চিহ্নমাত্র ছিল না। মুখ এবং গঠন কিশোর বয়স্কর ন্যায়। কান্তি পরম সুন্দর। এই যুবা পুরুষ দেবেন্দ্র বাবু। পূর্ব্বেই তাঁহার কিছু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

দেবেন্দ্র এবং নগেন্দ্র উভয়েই এক বংশ সম্ভূত; কিন্তু বংশের উভয় শাখার মধ্যে পুরুষানুক্রমে বিবাদ চলিতেছে। এমন কি দেবীপুরের বাবুদিগের সঙ্গে গোবিন্দপুরের বাবুদিগের মুখের আলাপ পর্য্যন্ত ছিল না। পুরুষানুক্রমে দুই শাখায় মোকদ্দমা চলিতেছিল। শেষে এক বড় মোকদ্দমায় নগেন্দ্রের পিতামহ দেবেন্দ্রের পিতামহকে পরাজিত করায়, দেবীপুরের বাবুরা একেবারে হীনবল হইয়া পড়িলেন। ডিক্রীজারিতে তাঁহাদের সর্ব্বস্ব গেল—গোবিন্দপুরের বাবুরা তাঁহার তালুক সকল কিনিয়া লইলেন। সেই অবধি দেবীপুর হ্রস্বতেজা, গোবিন্দপুর বর্দ্ধিতশ্রী হইতে লাগিল। উভয় বংশে আর কখনও মিল হইল না। দেবেন্দ্রের পিতা, ক্ষুণ্ণধনগৌরব পুনর্ব্বর্দ্ধিত করিবার জন্য এক উপায় করিলেন। গণেশ বাবু নামে আর একজন জমিদার, হরিপুর জেলার মধ্যে বাস করিতেন। তাঁহার একমাত্র অপত্য হৈমবতী। দেবেন্দ্রের সঙ্গে ঐ হৈমবতীর বিবাহ দিলেন। হৈমবতীর অনেক গুণ—সে কুরূপা, মুখরা, অপ্রিয়বাদিনী, আত্মপরায়ণা। যখন দেবেন্দ্রের সহিত তাহার বিবাহ হইল, তখন পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক। লেখা পড়ায় তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল এবং প্রকৃতিও সুধীর ও সত্যনিষ্ঠ ছিল। কিন্তু সেই পরিণয় তাঁহার কাল হইল। যখন দেবেন্দ্র উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তখন দেখিলেন যে ভার্য্যার গুণে গৃহে তাঁহার কোন সুখেরই আশা নাই। বয়স গুণে তাঁহার রূপতৃষ্ণা জন্মিল, কিন্তু আত্মগৃহে তাহা ত নিবারণ হইল না। বয়স গুণে দম্পতী প্রণয়াকাঙ্ক্ষা জন্মিল—কিন্তু অপ্রিয়বাদিনী, আত্মপরায়ণা হৈমবতীকে দেখিবামাত্র সে আকাঙ্ক্ষা দূর হইত। সুখ দূরে থাকুক—দেবেন্দ্র দেখিলেন, যে হৈমবতীর রসনাবর্ষিত বিষের জ্বালায়, গৃহে তিষ্ঠানও ভার। একদিন হৈমবতী দেবেন্দ্রকে এক কদর্য্য কটুবাক্য কহিল; দেবেন্দ্র অনেক সহিয়াছিল—আর সহিল না। হৈমবতীর কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাকে পদাঘাত করিল। এবং সেই দিন হইতে গৃহত্যাগ করিয়া পুষ্পোদ্যান মধ্যে তাঁহার বাসোপযোগী গৃহ প্রস্তুতের অনুমতি দিয়া, কলিকাতায় গেল। ইতিপূর্ব্বেই দেবেন্দ্রের পিতার পরলোক হইয়াছিল। সুতরাং দেবেন্দ্র এক্ষণে স্বাধীন। কলিকাতায় পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া, দেবেন্দ্র অতৃপ্তবিলাসতৃষ্ণা নিবারণে প্রবৃত্ত হইল। তজ্জনিত যে কিছু স্বচিত্তের অপ্রসাদ জন্মিত, তাহা ভূরি২ সুরাভিষিঞ্চনে ধৌত করিতে যত্ন করিতে লাগিল। পরিশেষে তাহার আর আবশ্যকতা রহিলনা—পাপেই চিত্তের প্রসাদ জন্মিতে লাগিল কিছুকাল পরে বাবুগিরিতে বিলক্ষণ সুশিক্ষিত হইয়া দেবেন্দ্র দেশে ফিরিয়া আসিল, এবং ত-

থায় নূতন উপবন গৃহে আপন আবাস সংস্থাপন করিয়া বাবুগিরিতে প্রবৃত্ত হইল।

কলিকাতা হইতে দেবেন্দ্র অনেক প্রকার ঢং শিখিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি দেবীপুরে প্রত্যাগমন করিয়া রিফরমর বলিয়া আত্মপরিচয় দিলেন। প্রথমেই এক ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত করিলেন। তারাচরণ প্রভৃতি অনেক ব্রাহ্ম জুটিল; বক্তৃতার আর সীমা রহিল না। একটা ফিমেল স্কুলের জন্যও মধ্যে২ আড়ম্বর করিতে লাগিলেন, কিন্তু কাজে বড় বেশী করিতে পারিলেন না। বিধবা বিবাহে বড় উৎসাহ। এমন কি দুই চারি টা কাওরা তিওরের বিধবা মেয়ের বিবাহ দিয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু সে বরকন্যার গুণে। জেনানা রূপ কারাগারের শিকল ভাঙ্গার বিষয় তারাচরণের সঙ্গে তাঁহার এক মত—উভয়েই বলিতেন মেয়েদের বাহির কর। এ বিষয়ে দেবেন্দ্র বাবু বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন—কিন্তু সে বাহির করার অর্থ বিশেষে।

দেবেন্দ্র গোবিন্দপুর হইতে প্রত্যাগমনের পর, বৈষ্ণবী বেশ ত্যাগ করিয়া, নিজমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক পাশের কামরায় আসিয়া বসিলেন।—একজন ভৃত্য শ্রমহারী তামাকু প্রস্তুত করিয়া আলবলা আনিয়া সম্মুখে দিল, দেবেন্দ্র কিছুকাল সেই সর্ব্বশ্রমসংহারিণী তামাকু দেবীর সেবা করিলেন। যে এই মহাদেবীর প্রসাদ সুখ ভোগ না করিয়াছে, সে মনুষ্যই নহে। হে সর্ব্বলোকচিত্তরঞ্জিনি বিশ্ববিমোহিনি! তোমাতে যেন আমাদের ভক্তি অচলা থাকে। তোমার বাহন আলবলা, হুঁকা, গুড়গুড়ি প্রভৃতি দেবকন্যারা সর্ব্বদা যেন আমাদের নয়নপথে বিরাজ করেন, দৃষ্টিমাত্রেই মোক্ষলাভ করিব। হে হুঁক্কে! হে আলবলে! হে কুণ্ডলাকৃতধূমরাশিসমুদ্গারিণি! হে ফণিনীনিন্দিতদীর্ঘনলসংসর্পিণি! হে রজতকিরীটমণ্ডিতশিরোদশস্থশোভিনি! কিবা তোমার কিরীটবিভ্রস্ত ঝালর ঝলমলায়মানা! কিবা শৃঙ্খলাঙ্গুরীয় সম্ভূষিতবঙ্কাগ্রভাগ মুখনলের শোভা! কিবা তোমার গর্ভস্থ শীতলাম্বুরাশির গভীর নিনাদ! হে বিশ্বরমে! তুমি বিশ্বজনশ্রমহারিণী, অলসজন প্রতিপালিনী, ভার্য্যাভৎর্সিত জনের চিত্ত বিকারবিনাশিনী,—প্রভুভীত জনের সাহস প্রদায়িনী। মূঢ়ে তোমার মহিমা কি জানিবে! তুমি শোকপ্রাপ্ত জনকে প্রবোধ দাও, ভয়প্রাপ্ত জনকে ভরসা দাও, বুদ্ধি ভ্রষ্ট জনকে বুদ্ধি দাও, কোপযুক্ত জনকে শান্তি প্রদান কর। হে বরদে! হে সর্ব্বসুখ প্রদায়িনি! তুমি যেন আমার ঘরে অক্ষয় হইয়া বিরাজ কর! তোমার সুগন্ধ দিনে২ বাড়ুক! তোমার গর্ভস্থ জলকল্লোলে মেঘ গর্জ্জনবৎ ধ্বনিত হইতে থাকুক! তোমার মুখনলের সহিত আমার অধরৌষ্ঠের যেন তিলেক বিচ্ছেদ না হয়।

ভোগাসক্ত দেবেন্দ্র যথেচ্ছা এই মহাদেবীর প্রসাদ ভোগ করিলেন—কিন্তু তাহাতে পরিতৃপ্তি জন্মিল না। পরে অন্যা মহাশক্তির অর্চ্চনার উদ্যোগ হইল। তখন ভৃত্যহস্তে, তৃণপটাবৃতা বোতল-বাহিনীর আবির্ভাব হইল। তখন সেই অমল শ্বেত সুবিস্তৃত শয্যার উ-

পরে, রজতাসুকৃতাসনে সান্ধ্যাগগণশোভি রক্তাম্বুদ তুল্য বর্ণবিশিষ্টা দ্রবময়ী মহাদেবী, ডেকান্টর নামে আম্বরিক ঘটে সংস্থাপিতা হইলেন। কট্ গ্লাসের কোষা পড়িল; প্লোটেড্ জগ্ তাম্রকুণ্ড হইল; এবং পাকশালা হইতে এক কৃষ্ণকূর্চ্চ পুরোহিত হট্ওয়াটরপ্লেট নামক দিব্য পুষ্পপাত্রে রোষ্ট্ মটন্ এবং কট্লেট্ নামক সুগন্ধি কুসুমরাশি রাখিয়া গেল। তখন দেবেন্দ্র দত্ত, যথাশাস্ত্র ভক্তিভাবে, দেবীর পূজা করিতে বসিলেন।

পরে তানপুরা, তবলা, সেতার প্রভৃতি সমেত গায়ক বাদক দল আসিল। তাহারা পূজার আবশ্যকীয় সংগীতোৎসব সম্পন্ন করিয়া গেল।

সর্ব্বশেষে দেবেন্দ্রের সমবয়স্ক, সুশীতল কান্তি এক যুবা পুরুষ আসিয়া বসিল। ইনি দেবেন্দ্রের মাতুলপুত্র সুরেন্দ্র। সুরেন্দ্র, গুণে সর্ব্বাংশে দেবেন্দ্রের বিপরীত। ইহার স্বভাবগুণে দেবেন্দ্রও ইহাঁকে ভাল বাসিতেন। দেবেন্দ্র ইহাঁকে ভিন্ন সংসারে আর কাহারও কথার বাধ্য নহেন। সুরেন্দ্র প্রত্যহ রাত্রে একবার দেবেন্দ্রের সম্বাদ লইতে আসিতেন। কিন্তু মদ্যাদির ভয়ে অধিকক্ষণ বসিতেন না। সকলে উঠিয়া গেলে, সুরেন্দ্র দেবেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তোমার শরীর কিরূপ আছে?"

দে। শরীরং ব্যাধি মন্দিরং।

সু। বিশেষ তোমার। আজি জ্বর জানিতে পারিয়াছিলে কি?

দে। না।

সু। আর যকৃতের সেই ব্যথাটা?

দে। পূর্ব্বমত আছে।

সু। তবে এখন এসব স্থগিত রাখিলে ভাল হয় না?

দে। কি—মদ খাওয়া? কত দিন বলিবে? ও আমার সাথের সাথি।

সু। সাথের সাথি কেন? সঙ্গে আসেন নাই—সঙ্গেও যাইবে না। অনেকে ত্যাগ করিয়াছে—তুমিও ত্যাগ করিবে না কেন?

দে। আমি কি সুখের জন্য ত্যাগ করিব? যাহারা ত্যাগ করে, তাহাদের অন্য সুখ আছে—সেই ভরসায় ত্যাগ করে। আমার আর কোন সুখই নাই।

সু। তবু, বাঁচিবার আশায়, প্রাণের আকাঙ্ক্ষায় ত্যাগ কর।

দে। যাহাদের বাঁচিয়া সুখ, তাহারা বাঁচিবার আশায় মদ ছাড়ুক। আমার বাঁচিয়া কি লাভ?"

সুরেন্দ্রের চক্ষু বাষ্পাকুল হইল। তখন বন্ধুস্নেহে পরিপূর্ণ হইয়া কহিলেন, "তবে আমাদের অনুরোধে ত্যাগ কর।"

দেবেন্দ্রের চক্ষে জল আসিল। দেবেন্দ্র বলিল, "আমাকে যে সৎপথে যাইতে অনুরোধ করে, তুমি ভিন্ন এমন আর কেহ নাই। যদি কখন আমি ত্যাগ করি, সে তোমারই অনুরোধে করিব। আর——

সু। আর কি?

দে। আর যদি কখন আমার স্ত্রীর মৃত্যুসম্বাদ কর্ণে শুনি—তবে মদ ছাড়িব। নচেৎ এখন মরি বাঁচি সমান কথা।"

সুরেন্দ্র সজল নয়নে, মনোমধ্যে হৈমবতীকে শতং গালি দিতেং গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সূর্য্যমুখীর পত্র।

প্রাণাধিকা শ্রীমতী কমলমণি দেবী চিরায়ুষ্মতীষু।

আর তোমাকে আশীর্ব্বাদ পাঠ লিখিতে লজ্জা করে। এখন তুমিও এক জন হইয়া উঠিয়াছ—এক ঘরের গৃহিণী। তা যাহাই হউক, আমি তোমাকে আমার কনিষ্ঠা ভগিনী ভিন্ন আর কিছুই বলিয়া ভাবিতে পারিতেছি না। তোমাকে মানুষ করিয়াছি। প্রথম "ক খ" লিখাই, কিন্তু তোমার হাতের অক্ষর দেখিয়া, আমার এ হিজিবিজি তোমার কাছে পাঠাইতে লজ্জা করে। তা লজ্জা করিয়া কি করিব? আমাদিগের দিন কাল গিয়াছে। দিনকাল থাকিলে আমার এমন দশা হইবে কেন?

কি দশা? এ কথা কাহাকে বলিবার নহে,—বলিতে দুঃখও হয়, লজ্জাও করে। কিন্তু অন্তঃকরণের ভিতর যে কষ্ট, তাহা কাহাকে না বলিলেও সহ্য হয় না। আর কাহাকে বলিব? তুমি আমার প্রাণের ভগিনী—তুমি ভিন্ন আর আমাকে কেহ ভাল বাসে না। আর তোমার ভাইয়ের কথা—তুমি ভিন্ন পরের কাছেও বলিতে পারি না।

আমি আপনার চিতা আপনি সাজাইয়াছি। কুন্দনন্দিনী যদি না খাইয়া মরিত, তাহাতে আমার কি ক্ষতি ছিল? পরমেশ্বর এত লোকের উপায় করিতেছেন, তাহার কি উপায় করিতেন না? আমি কেন আপনা খাইয়া তাহাকে ঘরে আনিলাম?

তুমি সে হতভাগিনীকে যখন দেখিয়াছিলে, তখন সে বালিকা। এখন তাহার বয়স ১৭।১৮ বৎসর হইয়াছে। সে যে সুন্দরী তাহা স্বীকার করিতেছি। সেই সৌন্দর্য্যই আমার কাল হইয়াছে।

পৃথিবীতে যদি আমার কোন সুখ থাকে, ত সে স্বামী। পৃথিবীতে যদি আমার কোন চিন্তা থাকে, তবে সে স্বামী। পৃথিবীতে যদি আমার কোন কিছু সম্পত্তি থাকে, তবে সে স্বামী। সেই স্বামী, কুন্দনন্দিনী আমার হৃদয় হইতে কাড়িয়া লইতেছে। পৃথিবীতে আমার যদি কোন অভিলাষ থাকে, তবে সে স্বামির স্নেহ। সেই স্বামির স্নেহে কুন্দনন্দিনী আমাকে বঞ্চিত করিতেছে।

তোমার সহোদরকে মন্দ বলিও না। আমি তাঁহার নিন্দা করিতেছি না। তিনি ধর্ম্মাত্মা, তাঁহার চরিত্রের এখনও শত্রুতেও কলঙ্ক করিতে পারে না। আমি প্রত্যহ দেখিতে পাই, তিনি প্রাণপণে আপনার চিত্তকে বশ করিতেছেন। যে দিকে কুন্দনন্দিনী থাকে, সাধ্যানুসারে কখন সে দিকে নয়ন ফিরান না। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে তাহার নাম মুখে আনেন না। এমন কি, তাহার প্রতি কর্কশ ব্যবহারও করিয়া থাকেন। তাহাকে বিনা দোষে ভৎর্সনা করিতেও শুনিয়াছি।

তবে কেন আমি এত হাবড়হাটি লিখিয়া মরি? পুরুষে এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে বুঝান বড় ভার হইত; কিন্তু তুমি মেয়ে মানুষ, এতক্ষণ বুঝিয়াছ। যদি কুন্দনন্দিনী অন্য স্ত্রীলোকের মত তাঁহার চক্ষে সামান্যা হইত, তবে তিনি কেন, তাহার প্রতি না চাহিবার জন্য

ব্যস্ত হইবেন? তাহার নাম মুখে না আনিবার জন্য কেন এত যত্নশীল হইবেন? কুন্দনন্দিনীর জন্য তিনি আপনার নিকট আপনি অপরাধী হইয়াছেন। এই জন্য কখন কখন তাহার প্রতি অকারণ ভর্ৎসনা করেন। সে রাগ তাহার উপর নহে—আপনার উপর। সে ভর্ৎসনা তাহাকে নহে, আপনাকে। আমি ইহা বুঝিতে পারি। আমি এত কাল পর্য্যন্ত অনন্যব্রত হইয়া, অন্তরে বাহিরে কেবল তাঁহাকেই দেখিলাম—তাঁহার ছায়া দেখিলে তাঁহার মনের কথা বলিতে পারি,—তিনি আমাকে কি লুকাইবেন? কখন কখন অন্যমনে তাঁহার চক্ষু এদিক ওদিক চাহে,কাহার সন্ধানে তাহা কি আমি বুঝিতে পারি না? দেখিলে আবার ব্যস্ত হইয়া চক্ষুঃ ফিরাইয়া লয়েন, কেন তাহা কি বুঝিতে পারি না? কাহার কণ্ঠের শব্দ শুনিবার জন্য, আহারের সময়, গ্রাস হাতে করিয়াও কান তুলিয়া থাকেন, তাহা কি বুঝিতে পারি না? হাতের ভাত হাতে থাকে, কি মুখে দিতে কি মুখে দেন, তবু কান তুলিয়া থাকেন,—কেন? আবার কুন্দের স্বর কানে গেলে তখনই বড় জোরে হাপুস হাপুস করিয়া ভাত খাইতে আরম্ভ করেন কেন, তা কি বুঝিতে পারিনা। আমার প্রাণাধিক সর্ব্বদা প্রসন্ন বদন—এখন এত অন্যমনা কেন? কথা বলিলে কথা কানে না তুলিয়া, অন্যমনে উত্তর দেন 'হুঁ';—আমি যদি রাগ করিয়া বলি, "আমি শীঘ্র মরি," তিনি না শুনিয়া বলেন 'হুঁ'। এত অন্যমনঃ কেন? জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, "মোকদ্দমার জ্বালায়।" আমি জানি মোকদ্দমার কথা তাঁহার মনেও স্থান পায় না। যখন মোকদ্দমার কথা বলেন, তখন হাসিয়া হাসিয়া কথা বলেন। আর এক কথা—এক দিন পাড়ার প্রাচীনার দল কুন্দের কথা কহিতেছিল, তাহার বাল্য বৈধব্য অনাথিনীত্ব এই সকল লইয়া তাহার জন্য দুঃখ করিতেছিল। তোমার সহোদর সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি অন্তরাল হইতে দেখিলাম তাঁহার চক্ষুঃ জলে পুরিয়া গেল—তিনি সহসা দ্রুতবেগে সেস্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

এখন এক জন নূতন দাসী রাখিয়াছি—তাহার নাম কুমুদ। বাবু তাহাকে কুমুদ বলিয়া ডাকেন। কখন কখন কুমুদ বলিয়া ডাকিতে কুন্দ বলিয়া ফেলেন। আর কত অপ্রতিভ হন! অপ্রতিভ কেন?

এ কথা বলিতে পারিব না যে, তিনি আমাকে অযত্ন বা অনাদর করেন। বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক যত্ন, অধিক আদর করেন। ইহার কারণ বুঝিতে পারি। তিনি আপনার মনে আমার নিকট অপরাধী। কিন্তু ইহাও বুঝিতে পারি যে, আমি আর তাঁহার মনে স্থান পাই না। যত্ন এক। ভালবাসা আর। ইহার মধ্যে প্রভেদ কি—আমরা স্ত্রীলোক, সহজেই বুঝিতে পারি।

আর একটা হাসির কথা। ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে না কি বড় পণ্ডিত আছে, তিনি আবার এক খানা বিধবা বিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন যে, বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয় সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে? এখন বৈঠকখানায় ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ আসিলে

সেই গ্রন্থ লইয়া বড় তর্ক বিতর্ক হয়। সে দিন ন্যায়, কচকচি ঠাকুর-মা স্বরস্বতীর সাক্ষাৎ বরপুত্র,—বিধবা বিবাহের সপক্ষে তর্ক করিয়া বাবুর নিকট হইতে টোল মেরামতের জন্য দশটী টাকা লইয়া যায়। তাহার পরদিন সার্ব্বভৌম ঠাকুর বিধবা বিবাহের প্রতিবাদ করেন। তাঁহার কন্যার বিবাহের জন্য আমি পাঁচ ভরির সোনার বালা গড়াইয়া দিয়াছি। আর কেহ বড় বিধবা বিবাহের দিগে নয়।

আপনার দুঃখের কথা লইয়া তোমাকে অনেকক্ষণ জ্বালাতন করিয়াছি। তুমি না জানি কত বিরক্ত হইবে? কিন্তু কি করি ভাই—তোমাকে মনের দুঃখ না বলিয়া কাহাকে বলিব? আমার কথা এখনও ফুরায় নাই—কিন্তু তোমার মুখ চেয়ে আজি ক্ষান্ত হইলাম। এ সকল কথা কাহাকেও বলিও না। আমার মাথার দিব্য, ঠাকুরজামাইকে এ পত্র দেখাইও না।

তুমি কি আমাদিগকে দেখিতে আসিবে না? এই সময় একবার আসিও, তোমাকে পাইলে অনেক ক্লেশ নিবারণ হইবে।

তোমার ছেলের সম্বাদ ও ঠাকুরজামাইয়ের সম্বাদ শীঘ্র লিখিবে। ইতি।

সূর্য্যমুখী।

পুনশ্চ। আর এক কথা—পাপ বিদায় করিতে পারিলেই বাঁচি। কোথায় বা বিদায় করি? তুমি নিতে পার? না ভয় করে?

কমল প্রত্যুত্তর লিখিলেন,—

"তুমি পাগল হইয়াছ। নচেৎ তুমি স্বামির হৃদয় প্রতি অবিশ্বাসিনী হইবে কেন? স্বামির প্রতি বিশ্বাস হারাইও না। আর যদি নিতান্তই সে বিশ্বাস না রাখিতে পার—তবে দীঘির জলে ডুবিয়া মর। আমি কমলমনি তর্কসিদ্ধান্ত ব্যবস্থা দিতেছি, তুমি দড়ি কলসী লইয়া জলে ডুবিয়া মরিতে পার। স্বামির প্রতি যাহার বিশ্বাস রহিল না—তাহার মরাই মঙ্গল।"

উত্তর চরিত।

দ্বিতীয় সংখ্যা।

পাঠকগণ আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন। আমরা আলঙ্কারিক নহি। অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রতি আমাদিগের বিশেষ ভক্তি নাই। এই উত্তরচরিত বাস্তবিক নাটক লক্ষণাক্রান্ত কি না—ইহা রূপক কি উপরূপক,—নাটক কি প্রকরণ কি ব্যাযোগ কি ত্রোটক;—ইহার বস্তু কি, বীজ কি, বিন্দু কি, পতাকা কোথায়, কোথায় প্রকরী, কার্য্য কি—এ সকল তত্ত্বের সমালোচনে আমরা প্রবৃত্ত নহি। মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ, উপসংহৃতি, প্রভৃতি নির্ব্বাচনে আমরা অসমর্থ। নায়ক ললিত কি শান্ত, ধীরোদাত্ত কি উদাত্ত—নায়িকা স্বকীয়া কি সামান্যা, মুগ্ধা কি প্রৌঢ়া—কোথায়

তিনি বাসকসজ্জা, কোথায় উৎকণ্ঠিতা, কোথায় বিপ্রলব্ধা, কোথায় প্রোষিত ভর্ত্তৃকা—তাঁহার হাব ভাব হেলা, লীলা বিলাস বিচ্ছিত বিভ্রম বিকৃতাদি কি প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে—তাহার বিচার করিয়া পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি বিধান করিতে ইচ্ছুক নহি। কথিত আছে ইহা করুণরসপ্রধান নাটক। বাস্তবিক তাহাই যথার্থ কি না—কোন্ অঙ্কে কোন্ রস প্রধান—কোথায় কোন্ ভাব,—হাস্য শোকাদি স্থায়ীভাব,—নির্ব্বেদ গ্লানি শঙ্কাদি ব্যভিচারীভাব—স্তম্ভস্বেদ রোমাঞ্চাদি সাত্ত্বিকভাব;—কৌশিকী, ভারতী প্রভৃতি কোন বৃত্তি কোথায় অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা আমরা কিছুই বলিতে পারি না। পাঠকের নিকট আমাদের অনুরোধ যে অলঙ্কারশাস্ত্র তিনি একেবারে বিস্মৃত হউন, নচেৎ নাটকের রসগ্রহণ করিতে পারিবেন না। আমরা সোজা কথায় তাঁহাকে বুঝাইতে চাহি—এই কবির সৃষ্টি মধ্যে কি ভাল লাগে, কি ভাল লাগে না। পাঠক যদি ইহার অধিক আকাঙ্ক্ষা না করেন, তবে আমাদিগের অনুবর্ত্তী হউন।

অঙ্কমুখে, রাম লক্ষ্মণ সীতাকে একখানি চিত্র দেখাইতেছেন। জনকাদির বিচ্ছেদে দুর্ম্মনায়মানা গর্ব্বিণী সীতার বিনোদনার্থ এই চিত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহাতে সীতার অগ্নিশুদ্ধি পর্য্যন্ত রামসীতার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত চিত্রিত হইয়াছিল। এই "চিত্র দর্শন" কেবল প্রেমপরিপূর্ণ—স্নেহ যেন আর ধরে না। কথায়২ এই প্রেম। যখন অগ্নিশুদ্ধির কথা উল্লেখমাত্রে রাম, সীতাবমাননা ও সীতার পীড়ন জন্য আত্মতিরস্কার করিতেছিলেন—তখন সীতার কেবল "হোদু অজ্জউত্ত হোদু—এহি প্রেক্খম্হ দাব দে চরিদং"—এই কথাতেই কত প্রেম! যখন মিথিলাবৃত্তান্তে সীতা রামের চিত্র দেখিলেন, তখন কত প্রেম উছলিয়া উঠিল! সীতা দেখিলেন,

অম্মহে দলন্তনবনীলুপ্পলসামলসিনিদ্ধমসিণসোহমাণমংসলেণ দেহসোহগ্গেণ বিহ্ময়ত্থিমিদতাদদীসমাণসোম্মসুন্দরসিরী অনাদরক্খুড়িদসঙ্করসরাসণো সিহণ্ডমুদ্ধমুহমণ্ডলো অজ্জ-উত্তো আলিহিদো।"*

যখন রাম সীতার বধূবেশ মনে করিয়া বলিলেন,

প্রতনুবিরলৈঃ প্রান্তোন্মীলন্মনোহর কুন্তলৈ
র্দশন মুকুলৈর্মুগ্ধালোকং শিশুর্দধতীমুখম্।
ললিতললিতৈর্জ্যোৎস্নাপ্রায়ৈরকৃত্রিমবিভ্রমৈ-
রকৃতমধুরৈরম্বানাংমে কুতূহলমঙ্গকৈঃ।†—

যখন গোদাবরীতীর স্মরণ করিয়া কহিলেন,

কিমপি কিমপি মন্দংমন্দমাসক্তিযোগা
দবিরলিতকপোলং জল্পতোরক্রমেণ।
অশিথিলপরিরম্ভব্যাপৃতৈকৈকদোষ্ণো

* আহা! আর্য্য পুত্রের কি সুন্দর চিত্র! প্রফুল্লপ্রায় নবনীলোৎপলবৎ শ্যামলস্নিগ্ধ কোমল শোভাবিশিষ্ট কি দেহসৌন্দর্য্য! কেমন অবলীলাক্রমে হরধনু ভাঙ্গিতেছেন, মুখমণ্ডল কেমন শিখণ্ডে শোভিত! পিতা বিস্মিত হইয়া এই সুন্দর শোভা দেখিতেছেন! আহা কি সুন্দর!

† "মাতৃগণ তৎকালে বালা জানকীর অঙ্গ সৌষ্টবাদি দেখিয়া কি সুখীই হইয়াছিলেন, এবং ইনিও অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ও অনতিনিবিড় দন্তগুলি, তাহার উভয়পার্শ্বস্থ মনোহর কুন্তল, মনোহর মুখশ্রী, আর সুন্দর চন্দ্রকিরণ সদৃশ নির্ম্মল এবং কৃত্রিমবিলাস রহিত ক্ষুদ্র২ হস্ত পদাদি অঙ্গদ্বারা তাঁহাদিগের আনন্দের একশেষ করিয়াছিলেন।" নৃসিংহ বাবুর অনুবাদ। এই কবিতাটি বালিকা বর্ণনার চূড়ান্ত।

রবিদিতগতযামা রাত্রিরেব ব্যরংসীৎ ॥*

যখন যমুনাতটস্থ শ্যামবট স্মরণ করিয়া রামচন্দ্র কহিলেন,

অলসললিতমুগ্ধান্যধ্ব সঞ্জাতখেদা
দশিথিলপরিরম্ভৈর্দত্তসংবাহনানি ।
পরিমৃদিতমৃণালীদুর্ব্বলান্যঙ্গকানি
ত্বমুরসি মম কৃত্বা যত্রনিদ্রামবাপ্তা ॥†

যখন নিদ্রাভঙ্গান্তে রামকে দেখিতে না পাইয়া কৃত্রিম কোপে সীতা বলিলেন,—

ভোদু মে কুবিস্সং জই মে প্রেক্খমাণা অত্তণো পহবিস্সং ।" ‡

তখন কত প্রেম উছলিয়া উঠিতেছে! কিন্তু এই অতি বিচিত্র কবিত্বকৌশলময় চিত্রদর্শনে আরও কতই সুন্দর কথা আছে! লক্ষ্মণের সঙ্গে সীতার কৌতুক, "বচ্ছ ইঅং বি অবরা কা?"—মিথিলা হইতে বিবাহ করিয়া আসিবার কথায় দশরথকে রামের স্মরণ—"স্মরামি! হন্ত স্মরামি!"—মন্থরার কথায় রামের কথা অন্তরিত করণ ইত্যাদি। সুর্পনখার চিত্র দেখিয়া সীতার ভয়, আমাদের অতি মিষ্ট লাগে,—

সীতা। হা অজ্জউত্ত এত্তিঅং দে দংসণং
রামঃ। অয়ি বিপ্রয়োগত্রস্তে! চিত্রমেতৎ।
সীতা। যধাতধাহোদু দুজ্জণো অসুহং উপ্পাদেই। ¶

স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে এটি অতি সুমিষ্ট ব্যঙ্গ; অথচ কেবল ব্যঙ্গ নহে।

কালিদাসের বর্ণনাশক্তি অতি প্রসিদ্ধা, কিন্তু ভবভূতির বর্ণনাশক্তি তদপেক্ষা হীনা নহে—বরং অনেকাংশে তাঁহার প্রাধান্য আছে। কালিদাসের বর্ণনা, তাঁহার অতুল উপমাপ্রয়োগের দ্বারা অত্যন্ত মনোহারিণী হয়। ভবভূতির উপমাপ্রয়োগ অতি বিরল; কিন্তু বর্ণনীয় বস্তু তাঁহার লেখনীমুখে স্বাভাবিক শোভার অধিক শোভা ধারণ করিয়া বসে। কালিদাস, একটী২ করিয়া বাছিয়া২ সুন্দর সামগ্রী গুলিন একত্রিত করেন; সুন্দর সামগ্রী গুলির সঙ্গে তদীয় মধুর ক্রিয়া সকল ধ্বনিত করেন, তাহার উপর আবার উপমাচ্ছলে আরও কতক গুলিন সুন্দর সামগ্রী আনিয়া চাপাইয়া দেন। এ জন্য তাঁহার কৃত বর্ণনা, যেমন স্বভাবের অবিকল অনুরূপ, তেমনি মাধুর্য্য পরিপূর্ণ হয়; বীভৎসাদি রসে কালিদাস সেই জন্য সফল হয়েন না। ভবভূতি বাছিয়া বাছিয়া মধুর সামগ্রী সকল একত্রিত করেন না; যাহা বর্ণনীয় বস্তুর প্রধানাংশ বলিয়া বোধ করেন, তাহাই অঙ্কিত করেন। দুই চারিটা স্থূল কথায় একটা চিত্র সমাপ্ত করেন—কালিদাসের ন্যায় কেবল বসিয়া বসিয়া তুলি ঘসেন না। কিন্তু সেই দুই চারিটা কথায় এমন একটু রস ঢালিয়া দেন, যে তাহাতে চিত্র

* "একত্র শয়ন করিয়া পরস্পরের কপোলদেশ পরস্পরের কপোলের সহিত সংলগ্ন করিয়া এবং উভয়ে উভয়কে এক এক হস্ত দ্বারা গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া অনবরত মৃদুস্বরে ও যদৃচ্ছাক্রমে বহুবিধ গল্প করিতে অজ্ঞাতসারে রাত্রি অতিবাহিত করিতাম।" ঐ

† "যেখানে তুমি পথজনিত পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া ঈষৎ কম্পবান্ তথাপি মনোহর এবং গাঢ় আলিঙ্গন কালে অত্যন্ত মর্দ্দনদায়ক আর দলিত মৃণালিনীর ন্যায় ম্লান ও দুর্ব্বল হস্তাদি অঙ্গ আমার বক্ষঃস্থলে রাখিয়া নিদ্রা গমন করিয়াছিলে।" ঐ বাবুর অনুবাদ।

‡ হৌক—আমি রাগ করিব—যদি তাঁহাকে দেখিয়া না ভুলিয়া যাই।

¶ সীতা। হাঁ আর্য্য পুত্র, তোমার সঙ্গে এই দেখা।
রাম। বিরহের এত ভয়—এ যে চিত্র।
সীতা। যাহাই হৌক না—দুর্জ্জন হলেই মন্দ ঘটায়।

অত্যন্ত সমুজ্জ্বল, কখন মধুর, কখন ভয়ঙ্কর, কখন বীভৎস হইয়া পড়ে। মধুরে কালিদাস অদ্বিতীয়—উৎকটে ভবভূতি।

উপরে উত্তরচরিতের প্রথমাঙ্ক হইতে উদাহরণ স্বরূপ কতকগুলিন বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে,—যথা রামচন্দ্র ও জানকীর পরস্পরের বর্ণিত বরকন্যা রূপ। ভবভূতির বর্ণনা শক্তির বিশেষ পরিচয় দ্বিতীয় ও তৃতীয়াঙ্কে জনস্থান এবং পঞ্চবটী, এবং ষষ্ঠাঙ্কে কুমারদিগের যুদ্ধ। প্রথমাঙ্ক হইতে আমরা একটি সংক্ষিপ্ত উদাহরণ উদ্ধৃত করি।

"বচ্ছএসো কুসমিদকঅম্বতরুতণ্ডবিদবরহিণো কিণ্ণামহেঅো গিরী, জত্থ,অনুভাবসোহগ্গমেত্তপরিসেসধূসরসিরী মুহুত্তং মুচ্ছন্তো তুএ পরুণ্ণেণ অবলম্বিদো তরুঅলে অজ্জউত্তো আলিহিদো।॥

দুইটিমাত্র পদে কবি কত কথাই ব্যক্ত করিলেন! কি করুণরসচরমস্বরূপ চিত্র স্থজিত করিলেন!

চিত্র দর্শনান্তে সীতা নিদ্রা গেলেন। ইত্যবসরে দুর্ম্মুখ আসিয়া সীতাপবাদ সম্বাদ রামকে শুনাইল। রাম সীতাকে বিসর্জ্জন করিবার অভিপ্রায় করিলেন।

রামচন্দ্রের চরিত্র নির্দ্দোষ, অকলঙ্ক, দেবোপম বলিয়া ভারতে খ্যাত, এবং সেই জন্যই ভারতে তাঁহার দেবত্বে প্রতিষ্ঠা। কিন্তু বস্তুতঃ বাল্মীকি কখন রামচন্দ্রকে নির্দ্দোষ বা সর্ব্বগুণ বিভূষিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছা করেন নাই। রামায়ণগীত শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রের অনেক দোষ; কিন্তু সে সকল দোষ গুণাতিরেকমাত্র। এই জন্য তাঁহার দোষ গুলিন ও মনোহর। কিন্তু গুণাতিরেকে যে সকল দোষ, তাহা মনোহর হইলেও দোষ বটে। পরশুরাম অতিরিক্ত পিতৃভক্ত বলিয়া মাতৃহন্তা, তাই বলিয়া কি মাতৃবধ দোষ নহে? পাণ্ডবেরা মাতৃ কথার অতিরিক্ত বশ বলিয়া এক পত্নীর পঞ্চ স্বামী, তাই বলিয়া কি অনেকের একপত্নীত্ব দোষ নয়?

রামচন্দ্রও অনেক নিন্দনীয় কর্ম্ম করিয়াছেন।—যথা বালিবধ। কিন্তু তিনি যে সকল অপরাধে অপরাধী, তন্মধ্যে এই সীতা বিসর্জ্জনাপরাধ সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। শ্রীরামের চরিত্র কোন্ দোষে কলুষিত করিয়া কবি তাঁহাকে এই অপরাধে অপরাধী করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করা যাউক।

যাঁহারা সাম্রাজ্য শাসনে ব্রতী হয়েন, প্রজারঞ্জন তাঁহাদিগের একটি মহদ্ধর্ম্ম! গ্রীক ও রোমক ইতিবৃত্তে ইহার অনেক উদাহরণ প্রকাশিত আছে। কিন্তু ইহার সীমাও আছে। সেই সীমা অতিক্রম করিলে, ইহা দোষরূপে পরিণত হয়। যে রাজা প্রজার হিতার্থ আপনার অহিত করেন সে রাজার প্রজারঞ্জন প্রবৃত্তি গুণ। ব্রুটস কৃত আত্ম পুত্রের বধ দণ্ডাজ্ঞা, এই গুণের উদাহরণ। যে রাজা প্রজার প্রিয় হইবার জন্য হিতাহিত সকল কার্য্যেই প্রবৃত্ত, সেই রাজার প্রজারঞ্জন প্রবৃত্তি দোষ। নাপোলেয়নদিগের যুদ্ধে প্রবৃত্তি ইহার উদাহরণ। রোবস্পীর ও

॥ বৎস, এই যে পর্ব্বত, যদুপরে কুসুমিত কদম্বে ময়ূরেরা পুচ্ছ ধরিতেছে—উহার নাম কি? দেখিতেছি, তরুতলে আর্য্য পুত্র লিখিত—তাঁহার পূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের পরিশেষমাত্র ধূষরশ্রীতে তাঁহাকে চেনা যাইতেছে। তিনি মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছা যাইতেছেন,—কাঁদিতেং তুমি তাঁহাকে ধরিয়া আছ।

দাঁত্তঁ কৃত বহু প্রজাবধ ইহার নিকৃষ্টতর উদাহরণ।

ভবভূতির রামচন্দ্র এই প্রজারঞ্জন প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া সীতাকে বিসর্জ্জন করেন। অনেকে স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রজারঞ্জক ছিলেন। কিন্তু রামচন্দ্রের চরিত্রে স্বার্থপরতামাত্র ছিল না। সুতরাং তিনি স্বার্থ জন্য প্রজারঞ্জনে ব্রতী ছিলেন না। প্রজারঞ্জন রাজাদিগের কর্ত্তব্য বলিয়াই, এবং ইক্ষ্বাকু বংশীয়দিগের কুলধর্ম্ম বলিয়া তাহাতে তাঁহার এতদূর দার্ঢ্য। তিনি অষ্টাবক্রের সমক্ষে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন,

স্নেহং দয়াং তথাসৌখ্যং যদি বা জানকীমপি,
আরাধনায় লোকস্য,মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা।*

এবং দুর্ম্মুখের মুখে সীতার অপবাদ শুনিয়াও বলিলেন,

সতাং কেনাপিকার্য্যেন লোকস্যারাধনংব্রতম্।
যৎ পূজিতং হি তাতেন মাঞ্চ প্রাণাংশ্চমুঞ্চতা ॥‡

ভবভূতির রামচন্দ্র এই বিষম ভ্রমে ভ্রান্ত হইয়া কুলধর্ম্ম এবং রাজধর্ম্ম পালনার্থ, ভার্য্যাকে পবিত্রা জানিয়াও ত্যাগ করিলেন। রামায়ণের রামচন্দ্র সেরূপ নহেন। তিনিও জানিতেন যে সীতা পবিত্রা,—

অন্তরাত্মা চমে বেত্তি সীতাং শুদ্ধাং যশস্বিনীম্।

তিনি কেবল রাজকুলসুলভ অকীর্ত্তিশঙ্কা বশতঃ পবিত্রা পতিমাত্র জীবিতা পত্নীকে ত্যাগ করিলেন। "আমি রাজা শ্রীরামচন্দ্র ইক্ষ্বাকুবংশীয়, লোকে আমার মহিষীর অপবাদ করে? আমি এ অকীর্ত্তি সহিব না—যে স্ত্রীর লোকাপবাদ আমি তাহাকে ত্যাগ করিব।" এই রূপ রামায়ণের রামচন্দ্রের গর্ব্বিত চিত্তভাব।

বাস্তবিক সর্ব্বত্রই, রামায়ণের রামচন্দ্র হইতে ভবভূতির রামচন্দ্র অধিকতর কোমলপ্রকৃতি। ইহার এক কারণ এই, উভয় চরিত্র, গ্রন্থ রচনার সময়োপযোগী। রামায়ণ প্রাচীন গ্রন্থ, কেহ কেহ বলেন যে উত্তরাকাণ্ড বাল্মীকি প্রণীত নহে। তাহা হউক বা না হউক, ইহা যে প্রাচীন রচনা তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। তখন আর্য্য জাতীয়েরা বীরজাতি ছিলেন—আর্য্য রাজগণ বীরস্বভাবসম্পন্ন ছিলেন। রামায়ণের রাম মহাবীর, তাহার চরিত্র গাম্ভীর্য্য এবং ধৈর্য্য পরিপূর্ণ। ভবভূতি যৎকালে কবি—তখন ভারতবর্ষীয়েরা আর সে চরিত্রের নহেন। ভোগাকাঙ্ক্ষা, অলসাদির দ্বারা, তাঁহাদের চরিত্র কোমলপ্রকৃত হইয়াছিল। ভবভূতির রামচন্দ্রও সেই রূপ। তাঁহার চরিত্রে বীর লক্ষণ কিছুই নাই। গাম্ভীর্য্য এবং ধৈর্য্যের বিশেষ অভাব। তাঁহার অধীরতা দেখিয়া কখনং কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা হয়। সীতাপবাদ শুনিয়া, ভবভূতির রামচন্দ্র যে প্রকার বালিকাসুলভ বিলাপ করিলেন, তাহাই ইহার উদাহরণ স্থল। তিনি শুনিয়াই মূর্চ্ছিত হইলেন। তাহার পর দুর্ম্মুখের কাছে অনেক কাঁদাকাটা করিলেন। অনেক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। তন্মধ্যে অনেক সকরুণ কথা আছে বটে, কিন্তু

* "প্রজারঞ্জনের অনুরোধে স্নেহ, দয়া, আত্মসুখ, কিম্বা, জানকীকে বিসর্জ্জন করিতে হইলেও আমি কোনরূপে ক্লেশ বোধ করিব না।" নৃসিংহ বাবুর অনুবাদ।

‡ "লোকের আরাধনা করা সাধু ব্যক্তিদিগের পক্ষে সর্ব্বতোভাবেই বিধেয়, এবং এইটি তাঁহাদের পক্ষে মহৎব্রতস্বরূপ। কারণ পিতা আমাকে এবং প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও তাহা প্রতিপালন করিয়াছিলেন।"—ঐ

এত বাগাড়ম্বরে করুণরসের একটু বিঘ্ন হয়। এত বালিকার মত কাঁদিলে রামচন্দ্রের প্রতি কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা হয়। নিম্নলিখিত উক্তি শুনিলে বা পাঠ করিলে, বোধ হয় যেন কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের কোন অধ্যাপক বা ছাত্রের রচনা—শব্দের বড় ঘটা, কিন্তু অন্তঃশূন্যঃ——

"হা দেবি দেবযজনসম্ভবে। হা স্বজন্মানুগ্রহপবিত্রিতবসুন্ধরে! হা নিমিজনকবংশনন্দিনি! হা পাবকবশিষ্ঠারুন্ধতী প্রশস্তশীলশালিনি! হা রামময়জীবিতে! হা মহারণ্যবাসপ্রিয়সখি! হা প্রিয়স্তোকবাদিনি। কথমেবং বিধায়াস্তবায়মীদৃশঃ পরিণামঃ!"*

এই রূপ রচনা ভবভূতির ন্যায় মহাকবির অযোগ্য—কেবল আধুনিক বিদ্যালঙ্কারদিগের যোগ্য। এইরূপস্থলে রামায়ণের রামচন্দ্র কি করিয়াছেন? কত

---

* অনুবাদ। তাহার এই মত কথা শুনিয়া রাম, পরম দুঃখিতের ন্যায় সুহৃৎ সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, এই রূপ কি আমাকে বলে?" সকলে ভূমিতে মস্তক নত করিয়া অভিবাদন ও প্রণাম করিয়া, দুঃখিত রাঘবকে প্রত্যুত্তরে কহিল, "এই রূপই বটে—সংশয় নাই।" তখন শত্রুদমন রামচন্দ্র সকলের এই কথা শুনিয়া বয়স্য বর্গকে বিদায় দিলেন। বন্ধুবর্গকে বিদায় দিয়া, বুদ্ধির দ্বারা অবধারিত করিয়া সমীপে আসীন দৌবারিককে এই কথা বলিলেন যে শুভলক্ষণ সুমিত্রা নন্দন লক্ষ্মণকে ও মহাভাগ ভরতকে ও অপরাজিত শত্রুঘ্নকে শীঘ্র আন। * * * তাঁহারা রামের মুখ, রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় এবং সন্ধ্যাকালীন আদিত্যের ন্যায় প্রভাহীন দেখিলেন। ধীমান্ রামচন্দ্রের নয়নযুগল বাষ্পপূর্ণ এবং মুখ হতশোভ পদ্মের ন্যায় দেখিলেন। তাঁহারা ত্বরিত তাঁহার অভিবাদন করিয়া এবং তাহার পদযুগল মস্তকে ধারণ করিয়া সকলে সমাহিত হইয়া রহিলেন। রাম অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। পরে বাহুযুগলের দ্বারা তাহাদিগকে আলিঙ্গন ও উত্থাপন পূর্ব্বক মহাবল রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে "আসনে উপবেশন কর;" এই বলিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে নরেশ্বরগণ! আমার সর্ব্বস্ব তোমরা; তোমরা আমার জীবন; তোমাদিগের কৃত রাজ্য আমি পালন করি। তোমরা শাস্ত্রার্থ অবগত; এবং তোমাদের বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত করিয়াছ। হে নরেশ্বরগণ, তোমরা মিলিত হইয়া যাহা বলি তাহার অর্থানুসন্ধান কর।" রামচন্দ্র এই কথা বলিলে অবধানপরায়ণ ভ্রাতৃগণ, "রাজা কি বলেন" ইহা ভাবিয়া উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া রহিলেন।

তখন সেই দীনচেতা উপবিষ্ট ভ্রাতৃগণকে পরিশুষ্ক মুখে রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, "তোমাদিগের মঙ্গল হউক! আমার সীতার সম্বন্ধে পৌরজনমধ্যে যেরূপ কথা বর্ত্তিয়াছে, তাহা শুন—মন অন্যথা করিও না। জনপদে এবং পৌরজন মধ্যে আমার সুমহান অপবাদ রূপ বীভৎস কথা রটিয়াছে, আমার তাহাতে মর্ম্মচ্ছেদ করিতেছে। আমি মহাত্মা ইক্ষাকুদিগের কুলে জন্মিয়াছি, সীতাও মহাত্মা জনকরাজার সৎকুলে জন্মিয়াছেন। আমার অন্তরাত্মাও জানে যে, যশস্বিনী সীতা শুদ্ধচরিত্রা।

* * *

তখন আমি বৈদেহীকে গ্রহণ করিয়া অযোধ্যায় আসিলাম। এক্ষণে এই মহান্ অপবাদে আমার হৃদয়ে শোক বর্ত্তিতেছে। পৌর জন মধ্যে এবং জনপদে সুমহান অপবাদ হইয়াছে। লোকে যাহার অকীর্ত্তিগান করে যাবৎ সেই অকীর্ত্তি লোকে প্রকীর্ত্তিত হইবে তাবৎ সে অধম লোকে পতিত থাকিবে। দে-

১১৩ পৃষ্ঠায় রামায়ণ হইতে যে কবিতাগুলিন উদ্ধৃত হইয়াছে, ভ্রমক্রমে ১১২ পৃষ্ঠার নোটে তাহারই অনুবাদ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ১১২ পৃষ্ঠার উদ্ধৃত সংস্কৃত পদ গুলির অনুবাদ ভ্রমক্রমে তথায় লিখিত না হইয়া ১১৪ পৃষ্ঠার নোটে লিখিত হইয়াছে। ১১৫ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভে যে নোট লিখিত হইয়াছে, উহাই ১১৫ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের নোট হইবে এবং ঐ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের নোট দ্বিতীয় স্তম্ভের নোট হইবে।

কাদিয়াছেন? কিছুই না। মহাবীরপ্রকৃত শ্রীরাম সভামধ্যে সীতাপবাদের কথা শুনিলেন। শুনিয়া সভাসদ্গণকে কেবল এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন সকলে কি এই রূপ বলে?" সকলে তাহাই বলিল। তখন ধীরপ্রকৃতি রাজা আর কাহাকে কিছু না বলিয়া সভাহইতে উঠিয়া গেলেন। মূর্চ্ছাও গেলেন না,—

বতারা অকীর্ত্তির নিন্দা করেন, এবং কীর্ত্তিই সকল লোকে পূজনীয়া। সকল মহাত্মা ব্যক্তিদের যত্ন কীর্ত্তিরই জন্য। হে পুরুষর্ষভগণ, আমি অপবাদভয়ে ভীত হইয়া জীবন ত্যাগ করিতে পারি তোমাদিগের ত্যাগ করিতে পারি, সীতার ত কথাই নাই।

অতএব তোমরা দেখ আমি কি শোকসাগরে পতিত হইয়াছি! আমি ইহার অধিক দুঃখ জগতে আর দেখি না। অতএব হে সৌমিত্রে! তুমি কল্য প্রভাতে সুমন্ত্রাধিষ্ঠিত রথে সীতাকে আরোপণ করিয়া স্বয়ং আরোহণ করিয়া, তাঁহাকে দেশান্তরে ত্যাগ করিয়া আইস। গঙ্গার অপর পারে তমসা নদীরতীরে মহাত্মা বাল্মীকি মুনির স্বর্গতুল্য আশ্রম। হে রঘুনন্দন! সেই বিজনদেশে তুমি ইহাঁকে ত্যাগ করিয়া শীঘ্র আইস,—আমার বচন রক্ষা কর—সীতাপরিত্যাগ বিষয়ে তুমি ইহার প্রতিবাদ কিছু করিও না। অতএব হে সৌমিত্রে! যাও—এ বিষয়ে আর কিছু বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। তুমি যদি ইহার বারণ কর, তবে আমার পরমাপ্রীতিকর হইবে। আমি চরণের স্পর্শে এবং জীবনের দ্বারা তোমাদিগকে শপথ করাইতেছি—যে যে ইহাতে আমাকে অনুনয় করিবার জন্য কোনরূপ কোন কথা বলিবে, আমার অভীষ্টহানি হেতুক তাহার শত্রু খ্যাতি নিত্য বর্ত্তিবে। যদি আমার আজ্ঞাবহ থাকিয়া, তোমরা আমাকে সম্মান করিতে চাও, তোমরা তবে আমার বচন রক্ষা কর, অদ্য সীতাকে লইয়া যাও।

মাতাও কুটিলেন না—ভূমেও গড়াগড়ি দিলেন না। পরে নিভৃত হইয়া, কাতরতাশূন্য ভাষায় ভাতৃবর্গকে ডাকাইলেন। ভ্রাতৃগণ আসিলে, পর্ব্বতবৎ অবিচলিত থাকিয়া, তাহাদিগকে আপন অভিপ্রায় জানাইলেন। বলিলেন, "আমি সীতাকে পবিত্রা জানি—সেই জন্যই গ্রহণ করিয়াছিলাম—কিন্তু এক্ষণে এই লোকাপবাদ! অতএব আমি সীতাকে ত্যাগ করিব।" স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া, লক্ষ্মণের প্রতি রাজ আজ্ঞা প্রচার করিলেন, "তুমি সীতাকে বনে দিয়া আইস।" যেমন অন্যান্য নিত্যনৈমিত্তিক রাজকার্য্যে রাজানুচরকে রাজা নিযুক্ত করেন, সেইরূপ লক্ষ্মণকে সীতা বিসর্জ্জনে নিযুক্ত করিলেন। চক্ষে জল কিন্তু একটিও শোকসূচক কথা ব্যবহার করিলেন না। "মর্ম্মাণি কৃন্তুতি" ইত্যাদি বাক্য সীতাবিয়োগাশঙ্কায় নহে—অপবাদ সম্বন্ধে। তথাপি তাঁহার এই কয়টি কথায় কত দুঃখই আমরা অনুভূত করিতে পারি! রামায়ণের মূল সচরাচর পঠিত হয় না, এবং এতদংশের অনুবাদও আমরা কোথাও দেখি নাই। অতএব এই স্থল উত্তরাকাণ্ড হইতে উদ্ধৃত এবং অনুবাদিত করিলাম।

তস্যৈবং ভাষিতং শ্রুত্বা রাঘবঃ পরমার্ত্তবৎ।
উবাচ সুহৃদঃ সর্ব্বান্ কথমেতদ্বদন্তি মাম্॥
সর্ব্বেতু শিরসাভূমাবভিবাদ্য প্রণম্য চ।
প্রত্যূচু রাঘবং দীনমেবমেতন্নসংশয়ঃ॥
শ্রুত্বাতুবাক্যং কাকুৎস্থঃ সর্ব্বেষাং সমুদীরিতম্।
বিসর্জয়ামাস তদা বয়স্যান্ শত্রুসূদনঃ॥
বিসৃজ্য তু সুহৃদ্বর্গং বুদ্ধ্যানিশ্চিত্য রাঘবঃ।
সমীপে দ্বাস্থমাসীনমিদং বচনমব্রবীৎ॥
শীঘ্রমানয় সৌমিত্রিং লক্ষ্মণং শুভ লক্ষণং।
ভরতং চ মহাভাগং শত্রুঘ্নং চাপরাজিতং॥

* * * *

তেত্তু দৃষ্ট্বা মুখং তস্য সগ্রহং শশিনং যথা।
সন্ধ্যাগতমিবাদিত্যং প্রভয়াপরিবর্জ্জিতং ॥
বাষ্পপূর্ণে চ নয়নে দৃষ্ট্বা রামস্য ধীমতঃ।
হতশোভং যথা পদ্মমুখন্বীক্ষ্য চ তস্য তে ॥
ততোভিবাদ্যত্বরিতাঃ পাদৌ রামস্য মূর্দ্ধভিঃ।
তস্থুঃ সমাহিতাঃ সর্ব্বে রামস্ত্বশ্রূন্যবর্ত্তয়ৎ ॥
তান্‌পরিষ্বজ্য বাহুভ্যামুত্থাপ্য চ মহাবলঃ।
আসনেষ্বাসতেত্যুক্ত্বা ততোবাক্যং জগাদহ ॥
ভবন্তোমম সর্ব্বস্বং ভবন্তোজীবিতং মম।
ভবদ্ভিশ্চকৃতং রাজ্যং পালয়ামি নরেশ্বরাঃ ॥
ভবন্তঃকৃতশাস্ত্রার্থাবুদ্ধ্যাচ পরিনিষ্ঠিতাঃ।
সংভূয়চ মদর্থোয়মন্বেষ্টব্যোনরেশ্বরাঃ ॥
তথা বদতি কাকুৎস্থে অবধান পরায়ণাঃ।
উদ্বিগ্নমনসঃ সর্ব্বে কিন্নুরাজাভিধাস্যতি ॥
তেষাং সমুপবিষ্টানাং সর্ব্বেষাং দীনচেতসাম্।
উবাচ বাক্যং কাকুৎস্থো মুখেন পরিশুষ্যতা ॥
সর্ব্বে শৃণুত ভদ্রন্বোমাকুরুধ্বং মনোন্যথা।
পৌরাণাং মম সীতায়া যাদৃশী বর্ত্ততে কথা ॥
পৌরাপবাদঃ সুমহান্ তথাজনপদস্যচ।
বর্ত্ততে ময়িবীভৎসা মম মর্ম্মাণি কৃন্ততি ॥
অহং কিল কুলে জাত ইক্ষ্বাকুনাং মহাত্মনাম্ ॥
সীতাপি সৎকুলেজাতা জনকানাং মহাত্মনাম্ ॥

* * * *

অন্তরাত্মা চ মে বেত্তি সীতাং শুদ্ধাং যশস্বিনীম্॥
ততো গৃহীত্বা বৈদেহী অযোধ্যামহমাগতঃ।
অয়ংতু মে মহান্বাদঃ শোকশ্চ হৃদি বর্ত্ততে ॥
পৌরাপবাদঃ সুমহাংস্তথা জনপদস্য চ।
অকীর্ত্তিযস্যগীয়েত লোকে ভূতস্য কস্যচিৎ ॥
পতত্যেবাধমালোকান্ যাবচ্ছব্দ প্রকীর্ত্ততে।
অকীর্ত্তিনিন্দ্যতে দেবৈঃকীর্ত্তিলোকেষু পূজ্যতে॥
কীর্ত্যর্থং তু সমারম্ভঃ সর্বেষাং সুমহাত্মনাম্।
অথাহং জীবিতং জহ্যাং যুষ্মান্বা পুরুষর্ষভাঃ॥
অপবাদভয়াদ্ভীতঃ কিং পুনর্জ্জনকাত্মজাম্।
তস্মাদ্ভবন্তঃ পশ্যন্ত পতিতং শোকসাগরে ॥
নহি পশ্যাম্যহং ভূতে কিঞ্চিদ্দুঃখমতোধিকং।
সত্বং প্রভাতে সৌমিত্রে সুমন্ত্রাধিষ্ঠিতং রথং ॥
আরুহ্য সীতামারোপ্য বিষয়াপন্তেসমুৎসৃজ।
গঙ্গায়াস্তপরে পারে বাল্মীকেস্ত মহাত্মনঃ ॥
আশ্রমোদিব্যসঙ্কাশস্তমসাতীরমাশ্রিতঃ।
তত্রৈনাম্বিজনে দেশে বিসৃজ্য রঘুনন্দন।
শীঘ্রমাগচ্ছ সৌমিত্রে কুরুষ্ব বচনং মম।
নচাস্মিন্ প্রতিবক্তব্যং সীতাং প্রতি কথঞ্চন ॥
তস্মাত্বং গচ্ছসৌমিত্রে নাত্র কার্য্যবিচারণা।
অপ্রীতির্হি পরামহ্যং ত্বয়ৈতৎ প্রতিবারিতে ॥
শাপিতা হি ময়াযূয়ং পাদাভ্যাংজীবনেন চ।
যেষাং বাক্যান্তরে ব্রূয়ুরনুনেতুং কথঞ্চন ॥
অহিতানামতে নিত্যংমদভিষ্ট বিঘাতনাৎ ॥
মানয়ন্তুভবন্তো মাং যদি মচ্ছাশনেস্থিতাঃ।
ইতোদ্যনীয়তাংসীতাংকুরুষ্ব বচনংমম ॥*

এই রচনা অতি মনোমোহিনী। রামায়ণের রাম, ক্ষত্রীয়, মহোজ্জ্বলকুলসম্ভূত, মহাতেজস্বী। তিনি পৌরাপবাদ শ্রবণে, ক্ষুব্ধ সিংহের ন্যায় রোষে দুঃখে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। ভবভূতির রামচন্দ্র তৎপরিবর্ত্তে স্ত্রীলোকের মত পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিলেন। তাঁহার ক্রন্দনের কিয়দংশ পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। রামায়ণের সঙ্গে তুলনা করিবার জন্য অবশিষ্টাংশও উদ্ধৃত করিলাম।

রাম। হা কষ্টমতিবীভৎসকর্ম্মা নৃশংসোস্মি-
সংবৃত্তঃ
শৈশবাৎ প্রভৃতি পোষিতাং প্রিয়াং
সৌহৃদাদপৃথগাশয়ামিমাম।
ছদ্মনা পরিদদামি মৃত্যবে
সৌনিকো গৃহশকুন্তিকামিব ॥
তৎকিমস্পর্শনীয়ঃ পাতকী দেবীং দূষযামি।
(সীতায়াঃ শিরঃ স্বৈরমুন্নময্য বাহুমাকর্ষন্)

---

* হা দেবি যজ্ঞভূমিসম্ভবে! হা জন্মগ্রহণ পবিত্রিতবসুন্ধরে! হা নিমি এবং জনকবংশের আনন্দদাত্রি! হা অগ্নি বশিষ্টদেব এবং অরুন্ধতী সদৃশ প্রশংসনীয় চরিতে! হা রামময় জীবিতে! হা মহাবনবাসপ্রিয়সহচরি! হা মধুরভাষিনি! হা মিতবাদিনি! এইরূপ হইয়াও শেষে তোমার অদৃষ্টে এই ঘটিল!”
নৃসিংহ বাবুর অনুবাদ।

অপূর্ব্বকর্ম্মচাণ্ডালময়ি মুগ্ধে বিমুঞ্চমাম্।
শ্রিতাসিচন্দনভ্রান্ত্যা দুর্বিপাকং বিষদ্রুমম্।।
উত্থায়। হন্ত বিপর্য্যস্তঃ সম্প্রতি জীবলোকঃ পর্য্যবসিতং জীবিতপ্রয়োজনং রামস্য শূন্যমধুনা জীর্ণারণ্যং জগৎ অসারঃ সংসারঃ কষ্টপ্রায়ং শরীরম্ অশরণোস্মি কিংকরোমি কা গতিঃ। অথবা।

দুঃখসংবেদনায়ৈব রামেচৈতন্যমাহিতম্
মর্ম্মোপঘাতিভিঃ প্রাণৈর্বজ্রকীলায়িতংস্থিরৈঃ॥

হা অম্ব অরুন্ধতি হা ভগবন্তৌ বশিষ্টবিশ্বামিত্রৌ হা ভগবন্ পাবক হা দেবি ভূতধাত্রি হা তাত জনক হা তাত হা মাতরঃ হা পরমোপকারিন্ লঙ্কাধিপতে বিভীষণ হা প্রিয়সখ সুগ্রীব হা সৌম্য হনুমন্ হা সখি ত্রিজটে মুষিতাস্থ পরিভূতাস্থ রামহতকেন। অথবা কস্তেষামহমিদানীমাহ্বানে।

তেহি মন্যে মহাত্মানঃ কৃতঘ্নেন দুরাত্মনা।
ময়াগৃহীতনামানঃ স্পৃশ্যন্ত ইব পাপ্মনা॥

যোহম্

বিস্রম্ভাদুরসি নিপত্য লব্ধনিদ্রা
মুন্মুচ্য প্রিয়গৃহিণীং গৃহস্য শোভাম্॥
আতঙ্কস্ফুরিতকঠোরগর্ভগুর্ব্বীং
ক্রব্যাদ্ভ্যো বলিমিব নির্ঘৃণঃ ক্ষিপামি॥

সীতায়াঃ পাদৌ শিরসিকৃত্বা। দেবি দেবি অয়ং পশ্চিমস্তে রামস্য শিরসাপাদপঙ্কজস্পর্শঃ ইতি রোদিতি।*

ইহার অনেক গুলিন কথা সকরুন বটে, কিন্তু ইহা আর্য্যবীর্য্যপ্রতিম মহারাজা রামচন্দ্রের মুখ হইতে নির্গত না হইয়া, আধুনিক কোন বাঙ্গালী বাবুর মুখ হইতে নির্গত হইলে উপযুক্ত হইত। কিন্তু ইহাতেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মন উঠে নাই। তিনি সীতার বনবাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে আরও কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, তাহা পাঠ কালে রামের কান্না পড়িয়া আমাদিগের মনে হইয়াছিল যে, যে বাঙ্গালীর মেয়েরা স্বামী বা পুত্রকে বিদেশে চাকরি করিতে পাঠাইয়া এই রূপ করিয়া কাঁদে।

ভবভূতির পক্ষে ইহা বক্তব্য, যে উত্তর চরিত নাটক ; নাটকের উদ্দেশ্য হৃচ্চিত্র ; রামায়ণ প্রভৃতি উপাখ্যান, কাব্যের * উদ্দেশ্য ভিন্নপ্রকার। সে উদ্দেশ্য

* হায় কি কষ্ট ! নিষ্ঠুরের মত, কি ঘৃণাজনক কর্ম্মই করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি ! বাল্যাবস্থা হইতে যাঁহাকে প্রিয়তমা বলিয়া প্রতিপালিত করিয়াছি ; যিনি গাঢ় প্রণয় বশতঃ কোন রূপেই আপনাকে আমা হইতে ভিন্ন বোধ করেন না, আজি আমি সেই প্রিয়াকে মাংস বিক্রয়ী যেমন গৃহপালিত পক্ষিণীকে অনায়াসে বধ করে, সেই রূপ ছল ক্রমে করাল কাল গ্রাসে নিপাতিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অতএব পাতকী সুতরাং অস্পৃশ্য আমি দেবিকে আর কেন কলঙ্কিত করি ? (ক্রমে ক্রমে সীতার মস্তক আপনার বক্ষঃস্থল হইতে নামাইয়া বাহু আকর্ষণ পূর্ব্বক) অয়ি মুগ্ধে ! এ অভাগাকে পরিত্যাগ কর। আমি অদৃষ্টচর এবং অশ্রুতপূর্ব্ব পাপ কর্ম্ম করিয়া চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি ! হায় ! তুমি চন্দনবৃক্ষভ্রমে এই ভয়ানক বিষবৃক্ষকে (কি কুক্ষণেই) আশ্রয় করিয়াছিলে ? (উঠিয়া) হায় এক্ষণে জীবলোক উচ্ছিন্ন হইল। রামেরও আর জীবিত থাকিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে পৃথিবী শূন্য এবং জীর্ণ অরণ্য সদৃশ নীরস বোধ হইতেছে। সংসার অসার হইয়াছে। জীবন কেবলমাত্র ক্লেশের নিদানস্বরূপ বোধ হইতেছে। হায় ! এতদিনে আশ্রয়বিহীন হইলাম। এখন কি করি (কোথায় যাই) কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না (চিন্তা করিয়া) উঃ ! আমার এখন কি গতি হইবে ? অথবা (সে চিন্তায় আর কি হইবে ?)

* আলঙ্কারিকেরা রামায়ণকে কাব্য বলেন না—ইতিহাস বলেন।

কার্য্যপরম্পরায় সরস বিবৃতি। কে কি করিল, তাহাই উপাখ্যান কাব্যে লেখকেরা প্রতীয়মান করিতে চাহেন; সে সকল কার্য্য করিবার সময়ে কে কি ভাবিল, তাহা স্পষ্টীকৃত করিবার প্রয়োজন তাদৃশ বলবৎ নহে। কিন্তু নাটকে সেই প্রয়োজনই বলবৎ। নাটককারের নিকট আমরা নায়কের হৃদয়ের প্রকৃত চিত্র চাহি। সুতরাং তাঁহাকে চিত্তভাব অধিকতর স্পষ্টীকৃত করিতে হয়। অনেক বাগাড়ম্বর আবশ্যক হয়। কিন্তু তথাপি উত্তর চরিতের প্রথমাঙ্কের রামবিলাপ মনোহর নহে। সে কথা গুলিন বীরবাক্য নহে—নবপ্রেমমুগ্ধ অসারবান্ যুবকের কথা।

যাবজ্জীবন দুঃখভোগ করিবার নিমিত্তই (হতভাগ্য) রামের দেহে প্রাণবায়ুর সঞ্চার হইয়াছিল, নতুবা নিজ জীবন পর্য্যন্তর কেন বজ্রের ন্যায় মর্ম্মভেদ করিতে থাকিবে? হা মাতঃ অরুন্ধতি! হা ভগবন্ বশিষ্ঠদেব! হা মহাত্মন্ বিশ্বামিত্র! হা ভগবন্ অগ্নে! হা নিখিল ভূত ধাত্রি ভগবতি বসুন্ধরে! হা তাত জনক! হা পিতঃ (দশরথ)! হা কৌশল্যা প্রভৃতি মাতৃগণ! হা পরমোপকারিন্ লঙ্কাপতি বিভীষণ! হা প্রিয়বন্ধো সুগ্রীব! হা সৌম্য হনুমন্! হা সখি ত্রিজটে! আজি হতভাগ্য পাপিষ্ঠ রাম তোমাদিগের সর্ব্বনাশ (সর্ব্বস্বাপহরণ) এবং অবমাননা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। (চিন্তা করিয়া) অথবা এই হতভাগ্য এখন তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিবারও উপযুক্ত নহে। কারণ, এই পাপাত্মা কৃতঘ্ন পামর কেবলমাত্র সেই সকল মহাত্মাদিগের নাম গ্রহণ করিলেও পাপস্পর্শ হইবার সম্ভাবনা। যেহেতুক আমি দৃঢ়বিশ্বাস বশতঃ বক্ষঃস্থলে নিদ্রিতা প্রেয়সীকে স্বপ্নাবস্থায় উদ্বেগ বশতঃ ঈষৎ কম্পিত গর্ভভরে মন্থরা দেখিয়াও অনায়াসেই উন্মোচনপূর্ব্বক নির্দ্দয় হৃদয়ে মাংসাশী রাক্ষসদিগকে উপহারের ন্যায় নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছি। (সীতার চরণদ্বয় মস্তকদ্বারা গ্রহণপূর্ব্বক) দেবি! দেবি! রামের দ্বারা তোমার পদপঙ্কজের এই শেষ স্পর্শ হইল! (এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন)।

জ্ঞান ও নীতি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অনেকে বলেন যে, মনুষ্যের জ্ঞানের উন্নতি আছে, নীতির উন্নতি নাই।* বিজ্ঞান দিন দিন কত নূতন তত্ত্বের আবিষ্ক্রিয়া করিতেছে; কিন্তু নীতিশাস্ত্র কোন নূতন কথা কহিতে পারে না। দূরবীক্ষণ সহযোগে গগনচর অসংখ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলের আকৃতি প্রকৃতি নির্ণীত হইতেছে; অণুবীক্ষণ সহকারে জলবিন্দুস্থিত কোটি কোটি কীটাণুগণের জীবনযাত্রা পর্য্যবেক্ষিত হইতেছে; উচ্চ হইতে উচ্চতর নৈসর্গিক নিয়মনিরূপণদ্বারা সমুদায় বিশ্বব্যাপার সম্বন্ধ ঘটনামালা বলিয়া প্রতীত হইতেছে; আড়াই শত বৎসরের পূর্ব্বে বিজ্ঞানের যেরূপ অবস্থা ছিল, এক্ষণে তাহা হইতে কত বিভিন্ন হইয়াছে। গতি, আলোক, তড়িৎ, তাপ, শব্দ প্রভৃতি

* সুপ্রসিদ্ধ পুরাবৃত্তবিৎ বাক্ল্ "সভ্যতার ইতিহাস" নামক গ্রন্থে এই মত সমর্থন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন।

পদার্থ নবীন ভাব ধারণ করিয়াছে; জ্যোতিষ, রসায়ন, শরীরতত্ত্ব, ও সমাজ তত্ত্বে কত অভিনব সত্য উদ্ভাবিত হইয়াছে। কিন্তু তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে অপেক্ষাকৃত অসভ্য য়িহুদী ব্যাবস্থাপক মুসা যে সকল নীতি বিষয়ক উপদেশ দিয়াছেন, সভ্যতাভিমানী ইউরোপ বাসীরা তাহা অপেক্ষা কি অধিক দিতে পারেন? আর যে ভারতবর্ষকে উপধর্ম্মসঙ্কুল বলিয়া তাঁহারা ঘৃণা করেন, সে ভারতবাসী মনু ও বুদ্ধ প্রাচীনকালে যেরূপ সুনীতির নিয়ম সংস্থাপন করিতে যত্ন পাইয়াছেন, তদতিরিক্ত তাঁহারা কি জানেন? যদি মত পরিত্যাগ করিয়া চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে কি ইদানীন্তন কালীন সভ্যজাতিদিগকে অন্যাপেক্ষা সচ্চরিত্র বোধ হয়? যাহারা ইউরোপ ও আমেরিকার মদ্যপায়িতা, অর্থলোভ, ইন্দ্রিয়সুখাশক্তি ও স্বার্থপরতার প্রতি দৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা কখনই একথা স্বীকার করিবেন না। তাঁহারা বর্ত্তমান কালস্থ সভ্যনামগর্ব্বিত সমাজ সমূহে ভীষণমূর্ত্তি দরিদ্রতার প্রবলতা ও দীনা হীনা নিরূপায়া অবলাকুলের দুরবস্থা দেখাইয়া উন্নতপদবীবিশিষ্ট শুভ্রকান্তি মহাত্মাগণের নৈতিক অনুন্নতি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পান। তাঁহারা বলেন, যেখানে একদিকে কতকগুলিন লোকে অতুল ঐশ্বর্য্যভোগে জগতীতলস্থ সমস্ত উপাদেয় পদার্থে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে, আর অন্য দিকে "হা অন্ন, হা বস্ত্র" করিয়া অসংখ্য বুদ্ধিজীবী জীবে কষ্টশ্রেষ্টে কথঞ্চিতরূপে দিনপাত করত অকালে কালের করাল কবলে কবলিত হইতেছে; সেখানে কখনই সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের কর্ত্তব্যজ্ঞান অন্যদেশীয়দিগের অপেক্ষা অধিক নাই।

মনুষ্যের নীতিবিষয়ে উন্নতি হইয়াছে কি না এবং সভ্যতারৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কিরূপ নৈতিক পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, আমরা এই প্রস্তাবে মীমাংসা করিতে যত্ন করিব, কতদূর কৃতকার্য্য হইব, সাহস করিয়া বলিতে পারি না।

মনুষ্যের আদিমকালের অবস্থা আমরা কিছুই জানি না। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন অন্যূন লক্ষ বর্ষ নরজাতি অবনীমণ্ডলে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে; কিন্তু এই বিস্তীর্ণসময়ের মধ্যে আমরা কেবল কোন কোন দেশের শেষ তিন চারি হাজার বৎসরের ইতিহাসের কিয়দংশ মাত্র অবগত আছি। যদি এই অল্পকালের মধ্যে বিশেষ নৈতিক উন্নতি প্রত্যক্ষীভূত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে যে নীতিবিষয়ে লক্ষ বৎসরে কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই, এ প্রকার উক্তি যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না; কিন্তু কেহ কেহ বলিতে পারেন, প্রায় সকল দেশেই জনপ্রবাদ আছে যে, পূর্ব্বকালে লোকে অপেক্ষাকৃত ধার্ম্মিক ছিল, আমাদিগের দেশীয় সত্যযুগ এবং যবন ও রোমক জাতির স্বর্ণযুগ প্রাচীনদিগের নীতিশ্রেষ্ঠতা বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। খ্রীষ্টানদিগের ধর্ম্মপুস্তকেও বলে প্রথমে মনুষ্য নিষ্পাপ ছিল, পরে সয়তানের কুহকে পড়িয়া পাতকপঙ্কে পতিত হইয়াছে। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন জাতির পুরাতন গ্রন্থপাঠে প্রতীত হইতে পারে যে, কালসহকারে নরজাতির নৈতিক অবনতি হইতেছে। এ

বিষয়ে আমাদিগের উত্তর এই যে স্বভাবতঃ পিতা মাতা এবং বৃদ্ধগণের প্রতি মানবগণের যথেষ্ট ভক্তি আছে, আপনাদিগের সমবয়স্ক চপল স্বভাব যৌবনোন্মত্ত ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা তাহাদিগকে সচ্চরিত্র দেখিয়া প্রাচীনদিগকে অপেক্ষাকৃত ধার্ম্মিক বলিয়া অনেকের ভ্রম জন্মিতে পারে ; বিশেষতঃ সমকালীন লোকদিগকে যেমন পাপে লিপ্ত দেখিতে পায়, অতীতকালের বিষয়ে জ্ঞান না থাকাতে পূর্ব্বকালস্থ লোকেরা সেরূপ পাপে লিপ্ত ছিল, পুরাবৃত্তানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভাবিতে পারে না। আমরা বর্ত্তমান কাল ও সমীপস্থ পদার্থের প্রতি অসন্তুষ্ট, কারণ তাহাদিগের দোষ পদে পদে লক্ষিত হয় ; কিন্তু দূরস্থ ও অজ্ঞাত বস্তুচয় আমাদিগের নিকট রমনীয় মূর্ত্তি ধারণ করে। এজন্যই আমরা পদতলস্থ শ্যামল শস্যক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া অস্পষ্ট বিজন বন্ধুর তুঙ্গগিরি-শৃঙ্গের প্রতি দৃষ্টি করি। এজন্যই আমরা সুখ-দুঃখ-মিশ্রিত বর্ত্তমান জীবন প্রবাহ পরিহারার্থে স্মৃতিপথে বাল্যকালাভিমুখে গমন করি, এবং আশার সাহায্যে অজ্ঞেয় ভবিতব্যবর্ত্মে ধাবিত হই। এজন্যই লোকে অন্ধতমসাবৃত অলক্ষ্য অতীত প্রদেশে সত্য বা স্বর্ণযুগ বিরাজমান দেখে। এজন্যই দুঃখময় কলির অবসানে ভারতবাসীগণ পুনরায় সত্যযুগের আবির্ভাব এবং য়িহুদী ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ীরা "মিলিনিয়ম" কল্পনা করিয়াছেন।

অতি প্রাচীন কালে মনুষ্যের যে অতীব হীনাবস্থা ছিল, যাঁহারা "ডারউইন্ ও ওয়ালেস্" সাহেবের মতাবলম্বী তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন।* যদি নর ও বানর উভয় জাতিই এক বংশ জাত হয়, তাহা হইলে মানব কুলের যে নীতিবিষয়ে উন্নতি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বিজ্ঞানবেত্তৃপ্রিয় দিগন্তপ্রসারী মত সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, পুরাতন জনশ্রুতি, অসভ্য জাতিদিগের বর্ত্তমানাবস্থা, এবং বিগত ত্রিসহস্র বর্ষের ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে সভ্যজাতিগণ যে অপেক্ষাকৃত সুনীতিসম্পন্ন হইয়াছে, স্পষ্ট প্রতীতি হইবে।

রামায়ণ পাঠে জানা যায় যে, পূর্ব্বকালে আমাদিগের দেশে নরবলি প্রচলিত ছিল।† পরে যখন বিবেচনা

* ডারউইন্ ও ওয়ালেস উভয়েই পরিণামবাদী। ইঁহাদিগের মতে অবস্থা ভেদে ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প পরিবর্ত্তন ঘটিয়া কাল সহকারে ইতর জন্তু হইতে উচ্চতর জীব সকল উৎপন্ন হইয়াছে।

† বালকাণ্ড রামায়ণ, ৬১ ও ৬২ সর্গ, শুনঃশেপের উপাখ্যান দেখ। কয়েকটী শ্লোকমাত্র এখানে উদ্ধৃত হইল।

এতস্মিন্নেব কালেতু অযোধ্যাপতি র্মহান্।
অম্বরীষ ইতি খ্যাতো যষ্টুং সমুপচক্রমে॥
তস্য বৈ যজমানস্য পশুমিন্দ্রোজহার হ।
প্রণষ্টেতু পশৌ বিপ্রো রাজানমিদমব্রবীৎ॥
পশুরভ্যাহৃতো রাজন্ প্রণষ্টস্তব দুর্ণয়াৎ।
অরক্ষিতারং রাজানং ঘ্নন্তি দোষা নরেশ্বর॥
প্রায়শ্চিত্তং মহদ্ধ্যেতৎনরং বা পুরুষর্ষভ।
আনয়স্ব পশুং শীঘ্রং যাবৎ কর্ম্ম প্রবর্ত্ততে॥

এই কালে অম্বরীষ নামে খ্যাত মহান্ অযোধ্যাধিপতি যজ্ঞারম্ভ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞের পশু ইন্দ্র হরণ করিলেন। সে পশু অপহৃত হইলে বিপ্র রাজাকে বলিলেন। "রাজন্ তোমার দুর্নীতি নিমিত্ত সংগৃহীত পশু অপহৃত হইয়াছে। হে নরেশ্বর, রক্ষাকার্য্য প-

হইল যে "অহিংসাই পরম ধর্ম্ম," তখন কি আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণ নীতি বিষয়ে উন্নতির পথে এক পাদ অগ্রসর হন নাই ? মহাভারতে প্রকটিত আছে আদিমকালে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিসংক্রান্ত স্বেচ্ছাচারিতা সৎকার্য্য বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইত; কোন স্বজাতীয় পুরুষে বাসনা প্রকাশ করিলে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করাই নারীগণের প্রধান ধর্ম্ম ছিল। পরে যখন শ্বেতকেতুর ধর্ম্মবুদ্ধি প্রভাবে সতীত্বের স্থষ্টি হইল, তখন কি আর্য্যগণ নৈতিক উন্নতিসোপানে কিয়দ্দূর ঊর্দ্ধগামী হন নাই ?† শত্রুবিনাশের অনেক প্রশংসা রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতিতে দেখা যায় ; কিন্তু "যেমন চন্দন বৃক্ষ ছেদনকালে ও ছেদনকারীকে সুগন্ধদান করে, তেমনি সাধুব্যক্তি মরণকালেও প্রাণাপহারক অপকারকের উপকার করেন," এই মহাবাক্য যখন সত্য বলিয়া পরিগৃহীত হইল, তখন কি পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিন্মাত্র সুনীতিবৃদ্ধি হয় নাই ?

রাঙ্মুখ রাজাকে দোষ সকল নষ্ট করে। কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইতে, হে পুরুষর্ষভ, হয় সেই পশুকে নতুবা মহৎ প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কোন নরকে শীঘ্র আনয়ন কর।

† অনাবৃতাঃ কিল পুরা স্ত্রিয় আসন্ বরাননে।
কামচারবিহারিণ্যঃ স্বতন্ত্রাশ্চারুহাসিনি ॥
তাসাংব্যুচ্চরমাণানাংকৌমারাৎসুভগেপতীন্।
না ধর্ম্মোহভূদ্বরারোহে সহিধর্ম্মঃ পুরাভবৎ॥
প্রমাণদৃষ্টো ধর্ম্মোহয়ং পূজ্যতে চ মহর্ষিভিঃ।
উত্তরেষু চ রম্ভোরু কুরুষ্বদ্যাপি পূজ্যতে॥
স্ত্রীণামনুগ্রহকরঃ স হি ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
অস্মিংস্তুলোকে ন চিরান্মর্য্যাদেয়ংশুচিস্মিতে॥
স্থাপিতা যেন যস্মাচ্চ তন্মে বিস্তরতঃ শৃনু।
বভূবোদ্দালকো নাম মহর্ষিরিতি নঃ শ্রুতম্।
শ্বেতকেতুরিতি খ্যাতঃ পুত্রস্তস্যা ভবন্মুনিঃ॥
মর্য্যাদেয়ং কৃতা তেন ধর্ম্ম্যা বৈ শ্বেতকেতুনা।
কোপাৎ কমলপত্রাক্ষি যদর্থংতংনিবোধ মে॥
শ্বেতকেতোঃ কিল পুরা সমক্ষংমাতরং পিতুঃ।
জগ্রাহ ব্রাহ্মণঃ পাণৌ গচ্ছাব ইতি চাব্রবীৎ ॥
ঋষিপুত্রস্ততঃ কোপং চকারামর্ষচোদিতঃ।
মাতরং তাং তথা দৃষ্ট্বা শ্বেতকেতুমুবাচ হ।
মা তাত কোপং কার্ষীস্ত্বমেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥
অনাবৃতা হি সর্ব্বেষাং বর্ণানামঙ্গনা ভুবি।
যথা গাবঃ স্থিতাস্তাত স্বে স্বে বর্ণে তথা প্রজাঃ॥
ঋষি পুত্রোহথ তং ধর্ম্মং শ্বেতকেতুর্ন চক্ষমে।
চকারচৈব মর্য্যাদা মিমাংস্ত্রীপুংসয়োর্ভুবি॥
মানুষেষু মহাভাগে নত্বেবান্যেষু জন্তুষু।
তদা প্রভৃতি মর্য্যাদা স্থিতেয় মিতি নঃ শ্রুতম্॥
ব্যুচ্চরন্ত্যাঃ পতিংনার্য্যা অদ্যপ্রভৃতি পাতকং।
ভ্রূণহত্যাসমং ঘোরং ভবিষ্যত্য সুখাবহম॥
১২২ অধ্যায়। আদিপর্ব্ব। মহাভারত।

হে সুমুখি চারুহাসিনি পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোকেরা অরুদ্ধ স্বাধীন ও সচ্ছন্দবিহারিণী ছিল। পতিকে অতিক্রম করিয়া পুরুষান্তরে উপগতা হইলে তাহাদের অধর্ম্ম হইত না, পূর্ব্বকালে এই ধর্ম্ম ছিল। ইহা প্রামাণিক ধর্ম্ম, ঋষিরা এই ধর্ম্ম মান্য করিয়া থাকেন, উত্তর কুরু দেশে অদ্যাপি এই ধর্ম্ম মান্য ও প্রচলিত আছে। এই সনাতন ধর্ম্ম স্ত্রীদিগের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। যে ব্যক্তি যে কারণে লোকে এই নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, তাহা বিস্তারিত কহিতেছি শুন। শুনিয়াছি উদ্দালোক নামে মহর্ষি ছিলেন, শ্বেতকেতু নামে তাঁহার এক পুত্র ছিলেন। সেই শ্বেতকেতু যে কারণে কোপাবিষ্ট হইয়া এই ধর্ম্ম যুক্তনিয়ম স্থাপন করিয়াছেন তাহা শুন। একদা উদ্দালক শ্বেতকেতু ও শ্বেতকেতুর জননী তিন জনে উপবিষ্ট আছেন। এমত সময়ে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া শ্বেতকেতুর মাতার হস্তে ধরিলেন এবং এস যাই বলিয়া একান্তে লইয়া গেলেন। ঋষিপুত্র এইরূপে জননীকে নীয়মানা দেখিয়া সহ্য করিতে না পারিয়া অত্যন্ত কুপিত

প্রাচীনকালে যে সর্ব্বদেশে নরবলি প্রদত্ত হইত, তাহার অণুমাত্র সংশয় নাই। ফিনিসীয়া, কার্থেজ, গ্রীস, যিহুদী ভূমি, ইংলণ্ড,এবং ভারতবর্ষের বিষয়ে ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। অদ্যাপি এতদ্দেশস্থ অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে এ কুপ্রথা চলিত আছে। যখন আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়, সেখানেও এই নৃশংস ব্যাপার প্রচুর পরিমাণে লক্ষিত হইয়াছিল। আমাদিগের অনুমান হয়, যাহারা নরবলি প্রদান করিত, তাহারা কোন না কোন সময়ে নরমাংসাশী ছিল; কারণ নরমাংস সুখাদ্য বলিয়া বোধ না হইলে কখনই দেবতাগণের সন্তোষ সাধনার্থে তাহা দিতে প্রথমে প্রবৃত্তি হইত না। এখনও অনেক অসভ্য জনপদে নরমাংস-ভক্ষণ চলিতেছে। এতদ্দেশীয় গ্রন্থনিচয়ে যে রাক্ষসদিগের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহারা, বোধ হয়, এই রূপ মানবভোজী ছিল। এই সমুদায় পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে যে, আদিকালে মনুষ্যগণ অন্যলোককে আপনার আয়ত্ত করিতে পারিলে তাহাকে মারিয়া আহার করিত। এই রাক্ষস বংশে বর্ত্তমানকালস্থ সভ্যজাতিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ভাবিলেই তাঁহারা নীতি বিষয়ে কত উন্নত হইয়াছেন, কতকদূর অনুভূত হইবে। ইহাঁদিগের যে রূপ দয়া দাক্ষিণ্য, আচার ব্যবহার, তাহাতে ইহাঁদিগকে মুক্তকণ্ঠে দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ বলিতে হয়।

অনেক অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে কেহ সতীত্ব ধর্ম্ম কাহাকে বলে জানে না। যদি বর্ত্তমান কালীয় সভ্যজাতিদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ তাদৃশ দশাপন্ন এক কালে ছিলেন, এই মতটী প্রামাণ্য হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগের অনেক নৈতিক উন্নতি হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে; কারণ তাঁহাদিগের ধর্ম্মে বলে কোন নারীর বিষয়ে মনে মনে অসৎ ইচ্ছা করাও পাপ।

অসভ্যজাতিগণ অন্যজাতীয় লোকদিগকে শত্রুজ্ঞান করে,এবং শত্রুবধ করাকে পুণ্যভাবে। সভ্যজাতিগণের মধ্যে এই ভাব অনেক দূর তিরোহিত হইয়াছে। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীগণ অন্ততঃ মুখেও বলিবেন, "সকল মনুষ্যই পরমেশ্বরের সন্তান, আমরা সকলেই এক পিতার পুত্র, আমরা সকলেই ভ্রাতা,পরস্পরের প্রতি প্রীতি করা আমাদিগের কর্ত্তব্য।"কার্য্যে যাহা হউক, এরূপ মিষ্ট কথা শুনিলেও কর্ণ জুড়ায়— এরূপ মত প্রকাশ অনেক নীতিবিষয়ক উন্নতির নিদর্শন। যথার্থপক্ষে ইহাও বলা উচিত, যে ইউরোপ ও আমেরিকা খণ্ডে

হইলেন। উদ্দালক শ্বেতকেতুকে কুপিত দেখিয়া কহিলেন, বৎস, কোপ করিও না, এ সনাতন ধর্ম্ম। পৃথিবীতে সকল বর্ণেরই স্ত্রী অরক্ষিতা। গোজাতি যেমন সচ্ছন্দ বিহার করে, মনুষ্যেরাও সেইরূপ স্ব স্ব বর্ণে সচ্ছন্দে বিহার করে। ঋষিপুত্র শ্বেতকেতু সেই ধর্ম্ম সহ্য করিতে না পারিয়া পৃথিবীতে স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধে এই নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন। হে মহাভাগে আমরা শুনিয়াছি তদবধি এই নিয়ম মনুষ্য জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে; কিন্তু অন্যং জন্তুদিগের মধ্যে নহে। অতঃপর যে নারী পতিকে অতিক্রম করিবেক, তাহার ভ্রূণ হত্যার সমান অসুখজনক ঘোর পাতক জন্মিবেক।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

অনেক মহাত্মা আছেন, যাঁহারা পরোপকারব্রতে নিয়ত ব্রতী রহিয়াছেন, যাঁহারা ধর্ম্মভেদ, বর্ণভেদ, জাতিভেদ না দেখিয়া চিরজীবন মানববংশের মঙ্গল-চেষ্টা করিতেছেন।

অসভ্যজাতিগণ যাহাদিগকে আহার না করে বা মারিয়া না ফেলে, তাহাদিগকে দাস করিয়া রাখে। প্রাচীন হিন্দু, গ্রীক, রোমক, প্রভৃতি সভ্য জাতিও দাসত্ব অবৈধ জ্ঞান করেন নাই। আরিষ্টটল্ ও মনু দাসত্বকে নীচ জাতির স্বাভাবিক অবস্থা বিবেচনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় শুদ্র, গ্রীসের "হেলট," রোমের "গ্লাডিয়েটর," সমাজের দাস স্বরূপ ছিল; তাহারাই উচ্চশ্রেণীস্থ জনগণের সেবাসুশ্রুষা করিত। অন্যের কথা দূরে থাকুক, সেন্টপল নামক বিখ্যাত খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক অসামান্যধীশক্তি-প্রভাবেও দাসত্ব যে নীতি বিরুদ্ধ, ইহা বুঝিতে পারেন নাই; কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধির সহকারে অল্পদিন হইল এই নীতি বিষয়ক প্রত্যয়টী সভ্যজাতিদিগের মধ্যে জন্মিয়াছে যে মনুষ্যকে দাস করিয়া রাখা অত্যন্ত অন্যায়; সকল লোকেই সমান. সকল লোকেই স্বাধীন, হওয়া উচিত। মানবগণের সমানতা ও স্বাধীনতা রূপ মহাবাক্য প্রথম ফরাসিস্ রাজবিপ্লবে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে উচ্চারিত হয়। ইহা একটী নীতিশাস্ত্রের নূতন তত্ত্ব—বর্ত্তমান সভ্যজাতিদিগের প্রকাশিত। ইহা অত্যল্পকাল মধ্যে অনেকগুলি মহৎকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে। ইহার প্রতাপে আফ্রিকার দাস বিক্রয় বন্ধ হইয়াছে, আমেরিকা ও রুসিয়ার বহুসংখ্যক লোকে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং স্ত্রীজাতির নীচাবস্থা দুর করিবার চেষ্টা হইতেছে পরিণামে যে ইহা দ্বারা মনুষ্যসমাজের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইবে, যিনি মনোযোগ পূর্ব্বক ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন তিনিই স্বীকার করিবেন।

যাঁহারা উপরে উপরে দেখেন তাঁহারা নরজাতির নৈতিক উন্নতি দেখিতে পান না; তাঁহারা বলেন, প্রাচীনেরাও যে উপদেশদিতেন, নব্যেরাও তাহাই দেন। মিথ্যা কথা কহিবে না, পরদ্রব্য অপহরণ করিবেনা, পরদারা হরণ করিবে না, পরের অপকার করিবে না, এই কথাই চিরকাল শুনা যাইতেছে; কিন্তু যখন ঈশা বলিলেন যে মনের সহিত ঈশ্বরকে ও লোক সকলকে প্রীতি করাই সকল ধর্ম্মের সার; তখন কি জগতীতলে নূতন নীতিপুষ্প বিকসিত হইল না? যেমন জগদ্বিখ্যাত নিউটন্ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করিয়া দেখাইয়াছেন যে তদ্দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডস্থ সমস্ত জড়পিণ্ড সম্বদ্ধ, তদ্রূপ ঈশা প্রকাশ করিয়াছেন যে মনুষ্য সমাজ সুখময় করিতে হইলে প্রীতিবন্ধনে সকলের বদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য। এই প্রীতির অর্থ অদ্যাপি লোকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই। নবাবিষ্কৃত সমানতা ও স্বাধীনতা এই প্রীতির গাঢ় ভাব দিন দিন উজ্জ্বলতর করিবে; এবং সকলেই স্বাধীন, সকলেই সুখ ভোগে সমান অধিকারী, এই ভাবিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিই যখন প্রীতিপূর্ণচিত্তে সকলের প্রিয়কার্য্য করিতে সযত্ন হইবে, তখন অবনীমণ্ডল নূতন শোভা ধারণ করিবে।

পূর্ব্বে যাহা যাহা উক্ত হইয়াছে তদ্দ্বা-

রা নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ের প্রমাণ হইতেছে।—

১। অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে যে পরিমাণে নির্দ্দয় ও অশিষ্ট ব্যবহার দৃষ্ট হয়, সভ্য জাতিদিগের মধ্যে তদপেক্ষা অনেক কম।

২। অনৈতিহাসিক সময়স্থ প্রাচীনদিগের যেরূপ নৃশংসতা ও স্বেচ্ছাচারিতার জনশ্রুতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, নব্য সভ্য জাতিদিগের সেরূপ অহিতাচার নাই।

৩। ঐতিহাসিক কালে প্রীতি, সমানতা, স্বাধীনতা প্রভৃতি কয়েকটী নূতন নীতিতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া দিন দিন মনুষ্য সমাজের সংস্কার করিতেছে।

অতএব বলা যাইতে পারে মানবকুলে জ্ঞানেরও যেমন উন্নতি আছে, নীতিরও তেমনি উন্নতি আছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ।

অনুষ্ঠান পত্র।

ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশ অপেক্ষা বিদ্যানুশীলন ও সভ্যতা বর্দ্ধনে বাঙ্গালা প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে অগ্রগামী হওয়াতে, ভারতবর্ষের অপরাপর প্রদেশের সাহিত্যাপেক্ষা বঙ্গীয় সাহিত্য উৎকর্য প্রাপ্ত হইয়া, ইউরোপীয় সাহিত্য সদৃশ হইতেছে। পৌরাণিক ইতিহাসের বারম্বার অনুকরণ এবং সামান্য শিশুবোধ অথবা অশ্লীল উপন্যাস পরিত্যাগ করিয়া, বাঙ্গালীরা এক্ষণে গদ্যকাব্য নাটক, দেশ পর্য্যটনবৃত্তান্ত, ইতিহাস, বিজ্ঞান, পদ্য কাব্য, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখিতেছে। অতএব বঙ্গভাষাকে প্রণালীবদ্ধ করিয়া তাহার একতা সম্পাদন করিবার ও সাহিত্যে প্রয়োগযোগ্য ভাষা নির্ণয় করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

এক্ষণে বাঙ্গালায় দুই দল দেখা যায়। এক দল পাণ্ডিত্যাভিমানে অপর্য্যাপ্ত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে প্রযত্নশীল। সাধারণ সমাজে তাঁহাদের ব্যবহৃত কঠিন শব্দ সকল বুঝে কি না, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, বাঙ্গালাকে তাঁহারা সংস্কৃত করিতে চাহেন। অপর দল ইতর ও স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করত সুশিক্ষিত সংস্কারের প্রতিযোগী হইয়া উঠিতেছেন।

ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে, সংস্কারবিশিষ্টা পাঁচটি প্রধান ; ইংরাজি, ফ্রেঞ্চ, জরমান, ইটালীয়, এবং স্পানীয়। তত্তদেশীয় সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের পাঠযোগ্য পুস্তকাদির জন্য, এক একটী পৃথক্ ও সুনির্ণীত ভাষা অবধারিত আছে। সুশিক্ষিত ইংরাজেরা ইংলণ্ডের যে প্রদেশ বা বিভাগ হইতেই লিখুন, এক ভাষাতেই লিখিবেন। বলটিক হইতে আল্প পর্য্যন্ত সকল জরমান জাতি, সাবয় হইতে পালামো পর্য্যন্ত সমস্ত ইটালীয়েরা, লিলে হইতে মারসেল পর্য্যন্ত সকল ফরাসিসেরা, এবং কাটালান গালিসিয়ান আণ্ডালুসিয়ান কাষ্টিলিয়ান প্রভৃতি সমস্ত স্পানীয়েরা, এক এক সুনির্ণীত

সাধুভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং সেই সেই ভাষাতে ব্যাকরণ ভেদ অথবা নির্ণীত শব্দ সকলের বিভিন্নতা কুত্রাপি দেখা যায় না।

অথচ প্রাচীন কালে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে, ঐ ঐ সকল ভাষার ঐক্য ছিল না। ইংলণ্ডে "হাবলক দি ডেন" লিঙ্কন্ প্রদেশের স্থানীয় ভাষায়, "পিয়র্স প্লৌমান" হান্ট্স্ প্রদেশের স্থানীয় ভাষায় লিখিত। বারবর এবং সরডেবিড লিণ্ডসে উত্তর প্রদেশীয় ইংরাজি অর্থাৎ "লোলাণ্ড" স্কচে লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই সকল গ্রন্থকার যে স্থানীয় ভাষায় লিখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের উপলব্ধিও হয় নাই। মধ্যস্থিত সর্ব্বমান্য কোন ভাষার সহিত তুলনা না করিলে খণ্ডদেশস্থিত কোন-ভাষাকে স্থানীয় ভাষা অথবা অপভ্রংশপ্রাপ্ত ভাষা বলা যায় না, এবং মধ্যস্থিত সাধারণের গ্রাহ্য কোন ভাষা "লিণ্ডসের" স্কচ, এবং লাংলাণ্ডের ষ্টাফোর্ডসায়র ইংরাজি বলিয়া অবশ্য পরিগণিত হইতে পারে না।

সপ্তম হেনরির রাজ্য কালে বিদ্রোহ শান্তি হয়। তদনন্তর তাঁহার পুত্রের অমাত্যবর্গ মহাপ্রভাশীল ধনগুণবিশিষ্ট মহাত্মাগণ লণ্ডন মহানগরকে শোভিত করাতে সহজেই ঐ স্থানের ভাষা সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতভাব গ্রহণ করিয়াছিল। এবং এলিজেবেথের রাজ্যকালে অদ্বিতীয় এবং চিরস্মরণীয় কতিপয় লেখকচূড়ামণির দ্বারা উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদি লিপিবদ্ধ হইলে ইংরাজি ভাষা স্থিরীকৃত হইয়া উঠিয়াছিল। যে ভাষায় সেক্ষপিয়র লিখিয়াছেন, তাহার সহিত অপর স্থানীয় ভাষার তুলনা বিরহ জন্য, তদবধি আধুনিক ইংরাজি ভাষা স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

ফ্রান্সে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, ষষ্ঠ শতাব্দীতে তদ্রাজ্যের যেরূপ ছিন্নাবস্থা, ভাষারও তদ্রূপ। উক্ত দেশে তৎকালে অসংখ্য ভাষা প্রচলিত হয়। সে সকল ভাষাই লাটিন ভাষা হইতে উৎপন্ন, কিন্তু কেল্ট এবং জরমান ভাষা মিশ্রিত প্রবেন্সল্, অর্থাৎ অক ভাষা এবং ফ্রেঞ্চ অর্থাৎ অএল ভাষা প্রধান। নরমান্ পিকার্দে এবং অপরাপর ভাষা সকলেই সমভাবাপন্ন ও সমকক্ষ হইয়া প্রচলিত হয়, এবং বড়২ লেখকেরাও আপনাপন স্থানীয় ভাষায় গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। উক্ত সকল ভাষার মূল দুইটী, প্রথম ফ্রেঞ্চ, দ্বিতীয় প্রবেন্সল। উত্তর প্রদেশীয় ভাষা অর্থাৎ ফ্রেঞ্চ, ফ্রান্সের সীমার বাহিরেও ব্যবহৃত হইত, অর্থাৎ ইংলণ্ডীয়, ইটালীয় ও জরমানির ভদ্র সমাজে প্রচলিত ছিল। যদিও এই ভাষা ক্রমে একতা প্রাপ্ত হইতেছিল, কিন্তু ষষ্ঠদশ শতাব্দী পর্য্যন্তও তাহার উচ্চারণ, বর্ণবিধান, এবং ব্যাকরণের বিশুদ্ধাবস্থা হয় নাই। ১৫৫৯ শালে এলিয়ট এবং ১৫৮০ শালে মল্টেন ফ্রেঞ্চ ভাষার প্রথমে একতা বদ্ধ করেন।

১৬৩৫ শালে কার্দিনাল্ রিশলু ফ্রেঞ্চ একাডেমি স্থাপন পূর্ব্বক দেশীয় ভাষার সংশোধন ও একতা বদ্ধমূল করিয়াছিলেন।

জরমানি ফ্রান্স হইতে অধিকতর বিস্তৃত। সহজেই তদ্দেশে ভাষাভেদের আরও আধিক্য ছিল, এবং জরমানি রোমরাজ্যের অধীন না হওয়ায় একতা

লাভের বিশেষ উপায়ও হয় নাই।

জরমানির প্রাচীন ভাষার অল্প মাত্রই উদাহরণ এক্ষণে পাওয়া যায়, যথা, ৩৫০ খৃষ্টাব্দে আলফিলাসের মিসোগথিক, ৪৯০ খৃষ্টাব্দে কয়েকটী শব্দ ফ্রাঙ্কিস এবং কিঞ্চিৎ আলিমানিক পাওয়া যায়। অনেক দিবসাবধি এক রাজার শাসনাধীন হওয়া প্রযুক্ত ফ্রাঙ্কিস্ আলিমানিক এবং বাবেরিয়ান্ ভাষাত্রয় ক্রমে মিলিত হইয়া এক ভাষা প্রায় হইয়া, হাইজরমান নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এবং অপর অপর ভাষা ঐরূপ মিলিত না হওয়া প্রযুক্ত তাহা "লোজরমান" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। স্থানীয় জরমান ভাষা সকল যে প্রণালীতে ক্রমে একতাভাব গ্রহণ করিয়াছে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ এস্থলে অনাবশ্যক। ৮০০ খৃঃ "কারল দি গ্রেট" কর্ত্তৃক বিদ্যানুশীলনের উন্নতি হইয়াছিল, কিন্তু অল্পকাল মাত্র স্থায়ী ছিল। রাজবংশ ফ্রাঙ্কিস্ থাকা জন্য ভাষাও ফ্রাঙ্কিস্ ছিল। অটফ্রিড এবং রেবেলসের এবং অপর অপর গ্রন্থকারের রচনা অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে। ইহার মধ্যে কতক লোজরমানে কতক সাক্ষণে, কতক ফ্রাঙ্কিসে লিখিত। অনেক কালাবধি এই মত ভাষা ভেদই প্রচলিত থাকে। কখন সাক্ষণ কবিরা, কখন স্বাবিয়ান লেখকেরা, কখন লোজরমান গ্রন্থকারেরা উন্নতিশীল হইয়াছিলেন, কিন্তু নব্য হাইজরমান সাধুভাষা মহাতেজস্বী বহুজ্ঞানাপন্ন লুথর মহোদয়ের দ্বারা স্থাপিত হয়। উত্তরাঞ্চলের লোডচ এবং বোভেরিয়ার ভাষার মধ্যবর্ত্তী সাক্ষণির ভাষা অবলম্বন করিয়া তিনি সাধারণের উপকারার্থে বহু পরিশ্রমে এবং মহাযত্ন সহকারে ভদ্র সমাজের সাধুভাষাতে ধর্ম্ম পুস্তক অনুবাদ করিয়া তাহা ১৫০৪ খৃঃ প্রকাশিত করেন। এই সাধুভাষা ক্রমে স্থানীয় ভাষা সমূহকে লুপ্ত করিয়া জরমানির ভদ্র সমাজের ভাষা হইয়াছে।

ইটালীও ঐ মত নানা স্থানীয় ভাষায় পূর্ণ ছিল। এই দেশে যদিও ভদ্র সমাজে শত শত বৎসরাবধি লাটিন ভাষা ব্যবহার হইত, কিন্তু অনুমান করিতে পারা যায় যে সাধারণ লোকে আপন আপন স্থানীয় ভাষা কখনই ত্যাগ করে নাই। যষ্ঠ শতাব্দীতে ইটালীতে বিদ্যা লুপ্ত হয়, এবং পাঁচশত বৎসর পর্য্যন্ত ভাষার একতাও উদ্দীপনা সাহিত্যাদির আলোকাভাবে ইটালী অন্ধকারপূর্ণ ছিল। একাদশ শতাব্দী হইতে কিঞ্চিৎ উন্নতি আরম্ভ হইয়া, দ্বাদশ শতাব্দীতে ইটালীর প্রভাত তারার স্বরূপ দান্তে এবং পেত্রার্কার উদয় হয়। এই কবিদ্বয়ের গভীর ও স্থায়ী গুণ সকল সমস্ত দেশ মধ্যে প্রচারিত হইলে, ইটালীয় ভাষার একতা আরম্ভ হয়, কিন্তু দেশীয় "একাডেমি" হইতে তাহার স্থায়িত্ব এবং নির্ণীতাবস্থা প্রাপ্তি হয়।

ইটালী দেশীয় সমস্ত একাডেমি মধ্যে ফ্লরেন্স নগরের একাডেমি সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। এই সভা ১৫৪০ খৃঃ স্থাপিত হয়। এতৎকালে ইটালীয় ভাষা টস্‌কান্ নামে বিখ্যাত ছিল। টস্‌কান্ ভাষার সংশোধন করণাভিপ্রায়ে এই একাডেমির নিয়োগ করা হয়। ইটালির অন্যান্য নগরে বহু সংখ্যক এই প্রকার একাডেমি স্থা-

পিত হয়,কিন্তু ফ্লরেন্সের একাডেমি সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলদায়ক হইয়াছিল। এই একাডেমির কয়েক জন সভ্য মূলসভা পরিত্যাগ করিয়া নূতন অপর এক সভা স্থাপিত করেন, তাহার নাম "একাদামি দেলা ক্রুস্কা"। চালুনির মত দোষ ছাঁকিয়া ফেলা ইহার উদ্দেশ্য, সেই জন্য ঐ নাম। স্বদেশে যে যে পুস্তকাদি প্রকাশ হইত তাহার দোষ গুণ বিচার করা এই সভার সভ্যদিগের কার্য্য, এবং রচনা সকলের গুণের প্রশংসা এবং দোষের নিন্দা করিয়া তাঁহারা দেশীয় লোকের বিচারশক্তির এবং রসগ্রাহিতার উৎকর্ষ সম্পাদন করিয়াছিলেন। ১৫৯০ খৃঃ এই সভা হইতে "বকেবলেরিয়া ডিলা ক্রুস্কা" নামক প্রথম শুদ্ধ ইউরোপীয় অভিধান প্রকাশিত হয়।

গথদিগের আক্রমণের পর বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত স্পেন দেশ মূর্খতান্ধকারে পূর্ণ ছিল। কিয়দংশ রাজ্য আরবগণের দ্বারা শাসিত হয়, এবং অপরাপর অংশ ক্ষুদ্র২ স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হওয়াতে সহজেই সমস্ত দেশ নানা স্থানীয় ভাষায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে কাষ্টিলিয়ানেরা তাহাদের বিখ্যাত নাটকাদি লিখিতে আরম্ভ করে। উসিনা নাহারো এবং রুহো স্পেনের আদ্য বিখ্যাত নাম, কিন্তু তথাকার অসামান্য গ্রন্থকারত্রয়,—সরবন্টিস্, লোপ দে বেগা এবং কালদেরণ আর এক শতাব্দীর পর আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ১৬০৩ খৃঃ সর বন্টিস কৃত "ডন্ কুইজট" প্রকাশ হয়। লোপের নাটকাদি তৎপরে এবং কালদেরণের পুস্তকাদি তৎপরে প্রকাশিত হয়।

পঞ্চম চারল্‌স এবং দ্বিতীয় ফিলিপের রাজ্যকালে যে২ মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করত স্বদেশকে মহাপ্রভাসম্পন্ন এবং শোভমান করিয়াছিলেন,তাঁহারা সকলই কাষ্টিলিয়ান। কবিতা ও প্রবন্ধে স্পেন অতি বিখ্যাত, কিন্তু প্রাচীন কবিতা সকলই প্রায় কাষ্টিলিয়ান ভাষাতে প্রস্তুত। কাটালান আরাগণ বিসকে গালিসিয়া আন্দালুসিয়া বলেনসিয়া এবং স্পেনের অপরাপর প্রদেশস্থ লোকে সাহিত্য প্রণয়নের দ্বারা দেশের হিতসাধন করিতে পারেন নাই। সুতরাং কাষ্টিলিয়ান্ স্পেনের সাধুভাষার পদে অভিষিক্ত হইয়াছে। সরবন্টিসের স্বদেশস্থ সকল লোকে দেশ সম্বন্ধে অদ্যাপিও আপনাদিগকে স্পানিয়ার্ড বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু ভাষার উল্লেখে তাহা 'কাষ্টালো' বলিয়া থাকে। স্পেনে, ফ্রেঞ্চ একাডেমির সদৃশ এক সভা আছে, এবং তদ্দ্বারা স্পেনের সর্ব্বতোভাবে হিতসাধন হইয়াছে।

সংক্ষেপে এবং অস্পষ্ট রূপে ইউরোপীয় প্রধান পঞ্চ ভাষার উৎপত্তি এবং উন্নতির ইতিহাস উপরে বর্ণন করা হইল। সম্প্রতি উক্ত ভাষা সকলের যে যে কারণে ক্রমে সৌন্দর্য্য ও স্থায়িত্ব বিধান হইয়াছে, তাহা লিখা যাইতেছে। এই কারণ সমূহের মধ্যে প্রধান উক্ত "একাডেমি"।

ফ্লোরেন্সের একাডেমি,এবং তদনুকরণে যে যে একাডেমি স্থাপিত হয়, তত্তৎ সভ্যোরা পেত্রার্কার গ্রন্থ সকল আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়া, ক্রমে অপরাপর প্রধান

কবিদিগের, অর্থাৎ দান্তে আরিয়স্তো এবং তাসোর রচনা এবং পলসি, বই-য়ার্দো প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর কবিদিগেরও গ্রন্থ সকল, পরীক্ষিত ও সমালোচিত করিতে আরম্ভ করেন। স্বদেশের সাহিত্যের এবং ভদ্র সমাজের কথোপকথনের উপযুক্ত ভাষা নির্ণীত ও স্থাপিত করা সভ্যদিগের উদ্দেশ্য এবং সঙ্কল্প ছিল। এতদভিপ্রায়জনিত প্রথা ও কর্ম্মপ্রণালী নিম্নে লিখিত হইতেছে। সভ্যেরা মধ্যে২ একত্র হইয়া প্রধান২ গ্রন্থকারদিগের ব্যবহৃত শব্দ ও ব্যাকরণ পদ্ধতির বিচার করিতেন। যে২ শব্দ নিয়ম সঙ্গত ও উত্তম জ্ঞান করিতেন, তাহা গ্রাহ্য এবং যাহা অশুদ্ধ ও অসামাজিক বিবেচনা করিতেন, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া, সভার মতামত প্রকাশ করিতেন। এইরূপ উৎকর্ষের এক আদর্শ ধার্য্য হইলে, লেখকেরা আপন আপন গ্রন্থ সমুদয় আদর্শ সদৃশ হইয়াছে কি না তাহার বিচার করিয়া ও নিয়মানুসারে সংশোধিত করত একাডেমির সভ্যদের বিচার জন্য অর্পিত করিতেন। সভ্যদিগের দ্বারা সংশোধিত হইলে গ্রন্থ প্রকাশিত হইত। এইরূপ বিচারে যদ্যপিও মধ্যে মধ্যে বাগাড়ম্বর, এবং বৃথা ও কঠোর তর্কে সামান্য শুদ্ধাশুদ্ধের অনেক অলীক কল্পনা হইত, কিন্তু পরিণামে যে তদ্দারা সামাজিক সাহিত্যের পরিমার্জ্জিতাবস্থা জন্মিয়াছিল তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক।

ইটালীর একাডেমি হইতে ফ্রেঞ্চ একাডেমি অধিকতর গৌরবান্বিত এবং বিখ্যাত ছিল। ফ্রেঞ্চ একাডেমির সভ্যেরা কেবলমাত্র শব্দের ও সমকালিক গ্রন্থের সমালোচনে তৃপ্ত হয়েন নাই। তাঁহারা প্রথম উদ্যম হইতেই অভিধান এবং ব্যাকরণ সৃজনে যত্নশীল হইয়াছিলেন। অভিধান সংগ্রহে, ফ্রান্সের সর্ব্বোত্তম গ্রন্থকারদিগের ব্যবহৃত উৎকৃষ্ট ফ্রেঞ্চ কথামাত্র উদ্ধৃত, এবং অশুদ্ধ অসামাজিক এবং দূরকল্পিত ভাববোধক শব্দ সকল ত্যাগ করা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য। ভদ্র সমাজে সাধারণ বাক্যালাপে যে যে কথা চলিত ছিল, তাহা তাঁহারা গ্রহণ করিতেন এবং ইতর লোকের ব্যবহৃত-শব্দ সামান্য হইলেও তাহার অনায়াস-বোধগম্যতা এবং ভাবব্যক্তি গুণ থাকিলে তাহাও উদ্ধৃত করিতেন। বহু পরিশ্রমে এবং যত্নে ১৬৯৪ খৃঃ এই অভিধান প্রকাশিত হইয়া ১৭০০ খৃঃ সংশোধিত হয়। সমাজে ইহার এমত মান ছিল যে কখন কোন গ্রন্থকার তাহার অবহেলা করিতে পারেন নাই। যে সময়ে এই মত ভাষা নির্ণীত হয়, তখন পাস্কল বস্যুএট মালেব্রান্‌শ এবং আর্ণল্‌ড্ নামক লেখক সকল অতি পরিশুদ্ধ গ্রন্থ সমূহ লিখিয়া স্বদেশকে পূজ্য করিয়াছিলেন। কেবল ভাষার প্রতি লক্ষ্য করিয়া রচনা করিতে হইলে সামান্য লোকের উদ্যম ভঙ্গ হইতে পারে। কিন্তু উক্ত মহাত্মারা ভাষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াও নিজ২ প্রভাসম্পন্ন শক্তির আশ্চর্য্য গুণে রচনা একবারে দোষশূন্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে যেমন বাহ্য প্রাকৃতিক নিয়মাদি অলঙ্ঘ্য, সেইমত কাব্য রচনার এবং ব্যাকরণের নিয়মাদিরও গতি অলঙ্ঘ্য। যেমন পদার্থের স্বাভা-

বিক নিয়মাদি মনুষ্যের বুদ্ধি কৌশলে সুফল প্রদায়িনী হইতে পারে, কিন্তু তৎপ্রতি বিদ্রোহাচরণ করা অনর্থক ও বিফল, সেই মত সাহিত্য রচনার এবং ব্যাকরণের নিয়মাদির গতি রোধ কাহারও সাধ্য নহে। কেহ তাহা করস্ত করিতে সক্ষম নহেন। উত্তম রচনার চিহ্ন এই যে, তাহা শুদ্ধ, অর্থ বোধক এবং সহজ হইবেক। কোন গ্রন্থকার বিশেষ গদ্য লেখক আপন মাতৃ ভাষার নির্দ্দিষ্ট নিয়মাদি ভঙ্গ অথবা চিত্তাকর্ষণ জন্য নূতন কথা কিম্বা নিয়মাদি ব্যবহার করিতে কোনমতে সক্ষম নহেন।*

ফ্রান্সের এবং ইংলণ্ডের আচার ব্যবহার পৃথক। ফ্রান্সে ভাষা পদ্ধতি সাধারণের ঐক্যে ও যত্নে নির্ণীত হইয়াছে, ইংলণ্ডে তাহা ক্রমে সময়ানুসারে ব্যক্তি বিশেষের স্বাধীন চর্চ্চায় উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ফ্রান্সে যাহা সাধারণের জ্ঞানকৃত সমূতচেষ্টায় সম্পাদিত, ইংলণ্ডে তাহা স্বতঃসৃষ্ট। কি প্রকারে জন্মিল তাহা হঠাৎ বোধগম্য নহে।

ফ্রান্সে এবং ইটালীতে পর্য্যটন করায় ইংরাজদিগের আপনাদিগের রূঢ় অথচ ব্যক্তিক্ষম ভাষার প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাত হয়। প্রাচীন ইংরাজি কবি "চসর" নিজ কবিতাবলী সুমিষ্ট করণ জন্য অনেক ফ্রেঞ্চ শব্দ তাহাতে ব্যবহার করিয়াছেন, এবং এই প্রথা অদ্যাপিও প্রচলিত আছে। লিলী আপন ইউফিস্ গ্রন্থে অপর প্রকারে ভাষাশুদ্ধির চেষ্টা পাইয়াছিলেন, এবং কিয়দ্দিনের জন্য তাঁহার পুস্তক মহামান্যও হইয়াছিল, কিন্তু যাহার যে যথার্থ নাম তাহা তাহাকে না দিয়া, প্রকারান্তরে প্রচুর শব্দ প্রয়োগদ্বারা সামান্য ভাবে বৃহৎ শব্দ ব্যবহার করা, ভাষার ব্যভিচার বলিতে হইবেক। লিলীর সময়ের ভদ্র সমাজেরও কথাবার্ত্তা অশ্লীল ছিল। ইউফিসের প্রণালীদ্বারা সামাজিক ভাষার অনেক উপকার হইয়াছিল ইহা স্বীকার করিতে হইবেক। ইউফিস্ ১৫৭৯ খৃঃ প্রকাশ হয়, এবং ৫০ বৎসর পরেই গদ্য লিখিবার এ প্রকার বিশুদ্ধ নিয়ম দেখা যায়, যে তাহার তুল্য রচনা এখনও পাওয়া দুঃসাধ্য। সর ফিলিপ সিডনির "আরকেডিয়া," বেকনের সারবতী ও গভীরা রচনা, এবং হুকর ও টেলরের অসামান্য মধুরতা, ইংরাজ মাত্রেরই আদরের স্থল। ১৬৪৪ খৃঃ প্রকাশিত মিলটনের "আরিওপেজিটিকা" বোধ হয় ইংরাজি গদ্যের অদ্বিতীয় আদর্শ। এই প্রবন্ধ গ্রন্থ পত্রাদির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লিখিত হয়, এবং কবিবর পদ্যে যেমন আপনার অসামান্য মধুরতার পরিচয় দিয়াছেন, তেমনি তাঁহার এই গদ্য প্রবন্ধ গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্য এবং সুমিষ্ট রসের পরিচয়।

পর শতাব্দীতে ইংলণ্ডে বহুতর সুলেখক জন্মিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থ সকল তৎকালপ্রচলিত পদ্ধতির দোষে মনকে তাদৃশ আকর্ষন করে না। প্রাচীনদিগের গাম্ভীর্য্য ও মিষ্টতা অতি মনোহর। ইংরাজী ভাষার উৎকৃষ্ট রূপ সেমুয়েল জনসন কর্ত্তৃক নির্ণীত হয়। জনসনের রচনা যদিও শ্রমসিদ্ধা কিন্তু বিশুদ্ধ এবং রমনীয় ছিল। ১৭৬০ খঃ জনসন নিজ মহাভিধান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। নানা

* "হালমস্ ইউরোপীয় লিটেরেচর" ৪, ২৯৩।

গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত এবং দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ সমস্ত ইংবাজি শব্দ ঐ অভিধানে স্থাপিত করিয়া ভাষার স্থায়িত্ব এবং শব্দের অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন। উদ্ধৃত করিবার জন্য পুস্তকের অভাব ছিল না। তিনি নিজ অসাধারণ বিচারশক্তি এবং দক্ষতার দ্বারা অসীম পরিশ্রমে এই কঠিন ব্যাপার সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। এলিজেবেথের সময়ের লেখকদের ব্যবহৃত অনেক কঠিন লাটিন শব্দ সাধারণের বোধগম্য নহে। জন্সন, তৎসমুদায় এবং অপর অপর লেখকের স্থানীয় অনেক রূঢ় শব্দ পরিত্যাগ করিয়া, অভিধানে কেবল বিশুদ্ধ অর্থবোধক ইংরাজী শব্দের সঙ্কলন করিয়াছিলেন। অভিধান প্রকাশ মাত্রেই সমাজের আদরণীয় হইয়া অদ্যাবধি ইংবাজী ভাষার "মাগ্না-চার্টা" হইযা পূজ্য হইয়া রহিয়াছে।

জরমানদিগের ভাষার আদ্যোপান্ত জন্ম বৃত্তান্ত কলহপূর্ণ। তাহাতে হস্তক্ষেপণ করিবার অনাবশ্যক। এক্ষণে উক্ত সকল তর্ক বিতর্ক বাঙ্গালা ভাষার পক্ষে উচিত কি না তাহাই বিবেচ্য।

বাঙ্গালা ভাষা প্রণালীবদ্ধ করা যে আবশ্যক, তাহা বোধ হয় সকলই স্বীকার করিবেন। বাঙ্গালাকে একেবারে সংস্কৃত ভাষা করিয়া তোলা এবং সংস্কৃত আভিধানিক শব্দ সমূহ প্রয়োগ পূর্ব্বক ভাষাকে সাধারণের বোধাতীত করা, কখন উচিত নহে। অথচ রূঢ়, স্থানীয়, কর্কশ এবং অশ্লীল বাক্য সকল সাধুভাষা হইতে বর্জ্জিত করা আবশ্যক।

কথিত হইয়াছে যে, ইংরাজি ভাষা ক্রমে স্বতন্ত্র উপায়ের দ্বারা কোন কোন অসাধারণ ব্যক্তির পরিশ্রম এবং ক্ষমতাতে প্রণালীবদ্ধ হইয়াছে। আর ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান এবং স্পানীয় ভাষা একত্রিত উৎসাহবিশিষ্ট সভার প্রযত্নে সুপ্রণালীবদ্ধ হইয়াছে। এই দুই প্রকার গতির মধ্যে সভার দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার হিতসাধনই উপযুক্ত ও সম্ভব বোধ হয়। বাঙ্গালায় এমত কোন সর্ব্বজনপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি নাই যে তাঁহার প্রচারিত নিয়ম, দেশীয় সকল লোকের নিকট মান্য হইবেক, এবং পাঠ্য পুস্তকে রও এমত আধিক্য ও উত্তমতা হয় নাই যে, তাহা হইতে জনসন সদৃশ কোন ব্যক্তি সঙ্কলন পূর্ব্বক সাধুভাষা অবধারিত করিতে সক্ষম হইতে পারেন।

অতএব বাঙ্গালা সাহিত্যেব ভাষার স্থিরতা বিধান জন্য সকল বাঙ্গালী মিলিত হইয়া সভা স্থাপন করত তদ্দ্বারা ভাষার উন্নতিসাধন করা আবশ্যক। যদি এমত সভা স্থাপিত হয়, এবং তদ্দ্বারা ভাষার নির্ণয় হয়,তাহা হইলে বঙ্গদেশের পরমোপকার হইবেক সন্দেহ নাই। আর সভা স্থাপিত হইলে যে এই কার্য্য সমাধা হওয়া সম্ভব, তাহাও সহজে অনুমান হয়। সভার দ্বাবা অভিধান প্রকাশিত হইলে তাহাতে যে যে শব্দের স্থান নাই কোন লেখক তাহা ব্যবহার করিতে সক্ষম হইবেন না, এবং ইহাতেই ভাষাপ্রণালীবদ্ধ হইবেক।

ইউরোপীয় একাডেমিতে প্রায় ৫০ জন সভ্য থাকা দেখা যায়, কিন্তু এদেশ বহু বিস্তীর্ণ এবং এ দেশে স্থানীয় ভাষাও অনেক। অতএব বঙ্গ একাডেমির শতাধিক সভ্য হইলেও হানি নাই। কলি-

কাতা রাজধানী, অতএব আদি সভা কলিকাতায় হওয়াই উচিত এবং ৩০ জন সভ্য তথায় বাস করা আবশ্যক। অপর সভ্য-গণ অন্যত্র নিবাসী পণ্ডিতবর্গ হইতে মনোনীত হইতে পারেন।

কলিকাতার সভ্যেরা সময়ে সময়ে একত্রিত হইবেন। অধিবেশনের জন্য একটী গৃহ অবধারিত করিলেও হানি নাই। কিন্তু প্রাচীন ফ্লরেন্টাইনদিগের ন্যায় সভ্যগণের মধ্যে কোন এক সভ্যের বাগান বাটীতে একত্রিত হইলে সুখকর হইতে পারে। কলিকাতায় এপ্রকার উদ্যানের অভাব নাই। এবং বুদ্ধিবিদ্যা-সম্পন্ন সাধুগণ একত্রিত হইলে অবশ্যই সকলেরই পরমাহ্লাদজনক ও শুভকর হইবেক। সুখদ বলিয়া ক্রমে সভার কার্য্য সাধারণের চিত্তাকর্ষণ পূর্ব্বক দেশের কুশলসাধন করিতে পারে।

অভিধান প্রস্তুত করাই সভার মূল কর্ম্ম। অথচ ঐ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠাদি এবং তর্ক বিতর্ক হইবার বাধা নাই। গ্রন্থকারেরা নিজ গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব্বে সভাতে পাঠ করিবেন এবং পণ্ডিত সমূহের পরামর্শে তাহার সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি করিবেন। এমতে সাহিত্যের ক্রমে নির্ম্মলতা এবং প্রতিভা বৃদ্ধি হইবেক। সঙ্গীত আলোচনার দ্বারা সভার মনোরঞ্জনও হইতে পারে। এবং প্রাচীন কবিগণের গীত ও নব্য গীতের সমালোচন সহকারে সঙ্গীতেরও উন্নতি লাভ হইতে পারিবেক।

প্রথম উদ্যমে টাকার আবশ্যক দেখা যায় না, কেবল বিদ্যা বুদ্ধি ও বিচারের আবশ্যক। ঈশ্বর প্রসাদাৎ সম্প্রতি কলিকাতার এবং দেশাভ্যন্তরে পল্লীগ্রামেও ইহার অভাব নাই। সভার দ্বারা আর এক বিশেষ উপকার এই হইবে, যে ঐক্য এবং প্রীতিবন্ধনে সকলে বাঁধা থাকিবেন, এবং একতাবলে বলিষ্ঠ হইবেন। পল্লীগ্রামস্থ পণ্ডিতেরা মফঃস্বলে কোন কথা প্রচলিত থাকিলে তাহা ব্যবহার করা আবশ্যক কিনা এবং সংস্কৃত যে যে শব্দ সহজে অর্থ বোধক হইবেক, তদ্বিষয়ে সুপরামর্শ দিতে পারিবেন। বঙ্গভাষা অপার। ইহা প্রণালীবদ্ধ করা মহৎকার্য্য। মনে করিলে আহ্লাদ হয়।

অধিকাংশ সভ্যগণ সহজেই বাঙ্গালী হইবেন, এবং কোন কোন হিতৈষী এবং বিজ্ঞ ইংরাজ মহোদয়গণকে গ্রহন করাও অত্যাবশ্যক। অনেক উৎসাহশালী এবং বঙ্গ হিতৈষী ইংরাজ মহাত্মারা আগ্রহ সহকারে এ বিষয়ে উৎসাহদান করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ভরসা হয় সভা স্থাপন পরে ভারতবর্ষের মহামহিম গৌরবান্বিত গবর্ণর জেনরেল বাহাদুর সভার অধিপতি পদ গ্রহণ স্বীকার করিয়া সভাকে সম্মানিত করিতে পারেন।

—০—

যে অনুষ্ঠানপত্র উপরে প্রকটিত হইল, তাহা পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত জে বীম্‌স্‌ সাহেব কর্ত্তৃক বঙ্গসমাজ মধ্যে প্রচারিত হইবে। ইহা প্রচারিত হইবার পূর্ব্বেই আমরা তাঁহার অনুগ্রহে বাঙ্গালায় প্রাপ্ত হইয়া সাদরে প্রকাশ করিলাম। বীম্‌স্‌ সাহেব দেশ বিখ্যাত পণ্ডিত, এবং বঙ্গদেশের বিশেষ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তাঁহার কৃত এই প্রস্তাব যে, পণ্ডিত সমাজে বিশেষ সমাদৃত হইবে, ইহা বলা বাহুল্য। তাঁহার কৃত প্রস্তাবের উপর অনুমোদন বাক্য আবশ্যক নাই, এবং বলিবার কথাও তিনি

কিছু বাকি রাখেন নাই। আমরা ভরসা করি যে সকল বঙ্গপণ্ডিতেরা দেশের চূড়া, তাঁহারা ইহার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইবেন। তাঁহাদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলে, আমরা এই প্রস্তাবের পুনরুত্থাপন করিব। ইতি।

———বঙ্গ-দর্শন সম্পাদক।

প্রভাত।

রাত পোহালো, ফর্‌সা হলো,
ফুট্‌লো কত ফুল।
কাঁপিয়ে পাকা, নীল পতাকা,
যুট্‌লো অলিকুল॥
পূর্ব্ব ভাগে, নবীন রাগে.
উঠ্‌লো দিবাকর।
সোনার বরণ, তরুণ তপন,
দেখ্‌তে মনোহর॥
হেরে আলো, চোক্ জুড়াল,
কোকিল করে গান।
বৌ কথা কয়, কর্‌্যে বিনয়,
ভাঙ্‌চে বয়ের মান॥
ঘরের চালে, পালে পালে,
ডাক্‌চে কত কাক।
পূজ় বাটীতে, জোর কাটিতে,
বাজ্‌চে যেন ঢাক॥
পতি বিরহে, পদ্ম দহে,
পদ্ম বিরহিণী।
ঝর্‌য়ে নয়ন, ভিত্‌য়ে বসন,
কাট্‌য়েছে যামিনী॥
গেল রজনী, হাস্‌লো ধনী,
পতির পানে চায়।
মুখ চুমিয়ে, আতর নিয়ে,
যাচ্চে উষার বায়॥
মাথা তুলি, মরাল গুলি,
নদীর কুলে ধায়।
চরণ দিয়ে, জল কাটিয়ে,
সাঁতার দিয়ে যায়॥
ঘোমুটা দিয়ে, ঘাটে বসিয়ে,
ছোট বোয়ের কুল।
মাজ্জে বাসন, বাজ্জে কেমন,
তাবিজ লঙ্গ ফুল॥
পরস্পরে, মধুস্বরে,
মনের কথা কয়।
ঘোম্‌টা থেকে, থেকে থেকে,
হাসির ধ্বনি হয়॥
অনেক মেয়ে, গাম্‌চা দিয়ে,
ঘস্‌চে কোমল গা।
পশি জলে, মুখে বলে,
নিস্তার গো মা॥
উঠে কূলে, এল চুলে,
বসে সুলোচনা।
মাটি দিয়ে, শিব গড়িয়ে,
কচ্চে উপাসনা॥
কত কুমারী, সারি সারি,
দুল্‌চে কানে দুল।
কানন হতে, কচুর পাতে,
আন্‌চে তুলে ফুল॥
আস্তে ঝাড়ি, তুঁষের হাঁড়ি,
আগুন করে বার্।
খর্সান খেয়ে, লাঙ্গল নিয়ে,
যাচ্চে চাসার সার॥
পান্তা খেয়ে, শান্ত হয়ে,
কাপড় দিয়ে গায়।
গোরু চরাতে, পাঁচন হাতে,
রাখাল গেয়ে যায়॥
গাভির পালে, দোয় গোয়ালে,
দুদে কেঁড়ে ভরে।

গজ গামিনী, গোয়ালিনী,
বসে বাছুর ধরে ॥
হাস্‌চে বালা, রূপের ডালা,
মুচ্‌কে মধুর মুখ।
গোপের মনে, দুদের সনে,
উঠ্‌ছে ফেঁপে সুখ ॥
গাছের তলে, বেড়ে অনলে,
বলে ববম্ বম্।
জটাশিরে, সন্ন্যাসীরে,
মার্চ্চে গাঁজায় দম্ ॥
তাড়ি বগলে, ছেলের দলে,
পাঠশালেতে যায়।
পথে যেতে, কোঁচড় হতে,
খাবার নিয়ে খায় ॥
এই বেলা, সকাল বেলা,
পাঠে দিলে মন।
বৈকালেতে, গৌরবেতে,
রবে যাদুধন ॥

গ্রাবু।

জলতলে একটি মৃৎপিণ্ড বিক্ষিপ্ত হইলে, সমকেন্দ্রী বীচিচক্র খেলিতে থাকে। চক্রের পরিধি ক্রমেই আয়ত হয়, কিন্তু তরঙ্গ বেগের ক্রমেই হ্রাস হইতে থাকে; দূরে ক্রমে মিশাইয়া যায়। কিন্তু প্রবাস চিন্তাবেগের ভিন্ন ধর্ম্ম; পরিবারের মধ্যে থাকিলে যে সামান্য বিপদের অনুপাত একেবারে গ্রাহ্যই করিতাম না, 'প্রবাসে দেখ সেই অশুভ সংবাদজনিত চিন্তার বেগ কত বিক্রম সংগ্রহ করিয়াছে। বাস হইতে প্রবাস যত দূর হইবে, তোমার হৃদয় কন্দরস্থ ভাবনাপিণ্ড ততই বেগে তাড়িত প্রতিতাড়িত হইয়া দুলিতে, চলিতে, উঠিতে, পড়িতে, ডুবিতে, ভাসিতে থাকিবে। আবার আকর্ষণী শক্তিবলে গৃহাভিমুখে ধাবিত হও, ভাল বাসার কেন্দ্রের যতই নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিবে, তরঙ্গের বেগ ততই বাড়িতে থাকিবে। প্রবাসে এক দিন এইরূপ দুর্ভাবনায় আলোড়িত হইতে ছিলাম। চাঞ্চল্য নিবারণ জন্য, হে কাগজাবতার তাস! আমি তোমার আশ্রয় লইয়াছিলাম। তুমি নানারূপে আমার নয়ন তৃপ্ত করিয়া, আমার মনকে ভুলাইয়াছিলে। মন তখন তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার তান্ত্রিক পূজার জন্য মানসিক উপকরণ আহরন করিতেছিল। কখন বা ধূপদীপ নৈবেদ্য রাশি রাশি গন্ধ পুষ্প উৎসর্গ করিতে ব্যস্ত ছিল; কখন বা মনোমোহিনী প্রতিমা সম্মুখে ক্ষুদ্র দীপ মালা জ্বালনে অভিনিবিষ্ট ছিল; কখন বা বলিদান অবসানে মন সদ্যঃ নিঃসৃত শোণিত পরিব্যাপ্ত প্রাঙ্গণে ঘোর রোল সমুত্থানকারী ঢক্কারবে' প্রোৎসাহিত হইয়া সমারোহ মধ্যে ভয়ানক ভাবে নৃত্য করিতেছিল। কখন বা নিরঞ্জনান্তে আর্দ্র বস্ত্রে পূর্ণঘট মস্তকে ধারণ করিয়া, আবার কবে ষষ্ঠী সপ্তমী আসিবে ভাবিতে ভাবিতে মন, মনে মনে ক্রন্দন করিতেছিল। হে কাগজাবতার! দ্বিপঞ্চাশদ বয়বী তুমিই তখন মনকে সেই ভয়ানক তান্ত্রিক পূজা হইতে ক্রমে বিরত করিয়া-

ছিলে। তুমি ধন্য! তুমি আমার যথার্থ উপকার করিয়াছিলে; আমি তোমার সেই উপকার স্বীকার জন্য আজ মুক্ত কলমে তোমার মহিমা বর্ণন করিব।

হে সুদৃশ্যস্থচিত্রচারুচৌকোনরূপধারি! তুমি আমাকে যে মনোপূজা হইতে বিরত করিয়াছিলে, তাহারি কৃতজ্ঞতা স্বীকার জন্য আমি তোমার গুণগান করিব। আমি সামান্য পৌত্তলিকদের ন্যায় ফল মূল গঙ্গাজল বিল্বদল "এতে গন্ধ পুষ্পে" দিয়া তোমার পূজা করি নাই। আমি মূঢ় পৌত্তলিক নহি, আমি পরম জ্ঞানীর ন্যায় নিরন্তর তোমার মহিমা ধ্যান করিয়াছি। তোমার গূঢ়তত্ত্ব সকল উদ্ভাবন করিয়াছি। তুমি কৃপালু, আমি তোমার প্রসাদে তোমার অগাধতত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছি, তোমার জয় হউক। আমি তোমার মহিমা জগতে প্রকাশ করিব। ইতি প্রস্তাবনা।

তাস খেলা এই জটিল সংসারের অতি সুন্দর অনুলিপি। প্রথম খেলা,—

খেলা এই সংসার লীলা। অনেকে বলেন যে চতুরঙ্গ ক্রীড়া অতি উত্তম,কেন না প্রতিদ্বন্দ্বী দুই জনে সমান উপকরণ লইয়া রণক্ষেত্র রূপ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইল; যাহার বুদ্ধি বিদ্যা বা বিচক্ষণতা থাকিবে, সেই জয় লাভ করিবে। এটি সত্য হউক মিথ্যা হউক ঘোর অনৈসর্গিক। কোথায় দেখিয়াছেন যে, রণে হউক, বনে হউক, কর্ম্মস্থানে হউক, বিলাস ভবনে হউক, শিক্ষায় হউক, পরীক্ষায় হউক কোথায় দেখিয়াছেন, দুই জনে সমান উপকরণ লইয়া প্রবিষ্ট হইল? কোন ইতিহাসে পাঠ করিয়াছেন যে,দুই দল যোদ্ধা সমান উপকরণ লইয়া রণক্ষেত্রে পরস্পর পরস্পরকে অভিবাদন করিয়াছে? জীবনে কোথায় দেখিয়াছেন, দুই জন সম যোধ সমান উপকরণ পাইয়াছে? তা হয় না। তা পায় না। বৈষম্যই জগতের নিয়ম; সাম্য তাহার ব্যভিচার মাত্র। তবে কেন খেলিবার সময় আমরা সমান উপকরণ লইয়া বসিব? কেন অপ্রাকৃতা শিক্ষা লাভে আমরা যত্নবান্ হইব? চতুরঙ্গ ক্রীড়া আমাদিগকে অতি ভুল শিক্ষা প্রদান করে। তাসখেলায় তাসের বৈষম্য সংস্থাপনই নিয়ম, সুতরাং তাসের একটি প্রশংসার কথা।

চতুরঙ্গের ক্রীড়ক সংখ্যা ও ক্রীড়া পদ্ধতিও অস্বাভাবিক। সংসারে মাত অথবা সাথী না থাকিলে চলে না; খেলাতেও মাত চাই। সংসারে সহায় নাই কার? যার নাই, তার আর খেলা কি? সে কিসের সংসারী? তাহার খেলিবার উপায়ই নাই। যাহারা তোমার অতি নিকটে বাম পার্শ্বে দক্ষিণ পার্শ্ব রহিয়াছে, তাহারা তোমার মাত নহে, তোমার প্রকৃত বন্ধু সম্মুখে সর্ব্বদাই আছেন; তোমার স্বার্থে তাঁহার স্বার্থ কিন্তু তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীদের ন্যায় তিনি তোমার নিকটে থাকিতে চান না। সংসারে, হিন্দু সংসারে পত্নির যে একমাত্র সহায়, দুখের দুখী, সুখের সুখী, ব্যথার ব্যথী, আহ্লাদে আহ্লাদিনী, বিষাদে অবসন্না, সেই সঙ্গিনী, সংসার খেলার সেই মাত, কখনই তোমার নিকট কুটুম্বিনী হইতে তোমার নিজ গোত্র হইতে পরিগৃহীত হইতে পারে না। দূর

বংশ হইতেই তুমি তোমার মাত পাইয়াছ।

তাস ক্রীড়ায় দেখুন, মাতের দোষে কত সময় কত ফল ভুগিতে হয়; মাতের গুণে কত সময় কত লাভ হয়। মনুষ্য সমাজের গাঁথনিই এই রূপ। যদি তুমি সৌভ্রাত্রসুখ আস্বাদন করিতে চাও, তবে তোমার সহোদর ইচ্ছা পূর্ব্বক কদন্ন সেবন করিয়া গুরুতর পীড়াগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহার রোগ শান্তির জন্য কিছু দিন রাত্রি জাগরণ করিয়া অনশনে কঠোর ব্রত আচরণ করিয়া কষ্ট ভোগ কর। যদি প্রণয়িণীর প্রণয় প্রার্থনা কর, তবে অন্ততঃ কিছু দিনের জন্যও উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া প্রণয় পচনে প্রবৃত্ত হও। যদি অপরূপ পিতৃস্নেহে অভিষিক্ত হইবে, তবে পিতার কঠোর শাসনে ক্ষুণ্ণ হইও না। যদি এ সকল কষ্ট স্বীকার করিতে না চাও, তুমি কোন সুখই পাবে না। মানব সমাজ তোমার জন্য নহে। সুখ দুঃখ বিনিময়ই এ বিপণির ব্যবসায়। তুমি এ সব না চাও, আমরা তোমায় চাই না। তুমি সন্ন্যাসী। এই সকল কারণেই সংসারে মাতের বা সঙ্গীর সৃষ্টি এবং তাহারই অনুলিপি তাসের গ্রাবু খেলায়।

চতুরঙ্গ ক্রীড়াতে সকল উপকরণই প্রকাশ্য ও সাজান। তাস খেলায় কাহার হস্তে কি আছে কেহ জানে না, কেহ কোন রূপ নিয়মিত সাজান উপকরণ পায় না। তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী কবে তোমাকে বলিয়া দিয়াছেন যে, আমি এই এই উপকরণ লইয়া তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছি? তুমি যদি তোমার সমুদয় উপকরণ বলিয়া দিয়া সমরক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হও, তাহা হইলে তুমি নির্ব্বোধ। তোমাকে নিশ্চয় হারিতে হইবে। হতে পারে তুমি এমন তাস পাইয়াছ যে, তুমি মাতের সাহায্য না লইয়া কাহাকেও ভয় না করিয়া এক হাতেই নিজ হাতেই ছক্কা করিতে পার, তখন তোমার উপকরণ ভার বলিয়া দিলে কোন ক্ষতিই নাই বরং সেত আর তখন বিলক্ষণ স্পর্দ্ধার কথাই বলিতে হইবে। কিন্তু এক হাতে ছক্কা করা যায়, এমন তাস কয় জন কয় বার এ সংসারে পাইতে পারে? বাস্তবিক জগতে উপকরণ সর্ব্বদাই গুপ্ত থাকে। পরচিত্ত অন্ধকার এবং ইহলোকে আমাদের পরচিত্ত লইয়াই ব্যবসায় সুতরাং প্রধান উপকরণই গুপ্ত রহিয়াছে; যে গুপ্ত অনুমান করিতে পারে সেই বিষয়ী; প্রকাশিত উপকরণ চালনা করিতে পারিলেই কি না পারিলেই কি? তবে উপকরণ কাহার স্থানে কি আছে, তাহা কি রূপে অনুমান করিবে। তাস খেলায় যাহা কর, সংসারেও তাহাই কর। অথবা সংসারে যাহা করিতে হয়, তাস খেলায় তাহাই আছে। এক ব্যক্তির কি উপকরণ আছে, জানিতে হইলে আমরা কি করি? তাহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করি, তিনি কখন কি কার্য্য করিলেন, সেটি বেশ করিয়া পর্য্যালোচনা করি, তাহার পূর্ব্বাধিকারীর স্থানে কি পাইয়াছিলেন, তাহাও স্মরণ করি, স্মরণ করিয়া অনুমান করি। তাস খেলাতেও তাহাই করি। ইনি যখন ছুটা দশের উপর তুরুপ করিলেন না, তখন ইহার স্থানে তুরুপ নিশ্চয় নাই। ইনি

ইস্কাবনের দশ দিলেন, আর হাতে ইস্কাবনের টেক্কার পিটে ইস্কাবনের টেক্কার পরই দশ ছিল, তবে টেক্কা, এঁর স্থানেই আছে, আমার মাতের হাতেত নাই, থাকিলে তিনি এমন সময় ফ্রাই ভেঙ্গেও রঙ খেলিবেন কেন? আমার দক্ষিণ-দিকের দ্বন্দ্বীর স্থানেও নাই, থাকিলে কেন আমার সাহেবের উপর তুরুপ করিবেন। তবে টেক্কাটা এঁর স্থানেই আছে। যা সংসারে করি, ঠিক্ তাই করিলাম।

তাস খেলার কাটানও সংসারের অনুলিপি। কাটান সংসারে প্রবেশ—বা জন্ম পরিগ্রহ। এক জন্ম পরিগ্রহেই সমস্ত উপকরণ নির্ণীত হইয়াছে, জন্মই বলুন আর কাটানই বলুন একেবারে সম্পূর্ণ অদৃষ্ট মূলক। আপনার জন্মের উপর কাহার হাত আছে। তুমি কেন হাজার বিদ্যাবুদ্ধি লাভ কর না, তোমার —জন্ম ফলভোগ তোমাকে করিতেই হইবে। কেবল জন্ম বৈগুণ্যেই দেখ ঐ ব্যক্তি শৃঙ্খলবদ্ধপদে মলমূত্র পরিষ্কার করিতেছে। সে যদি আঢ্য বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিত,তাহা হইলে তাহাকে উদর পূর্ত্তি জন্য চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইত না। আর বিচারপতি সাহেবও তাহার শেষ বিচারের দিন তাহাকে নীচ নরাধম উপাধি দিয়া সম্মান বৃদ্ধি করিতেন না। তাস খেলায় এক জন কিছু না পাইয়া যদি হারিয়া যায়, তবে সে কি নীচ নরাধম, তা যদি না হয়, তবে চোর কি করিয়া হইল? তবে কি সকলেই পেটের দায়ে চোর হয়? তা কে বলিতেছে? তিনখানা তুরুপেও অনেকে যে নওলা ধরা দিতেছে। তাস খেলায় যেমন বোকা আছে—সংসারে তাহা অপেক্ষা অধিক বোকা আছে। তবে যে পেটের দায়ে নীচ,তাহাকে যে নীচ বলে, সে আরো নীচ।

কাটান যদি জন্ম পরিগ্রহ হইল, তাহলে এখন তুরুপ কি তা বোঝাগেল। জাতিগত বৈলক্ষণ্য জনিত প্রাধান্যই তুরুপ। প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ তুরুপ, এখন ইংরাজই তুরুপ, কোথাও অসভ্য জনগণ মধ্যে ক্ষত্রিয়ই তুরুপ, আবার কোথাও বৈশ্য তুরুপ। প্রাচীন কালে ড্রুইড, পোপ, পাদরি, আগ্নিক পারসী, ও ব্রাহ্মণ পৃথিবীর নানা স্থানে ধর্ম্ম তুরুপ ছিলেন। এখন পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই ধন তুরুপ এবং বোধ হয় কালে বিদ্যাবুদ্ধিই তুরুপ হইবে।

ধনীরাই রঙ্গ আর সকলেই বদ রঙ্গ। ধনীর জন্ম পরিগ্রহই জগতে প্রচারিত হইল। কাটান কি তা জানাগেল সেই সঙ্গে সঙ্গে নির্ধনী কে, তাও জানাগেল, বদ রঙ্গ কি তা বোঝা গেল।

চারি রঙ্গ কি তা কিন্তু,কিছুই বোঝা যায় নাই। প্রাচীন কালে সমাজের যে চারিভাগ ছিল ইহা তাহাই মাত্র। যে ইস্কাবান সে ইস্কাপনই আছে, তবে কাটানর জন্যই ইস্কাপনের সাতাও এখন হরতনের টেক্কা অপেক্ষা অধিক বলশালী। যে শূদ্র সে নামে এখনও শূদ্রই আছে, কেবল জন্মগুণে সে দেখ উচ্চ গদির উপর আসীন। সে এখন তুরুপ বলিয়াই ঐ দেখ শ্রীরামচন্দ্রের বংশধর অভিজিৎ ছত্তন ও বাল মুকুন্দ দরবৎ তাহারে দুয়ারের দুয়ারী। সে এখন

তুরুপ হইয়াছে—বলিয়াই বেগের গাঙ্গুলি শিবের সন্তান ঐ পাঁচকড়ি গোমস্তা নীচে মসিপূর্ণ ছিন্নশপে বসিয়া বাবুর গোলাল গালাল কাল কোল হাস্থলি পদকপরান ছেলেটিকে কোলে করিতেছে। এখন তুরুপহয়েছে বলিয়াই ইস্কাপনের সাত্তা হরতনের টেক্কার উপর হইল কি না? ছেলেবেলা ভাবিতাম এরূপ খেলার সৃষ্টি কেন হইল? কে করিল? এখনও এই সমাজের খেলার কথা ভাবি যে, এ খেলার সৃষ্টি কেন হইল? কে করিল? উভয়ই মনুষ্য করিয়াছে। যখন গ্রাবু খেলিতে বসিয়াছ, তখন তুরুপের বল মানিতেই হইবে। তুরুপ বেশী না পাও বিরক্ত হইও না। যাহা পাইয়াছ তাহাতেই খেলিতে হইবে। খেলাতে কোন চুকভুল না হইলেই হইল। আর খেলিতে না চাও, তাহলেত কথাই নাই। আর যদি এবার বেশী তুরুপ পাইয়া থাক, তাহলে একেবারে গর্ব্বিত হইও না, হয়ত সাততুরুপ হইলেও হইতে পারে। এহাত এই হইল আর হাত কি হইবে, তার স্থির কি আছে? ছক্কা পঞ্জা রেখে খেলাভেঙ্গে উঠে যেতে পার, তবেই ভাল; কিন্তু মনে থাকে যেন তোমার ৪ খানা কাগজ ও এক ছক্কা এক হাতেই উঠিতে পারে। অতএব ক্রীড়ক গর্ব্বিত হইওনা অতএব ধনী তাস খেলা মনে করে একটু সাম্য অবলম্বন কর।

সাততুরুপ আটতুরুপে খেলেনা কেন? এটি প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের মধ্যে সমতা রাখিবার চেষ্টা মাত্র। বাহ্য দর্শনে সকলেই দুই পদ দুইহস্ত, দুই চক্ষু দুই কর্ণ লইয়া—জগৎ খেলায় অবতীর্ণ হইয়াছে কিন্তু জন্ম বৈলক্ষণ্যে এক ব্যক্তি প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষগত ক্ষয়রোগগ্রস্ত ও নির্ধনী—আর অপর ব্যক্তি বলিষ্ঠ ও ধনবান্, ইহাকেই পূর্ব্ব অদৃষ্টের ফলাফল বলিতেছিলাম। আমরা ষোলখানা পাইয়াছি তোমারও ষোলখানা পাইয়াছ কিন্তু আমার ষোলখানা এমন কাগজ তাহার প্রত্যেক খানায় যে বল ধারণ করে, তাহা তোমার সকল গুলিতে একত্রে নাই। তাসদেব একটু দয়া করিয়া নির্ধনীর দিকে একটু মুখতুলে চাহিয়াছেন। যদি ধনী তুমি নির্ধনীর সঙ্গে খেলিতে চাও, তাস বিধাতা বলিতেছেন, আমি এই নিয়ম করিলাম যে তুমি সমস্ত ধন (তুরুপ) নিজে লইও না, অথবা তাঁহার সপ্ত গুণক পরিমিত ধন লইওনা।—এত বৈষম্য আমরা দেখিতে পারিব না। তাস বিধাতাকে ধন্য বাদ প্রদান করিতে হয়। সমাজ বিধাতৃগণ শাসন কর্ত্তৃপক্ষ যদি সকল সময় এই রূপ নিয়ম করেন, তাহা হইলেও ত কতক মঙ্গল হয়; অনেক সময় তাঁহারা তাহা করেন না। অনেক সময় মাতে তুরুপে এক তুরুপে খেলিতে বসাইয়া খেলা দেখিতে থাকেন। হে ফলকাবতার! তাঁহারা তোমার অবমাননা করেন। তুমি প্রেমারা মূর্ত্তিতে তাঁহাদের লক্ষ্মীর হাঁড়িতে প্রবেশ করিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ কর। আমার প্রার্থনাপূরণ কর, তোমার মঙ্গল হউক। সকলেই শুনিয়া থাকিবেন যে, সাততুরুপের পর পড়তা ফিরিয়া যায়। তাস খেলায় তাহা নিত্য হয় কিনা তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না।

সামান্য ব্যক্তিগণ মধ্যে, বা খণ্ড সমাজে প্রায়ই হয় না—কেননা—শাসনকর্ত্তৃগণ অনেক সময় সাততুরুপের আইন মানিয়া চলেন না কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ সাম্রাজ্যে এরূপ সাততুরুপ মধ্যে মধ্যেই হইয়া থাকে ও পড়তাও ফিরিয়া যায়। পুরাকালের দৃষ্টান্ত পুরাণ কথায় কাজ কি, তাতে শ্রদ্ধাই বা কে করিবে? আধুনিক দৃষ্টান্ত দেখাইলেই সকলেই বুঝিতে পারিবেন। সাততুরুপের অথবা আটতুরুপের প্রধান দৃষ্টান্ত ফরাশিস বিপর্য্যয়। এটি আটতুরুপ, হাতের কাগজ পর্য্যন্ত গেল। আর একটি দৃষ্টান্ত আয়র্লণ্ড বাসীদিগের দেশত্যাগ ও আমেরিকায় নূতন পড়তা লইয়া খেলা আরম্ভ করা। তৃতীয় সাততুরুপে মহাজন পীড়িত সাঁওতালগণের রাজ বিদ্রোহ। চতুর্থ স্পেইনে রাজবিপ্লব; পঞ্চম এখন চলিতেছে ইংলণ্ডে শ্রমোপজীবিগণের Strike অর্থাৎ এক মতে অধিক বৃত্তি প্রার্থনা করা, তাহারা এত দিন সাততুরুপে খেলিতেছিল; হারিতেও ছিল, আর তাহারা তুরুপ না পাইলে কিছুতেই খেলিতে চায়না। হে লালকাল ফোঁটা সমন্বিতপঞ্জাপতাকা চিহ্ন ধারি! তুমিই তাহাদের মনেএই প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছ। আমরা তোমাকে সুতরাং ভক্তি পূর্ব্বক নমস্কার করি।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে চারি রঙ্গ সমাজের পূর্ব্বকালিক চারিটি ভাগমাত্র। কোন রঙ্গটি কোন ভাগ ছিল? উত্তর। হরতন রুইতন ইস্কাবন ও চিড়িমার এই চারিরঙ্গ। ইহাদিগকে ইংরাজিতে (Heart) বা হৃদয়, (Diamond) বা হীরক, (Spade) বা কৃষিযন্ত্র ও (Club or dagger) অথব যুদ্ধাস্ত্র কহে। ভারত বর্ষের জনগণের এখন যেরূপ ভাগ এও ঠিক তাই। এখনকার ভাগ ঠিক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র লইয়া নহে। এখন শূদ্রেরা একটু উন্নতি পদবী প্রাপ্ত হইতেছে। তাহারা ক্রীতদাস নহে। কৃষকবৃত্তি অবলম্বন করিতে তাহাদিগকে এখন কেহই নিষেধ করিতে পারে না। এখন বৈশ্য দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। কতক কৃষিজীবী, তাহারা শূদ্র ভাবাপন্ন। কতক কুসিদজীবী বা আভ্যন্তরিক বাণিজ্য ব্যবসায়ী। ইহারাই, দক্ষিণে ভাওজি রাওজি পশ্চিমে শ্রেষ্ঠী বা শেঠিয়া, আর্য্যাবর্ত্তে আগরওয়ালা বা মারওয়ারি বা কাঁইয়া এবং বঙ্গে বণিক। তাসের ভাগ দেখুন। যে পরের হৃদয়ের উপর বিশ্বাসের উপর আপনার জীবিকা নির্ব্বাহ করে সে কি? সে ধর্ম্মযাজক বা ব্রাহ্মণ, তিনি হরতন। যে হীরা মণিমুক্তাদি লইয়া জীবিত থাকে সে কি? সে জহুরি বা বণিক, বৈশ্য বা ধনী; তিনি রুইতন। কৃষিযন্ত্রই যার জীবনের একমাত্র উপায় বা চিহ্ন সে কৃষী, শূদ্রই বলুন বা বৈশ্যই বলুন তিনি ইস্কাপন। আর গদা বা তরবারি যে ক্ষত্রিয়ের চিহ্ন তা কে না জানে। সুতরাং তাসের ভাগ সমাজের ভাগের প্রতিরূপ মাত্র।

চারিরঙ্গ যদি এইরূপই হইল, তবে সাত্তা আট্টা এ সব কি? সাত্তা হইতে টেক্কা একটি হিন্দু পরিবারের প্রতিকৃতি। কিন্তু কোনটি কি তাহা বলিবার পূর্ব্বে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। সংসারে আমরা প্রাধান্য স্বীকার দুইভাবে করিয়া

থাকি। একজন প্রভুত্ব করে, আমরা সেই প্রভুত্বের দাসত্ব করিতে বাধ্য হই, বলিয়া তাহার প্রাধান্য স্বীকার করি। আর কতকগুলি লোককে আমরা মান মর্য্যাদা সম্ভ্রম গৌরব আদর ইত্যাদি প্রদান করিয়া থাকি। তাস খেলাতেও এই রূপ দুই প্রকার প্রাধান্য গণনা আছে। এক ফোঁটা গণনা আর এক উপর্য্যুপরি গণনা। দওলা তিন খানা তাসের পর বটে কিন্তু ইহার মর্য্যাদা বিস্তর। মর্য্যাদায় ইহা দ্বিতীয় গণিত কেবল টেক্কার নীচে মাত্র। সাহেব গণনায় টেক্কার নীচে বটে, কিন্তু তেমন আদর নাই, ফোঁটা গণনায় তিন ফোঁটা মাত্র। কেন এমন হয় তাহা ক্রমে বলিতেছি। বলিয়াছি যে সাত্তা হইতে টেক্কা একটি *হিন্দু পরিবারের প্রতিকৃতি।* সাত্তা হইতে টেক্কার ক্রমে বয়োধিক্য জনিতই একের উপর অন্যের সংস্থান বুঝিতে হইবে। সাত্তা অবিবাহিতা কন্যা।

আটা তাই; তবে বয়োধিক্য বশতঃ সাত্তার উপর বটে। হিন্দু পরিবার মধ্যে ইহাদিগের আবার কি গৌরব থাকিবে? অনেকেই মনুবচন উদ্ধৃত করিয়া নারী জাতির উপর আমাদিগের সাম্য দৃষ্টির চূড়ান্ত প্রমাণ প্রদান করেন।

বচনের শেষ ভাগটি এই—

কন্যাপ্যেব পালনীয়া
শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।

কন্যাকেও পালন করিবে, অতি যত্নে শিক্ষা দিবে। মহাত্মা মনুর অবমাননা হয় এমন কথা আমাদের লেখনীমুখ হইতে সহজে বহিষ্কৃত হইতেছেনা। তবে তাঁহার বচনোদ্ধৃত কারকদিগের দোষ তাঁহাকে শিরে ধারণ করিতে হইতেছে। কিন্তু যাহাতে ধর্ম্মে না পতিত হই, এমন করিয়া বলিতে হইবে। ব্রাহ্মণের সহিত ব্রাহ্মণের তুলনা করিলে আর অবমাননা কি হইল? বঙ্গদেশীয় ব্রহ্মত্বাভিমানী ব্রাহ্মণের বাটীতে কখন শূদ্র ভোজন দেখিয়াছেন? মনে করুন, গৃহস্বামী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে দালানে দণ্ডায়মান, শ্রীবিষ্ণু, দালানের থামে হেলান দিয়া বসিয়া আছেন। ভৃত্যে তাঁহাকে পাখা করিতেছে, বেলা সার্দ্ধ তৃতীয় প্রহর; পল্লীর নবশাখগণ নূতন ঘাসছোলা তিন বার গোবর দেওয়া প্রাঙ্গণে উচু হইয়া বসিয়া ভোজনে ভোর। বাঁড়ুযে মহাশয় পরিবেশক দিগকে বলিলেন "ওহে শূদ্রদেরও লাউচিংড়ি আর বঁদে দিও।" এই হল কন্যাপ্যেব পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ সুতরাং সাত্তা আটার কি ক্ষমতা থাকিবে?

নওলা। অবিবাহিত বালক; অবশ্য অনুজা ভগিনীদিগের উপর ইহার প্রভুত্ব আছে। আর যখন বড় মানুষের ছেলে অর্থাৎ তুরুপ হয়, তখন তার কথা পরে বলিব।

দওলা। নবোঢ়া বধূ। বাড়ির কনে বৌ। এঁর গৌরব কেবল দ্বিতীয় গণিত। আহা! বঙ্গ পরিবার মধ্যে নবোঢ়া বধূর আদর দেখিলে কাহার না কনে হতে ইচ্ছা করে? বৌমা সর্ব্বদা অলঙ্কারে ভূষিতা, ভাল সাটী পরিহিতা, ধনী গৃহে দাসীমণ্ডলীপরিবেষ্টিতা,—কাঙ্গালির গৃহে নিভৃতদেশে গুণ্ঠনাবৃতা স্থিতা। কিন্তু লোক যে অবস্থারই হউক না কেন, বৌয়ের আদর কত; পুতের বৌ, তিনি কোলে কোলে ফিরিতেছেন। যদি ক-

র্ত্তার ভোজন হইল, তবে এখন বৌমার খাবার কি? বৌকে খাওয়ালে, বৌকে শোয়ালে শাশুড়ির, পরিবারের কতই আনন্দ। "বাছা পরের মেয়েকে আপনার করিতে হইবে।" আহা বঙ্গাঙ্গনাগণ কেন তোমরা চিরকালই কনে বৌ থাকনা? আহা দওলার গৌরব কত গৌরব।

গোলাম। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ। গোলামকে ইংরাজিতে (Slave) এবং(Knave) উভয় উপাধি প্রদান করে (Slave) শব্দে গোলাম (Knave) শব্দে পাজি, সেই জন্য গোলামের আর একটি নাম পাজিও বলা যাইতে পারে। কোন কোন স্থলে ব্যবহৃতও হইয়া থাকে। বাস্তবিক ধূর্ত্ততা গণনা করিয়া ইহার স্থানাবধারণ হইয়াছে। সে কথা পরে বিস্তৃত করিয়া বলা যাইবে; এক্ষণে সাধারণতঃ গোলাম পুরুষ বলিয়া গৌরবে এক ফোঁটা মাত্র, জ্যেষ্ঠ বলিয়া পূর্ব্বোক্ত চারিতাসের উপর। বিদ্যাবুদ্ধি ধর্ম্ম প্রভৃতি কোন গুন নাই, তবে পেজোমি পূর্ণ। সে গুণের কি ফল ফলে, পরে দেখিবেন।

বিবি। পৌঢ়া বঙ্গ মহিলা। বাড়ির বড় বৌ। যখন কনে বৌ তখন ইহাঁর গৌরব দশ ফোঁটা ছিল এখন দুই ফোঁটা মাত্র। বাড়ির গৃহিনী—বয়সে তৃতীয়া তিনি সর্ব্বদাই বঙ্গ সংসার লইয়া ব্যস্ত, কে তাঁহাকে আদর করিবে। তাঁর সময়ে আহার হয় না, রাত্রিতে শোবার অবকাশ নাই, দিবসে কথার অবকাশ নাই। কর্ত্রী বটেন কিন্তু দাসী। যাহাকে সকলের মনোরঞ্জন করিতে হইল, সে সকলের দাসী বই আর কি বলিব? তবে তিনি ধনশালীর বনিতা হইলে তাঁহার কোন বিশেষ গৌরব কখন কখন হয়, কিন্তু সে কথা পরে বক্তব্য। সাধারণত তিনি বঙ্গ মহিলা, কর্ত্রী গৌরবে কেবল পাজি হইতে অর্থৎ গোলাম অপেক্ষা কিছু অধিক।

সাহেব। বঙ্গীয় কৃতী পুরুষ। তাহাতেই ইহাঁর নাম সাহেব। সাহেবেরাই কৃতী। ইনি কর্ত্রীর অগ্রে ভোজন করিতে পান কিন্তু কনে বৌ দওলার পরে। "এই যে বৌমাকে খাওয়াইয়া আসিয়া তোমাকে ভাত দি।" সাহেব ছয়তাসের উপর কিন্তু গণনে তিন ফোঁটা।

টেক্কা বাড়ীর কর্ত্তা। সাধারণতঃ ইহার মান, মর্য্যাদা, সম্ভ্রম, প্রভুত্ব সকলি অধিক, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এমন কি আদরে কনে বৌকেও ইহাঁর পরে গণনা করিতে হয়। প্রভুত্বে কৃতী সাহেবকেও ইহাঁর অধীনে থাকিতে হয়। ইনি টেক্কা, ইহার চিহ্ন এক। কর্ত্তা কি একজন ভিন্ন দুই জন হয়? গণনায় ইনি একাদশ। এক পাজির এগার গুন।

তবে তুরুপের সময় এমন বিপর্য্যস্ত হয় কেন? তাহার কারণ আছে। সে হইতেছে নাকি ধনীদের কথা, সাধারণ নিয়ম হইতে একটু বিপর্য্যস্ত হইবে বই কি? যে ধনী অথচ পাজি, পৃথিবীতে সেই বড় লোক। সে রঙ্গের গোলাম। সেই কর্ত্তা সেই কৃতি, কিন্তু অথচ পাজি বলিয়া সে কৃতী হইতে কত গুন; কর্ত্তা হইতে কত গুন অধিক। গোলাম গৌরবে টেক্কার প্রায় দ্বিগুন, প্রভুত্বে কর্ত্তার উপরি স্থিত। অমুক মুখুর্য্যে বড় লোক।

কেন জানেন? তিনি ধনী আর পাজি। তাঁর মত ধনীও বিস্তর আছে, পাজিও বিস্তর আছে, কিন্তু তাঁর এত প্রশংসা কিসে? না তিনি ধনী পাজি। রঙ্গের গোলাম। বাপ রে। তাহাতেই রঙ্গের নওলা দ্বিতীয় তাস। বড় মানুষের ছেলে অপ্রাপ্ত বয়স্ক, কাজেই উদ্ধতস্বভাব; প্রভু বিক্রমশালী ও সমধিক গৌরবান্বিত। গৌরবেও দ্বিতীয় প্রভুত্বেও দ্বিতীয়। বাইরণ ছেলেবেলা কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থের নাম পত্রে লিখিত ছিল "এই কাব্য লর্ড বায়রণ নামক কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক বিরচিত" সমালোচক ব্রুম সাহেব এই কথার উপর নানা উপহাস করিয়াছেন। তিনি বলেন যে কিসের জন্য গ্রন্থের প্রশংসা করিব? নাবালগের লেখা বলে? না লর্ডের লেখা বলে? না—নাবালক লর্ডের লেখা বলে? আমরা উত্তর দিতেছি। নাবালগ লর্ডের লেখা বলে। এক জন নওলা শ্রেণীর লোকের লেখা বলে। সংসারে সকলেই যাহা করে, বাইরণের গ্রন্থ প্রকাশক তাহাই করিয়াছিলেন মাত্র, ব্রুমের এতটা উপহাস করা ভাল হয় নাই। বিশেষতঃ আমরা তাসভক্ত লোক, নওলার নিন্দা আমাদের সহ্য হইবে কেন? ঐ যে অমুক কুমার বড় ঘোঁড় সওয়ার হইয়াছেন, ইহার অর্থ কি? অর্থ যে তিনি বড় মানুষের ছেলে ঘোঁড়ায় চড়েন, আর দুধারি লোককে চাবুক মারেন, কেননা তিনি বড়মানুষের ছেলে সুতরাং উদ্ধতস্বভাবান্বিত। তিনি এক জন নওলা। ছোট বাবুর আদরের কথা সকলেই জানে। ছোট বাবুর দৌরাত্ম্য উপদ্রব সকলি অধিক সুতরাং নওলা গৌরবে ও প্রভুত্বে কেবল পাজি গোলামের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন মাত্র।

এক্ষণে তাস খেলায় আরো একটি অতি সুমহৎ উপদেশ পাওয়া যায়। তাস খেলায় বিস্তি আছে, পঞ্চাশ আছে, শ আছে, ও ইস্তক আছে। তিন খানা তাস একত্র হইলে এক কুড়ির কার্য্য করে, পাঁচ খানা একত্র হইলে একবারকার খেলায় জয় হয় ও খেলা শেষ হয়। তোমরা দুই কোটি প্রজায় আর্ত্তনাদ করিলে কি—রাজার এক বিন্দু অশ্রুপাতও হইবে না, তা কখনই নহে। একতাই উন্নতির মূল, একতাই সমাজের বন্ধন, একতাই জীবন, একতাই জাতিযোগের ভিত্তিভূমি। এক জন অপ্রাপ্ত ব্যবহার নওলা ও দুই জন বঙ্গকুমারী সাত্তা আটা একত্র মিলিত হইলে, কর্ত্তা কর্ত্রী ও কুতীর সহিত তুল্য বল ধারণ করে। একতা এই রূপ পদার্থ বটে, যে তিন তাসের কিছু মাত্র গৌরব নাই, একত্র হইয়াছে বলিয়া তাহারা এখন গৌরবে প্রধান তাসের সমকক্ষ হইল। বঙ্গবাসীগণ তাস খেলিবার সময় যখন বিস্তি বলিয়া ডাকিবে, তখন একবার তোমার ভ্রাতার সহিত যে মোকদ্দামা চলিতেছে, তাহা এক বার স্মরণ করিও। যদি গোঁড়া হিন্দু হও, তবে এক বার আধুনিক নব্য সম্প্রদায়কে—নব্য বলিয়া ব্রাহ্ম বলিয়া কৃশ্চান বলিয়া নাস্তিক বলিয়া,—অভক্ষ্য ভোজী জানিয়া যে আধুনিক হিন্দুয়ানির সারময়ী ঘৃণা প্রদর্শন কর, তাহা একবার স্মরণ করিও। নব্য ভ্রাতৃগণ আপনারাও এক বার বিদ্যামত্তার সারতত্ত্ব ভূত যে অপূর্ব্ব বিদ্বেষ

ভাবটি বুড়ো বোকা পৌত্তলিকদের প্রতি প্রদর্শন করেন, তাহা একবার স্মরণ করিবেন। তাহা হইলেই তাসাবতারের কার্য্য সিদ্ধ, আর আমি এই অবতারের অদ্বৈত প্রভু অভিষেক কর্ত্তা যোহন, আমারও মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে।

ইস্তকও একতার গুণের পরিচয় প্রদানকরে। কিন্তু এবার দম্পতি মিলন। ধনবান কৃতী যদি ধনশালিনী কর্ত্রীর সহিত একযোগ হয়েন, তাহা হইলে সাধারণের তিন জনের মিলনের ন্যায় গৌরবান্বিত হইবেন, তাহার আর বৈচিত্র কি? সাধারণের দম্পতি মিলনের গৌরব কি? সেত হতেই হবে। যাহাদের মধ্যে সচরাচর হয় না, তাহাদের মধ্যে হলেই না গৌরব? আমাদের যুগল রূপ দেখিয়া কে তৃপ্ত হইবে? তবে দম্পতি প্রণয়ের কথা? সমাজ বিশেষতঃ আধুনিক বঙ্গসমাজ কবে দম্পতি প্রণয়ের গৌরব করিয়াছে? সে তোমার ঘরের কথা। তুমি তাহাতে সুখী হও, আমরা সমাজ, তাহার জন্য কিছুই করিতে পারিনা—তবে বড়মানুষের স্ত্রীপুরুষের মিল। হাঁ গৌরব করা উচিত বটে। ইস্তকে এক কুড়ি দেওয়া গেল।

যেমন শ্রেণীবদ্ধ পাঁচজনের মিলে এক শত হয়, তেমনি চারিবর্ণের এক রূপ লোক একত্রিত হইলে সেই শত গৌরব পায়। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারিবর্ণের এক ধর্ম্মাক্রান্ত লোক একত্র হইলে যে গৌরবের কথা হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? তবে চারিজন কনে বৌয়ে, নবোঢ়া বধূ একত্রিত হইয়া কি করিতে পারে? তাহাদের আপনাদের যে চল্লিশ সংখ্যার গৌরব আছে, তাঁহারা যদি নিজ কুলে থাকিয়া যান, তবেই সে কুলের গৌরবের বৃদ্ধি করিলেন। নতুবা তোমার কুল ভ্রষ্ট করিয়া তাহাদিগকে লইয়াগিয়াছে, খেলার শেষ গণনায় তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীরই গৌরব বাড়িল।

সেই রূপ চারিজন অপ্রাপ্ত ব্যবহার বালক বা বালিকা একত্র হইয়া কি করিতে পারিবে? এই জন্য চারিসাত্তায়, চারি আটায়, চারি নওলায়, চারি দশে শ হয় না।

হাতের পাঁচ। কোন সংগ্রামে যে পক্ষ শেষ যুদ্ধে জয়ী হয়, তাহার কিছু অতিরিক্ত গৌরব করিতেই হয়। শেষ জয়ের সুখ্যাতির নামই হাতের পাঁচ। কিন্তু যেমন খেলায় নির্ব্বোধ আছে, তেমনি সংসারে তদপেক্ষাও নির্ব্বোধ আছে। সংসারে কৃপণ লোক দেখিতে পাওয়া যায়, কেবল হাতের পাঁচ রাখিবার জন্যই যাবজ্জীবন ব্যস্ত, কিন্তু হাতের পাঁচ রাখিলেন অথচ গুণিয়া দেখেন যে দুকুড়ি সাত নাই। আগেখেলা রাখ, তার পর হাতের পাঁচের চেষ্টা কর। তা না করিলে তুমি বড় নির্ব্বোধ।

যে হাতের পাঁচ রাখিয়াছে, শেষ রক্ষা করিয়াছে, অথচ খেলা আছে সে পরে হাতে কাগজ তাসিবে। শেষ যুদ্ধে আমি জয়ী। এক্ষণ আমি যেখানে শিবির স্থাপন করিয়াছি তোমাকে আসিয়া সেই খানে লড়াই দিতে হইবে। গত বৎসর তোমায় আমায় ভিন্ন২ রূপে কারবার করিয়া তোমার চৈত্র মাসের শেষে বিলক্ষণ লাভ হইয়াছে, এক্ষণে বৈশাখের প্রথমে তোমার দর লইয়াই

আমাকে কারবার করিতে হইতেছে। অর্থাৎ তোমার হাতের পাঁচ ছিল, তুমিই কাগজ দিলে। তুমি কাগজ দিয়াছ, তোমার কতক গুলি সুবিধা, এখন তোমায় আমায় যদি দুই জনে এক রকমের বিন্তি পঞ্চাশ ডাকি, তাহাহইলে আমার গৌরব অধিক হইবে। বাস্তবিক মধ্যস্থ হইতে হইলে এই রূপ বিচার করাই উচিত।

আর কুড়ি খানি কাগজের কথা বাকি আছে। এ গুলি সামান্যত গৌরবচিহ্ন মাত্র। যত দিন তুমি গৌরবের পাতসাই পঞ্জা উড়াতে না পারিলে,তত দিন তোমার গৌরব ঢাকা থাকাই বিধেয়। অর্থাৎ চারি খানা পর্য্যন্ত কাগজ উপুড় করিয়া ধরিও। সংসারের একটি রীতিই এই যে তুমি চারিবার অনেক কষ্ট করিয়া যে খ্যাতিপত্তি টুকু সঞ্চয় করিলে, তোমার এক বার খেলা না হওয়াতে তাহা তৎক্ষণাৎ লীন হইয়া গেল। তবে যদি তুমি এক বার পঞ্জা জাহির করিয়া থাক, তাহা হইলে পাঁচ হাত অন্ততঃ না গেলে তুমি আর একেবারে হীনগৌরব হইবে না। পাঁচ হাত নহিলে পঞ্জা উঠে না। ছক্কা বড় বাড়। পঞ্জার উপর এক ফোঁটা। হুতোম যাহাদিগকে সহরের হঠাৎ অবতার বলেন, তাঁহাদেরই চিহ্ন এই তাসের ছক্কা। তাঁহারা ভোগাইতে আসেন, ভোগাইয়া চলিয়া যান। ধূমকেতুর ন্যায় গগনপথে উদিত হইল; শিখায় গগণের একদেশ উজ্জ্বলীকৃত হইল, কত লোকের মনে কত অশুভ ভাবনা সেই সঙ্গে সঙ্গে উদিত হইল। কিন্তু কত কাল যে স্থায়ী হইবে,তাহা কে বলিতে পারে ? যখন গেল, হঠাৎ চলিয়া গেল। এই জন্য ভাল খেলওয়ারে ছক্কা করিবার বড় আস্থা প্রদর্শন করে না। খেলাত পঞ্জা, ছক্কা কেবল বৃথা জাঁক জমক মাত্র।

তাস খেলা যে সংসারের অবিকল প্রতিরূপ, তাহা আমরা এক প্রকার দেখাইলাম। কিন্তু অতি গূঢ় কথা এখনও বলি নাই। সংসারের অতি গূঢ় বিদ্যা কি ? জুয়াচুরি। তিনি বড় পাকা লোক বলিলে কি বুঝায়, যে তিনি এক জন জুয়াচোর। তোমার হাতে কিছুমাত্র তাস নাই, কিন্তু তুমি এমনি মুখভঙ্গী করিতেছ যে সকলেই মনে করিল, তুমি এক জন আঢ্য লোক। তুমি তাসে পাকা খেলোয়ার হইলে, সংসারে তুমি পাকা লোক হইলে। যখন "খেলার গুরু কেন নাই" আমরা বলি তখন যেন মনে থাকে, যে তিনিই এই লোকযাত্রার গুরু। তবে তাস খেলার সময় আমরা স্বীকার করি, ভবের খেলাতে স্বীকার করাটা বড় প্রথা নয়।

সকল কথাই বলা হইল। এখন হে তাসদেব ! তোমার বাওয়ান্নপীঠ মূর্ত্তিতে একবার আবির্ভূত হও। হইয়া তোমার ঊনপঞ্চাশ মূর্ত্তি আমার ঊনপঞ্চাশ অবয়বে ভর কর; আর তোমার প্রধান তিন মূর্ত্তি আমার লেখনী মসী ও কাগজে আশ্রয় করে, আমি এক বার,—

"কথাচ্ছলেন বালা নাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে।"

সাত্তা আট্টা কুমারীগণ! তোমাদের গৌরব কি এতক্ষণে বুঝিতে পারিলে ত ?

নওলা ভাই ! যদি তুরুপের হও ত মনে করিও যে বিপক্ষের গোলামে তো-

মাকে লইয়া যাইতে পারে।

দওলা ভগিনী! কুলে থাকিলেই কুলের গৌরব; কিন্তু বাঙ্গালায় যত দিন কনে থাকিবে, তত দিনই তোমাদের সুখের দিন, অতএব শীঘ্র ঘোমটা খুলিও না।

অহে গোলাম। অদৃষ্টক্রমে এবার তুরুপের হয়েছ,মনে থাকে যেন, বদ রঙ্গের বেলা তোমার গৌরব সর্ব্বাপেক্ষা কম।

বিবি, সাহেব। কর্ত্রী! ও কৃতি!— তোমাদিগকে আমার আর কিছু বলিতে হইবে না। কিন্তু ধনী! ও ধনশালিনী যেন ইস্তকটা কি তাহা মনে থাকে।

টেক্কা কর্ত্তা মহাশয়! বদ রঙ্গের সময় আপনাকে রঙ্গের সাত্তা দলন করে বলে, আপনি ক্ষুব্ধ হইবেন না। ফিরে হাতে কি হয় দেখিবেন?

ভাই খেলওয়ারগণ তুরুপ পাইবার সময় যেন সাত তুরুপ মনে থাকে, আর হাতের পাঁচ রাখিতে গিয়া যেন খেলা খোয়াইও না। মহাপ্রভু তাস! যদিও আমি অদ্বৈত এবং তোমার গুরু, কিন্তু তুমি ভবাবতার তোমাকে নমস্কার করি।

রসিকতা।

অনেক কবি, দার্শনিক, এবং অন্যান্য মহাত্মাগণ "সুখ কি?" এতদ্বিষয়ের মীমাংসার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আমরা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিয়াছি যে, রসিকতা প্রকাশ করাতেই মনুষ্যের সুখ। নচেৎ রসিকতা করিবার জন্য লোকে এত অস্থির হইবে কেন? ধনের চেষ্টায় সকলেই ব্যস্ত বটে, কিন্তু আমরা স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, রসিক বলিয়া নাম কিনিবার জন্য লোকে যেমন উদ্যোগী, ধনী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিবার জন্য কেহ তত নহে। অনেকেই স্বীকার করে, "আমি নির্ধন।" "আমি গরিব—আমি দিতে কোথায় পাইব?"—"আমি কাঙ্গাল,আমার উপর এ দৌরাত্ম্য করিও না," এই রূপ কথা কাহার মুখে শুনিতে না পাওয়া যায়? কিন্তু কে কোথায় কবে কাহার কাছে স্বীকার করিয়াছে যে "মহাশয়, আমি অরসিক।" কে কোথায় কবে বলিয়াছে, "মহাশয়, আমি অরসিক, আমার সঙ্গে হাস্য পরিহাস করিবেন না," —কে কোথায় কবে ভাবিয়াছে যে, "আমার কথায় রস নাই—আমি আর রসিকতা ছড়াইবার চেষ্টা করিব না?" কে না উপযুক্ত লোক দেখিলেই আপনার রসিকতার পরিচয় দিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়। কেহ কাহার সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলে, আপনার ঐশ্বর্য্যের বা বিদ্যাবত্তার, বা যশস্বিতার বা অন্য গুণের পরিচয় দিবার জন্য তাদৃশ ব্যস্ত হয় না, কিন্তু রহস্য উত্থাপন করিয়া রসিকতার পরিচয় দিবার জন্য সকলেই শশব্যস্ত।

অধুনাতন বাঙ্গালী মহলে রসিকতার

অত্যন্ত দৌরাত্ম্য আরম্ভ হইয়াছে। “তামাসা ঠাট্টা” “ইয়ারকি” “রং” মজা” ইত্যাদি বিবিধ নামে, রসিকতা বঙ্গদেশে একাধিপত্য করিতেছে। বরং কথোপকথনে কিছু নিস্তার আছে। সম্বন্ধ বিরুদ্ধ লোকের কাছে, বা শোকদুঃখাদির সময়ে, বা বিষয় কর্ম্মের সময়ে, অনেকে বাঁচাইয়া চলেন। কিন্তু লেখকদিগের নিকট কিছুতেই নিস্তার নাই। সুসময়ে, অসময়ে; সৎকথায়, কুকথায়; যেখানে সেখানে; যখন তখন, রসিকতা করা আজি কালি কতক গুলিন লেখকের ব্যবসায়।

এমত বলি না যে,সকল লেখকই রসিকতা ব্যবসায়ী। কতকগুলিন লেখক বড় বিজ্ঞ। তাঁহারা রসিকতার প্রতি বড় অপ্রসন্ন। তাঁহাদের ধারণা আছে, যে পুত্র শোকাতুরের ন্যায় অনবরত মুখ দীর্ঘীকৃত করিয়া রাখাই পাণ্ডিত্য। রসিকতার সংস্পর্শ মাত্র দুরপনেয় কলঙ্কের কারণ। তাঁহাদের কাছে রসিকতার নাম গ্রাম্যতা। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। অধিকাংশ সাপ্তাহিক লেখক এই সম্প্রদায় ভুক্ত।

অপর সম্প্রদায়ের অন্য কাজ নাই; কেবল প্রাণপণে রসিকতা করাই কাজ। প্রথম সম্প্রদায় কৃষ্ণযাত্রার মুনি গোঁসাই, দ্বিতীয় বাসদেব। এক সম্প্রদায় শ্বেতশ্মশ্রু,জটা, এবং বিজ্ঞতা লইয়া ব্যস্ত, রসিকতায় বড় বিরক্ত। কিন্তু দ্বিতীয় সম্প্রদায় তাহা মানে না; নিয়ত রসিকতা করিবার জন্য অস্থির, সুতরাং মুনি গোসাঁইয়ের বিজ্ঞতা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যায়। বাস্‌দেবদিগের রসিকতা সকল সময়ে সরস হয় না,—না হউক—রসিকতা করিতে হইবে। রচনা সরস হউক বা-নীরস হউক—তাহাতে কেহ হাস্থক বা না হাস্থক—তাঁহারা রসিকতা করিবেন। রসিকতার কথার অনুরোধে সত্যকে মিথ্যা করিতে হয় তাহাও স্বীকার, নিন্দনীয়কে পূজা করিতে হয়, বা পূজ্যকে নিন্দা করিতে হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই, রসিকতার স্রোতঃ না মন্দ পড়ে। পূর্ব্বে এ শ্রেণীর লেখক এদেশে সচরাচর দেখা যাইত না। পাঁচালি এবং কবিওয়ালা ও যাত্রার দলেই ইহার প্রাদুর্ভাব ছিল। কুক্ষণে হুতমপেঁচার নক্‌শা এদেশে প্রচার হইল। সেই পর্য্যন্ত এই লেখক গুলির রসিকতায় দেশ প্লাবিত হইতেছে।

রসিকতা, বাচনিক হউক বা লিখিত হউক, সর্ব্বত্র সমান প্রকৃতি দেখা যায়। প্রচলিত রসিকতা নানা প্রকার।

প্রথম, প্রাচীন রসিকতা। কেহ কাহাকে সম্বন্ধ নিষিদ্ধ কোন দোষারোপ করিতে পারিলেই আপনাকে রসিকতায় পারদর্শী বিবেচনা করেন। এই প্রকার রসিকতা প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিশেষ আদৃত। বৃদ্ধ গাঙ্গুলি মহাশয়, যদি কোন প্রকারে ইঙ্গিত করিতে পারিলেন, যে রাম শ্বাশুড়ে, কি যদু বউও তবেই তিনি সে দিনের মত রসিকতার জয়পতাকা বাঁধিলেন।

ইহারই সম্প্রসারণে দ্বিতীয় প্রকারের রসিকতার সৃষ্টি। কেহ কাহাকে যে কোন প্রকারের গালি দিলেই মনে করেন যে আমি বিশেষ রসিকতা করিলাম। পরের মাতৃ পিতৃ প্রভৃতি সম্বন্ধে কদর্য্য কথা বলিতে পারিলেই এরূপ রসিকতার চরম হইল। সুতরাং গ্রাম্য বালকেরা এই রূপ রসিকতায় সর্ব্বাপেক্ষা সুপণ্ডিত!

হুতোমপেঁচার অনুকরণে ব্রতী লেখকেরা প্রায় তাহাদের কাছে২ যান।

তৃতীয় শ্রেণীর রসিকেরা, রসিক চূড়ামণি। অশ্লীলতাই তাঁহাদের কাছে রসিকতা। কোন ক্রমে অনুচ্চার্য্য কোন কথা ব্যক্ত করিতে পারিলেই, তাঁহারা রসিকতার একশেষ করিলেন। যাহা ভদ্রের অশ্রাব্য বা অপাঠ্য, এবং সুনীতির বিনাশক, তাহাই তাঁহাদের কাছে রসিকতা। কথা গুলি স্পষ্ট বলিতে পারিলেই তাঁহাদের মনের মত রস ছড়ান হয়, কিন্তু আইনের দৌরাত্ম্যে কেবল ইঙ্গিতে রসিকতা করিয়াই অনেককে ক্ষান্ত থাকিতে হয়।

আর এক প্রকারের রসিকতা কেবল চাপল্যমাত্র। গ্রাম্য ইতর ভাষায় তাহার নাম "ঝাঁপাই ঝোড়া।" অনবরত মুখভঙ্গী, নিয়ত হস্তপদ সঞ্চালন, রাত্রিদিবা হাসিবার এবং হাসাইবার নিষ্ফল উদ্যম, এই রসিকতার সামগ্রী। যাত্রার, "ভুলুয়া" এবং "মটরু" এই সকল শ্রেণীর রসিকদিগের আদর্শ। যেব্যক্তি মুখে২ এই রূপ রসিকতা করিবার জন্য কষ্ট করে, তাহার দুঃখ দেখিয়া দুঃখ হয়, রাগ হয় না। কিন্তু যে সকল লেখক এরূপ ভুলুয়াগিরিতে প্রবৃত্ত, তাহাদের রসিকতা অসহ্য। আধুনিক নাটক লেখকদিগের মধ্যে অধিকাংশ, এবং হুতোম সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে, এই শ্রেণীর রসিক। রসিকতা করিবার জন্য তাঁহারা অত্যন্ত অস্থির; দন্ত সর্ব্বদাই বহিষ্কৃত; অঙ্গ ভঙ্গীর বিরাম নাই; চক্ষুর নানারূপ বিকৃতি; কিন্তু রসিকতার উপকরণের মধ্যে কতকগুলিন নীরস, অসংলগ্ন, অর্থশূন্য, ইতর কথা। তাঁহাদের গ্রন্থে একটুং তাড়িখানার গন্ধ থাকে।

কোম্‌ৎ দর্শন।

১। ওগুস্ত কোম্‌ৎ।

মহাত্মা ওগুস্ত কোম্‌তের তুল্য দর্শনবিৎ অতি দুর্লভ। অনেকে তাঁহাকে অদ্বিতীয় দার্শনিক বলিয়া মান্য করেন। সে যাহা হউক, তিনি যে অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। পণ্ডিতপ্রসবিনী ফ্রান্স ভূমিতে তাঁহার তুল্যব্যক্তি জন্মে নাই। কোম্‌ৎ দর্শন, কাপিল সূত্রের ন্যায় নিরীশ্বর; কিন্তু নিরীশ্বর বলিয়া অনেক ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি ঐ দর্শনের কোন২ অংশ ভ্রমাত্মক বিবেচনা করিয়াও তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন না।

২। বহির্বিষয় জ্ঞান।

বস্তুতত্ত্ববিষয়ে কোম্‌তের মত এক্ষণে ইউরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিতমাত্রেই অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করেন। আমরা বস্তু সকলের গুণ জানি এবং বিশেষ অবস্থায় তদীয় বিশেষ কার্য্য জানি। কিন্তু বস্তুসকল যে কি, তাহা আমাদের বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর। তাহাদের মূল প্রকৃতির বিষয় আমরা কিছুই জানিতে পারি না। চম্পক পুষ্পের এই গুণ যে তাহা হইতে অণু উত্থিত হইয়া তোমার নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করিলে গন্ধ বোধ হয়। ঐ গন্ধগুণের বিষয় তুমি জানিতেছ। চম্পকের আর এক গুণ যে তাহা হইতে জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইয়া তোমার চক্ষুতে লাগিলে তুমি চম্পক পীতবর্ণ দেখ। ঐ বর্ণগুণের বিষয় তুমি জানিতেছ। চম্পকের আর এক গুণ এই যে তাহা স্পর্শ করিলে কোমল বোধ হয়। তুমি ইহার কোমলতা গুণ জানিতেছ। চম্পক চর্ব্বণ করিয়া তিক্ত রস বোধ করিতেছ। স্পর্শেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারায় চম্পকের বিস্তৃতি জানিতেছ। গন্ধ, বর্ণ, রস, কোমলতা ও বিস্তৃতি গুণ ত্যাগ করিলে, চম্পকের বিষয় কি জান? কিছুই না। মনুষ্যের প্রকৃতিমূলক সংস্কার এই যে, যেস্থলে গুণ জানিতে পারে, সে স্থলে গুণের আধার বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করে।

যাঁহারা মায়াবাদীদিগকে বাতুল বলিয়া উপেক্ষা করেন, তাঁহারা নিতান্ত স্থূলদর্শী। বস্তুত মায়াবাদীরা সাধারণ লোক অপেক্ষা সূক্ষ্মদর্শী। তাঁহাদের ভ্রম এই যে তাঁহারা গুণ হইতে গুণাধার বিষয়ের সত্ত্বোপলব্ধি অমূলক বিবেচনা করেন। যদি কোন মায়াবাদী আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, "গুণ হইতে গুণাধার বিষয়ের উপলব্ধি কেন কর?" ইহার উত্তর এই দেওয়া যাইতে পারে, "এ সংস্কার আমাদের স্বভাবসিদ্ধ।" মায়াবাদীদের মতের অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিবার দ্বিতীয় উপায় নাই।

৩। কারণ জ্ঞান।

কারণ শব্দ প্রয়োগ করিতে কোম্‌তের বিলক্ষণ আপত্তি আছে। তিনি বলেন, যাঁহারা তত্ত্ববিজ্ঞানের অনুশীলন করেন, তাঁহারা যাহাকে কারণ বলেন, সে কারণের বিষয় আমরা কিছুই জানিতে পারি না। কেবল প্রাকৃতিক

ঘটনা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে ঘটিয়া থাকে, ইহাই আমরা জানিতে পারি।

সূর্য্যের তাপ জলরাশিতে পড়িলে জলরাশির কিয়দংশ বাষ্প হয়। ঐ বাষ্প জলরাশির উপরিস্থ বায়ু অপেক্ষা লঘু, এ জন্য আকাশ মার্গে উত্থিত হয়। ঊর্দ্ধস্থ বায়ুর শৈত্য গুণে বাষ্প সঙ্কুচিত ও দ্রবীভূত হইয়া জল হয়। এই রূপে বৃষ্টি হয়। তাপে জলাদি জড় বস্তুর যোগাকর্ষণের হ্রাস হয়, তাহাতে উত্তপ্ত বস্তুর পরমাণু সকল বিচ্ছিন্ন হয়, এবং এই রূপে উত্তপ্ত বস্তু স্ফীত ও প্রসারিত হয়। কিন্তু তাপে কেন যোগাকর্ষণের হ্রাস হয়? কেন জল বাষ্প হয়? এ প্রশ্নের উত্তর কেহই দিতে পারে না।

শ্বেত বর্ণ পারদ ও পীত বর্ণ গন্ধক রাসায়ণিক যোগে রক্ত বর্ণ হিঙ্গুল উৎপন্ন করে; কিন্তু শ্বেত বর্ণ, পীত বর্ণ অথবা অন্য বর্ণের দ্রব্য উৎপন্ন না হইয়া কেন রক্ত বর্ণ দ্রব্য উৎপন্ন হয়, ইহা কেহই বলিতে পারেন না। প্রাকৃতিক ঘটনা কিরূপে হয়, আমরা জানিতেছি; কেন হয়, জানি না। কোম্‌ৎ বলেন, "কেন হয়," না জানিলে কারণ শব্দ প্রয়োগ করা উচিত নহে। অমুক ঘটনা হইলে অমুক ঘটনা হইবে, ঘটনা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে হইবে, ইহাই আমরা জানি, এপর্য্যন্তই আমাদের জ্ঞানের সীমা। যাহাকে লোকে কারণ কার্য্য সম্বন্ধের নিয়ম বলে, তাহা কোম্‌তের মতে প্রাকৃতিক ঘটনার পূর্ব্বভাব ও উত্তরভাবের নিয়মমাত্র।

যিনি কারণজ্ঞান মনুষ্যের সাধ্যাতীত বলেন, তিনি যে বিশ্বের আদি কারণজ্ঞান মনুষ্যের সাধ্যাতীত বলিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। তাঁহার মতে বিশ্বের উৎপত্তির বিষয় মনুষ্য কখনই জানিতে সক্ষম হইবে না। সুতরাং এ বিষয়ের আলোচনা বৃথা।

৪। দৈববলেবিশ্বাস।

পুরাকালে মানবজাতি সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনা দৈববলঘটিত বলিয়া বিশ্বাস করিত। এক্ষণেও ঐ রূপ বিশ্বাস ভারতবর্ষে এবং অন্যান্য দেশে আছে। বায়ু বহিতেছে; অতএব বায়ুর অধিষ্ঠাতা দেবতা আছেন। স্রোতঃ চলিতেছে; অতএব নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী আছেন। বৃষ্টি হইতেছে; অতএব মেঘ দৈব বলে সৃষ্ট ও চালিত হইয়া বারি বর্ষণ করিতেছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের যত অনুশীলন হইতেছে, তত সাধারণ প্রাকৃতিক ঘটনা সম্বন্ধে এ প্রকার দৈববলে বিশ্বাসের হ্রাস হইতেছে। কোম্‌ৎ বলেন, যখন মনুষ্যেরা প্রাকৃতিক নিয়ম সকল ভালরূপে বুঝিতে পারিবে, তখন দৈববলে বিশ্বাস একবারে অন্তর্হিত হইবে। মনুষ্যেরা প্রথমতঃ জড়োপাসক হয়, পরে বহুদেবোপাসক হয়, তৎপরে একেশ্বরবাদী হয়; পরিণামে নিরীশ্বর হইবে। বিশ্বে যে নিয়ম আছে, এ কথা তিনি স্বীকার করেন, কিন্তু তাহা হইতে বিশ্বনিয়ন্তা উপলব্ধি করা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করেন না।

৫। কোম্‌ৎ নাস্তিক কি না?

ইহাতে অনেকেই মনে করিবেন, কোম্‌ৎ নাস্তিক; কিন্তু তাঁহাতে ও অন্যান্য নাস্তিকে অনেক প্রভেদ আছে। তাঁহার প্রণীত দর্শনশাস্ত্রে সাংখ্য দর্শ-

নের প্রথম অধ্যায়ের ৯২, ৯৩ বা ৯৪ সূত্রের ন্যায় কোন সূত্র নাই। মহর্ষি কপিলের ন্যায় তিনি কোন স্থলে "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" বচন প্রয়োগ করেন নাই। বরং তিনি স্বরচিত এক গ্রন্থে কহিয়াছেন, "আমি নাস্তিক নহি ; যাহারা ঈশ্বরকে বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা না মানিয়া প্রকৃতি হইতে বিশ্বের উৎপত্তি মানে, তাহারাই নাস্তিক। (১) তাহাদের মত হইতে ঈশ্বরবাদীদের মত অপেক্ষাকৃত যুক্তিসিদ্ধ।" কিন্তু যদিও তিনি কোন স্থলে ঈশ্বর নাই অথবা ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণাভাব, এমন কথা বলেন নাই, তথাপি তাঁহার দর্শন আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে, নিরীশ্বর বলিয়া প্রতীত হইবে।

৬। কোম্‌ৎ দর্শনের দোষ।

কোম্‌ৎ দর্শন নিরীশ্বরতা দোষে দূষিত না হইলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত, সন্দেহ নাই—এমন কি, সর্ব্বদর্শনশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইত। কোম্‌ৎ মনুষ্যজাতির ইতিহাস অবলম্বন করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে,দৈববলে বিশ্বাসের ক্রমে হ্রাস হইতেছে, আরও হইবে। ইহাতে তিনি অনুমান করেন যে, পরিশেষে ঐ বিশ্বাস একবারে অন্তর্হিত হইবে।

বিশ্বনিয়ম দৃষ্টে বিশ্বনিয়ন্তা উপলব্ধি কেন অযৌক্তিক, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। কোম্‌ৎ এ বিষয়সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত ঐতিহাসিক প্রমাণ ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণ দেন নাই। কিন্তু ঐ প্রমাণ কোন ক্রমেই প্রচুর বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ঈশ্বরবাদীদের মতের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করা অসম্ভব ; এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, নিয়ম হইতে নিয়ন্তা উপলব্ধি আমাদের স্বভাবসিদ্ধ। এবং আমাদের জ্ঞানের সীমা ও বিশ্বাসের সীমা সর্ব্বতোভাবে সমান হইতে পারে না। কালের আদি আছে বা অন্ত আছে, ইহা কেহই অনুভব করিতে সক্ষম নহে ; এ জন্য সকলেই বলে, কাল অনাদি ও অনন্ত। কিন্তু অনাদি ও অনন্ত বিষয় মনে ধ্যান বা ধারণা করা কাহার্ সাধ্য? কাহারও সাধ্য নাই। আকাশের সীমা আছে, ইহা কেহ অনুভব করিতে পারে না ; এ জন্য সকলেই বলে, আকাশ অসীম। কিন্তু অসীম পদার্থ মনুষ্যের পরিমিত বুদ্ধিতে কখনই ধারণা করিতে পারে না।

অনাদি, অনন্ত ও অসীম পদার্থ আমরা মনে ধারণা করিতে অক্ষম হইয়াও বিশ্বাস করিতেছি—কাল অনাদি ও অনন্ত, এবং আকাশ অসীম। এ স্থলে আমাদের বিশ্বাসের সীমা জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করিয়াছে, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। ঈশ্বর সম্বন্ধেও সেই রূপ। তাঁহার বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অতি অসম্পূর্ণ ও অপরিস্ফুট ; কিন্তু এ কারণে তাঁহাতে বিশ্বাসের লাঘব হওয়া উচিত নহে। মধ্যাহ্ন সূর্য্য ঘনাবৃত হইলেও তিনি অস্তগত হন নাই বুঝিতেছি।

৭। কোম্‌ৎ কপিল।

সাংখ্যদর্শন ও কোম্‌ৎদর্শন নিরীশ্বর হইলেও এই দুই দর্শনে উচ্ছৃঙ্খলতার লেশমাত্র নাই। মনুষ্যদিগকে ধর্ম্মশৃঙ্খলে বদ্ধ করাই উভয় দর্শনের উদ্দেশ্য। গত

(১) যথা ; –
প্রকৃতিবাস্তবেচ পুরুষস্যাধ্যাসসিদ্ধিঃ। সাংখ্যপ্রবচন ২য় অধ্যায়, ৫ম সূত্র।

শতাব্দীর অধিকাংশ নাস্তিক চার্ব্বাক ছিলেন; এক্ষণেও জর্ম্মনি দেশের প্রসিদ্ধ নাস্তিক লুড্‌উইগ্‌ ফুএয়ার্বাক্‌ এবং ডাক্তর বুক্‌নেয়ারের শিষ্যেরা চার্ব্বাক্‌। ইহাঁদের অধিকাংশের মতে ইন্দ্রিয় সুখভোগই পরম পুরুষার্থ। কিন্তু কোম্‌ৎ ও কপিল ইন্দ্রিয় সংযমের যেরূপ নিয়ম করিয়াছেন, এরূপ কঠিন নিয়ম ঈশ্বরপরায়ণ দার্শনিকদের গ্রন্থেও দুষ্প্রাপ্য। মহর্ষি কপিল বলিয়াছেন, "ঈশ্বর আছেন বলিয়া কর্ম্মফল হয়, এমন নহে, তিনি থাকিলেও হইবে,না থাকিলেও হইবে।" (১) এই বচন সাংখ্য দর্শন, কোম্‌ৎ দর্শন ও বৌদ্ধধর্ম্মের মূলসূত্র বলিলে বলা যায়। এ পর্য্যন্ত কোম্‌তে ও কপিলে ঐক্য আছে।

৮। পুরুসার্থ।

কপিলের মতে তিন প্রকার দুঃখের সম্পূর্ণ নিরত্তিই পরম পুরুষার্থ। দৃষ্ট উপায়ে অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য ভোগে, ইন্দ্রিয় ভোগে, বাহ্যাড়ম্বরে দুঃখ নিরত্তি হয় না। বিষয়বাসনা ত্যাগ করিয়া ঔদাসীন্যভাব প্রাপ্ত হইলেই অপবর্গ লাভ হয়। প্রকৃতি পুরুষের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদই পুরুষার্থ।(২)

পুরুষার্থ লাভের জন্য বানপ্রস্থ হইবার প্রয়োজন নাই; আপন আশ্রমে থাকিয়া আশ্রমবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য। অভ্যাস ও বৈরাগ্য অবলম্বন করিলে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ হইবে। (৩) ওগুস্ত কোম্‌তের মতে আপনার সুখের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া কর্ত্তব্যানুষ্ঠানই পুরুষার্থ। "কর্ত্তব্যানুষ্ঠানেই মানবাধিকার," ইহা তাঁহার প্রসিদ্ধ বচন। কর্ত্তব্য সাধনে আমাদের সুখ হইতে পারে; কিন্তু সুখ আমাদের প্রকৃত লক্ষ্য নহে।

৯। পরমসৎ

কোম্‌তের আর এক বচন "পরোপকারার্থে জীবনধারণ।" সমস্ত মানবজাতিকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা জ্ঞান করিয়া তাহার সেবায় ব্রতী হওয়া কর্ত্তব্য। এই দেবের নাম তিনি "পরমসৎ," (৪) রাখিয়াছেন। তিনি বলেন, কালে সকলে অন্যদেবের উপাসনা ত্যাগ করিয়া পরমসতের উপাসনা করিবে। যে পরিমানে উপচিকীর্ষাবৃত্তি স্বার্থপরতাকে জয় করিবে, যে পরিমাণে মনুষ্যজাতি স্বার্থবিরত ও আত্মবিস্মৃত হইয়া পরের মঙ্গলসাধনে প্রবৃত্ত হইবে, সেই পরিমানে পরম সতের সেবা হইবে ও পুরুষার্থ লাভ হইবে। কেবল উপচিকীর্ষার দ্বারায় সম্যক্‌ উন্নতি লাভ করা দুঃসাধ্য। বিশুদ্ধ প্রেম, ভক্তি ও স্নেহ আমাদের উন্নতির এক প্রধান সোপান। কোম্‌তের মতে ভক্তিরূপা মাতা, প্রীতিরূপা ভার্য্যা, এবং স্নেহরূপা কন্যা আমাদের প্রত্যক্ষ গৃহদেবতা।

(১) নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তিঃ কর্ম্মণা তৎসিদ্ধেঃ। ৫ম অধ্যায়, ২য় সূত্র।

(২) অথ ত্রিবিধ দুঃখাত্যন্ত নিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ। ১ম অধ্যায়, ১ম সূত্র।

নদৃষ্টাত্তৎসিদ্ধি নিবৃত্তেরপ্যনুবৃর্ত্তি দর্শনাৎ। ঐ, ২য় সূত্র।

দ্বয়োরেকতরস্য চৌদাসীন্যমপবর্গঃ; ৩য় অ ৬৫ সূত্র

যদ্বা তদ্বা তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থস্তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ। ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৭০ সূত্র।

(৩) স্বকর্ম্ম স্বাশ্রমে বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানম্‌। ৩য় অধ্যায়, ৩৫ সূত্র। বৈরাগ্যাদভ্যাসাশ্চ ঐ, ৩৬ সূত্র।

(৪) Grand être পদের প্রকৃত অনুবাদ "মহাসৎ।" পাঠকবর্গ মহাসৎ পদের বিপরীতার্থ "মহা অসৎ" করিতে পারেন; এজন্য পরমসৎ প্রয়োগ করা গেল।

১০। প্রেম।

নারীকুলের ভূষণ মাদাম্‌ দেষ্টাল কহিয়াছেন, "পৃথিবীতে প্রেমের ন্যায় পদার্থ নাই।" কোম্‌ৎ এই বচনের সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন। পূর্ব্বে তাঁহার কেবল পরিমিত ও পরিমেয় পদার্থে বিশ্বাস ছিল ; বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারায় যাহা কিছু বুঝিতে পারা যায়, কেবল তাহাই তিনি মানিতেন। পরে মাদাম্‌ ক্লোতিল্‌দ্‌ দেভো নাম্নী এক গুণবতী রমণীর প্রতি বিশুদ্ধ প্রীতি সঞ্চার হওয়ায় তাঁহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বর্দ্ধিত ও উত্তেজিত হইয়াছিল। তখন তাঁহার এই সংস্কার জন্মিল, "বুদ্ধিবৃত্তি ধর্ম্মপ্রবৃত্তির দাসী, কিন্তু তাহার বন্দিনী নহে।"

১১। বিবাহ।

পুরুষ ৩৫ বৎসর বয়সে, নারী ২৮ বৎসর বয়সে বিবাহ করিবে ; অবস্থা বিশেষে পুরুষের ২৮ বৎসরে, এবং নারীর ২১ বৎসরে বিবাহ হইতে পারে। জীবদ্দশায় ব্যভিচার দূরে থাকুক, দম্পতীর একের মরণান্তেও জীবিত ব্যক্তি অন্য পতি বা পত্নী গ্রহণ করিতে পারিবে না। কোম্‌ৎ বলেন, মৃতভর্তৃকা নারী অথবা মৃতভার্য্য পুরুষ পুনর্ব্বার বিবাহ করিলে বিশুদ্ধ প্রীতির এবং শ্রাদ্ধের ব্যাঘাত হয়।

১২। শ্রাদ্ধ।

অনেকে অবাক্‌ হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, নাস্তিকের আবার শ্রাদ্ধ কি? বস্তুতঃ কোম্‌তের মতে শ্রাদ্ধ আছে। মৃতব্যক্তির উদ্দেশে যে শ্রদ্ধার কার্য্য করা যায়, তাহাই শ্রাদ্ধ। ঐ শ্রাদ্ধে খোলা, ডোঙ্গা বা ভুজ্যের প্রয়োজন নাই। প্রণয় ও স্নেহের পাত্রদের মৃত্যু হইলে সময়েং তাহাদের স্মরণ করা, ধ্যান করা, ও উপাসনা করাই শ্রাদ্ধ। কোম্‌ৎ এইরূপে মাদাম্‌ ক্লোতিল্‌দ্‌ দেভোর শ্রাদ্ধ করিতেন। শ্রাদ্ধে মৃত ব্যক্তির কোন উপকার নাই বটে ; কিন্তু তাহাতে শ্রাদ্ধকারীর চিত্তোৎকর্ষ হয়, তাহার সন্দেহ নাই। নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা প্রাচীন হিন্দুদের সমস্ত আচার ব্যবহারের প্রতি উপহাস করেন, তাঁহাদের একবার এ বিষয় বিবেচনা করা উচিত। কেবল আপনার উপাসনা না করিয়া মধ্যেং ভক্তিভাজন মৃত ব্যক্তির উপাসনা করিলে মন উন্নত হয়; অবনত হয় না।

১৩। বৈরাগ্য।

কোম্‌তের মতে যে দ্রব্য আহার করিলে আমাদের বলাধান ও স্বাস্থ্য বর্দ্ধন হয়, তাহাই আহার করা উচিত। যাহাতে কেবল জিহ্বা ও তালু পরিতৃপ্ত হয়, তাহা একবারে আহার করা উচিত নহে। শরীরের বলাধানের একমাত্র উদ্দেশ্য পরমসতের সেবা। তিনি সুরাপানের দোষ দিয়া সুরাপান প্রতিষেধকারী মহম্মদের প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি কামরিপু সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "এই রিপু সকল রিপু অপেক্ষা দুর্দ্দান্ত ; এবং ইহার শাসন বহুকাল পর্য্যন্ত চিত্তশাসনের প্রধান উপায় থাকিবে।" তিনি ভরসা করেন, ক্রমশঃ সংযত হইয়া ঐ রিপু একবারে নির্ম্মূল হইতে পারিবে। কাম নির্ম্মূল হইলে মনুষ্য জাতিও নির্ম্মূল হইবে। তাহাদের রক্ষার উপায় কি? কোম্‌ৎ বলেন, "কালে স্ত্রীজাতির পুরুষসহযোগ ব্যতীত সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা হওয়া অসম্ভব নহে।" আমাদের এই বক্তব্য যে

যিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও মানব-জাতির ইতিবৃত্তের উপর আপন দর্শনশাস্ত্র স্থাপিত করিয়াছেন, এ মীমাংসা তাঁহার উপযুক্ত হয় নাই। তিনি যাহা সম্ভব বলিয়াছেন, শরীরতত্ত্ব ও আয়ুস্তত্ত্ব অনুসারে তাহা অসম্ভব। মানবজাতির ইতিবৃত্ত অনুসারেও তাহা অসম্ভব। "না শক্যোপদেশ বিধিরুপদিষ্টে যপ্যনুপদেশঃ।" সাংখ্যদর্শন ১ম অধ্যায়, ৯ম সূত্র। উপদেষ্টার পক্ষে যাহা অসম্ভব, সে উপদেশ উপদেশই নহে। কোম্‌ৎ যদি কামরিপু সংযমের উপদেশ দিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলে ভাল হইত। যখন কামোচ্ছেদের বিধি দিয়াছেন, তখন ভারতবর্ষের দার্শনিকশ্রেষ্ঠের বচন দ্বারায় ইউরোপীয় দার্শনিকশ্রেষ্ঠের মত খণ্ডন করিতে হইল। (১)

সঙ্গীত।

তৃতীয় সংখ্যা।

প্রচলিত সঙ্গীত লিখিবার ইউরোপীয় প্রণালী কঠিন। আমরা বন্দনীয় কোন ইউরোপীয় বন্ধুর সাহায্যে নিম্ন লিখিত কতিপয় গীতাবলী সঙ্কলন করিয়াছি, পাঠকদিগের মনোরঞ্জন জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে। প্রকাশ করিবার তাৎপর্য্য দুই,—প্রথমত, এতৎপ্রণালীর দ্বারা সঙ্কেত স্তম্ভে কোমল তীব্র প্রভৃতি কঠিন প্রথা সকল পরিত্যাগ করত গীত লেখা সহজসাধ্য বোধ হয়। দ্বিতীয়তঃ, "হারমোনিয়মের" স্বর অনুসারে লিখিত হওয়াতে রাগিণীগণের ব্যত্যয়ও দৃষ্ট হইবেক, এবং হিন্দু হারমোনিয়ম হইবার আবশ্যকতার প্রমাণ পাওয়া যাইবেক। সহজেই 'নিম্নলিখিত গীতসকল যে উচিতমতে আদর্শিত হয় নাই, তাহা বলা বাহুল্য। ছয়টী দেশীয় গীত দেওয়া গেল, সপ্তম গীত বহুমিলনের সামান্য দৃষ্টান্তমাত্র। ভাল হইয়াছে, এমত বলা যায় না, কেবল পথদর্শক স্বরূপ হইয়া সমাজে গৃহীত হইলে, আমরা চরিতার্থ হইব এবং উদ্দেশ্যের মূল ফল প্রাপ্ত হইব।

(১) কোম্‌ৎ যে এমন কথা বলিয়াছেন, পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস করিবেন না। পজিটিভ্ পলিটীক গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ সমাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু ঐ অনুবাদ অদ্যাপি প্রচারিত হয় নাই। অতএব আমরা মূল গ্রন্থ হইতে তাঁহার রচনা উদ্ধৃত করিতে বাধিত হইলাম;—

"Si 'appareil masculin ne contribute a notre generation que d'apres une simple excitation derivée de sa destination organique, on conçoit la possibilité de remplacer ce stimulant par un ou plusieuy autres, dont la femme disposerait librement. L' absence d'une telle faculté chez les espèces voisines ne saurait suffire pour l' interdire à la race la plus éminente at la plus modifiable. Ce privilége s'y trouvait en harmonie avec d'autres particularités relatives a la meme function, oú la menstruation constitute surtout une amélioration décisive, éleauchée chez les principaux animaux, mais developpée pur notre civilisation."—Comtés Sytème de politique positive, Tome IV, p. 68.

লিখন প্রণালীর সঙ্কেতের অর্থ ।

খরজ	মধ্যম	সপ্তম
...১০ ১১ ১২	১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২	১ ২ ৩ ৪ ৫
প্রাচীন নাম গা .	মা তী পা তী ধা নি তী সা তী রে তী গা	মা পা ধা
তীব্র = তীঃ কোমল = কো	কো কো কো কো কো	

এ প্রণালীতে সহজ ও কোমল তীব্র সকল সুরই এক এক পূর্ণ সুর বলিয়া গণনা করা হইয়াছে, অতএব ৭ সহজ সুর এবং ৫ কোমল সুর লইয়া ১২টি মাত্র অঙ্ক দেওয়া গেল। প্রত্যেক অঙ্কে এক তাল এবংতালের বৈষম্য অর্থাৎ সময়ের তারতম্য প্রকাশ জন্য (•) শূন্য দেওয়া হইল। এক শূন্যে (•) এক তাল, অতএব (১•) অর্থ দুই তাল (১••) তিন তাল (১•••) চারি তালের সময় নির্দ্দেশ করিবেক। সমের (০) এই চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে। এক এক অঙ্ক এক স্তম্ভ অথবা দুই স্তম্ভের মধ্যে লিখিত হইলে অর্দ্ধ তাল অথবা দ্ব্যর্দ্ধ তাল ইত্যাদি বুঝাইবেক যথা—

	৫ ৬	৫ ০ ৬	৬ ৩ ৮	১ ৫ ৮ ১	৬০৮
৫ = একতাল	১/২ ১/২	১/৩ ১/৩ ১/৩	১/২ ১/৪ ১/৪	১/৪ ১/৪ ১/৪ ১/৪	১/২ ১/৪ ১/৪

ইত্যাদি।

গীতাবলী।

(১সংখ্যা)

রাগিণী মুলতানী।

৬ ৮　৮৬৪　৩ ১　১ ১ ৪ ৬　৮ ৮
আর যাব না লো সই য মু না রি জলে

৫ ৫ ৫　৫ ৮ ১২　১ ১　৮৮৮ ৬৬,৫
ভরিয়া এনেছি কুম্ভ নয়ন সলিলে

৬ ৬ ৬ ৬ ৮ ১২ ১　১ ১　১ ১　১ ২
কি হেরিলাম রূপতার ঘরে আসা হলো

১ ১　৮　৮　৮৮৮　৮৯　৬৬৬　৬ ৭৫
তার নাম যে জানিনে তার সেথাকে গোকুলে

(২) বারোয়াঁ।

১১২ ১১৪ ২২১ ৫ ৫ ৬৬৬ ৬৬৬
ঘরে রহিতে নাদিলে শ্যামের বাঁশরী কিগুণ

৮৪ ১ ১২ ১১৪৬৬৬ ৮৮ ৪৪
জানে ঘরে ইত্যাদি একেত চিকন কালা গলে

৬৬ ৬৬৬৬ ৫৫ ৬৬ ৬৬ ৬৬৪
শোভে বনমালা হাতে শোভে মোহন বাঁশরী

(৩) ভৈরবী।

১১১ ১২ ১১ ১০৮ ৮৮ ১০ ৪৪৪ ৪৩৩
কাজল নয়নে আর দিও না কখন প্রাণ

১৩ ৫৬ ৮১০ ১২১ ৮১১৯৮ ৬৪ ৩৪
শরে কেবা নাহি মরে বিষ যোগ তাহে কেন,

১১ ১১২ ১১ ১২ ১০ ৪৩৪ ৬৬৬৬ ৫৬
সবে মাত্র এক প্রাণ উপায় তা কহি শুন

১৩ ৫৬৮১০ ১২১২ ৮১১৯৮৬৪ ৩৪
সুধা হলাহল সুরা নয়নেরি তিন গুণ

(৪) পরজ।

১২ ১৩ ৫৬ ১১২০ ৫৫৫ ৫৫৬০
কেনরে প্রাণ নয়নে অরুণ উদয়

৩৩৬ ৬৬৬ ৬৬ ৫৫৬ ৬৭০৬
তপন সবারে দহে নাদহে কমল

৩৩ ৩৫ ৬১০ ৮৬ ৬৬৬৬৬৫
তব আঁখি রবি হৃদি কমলে জ্বলায়

১০১০ ১০১০ ১৩৫৬ ৬৫৩ ১১২১০ ৮৬
তব কেশ · ঘন ঘন পীড়ন করিত প্রাণ

৩৬৬ ৬৬০৩৩ ৫৬০৮৬ ৬৬ ৫৫৫
এখন তা নয় এরে ফণিময় হেরি কাতর

৬৭৬ | ৩৩৩ ৫ ৬৮ ৬৬ ৬৬ ৮৮ ৬৫ ||
পরাণ | নিকট না হতে পারি দংশে পাছে ভয় ||

(৫) সুহিনী।

২ ২ ০০ ২ ২ ২ ৬০ ৩ ২০ ১০ ১০ ২০ ৬০
তোদের কায কি শ্যামের কথা কয়ে

১ ৬৬ ৬৬৬৬ ৫৬৬৫ ৬ ৬
শ্যাম জানে আমি জানি তোরা পরের মেয়ে

৬ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ ৫ ৮ ৬ ৫ ৫ ৬
আপনি করেছি মান আপনি বুঝিয়ে

(৬) বসন্ত।

১২১২১২১২ ১২১২১২১২ ১০১০১০ ৩ ৫ ৬
বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে

৩ ৩ ৩ ৫ ৬ ৬ ৩ ৩ ৫ ৫ ৬
নৃত্যতি যুবতী জনেন সমং

৩ ৩ ৫ ৫ ৫ ৩ ৩ ৩ ৩ ৫ ৬
সখি বিরহি জনস্য দুরন্তে

৬ ৬ ১১ ১১১১১১ ১১১০ ১১ ৪ ৩ ৩
ললিত লবঙ্গ লতা পরিশীলন

১২১২১২ ২২২ ২ ৩ ২ ১০১০ ২২
কোমল মলয় সমীরে মধু কর

২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ৬ ২ ২ ১২ ১ ১ ২
নিকর কর ম্বিত কোকিল কূজিত কুঞ্জ কুটীরে

১ সংখ্যা । মূলতানী রাগিণীর বহু মিলনের যথাসাধ্য উদাহরণ ।

সপ্তম	৬ ৮ ৮ ৬ ৪ ৩ ১	১ ১ ৪ ৬ ৮ ৮
মধ্যম	৩ ৩ ৩ ২ ১ ১১ ৮	৯ ১০ ১ ১ ৪ ৪
খরজ	১২ ১১ ১২ ১০ ১০ ৮ ৪	৫ ৭ ৮ ৯ ১ ১২
	আর যাব না লো সোই	যমুনার জলে
	৫ ৫ ৫ ৫ ৮ ১২ ১ ১	৮ ৮ ৮ ৬ ৬ ৫
	২ ২ ২ ২ ৩ ৮ ৮ ৯	৩ ২ ১ ২ ২ ১২
	১১ ১১ ১০ ১০ ১১ ২ ৪ ৫	১২ ১১ ১০ ১০ ১১ ৫
	ভরিয়ে এনেছি কুম্ভ	নয়ন সলিলে
	৬ ৬ ৬ ৬ ৮ ১২ ১	১ ১ ১ ১ ১ ২
	৩ ৩ ২ ২ ৫ ৮ ৮	৮ ৯ ৯ ৮ ৭॰ ৬
	১২ ১২ ১১ ১১ ১১ ২ ৪	৪ ৫ ৫ ৪ ৩ ২
	কি হেরিলাম রূপ তার	ঘরে আসা হলো
	১ ১ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৯	৬ ৬ ৬ ৬ ৭ ৫
	১০ ১০ ২ ৩ ৪ ২ ২ ৩ ৩	২ ১ ১ ২ ২ ১
	৭ ৫ ৮ ১১ ১০ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১	১০ ১০ ১০ ১১ ১০ ৯
	তার নাম যে জানিনে তার	সে থাকে গোকুলে

আমাদের সঙ্গীত শাস্ত্র অতি বিস্তৃত। অসাধারণ কল্পনা ও তর্কবিশিষ্ট প্রাচীন পুরুষগণ কর্ত্তৃক বহু পরিশ্রমে নির্ম্মিত হয়, কালক্রমে তাহার অবস্থা মন্দ হইয়াছে। নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সঙ্গীতের নাম উপস্থিত হইলেই, মাথায় তাজ, কাল দাড়ি, বড় পেট, বড় তানপুরা, খরজ শব্দ, এবং হস্ত চালনা, ও হা, মনে পড়ে। বিবেচনা করা উচিত যে উৎসাহ ব্যতীতই এবং সময়ের গতিতেই এই সকল গায়ক ধৈবত বাঁচাইতে গিয়া রাগ রাগিণীকে দগ্ধ করেন। সভ্যতার প্রধানচিহ্ন সঙ্গীতানুরাগ। ভরসা করি, বাঙ্গালীগণ এ বিষয়ে মনযোগী হইবেন, এবং অসাধারণ সৌষ্ঠব সম্পন্ন পূর্ব্বলক্ষিত ভারতসঙ্গীতপ্রণালী পুনরুদ্দীপ্ত করিবেন।

ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গূল।

দ্বিতীয় বক্তৃতা।

সভাপতি মহাশয়, বাঘিনীগণ, এবং ভদ্র ব্যাঘ্রগণ!

আমি প্রথম বক্তৃতায় অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে, মানুষের বিবাহ প্রণালী এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলিব। ভদ্রের অঙ্গীকার পালনই প্রধান ধর্ম্ম। অতএব আমি একবারেই আমার বিষয়ে প্রবেশ করিলাম।

বিবাহ কাহাকে বলে, আপনারা সকলেই অবগত আছেন। সকলেই মধ্যে২ অবকাশ মতে বিবাহ করিয়া থাকেন। কিন্তু মনুষ্যবিবাহে কিছু বৈচিত্র আছে। ব্যাঘ্র প্রভৃতি সভ্য পশুদিগের দারপরিগ্রহ কেবল প্রয়োজনাধীন, মনুষ্যপশুর সেরূপ নহে—তাহাদের মধ্যে অনেকেই এক কালীন জন্মের মত বিবাহ করিয়া রাখে।

মনুষ্যবিবাহ দ্বিবিধ—নিত্য এবং নৈমিত্তিক। তন্মধ্যে নিত্য অথবা পৌরোহিত বিবাহই মান্য। পুরোহিতকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া যে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাই পৌরোহিত বিবাহ।

মহাদংষ্ট্রা।—পুরোহিত কি?

বৃহল্লাঙ্গূল।—অভিধানে লেখে,পুরোহিত চালকলাভোজী বঞ্চনাব্যবসায়ী মনুষ্য বিশেষ। কিন্তু এই ব্যাখ্যা দুষ্ট। কেননা সকল পুরোহিত চালকলাভোজী নহে; অনেক পুরোহিত মদ্য মাংস খাইয়া থাকেন; অনেক পুরোহিত সর্ব্বভুক। পক্ষান্তরে, চাল কলা খাইলেই পুরোহিত হয়, এমত নহে। বারাণসী নামক নগরে অনেক গুলিন ষাঁড় আছে—তাহারা চালকলা খাইয়া থাকে। তাহারা পুরোহিত নহে, তাহার কারণ, তাহারা বঞ্চক নহে। বঞ্চকে যদি চালকলা খায়, তাহা হইলেই পুরোহিত হয়।

পৌরোহিত বিবাহে এই রূপ এক জন পুরোহিত বরকন্যার মধ্যবর্ত্তী হইয়া বসে। বসিয়া কতক গুলা বকে। এই বক্তৃতাকে মন্ত্র বলে। তাহার অর্থ কি, আমি সবিশেষ অবগত নহি, কিন্তু আমি যেরূপ পণ্ডিত, তাহাতে ঐ সকল মন্ত্রের এক প্রকার অর্থ মনে মনে অনুভূত করিয়াছি। বোধ হয়, পুরোহিত বলে,

"হে বরকন্যে! আমি আজ্ঞা করিতেছি, তোমরা বিবাহ কর। তোমরা বিবাহ করিলে, আমি নিত্য চাল কলা পাইব—অতএব তোমরা বিবাহ কর। এই কন্যার গর্ভাধানে, সীমন্তোন্নয়নে, সুতিকাগারে, চাল কলা পাইব—অতএব তোমরা বিবাহ কর। সন্তানের ষষ্ঠীপূজায়, অন্নপ্রাশনে,কর্ণবেধে, চূড়াকরণে বা উপনয়নে—অনেক চাল কলা পাইব, অতএব তোমরা বিবাহ কর। তোমরা সংসারধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, সর্ব্বদা ব্রত নিয়মে, পূজা পার্ব্বণে, যাগ যজ্ঞে, রত হইবে, সুতরাং আমি অনেক চাল কলা পাইব; অতএব তোমরা বিবাহ কর। বিবাহ কর, কখন এ বিবাহ রহিত করিও না। যদি

রহিত কর, তবে আমার চাল কলার বিশেষ বিঘ্ন হইবে। তাহা হইলে একং চপেটাঘাতে তোমাদের মুণ্ডপাত করিব। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের এই রূপ আজ্ঞা।"

বোধ হয়, এই শাসনের জন্যই পৌরোহিতবিবাহ কখন রহিত হয় না।

আমাদিগের মধ্যে যে বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে, তাহাকে নৈমিত্তিক বিবাহ বলা যায়। মনুষ্যমধ্যে এরূপ বিবাহও সচরাচর প্রচলিত। অনেক মনুষ্য এবং মানুষী, নিত্য নৈমিত্তিক উভয়বিধ বিবাহ করিয়া থাকে। কিন্তু নিত্য নৈমিত্তিক বিবাহে বিশেষ প্রভেদ এই, যে নিত্য বিবাহ কেহ গোপন করে না, নৈমিত্তিক বিবাহ সকলেই প্রাণপণে গোপন করে। যদি এক জন মনুষ্য অন্য মনুষ্যের নৈমিত্তিক বিবাহের কথা জানিতে পারে, তাহা হইলে কখন কখন তাহাকে ধরিয়া প্রহার করে। আমার বিবেচনায় পুরোহিতেরাই এই অনর্থের মূল। নৈমিত্তিক বিবাহে তাহারা চাল কলা পায় না—সুতরাং ইহার দমনই তাহাদের উদ্দেশ্য—তাহাদের শিক্ষামতে সকলেই নৈমিত্তিকবিবাহকারিকে ধরিয়া প্রহার করে। কিন্তু বিশেষ চমৎকার এই, যে অনেকেই গোপনে স্বয়ং নৈমিত্তিক বিবাহ করে, অথচ পরকে নৈমিত্তিক বিবাহ করিতে দেখিলে ধরিয়া প্রহার করে!

ইহাতে আমার বিবেচনা হইতেছে যে, অনেক মনুষ্যই নৈমিত্তিক বিবাহে সম্মত, তবে পুরোহিত প্রভৃতির ভয়ে মুখ ফুটিতে পারে না। আমি মনুষ্যালয়ে বাস কালীন জানিয়া আসিয়াছি, অনেক উচ্চ শ্রেণীস্থ মনুষ্যের নৈমিত্তিক বিবাহে বিশেষ আদর। যাঁহারা আমাদিগের ন্যায় সুসভ্য, সুতরাং পশুবৃত্ত, তাঁহারাই এ বিষয়ে আমাদিগের অনুকরণ করিয়া থাকেন। আমার এমনও ভরসা আছে যে, কালে মনুষ্যজাতি আমাদিগের ন্যায় সুসভ্য হইলে, নৈমিত্তিক বিবাহ তাহাদের মধ্যে সমাজসম্মত হইবে। অনেক মনুষ্য পণ্ডিত তৎপক্ষে প্রবৃত্তিদায়ক গ্রন্থাদি লিখিতেছেন। তাঁহারা স্বজাতিহিতৈষী, সন্দেহ নাই। আমার বিবেচনায়, সম্মান বর্দ্ধনার্থ তাঁহাদিগকে এই ব্যাঘ্র সমাজের অনরারি মেম্বর নিযুক্ত করিলে ভাল হয়। ভরসা করি, তাঁহারা সভাস্থ হইলে, আপনারা তাঁহাদিগকে জলযোগ করিবেন না। কেননা তাঁহারা আমাদিগের ন্যায় নীতিজ্ঞ এবং লোকহিতৈষী।

মনুষ্যমধ্যে বিশেষ এক প্রকার নৈমিত্তিক বিবাহ প্রচলিত আছে, তাহাকে মৌদ্রিক বিবাহ বলা যাইতে পারে। এ প্রকার বিবাহ সম্পন্নার্থ মানুষ মুদ্রার দ্বারা কোন মানুষীর করতল সংস্পৃষ্ট করে। তাহা হইলেই মৌদ্রিক বিবাহ সম্পন্ন হয়।

মহাদংষ্ট্রা। মুদ্রা কি?

বৃহল্লাঙ্গূল। মুদ্রা মনুষ্যদিগের পূজ্য দেবতা বিশেষ। যদি আপনাদিগের কৌতূহল থাকে, তবে আমি সবিশেষে সেই মহাদেবীর গুণ কীর্ত্তন করি। মনুষ্য যত দেবতার পূজা করে, তন্মধ্যে ইঁহার প্রতিই তাহাদের বিশেষ ভক্তি। ইনি সাকারা। স্বর্ণ রৌপ্য এবং তাম্রে ইঁহার

প্রতিমা নির্ম্মিত হয়। লৌহ টিন এবং কাষ্ঠে ইহাঁর মন্দির প্রস্তুত করে। রেশম, পশম, কার্পাস, চর্ম্ম প্রভৃতিতে ইঁহার সিংহাসন রচিত হয়। মনুষ্যগণ রাত্রিদিন ইঁহার ধ্যান করে, এবং কিসে ইঁহার দর্শন প্রাপ্ত হইবে, সেই জন্য সর্ব্বদা শশব্যস্ত হইয়া বেড়ায়। যে বাড়ীতে টাকা আছে জানে, অহরহ সেই বাড়ীতে মনুষ্যেরা যাতায়াত করিতে থাকে,—এমনই ভক্তি, কিছুতেই সে বাড়ী ছাড়ে না—মারিলেও যায় না। যে এই দেবীর পুরোহিত, অথবা যাহার গৃহে ইনি অধিষ্ঠান করেন, সেই ব্যক্তি মনুষ্যমধ্যে প্রধান হয়। অন্য মনুষ্যেরা সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট যুক্তকরে স্তব স্তুতি করিতে থাকেন। যদি মুদ্রাদেবীর অধিকারী এক বার তাঁহাদের প্রতি কটাক্ষ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা চরিতার্থ হয়েন।

দেবতাও বড় জাগ্রত। এমন কাজই নাই যে এই দেবীর অনুগ্রহে সম্পন্ন হয় না। পৃথিবীতে এমন সামগ্রীই নাই যে এই দেবীর বরে পাওয়া যায় না। এমন দুষ্কর্ম্মই নাই যে এই দেবীর উপাসনায় সম্পন্ন হয় না। এমন দোষই নাই যে ইঁহার অনুকম্পায় ঢাকা পড়ে না। এমন গুণই নাই যে তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত গুণ বলিয়া মনুষ্যসমাজে প্রতিপন্ন হইতে পারে; যাহার ঘরে ইনি নাই—তাহার আবার গুণ কি? যাহার ঘরে ইনি বিরাজ করেন, তাহার আবার দোষ কি? মনুষ্যসমাজে মুদ্রামহাদেবীর অনুগৃহীত ব্যক্তিকেই ধার্ম্মিক বলে—মুদ্রাহীনতাকেই অধর্ম্ম বলে। মুদ্রা থাকিলেই বিদ্বান হইল। মুদ্রা যাহার নাই, তাহার বিদ্যা থাকিলেও, মনুষ্যশাস্ত্রানুসারে সে মূর্খ বলিয়া গণ্য হয়। আমরা যদি "বড় বাঘ" বলি, তবে অমিতোদর, মহাদংষ্ট্রা, প্রভৃতি প্রকাণ্ডাকার মহাব্যাঘ্রগণকে বুঝাইবে। কিন্তু মনুষ্যালয়ে "বড় মানুষ" বলিলে সেরূপ অর্থ হয় না—আট হাত বা দশ হাত মানুষ বুঝায় না, যাহার ঘরে এই দেবী বাস করেন, তাহাকেই "বড় মানুষ" বলে। যাহার ঘরে এই দেবী স্থাপিতা নহেন, সে পাঁচ হাত লম্বা হইলেও তাহাকে "ছোট লোক" বলে।

মুদ্রাদেবীর এই রূপ নানাবিধ গুণগান শ্রবণ করিয়া আমি প্রথমে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, যে মনুষ্যালয় হইতে ইঁহাকে আনিয়া ব্যাঘ্রালয়ে স্থাপন করিব। কিন্তু পশ্চাৎ যাহা শুনিলাম, তাহাতে বিরত হইলাম। শুনিলাম যে, মুদ্রাই মনুষ্যজাতির যত অনিষ্টের মূল। ব্যাঘ্রাদি প্রধান পশুরা কখন স্বজাতির হিংসা করে না, কিন্তু মনুষ্যেরা সর্ব্বদা আত্মজাতির হিংসা করিয়া থাকে। মুদ্রাপূজাই ইহার কারণ। মুদ্রার লোভে, সকল মনুষ্যেই পরস্পরের অনিষ্টচেষ্টায় রত। প্রথম বক্তৃতায় বলিয়াছিলাম যে, মনুষ্যেরা সহস্রে২ প্রান্তর মধ্যে সমবেত হইয়া পরস্পরকে হনন করে। মুদ্রাই তাহার কারণ। মুদ্রাদেবীর উত্তেজনায় সর্ব্বদাই মনুষ্যেরা পরস্পরে হত, আহত পীড়িত, অবরুদ্ধ, অপমানিত, তিরস্কৃত, করে। মনুষ্যলোকে বোধ হয়, এমত' অনিষ্টই নাই, যে এই দেবীর অনুগ্রহপ্রেরিত নহে। ইহা আমি জানিতে পারিয়া, মুদ্রাদেবীকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া তাঁহার পূজার অভিলাষ ত্যাগ করিলাম।

কিন্তু মনুষ্যেরা ইহা বুঝে না। প্রথম বক্তৃতাতেই বলিয়াছি যে, মনুষ্যেরা অত্যন্ত অপরিণামদর্শী—সর্ব্বদাই পরস্পরের অমঙ্গল চেষ্টা করে। অতএব তাহারা অবিরত রূপার চাকি ও তামার চাকি সংগ্রহের চেষ্টায় কুমারের চাকের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়।

মনুষ্যদিগের বিবাহতত্ত্ব যেমন কৌতুকাবহ, অন্যান্য বিষয়ও তদ্রূপ। তবে, পাছে দীর্ঘ বক্তৃতা করিলে, আপনাদিগের বিষয় কর্ম্মের সময় পুনরুপস্থিত হয়, এই জন্য অদ্য এই খানে সমাধা করিলাম। ভবিষ্যতে যদি অবকাশ হয়, তবে অন্যান্য বিষয়ে কিছু বলিব।"

এই রূপে বক্তৃতা সমাধা করিয়া পণ্ডিতবর ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গূল, বিপুল লাঙ্গূলচট্‌চটারব মধ্যে উপবেশন করিলেন। তখন দীর্ঘনখ নামে এক সুশিক্ষিত যুবা ব্যাঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া, হাউ মাউ শব্দে বিতর্ক আরম্ভ করিলেন।

দীর্ঘনখ মহাশয় গর্জ্জনান্তে বলিলেন, "হে ভদ্র ব্যাঘ্রগণ! আমি অদ্য বক্তার সদ্বক্তৃতার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব করি। কিন্তু ইহা বলাও কর্ত্তব্য যে বক্তৃতাটি নিতান্ত মন্দ, মিথ্যা কথা পরিপূর্ণ, এবং বক্তা অতি গণ্ডমূর্খ।"

অমিতোদর। "আপনি শান্ত হউন। সভ্যজাতীয়েরা অত স্পষ্ট করিয়া গালি দেয় না। প্রচ্ছন্নভাবে আপনি আরও গুরুতর গালি দিতে পারেন।"

দীর্ঘনখ। "যে আজ্ঞা। বক্তা অতি সত্যবাদী, তিনি যাহা বলিলেন, তাহার মধ্যে অধিকাংশ কথা অপ্রাকৃত হইলেও, দুই একটা সত্য কথা পাওয়া যায়। তিনি অতি সুপণ্ডিত ব্যক্তি। অনেকেই মনে করিতে পারেন যে, এই বক্তৃতার মধ্যে বক্তব্য কিছুই নাই। কিন্তু আমরা যাহা পাইলাম, তাহার জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। তবে বক্তৃতার সকল কথায় সম্মতি প্রকাশ করিতে পারি না। বিশেষ, আদৌ মনুষ্যমধ্যে বিবাহ কাহাকে বলে, বক্তা তাহাই অবগত নহেন। ব্যাঘ্র জাতির কুল রক্ষার্থ যদি কোন বাঘ কোন বাঘিনীকে আপন সহচরী (সহচরী, সঙ্গে চরে) করে, তাহাকেই আমরা বিবাহ বলি। মানুষের বিবাহ সেরূপ নহে। মানুষ, স্বভাবতঃ দুর্ব্বল এবং প্রভুভক্ত। সুতরাং প্রত্যেক মনুষ্যের এক২টি প্রভু চাহি। সকল মনুষ্যই এক২ জন স্ত্রীলোককে আপন প্রভু বলিয়া নিযুক্ত করে। ইহাকেই তাহারা বিবাহ বলে। যখন তাহারা কাহাকে সাক্ষী রাখিয়া প্রভুনিয়োগ করে, তখন সে বিবাহকে পৌরোহিত বিবাহ বলা যায়। সাক্ষির নাম পুরোহিত। বৃহল্লাঙ্গূল মহাশয় বিবাহ মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অযথার্থ। সে মন্ত্র এই রূপ;—

পুরোহিত। 'বল, আমাকে কি বিষয়ের সাক্ষী হইতে হইবে?'

বর। 'আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি এই স্ত্রীলোকটিকে জন্মের মত আমার প্রভুত্বে নিযুক্ত করিলাম।'

পুরো। 'আর কি?'

বর। 'আর আমি জন্মের মত ইহার শ্রীচরণের গোলাম হইলাম। আহার যোগানের ভার আমার উপর;—খাইবার ভার উঁহার উপর।'

পুরো। (কন্যার প্রতি) 'তুমি কি বল?'

কন্যা। "আমি ইচ্ছাক্রমে এই ভৃত্যটিকে গ্রহণ করিলাম। যত দিন ইচ্ছা হইবে, চরণ সেবা করিতে দিব। যে দিন ইচ্ছা না হইবে, সেদিন নাতি মারিয়া তাড়াইয়া দিব।'

পুরো। 'শুভমস্তু।'

এইরূপ আরও অনেক ভূল আছে। যথা মুদ্রাকে বক্তা মনুষ্যপূজিত দেবতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক উহা দেবতা নহে। মুদ্রা এক প্রকার বিষচক্র। মনুষ্যেরা অত্যন্ত বিষপ্রিয়; এই জন্য সচরাচর মুদ্রাসংগ্রহ জন্য যত্নবান্। মনুষ্যগণকে মুদ্রাভক্ত জানিয়া আমি পূর্ব্বে বিবেচনা করিয়াছিলাম যে 'না জানি মুদ্রা কেমনই উপাদেয় সামগ্রী; আমাকেএকদিন খাইয়া দেখিতে হইবে।' একদা বিদ্যাধরী নদীর তীরে একটা মনুষ্যকে হত করিয়া ভোজন করিবার সময়ে, তাহার বস্ত্রমধ্যে কয়েকটা মুদ্রা পাইলাম। পাইবামাত্র উদরসাৎ করিলাম। পর দিবস আমার উদরের পীড়া উপস্থিত হইল। স্থতরাং মুদ্রা যে এক প্রকার বিষ, তাহাতে সংশয় কি?"

দীর্ঘনখ এই রূপে বক্তৃতা সমাপন করিলে পর অন্যান্য ব্যাঘ্র মহাশয়েরা উঠিয়া বক্তৃতা করিলেন। পরে, সভাপতি অমিতোদর মহাশয় বলিতে লাগিলেন;—

"এক্ষণে রাত্রি অধিক হইয়াছে, বিষয় কর্ম্মের সময় উপস্থিত। বিশেষ, হরিণের পাল কখন্ আইসে, তাহার স্থিরতা কি? অতএব দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া কাল হরণ করা কর্ত্তব্য নহে। বক্তৃতা অতি উত্তম হইয়াছে—এবং বৃহল্লাঙ্গূল মহাশয়ের নিকট আমরা বড় বাধিত হইলাম। এক কথা এই বলিতে চাহি, যে আপনারা দুই দিন যে বক্তৃতা শুনিলেন, তাহাতে অবশ্য বুঝিয়া থাকিবেন যে, মনুষ্য অতি অসভ্য পশু। আমরা অতি সভ্য পশু। স্থতরাং আমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে যে আমরা মনুষ্যগণকে আমাদের ন্যায় সভ্য করি। বোধ করি, মনুষ্যদিগকে সভ্য করিবার জন্যই জগদীশ্বর আমাদিগকে এই সুন্দরবন ভূমিতে প্রেরণ করিয়াছেন। বিশেষ, মানুষেরা সভ্য হইলে, তাহাদের মাংস আরও কিছু সুস্বাদু হইতে পারে,এবং তাহারাও আরও সহজে ধরা দিতে পারে। কেন-না সভ্য হইলেই তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, ব্যাঘ্রদিগের আহারার্থ শরীরদান করাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য। এই রূপ্র সভ্যতাই আমরা শিখাইতে চাই। অতএব আপনারা এ বিষয়ে মনোযোগী হউন। ব্যাঘ্রদিগের কর্ত্তব্য যে, মনুষ্যদিগকে অগ্রে সভ্য করিয়া পশ্চাৎ ভোজন করেন।"

সভাপতি মহাশয় এই রূপে বক্তৃতা সমাপন করিয়া লাঙ্গূলচট্ চটারব মধ্যে উপবেশন করিলেন। তখন সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদানান্তর ব্যাঘ্রদিগের মহাসভা ভঙ্গ হইল। তাঁহারা যে যথায় পারিলেন, বিষয় কর্ম্মে প্রয়াণ করিলেন।

যে ভূমিখণ্ডে সভার অধিষ্ঠান হইয়াছিল, তাহার চারি পার্শ্বে কতক গুলিন বড়২ গাছ ছিল। কতকগুলিন বানর, তদুপরি আরোহণ করিয়া, বৃক্ষপত্রমধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, ব্যাঘ্রদিগের বক্তৃতা

শুনিতেছিল। ব্যাঘ্রেরা সভাভূমি ত্যাগ করিয়া গেলে, একটি বানর মুখ বাহির করিয়া অন্য বানরকে ডাকিয়া কহিল, "বলি, ভায়া ডালে আছ ?"

দ্বিতীয় বানর বলিল, "আজ্ঞে,আছি।

প্রথম বানর। "আইস, আমরা এই ব্যাঘ্রদিগের বক্তৃতার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই।"

দ্বি, বা। "কেন ?"

প্র, বা। "এই বাঘেরা আমাদিগের চিরশত্রু। আইস, কিছু নিন্দা করিয়া শত্রুতা সাধা যাউক।"

দ্বি, বা। "অবশ্য কর্ত্তব্য। কাজটা আমাদিগের জাতির উচিত বটে।"

প্র, বা। "আচ্ছা, তবে দেখ বাঘেরা কেহ নিকটে নাই ত ?"

দ্বি, বা। "না। তথাপি আপনি একটু প্রচ্ছন্ন থাকিয়া বলুন।"

প্র, বা। "সেই কথাই ভাল। নইলে কি জানি, কোন্ দিন কোন্ বাঘের সমুখে পড়িব, আর আমাকে ভোজন করিয়া ফেলিবে।"

দ্বি, বা। "বলুন কি দোষ!"

প্র, বা। "প্রথম, ব্যাকারণ অশুদ্ধ। আমরা বানরজাতি, ব্যাকরণে বড় পণ্ডিত। ইহাদের ব্যাকরণ আমাদের বাঁদুরে ব্যাকরণের মত নহে।"

দ্বি, বা। "তার পর ?"

প্র, বা। "ইহাদের ভাষা বড় মন্দ।"

দ্বি, বা। "হাঁ; উহারা বাঁদুরে কথা কয় না!"

প্র, বা। "ঐ যে অমিতোদর বলিল, 'ব্যাঘ্রদিগের কর্ত্তব্য, অগ্রে মনুষ্যদিগের সভ্য করিয়া পশ্চাৎ ভোজন করেন,' ইহা না বলিয়া যদি বলিত, 'অগ্রে মনুষ্যদিগকে ভোজন করিয়া পশ্চাৎ সভ্য করেন, তাহা হইলে সঙ্গত হইত

দ্বি, বা। "সন্দেহ কি—নহিলে আমাদের বানর বলিবে কেন ?"

প্র, বা,। "কি প্রকারে বক্তৃতা হয়, কি কি কথা বলিতে হয়,তাহা উহারা জানে না। বক্তৃতায় কিছু কিচমিচ করিতে হয়, কিছু লম্ফ ঝম্ফ করিতে হয়, দুই এক বার মুখ ভেঙ্গাইতে হয়, দুই এক বার কদলী ভোজন করিতে হয়; উহাদের কর্ত্তব্য, আমাদের কাছে কিছু শিক্ষা লয়।"

দ্বি, বা,। "আমাদিগেব কাছে শিক্ষা পাইলে উহারা বানর হইত, ব্যাঘ্র হইত না।"

এমত সময়ে আরো কয়েকটা বানর সাহস পাইয়া উঠিল। এক বানর বলিল, "আমার বিবেচনায় বক্তৃতার মহদ্দোষ এই যে, বৃহল্লাঙ্গূল আপনার জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা আবিষ্কৃত অনেক গুলিন নূতন কথা বলিয়াছেন। সে সকল কথা কোন গ্রন্থেই পাওয়া যায় না। যাহা পূর্ব্বলেখকদিগের চর্ব্বিত চর্ব্বণ নহে, তাহা নিতান্ত দূষ্য। আমরা বানর জাতি, চিরকাল চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিয়া বানরলোকের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া আসিতেছি—ব্যাঘ্রাচার্য্য যে তাহা করেন নাই, ইহা মহাপাপ।"

তখন একটি রূপী বানর বলিয়া উঠিল, "আমি এই সকল বক্তৃতার মধ্যে হাজার এক দোষ তালিকা করিয়া বাহির করিতে পারি। আমি হাজার এক স্থানে বুঝিতে পারি নাই। যাহা আমার বিদ্যা বুদ্ধির অতীত, তাহা মহাদোষ বই আর কি ?"

আর একটি বানর কহিল, "আমি বিশেষ কোন দোষ দেখাইতে পারি না। কিন্তু আমি বায়ান্ন রকম মুখভঙ্গী করিতে পারি; এবং অশ্লীল গালিগালাজ দিয়া আপন সভ্যতা এবং রসিকতা প্রচার করিতে পারি।"

এই রূপে বানরেরা ব্যাঘ্রদিগের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত রহিল। দেখিয়া এক স্থূলোদর বানর বলিল, যে "আমরা যেরূপ নিন্দাবাদ করিলাম তাহাতে বৃহল্লাঙ্গূল বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবে।" আইস, আমরা কদলী ভোজন করি।"

উত্তরচরিত।

তৃতীয় সংখ্যা।

প্রথমাঙ্ক ও দ্বিতীয়াঙ্কের মধ্যে দ্বাদশ বৎসর কাল ব্যবধান। উত্তরচরিতের একটী দোষ এই যে, নাটকবর্ণিত ক্রিয়া সকলের পরস্পর কালগত নৈকট্য নাই। এ সম্বন্ধে উইন্টর্সটেল্ নামক সেক্ষপীয়রকৃত বিখ্যাত নাটকের সঙ্গে ইহার বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

এই দ্বাদশ বৎসর মধ্যে সীতা যমল সন্তান প্রসব করিয়া স্বয়ং পাতালে অবস্থান করিলেন, তাঁহার পুত্রেরা বাল্মীকির আশ্রমে প্রতিপালিত এবং সুশিক্ষিত হইতে লাগিল। রামচন্দ্রের পূর্ব্বপ্রদত্ত বরে দিব্যাস্ত্র তাহাদের স্বতঃসিদ্ধ হইল। এ দিগে রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণের পুত্র চন্দ্রকেতু সৈন্য লইয়া যজ্ঞের অশ্ব রক্ষণে প্রেরিত হইলেন। কোন দিন রামচন্দ্র দৈবাদেশে জানিলেন যে শম্বূক নামক কোন নীচ জাতীয় ব্যক্তি তাঁহার রাজ্য মধ্যে তপশ্চারণ করিতেছে। ইহাতে তাঁহার রাজ্যমধ্যে অকালমৃত্যু উপস্থিত হইতেছে। রামচন্দ্র ঐ শূদ্র তপস্বীর শিরশ্ছেদ মানসে সশস্ত্রে তাহার অনুসন্ধানে নানা দেশ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। শম্বূক পঞ্চবটীর বনে তপঃ করিতেছিল।

দ্বিতীয়াঙ্কের বিষ্কম্ভকে মুনিপত্নী আত্রেয়ী এবং বনদেবতা বাসন্তীর প্রমুখাৎ এই সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ হইয়াছে। যেমন প্রথমাঙ্কের পূর্ব্বে প্রস্তাবনা, সেই রূপ অন্যান্য অঙ্কের পূর্ব্বে একটিং বিষ্কম্ভক আছে। এ গুলি অতি মনোহর। কখন বিদুষী ঋষিপত্নী, কখন প্রেমময়ী বনদেবী, কখন তমসা মুরলা নদী, কখন বিদ্যাধর বিদ্যাধরী, এইরূপে সৌন্দর্য্যময়ী সৃষ্টির দ্বারা ভবভূতি বিষ্কম্ভক সকল অতি রমণীয় করিয়াছেন। দ্বিতীয়াঙ্কের আরম্ভই সুন্দর। যথা;—

"অধ্বগবেশা তাপসী। অয়ে বন দেবতেয়ং ফলকুসুমপল্লবার্ঘেণ মামুপতিষ্ঠতে। (১)

শিক্ষা সম্বন্ধে আত্রেয়ীর কথা বড় সুন্দর—

"বিতরতি গুরুঃপ্রাজ্ঞে বিদ্যাং যথৈবতথা জড়ে নচখলু তয়োর্জ্ঞানে শক্তিং করোত্যপহন্তিচ।

(১) ঐ দেখ, এই বনদেবতা ফলপুষ্প পল্লবার্ঘ্যের দ্বারা আমার অভ্যর্থনা করিতেছেন।

ভবতি চ তয়োর্ভূয়ান্ ভেদঃ ফলং প্রতি তদ্যথা
প্রভবতি শুচির্বিম্বোদ্গ্রাহে মণির্ন মৃদাং চয়ঃ ॥(১)

হরেস্ হেমান উইল্‌সন্ বলেন যে, উত্তরচরিতে কতক গুলিন এমত সুন্দর ভাব আছে যে তদপেক্ষা সুন্দর ভাব কোন ভাষাতেই নাই। উপরে উদ্ধৃত কবিতা এই কথার উদাহরণ স্বরূপ তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।

রামচন্দ্র শম্বূকের সন্ধান করিতে২ পঞ্চবটীর বনে শম্বূককে পাইলেন। এবং খড়্গাদ্বারা তাহাকে প্রহার করিলেন। শম্বূক দিব্য পুরুষ; রামের প্রহারে শাপবিমুক্ত হইয়া রামকে প্রণিপাত করিল। এবং জনস্থানাদি রামচন্দ্রের পূর্ব্বপরিচিত স্থান সকল দেখাইতে লাগিল। উভয়ের কথোপকথনে বনবর্ণনা অতি মনোহর।

স্নিগ্ধশ্যামাঃক্বচিদপরতো ভীষণাভোগরুক্ষাঃ
স্থানে স্থানে মুখরককুভো ঝাঙ্কৃতৈর্নির্ঝরাণাম্।
এতে তীর্থাশ্রমগিরিসরিদ্গর্ত্তকান্তারমিশ্রাঃ
সন্দৃশ্যন্তে পরিচিতভুবো দণ্ডকারণ্যভাগাঃ॥

* * * *

এতানি খলু সর্ব্বভূতলোমহর্ষণানি উন্মত্তচণ্ড শ্বাপদকুলসঙ্কুলগিরিগহ্বরাণি জনস্থানপর্য্যন্তদীর্ঘারণ্যানি দক্ষিণাং দিশমভিবর্ত্তন্তে।

তথাহি

নিষ্কূজস্তিমিতাঃ ক্বচিৎ ক্বচিদপি প্রোচ্চণ্ডসত্ত্বস্বনাঃ
স্বেচ্ছাসুপ্তগভীরঘোষভুজগশ্বাস প্রদীপ্তাগ্নয়ঃ।

(১) গুরু বুদ্ধিমান্‌কে যেমন শিক্ষা দেন, জড়কেও তদ্রূপ দিয়া থাকেন। কাহারও জ্ঞানের বিশেষ সাহায্য বা ক্ষতি করেন না। কিন্তু তথাপি তাহাদের মধ্যে ফলের তারতম্য ঘটে। কেবল নির্ম্মল মণিই প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে পারে; মৃত্তিকা তাহা পারে না।

সীমানঃপ্রদরোদরেষু বিলসৎস্বল্পাম্ভসো যাস্বয়ং
তৃষ্যদ্ভিঃ প্রতিসূর্য্যকৈরজগরস্বেদদ্রবঃ পীয়তে॥

* * * *

অথৈতানি মদকলময়ূরকণ্ঠকোমলচ্ছবিভিরবকীর্ণানি পর্ব্বতৈরবিরলনিবিষ্টনীলবহুলচ্ছায়তরুষণ্ডমণ্ডিতানি অসম্ভ্রান্তবিবিধমৃগযূথানি পশ্যতু মহানুভাবঃ প্রশান্তগম্ভীরাণি মধ্যমারণ্যকানি।

ইহ সমদশকুন্তাক্রান্তবানীরবীরুৎ
প্রসবসুরভিশীতস্বচ্ছতোয়াঃ বহন্তি।
ফলভরপরিণামশ্যামজম্বূনিকুঞ্জ
স্খলনমুখরভূরিস্রোতসো নির্ঝরিণ্যঃ॥

অপিচ

দধতি কুহরভাজামত্র ভল্লূকযূনা
মনুরসিতগুরূণি স্ত্যানমম্বূকৃতানি।
শিশিরকটুকষায়ঃ স্ত্যায়তে শল্লকীনা
মিভদলিতবিকীর্ণগ্রন্থিনিষ্যন্দগন্ধঃ॥(১)

প্রবন্ধের অসহ্য দৈর্ঘ্যাশঙ্কায় আর অধিক উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

(১) এই যে পরিচিতভূমি দণ্ডকারণ্য দেখা যাইতেছে। কোথাও স্নিগ্ধশ্যাম, কোথাও ভয়ঙ্কর রুক্ষদৃশ্য, কোথাও বা নির্ঝরগণের ঝরঝরশব্দে দিগন্ত শব্দিত হইতেছে; কোথায় তীর্থাশ্রম, কোথাও পর্ব্বত, কোথাও নদী এবং মধ্যে২ অরণ্য।

ঐ যে জনস্থান পর্য্যন্ত দীর্ঘ অরণ্য সকল দক্ষিণ দিগে চলিতেছে। এ সকল সর্ব্ব লোক লোমহর্ষণ — তত্রস্থ গিরিগহ্বর উন্মত্ত প্রচণ্ড হিংস্র পশুগণে সমাকুল। কোথাও বা একবারে নিঃশব্দ; কোথাও পশুদিগের প্রচণ্ড গর্জ্জনপরিপূর্ণ; কোথাও বা স্বেচ্ছাসুপ্ত গভীর গর্জ্জনকারী ভুজঙ্গের নিশ্বাসে জ্বালিত অগ্নি। কোথাও গর্ত্তে অল্প জল দেখা যাইতেছে। তৃষিত কৃকলাসেরা অজগরের ঘর্ম্মবিন্দু পান করিতেছে।

* * * দেখুন, এই মধ্যমারণ্য সকল কেমন প্রশান্ত গম্ভীর! মদকল ময়ূরের কণ্ঠের ন্যায় কোমলচ্ছবি পর্ব্বতে অবকীর্ণ; ঘননিবিষ্ট, নীলপ্রধান, অনতিপ্রৌঢ় বৃক্ষ সমূহে শোভিত; এবং ভয়শূন্য বিবিধ মৃগযূথে পরিপূর্ণ। স্বচ্ছতোয়া নির্ঝরিণী সকল বহুস্রোতে বহিতেছে; আনন্দিত পক্ষী সকল তত্রস্থ বেতস লতার উপর বসিতেছে, তাহাতে বেতসের কুসুম বৃন্তচ্যুত হইয়া সেই জলে পড়িয়া জলকে সুগন্ধি

শম্বূক বিদায় পরে পুনরাগমন পূর্ব্বক রামকে জানাইলেন যে, অগস্ত্য রামাগমন শুনিয়া তাঁহাকে আশ্রমে আমন্ত্রিত করিতেছেন। শুনিয়া রাম তথায় চলিলেন। গমনকালীন ক্রৌঞ্চাবত পর্ব্বতাদির বর্ণনা অতি মনোহর। আমরা সচরাচর অনুপ্রাসালঙ্কারের প্রশংসা করি না, কিন্তু এরূপ অনুপ্রাসের উপর বিরক্ত হওয়াও যায় না।

গুঞ্জৎকুঞ্জকুটীরকৌশিকঘটাঘূৎকারবৎ কীচক
স্তম্বাডম্বরমূকমৌকুলিকুলঃক্রৌঞ্চাবতোয়ং গিরিঃ।
এতস্মিন্ প্রচলাকিনাং প্রচলতামুদ্বেজিতাঃ কুজিতৈ
রুদ্বেল্লন্তি পুরাণরোহিণতরুস্কন্ধেষুকুম্ভীনসাঃ॥
এতেতে কুহরেষু গদ্গদনদদ্গোদাবরীবারয়ো
মেঘালঙ্কৃতমৌলিনীলশিখরাঃ ক্ষৌণীভৃতো দক্ষিণাঃ।
অন্যোন্যপ্রতিঘাতসঙ্কুলচলৎকল্লোলকোলাহলৈ
রুত্তালাস্ত ইমে গভীর পয়সঃ পুণ্যাঃ সরিৎসঙ্গমাঃ।(২)

তৃতীয়াঙ্ক অতি মনোহর। সত্য বটে যে, এই উৎকৃষ্ট নাটকে ক্রিয়াপারম্পার্য্য বড় মনোহর নহে, এবং তৃতীয়াঙ্ক সেই দোষে বিশেষ দুষ্ট। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম অঙ্ক যেরূপ বিস্তৃত, তদনুরূপ বহুল ক্রিয়াপরম্পরা নায়ক নায়িকাগণ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয় নাই। যিনি মাক্‌বেথ পাঠ করিয়াছেন, তিনি জানেন যে নাটকে বর্ণিতা ক্রিয়া সকলের বাহুল্য, পারম্পর্য্য, এবং শীঘ্র সম্পাদন, কি প্রকার চিত্তকে মন্ত্রমুগ্ধ করে। কার্য্যগত এই গুণ নাটকের একটি প্রধান গুণ। উত্তরচরিতে তাহার বিরলপ্রচার; বিশেষতঃ প্রথম ও তৃতীয়াঙ্কে। তথাপি ইহাতে কবি যে অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, সেই গুণে আমরা সে সকল দোষ বিস্মৃত হই।

দ্বিতীয়াঙ্কের বিষ্কম্ভক যেমন মধুর, তৃতীয়াঙ্কের বিষ্কম্ভক ততোধিক। গোদাবরীসংমিলিতা, তমসা ও মুরলা নাম্নী দুইটি নদী রূপ ধারণ করিয়া রামসীতা বিষয়িণী কথা কহিতেছে।

অদ্য দ্বাদশ বৎসর হইল, রামচন্দ্র সীতাকে বিসর্জ্জন করিয়াছেন। প্রথম বিরহে তাঁহার যে গুরুতর শোক উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে চিত্রিত হইয়াছে। কালসহকারে সে শোকের লাঘব জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তাহা ঘটে নাই; সর্ব্বসন্তাপহর্ত্তা কাল এই সন্তাপের শমতা সাধিতে পারে নাই।

অনির্ভিন্নগভীরত্বাদন্তর্গূঢ়ঘনব্যথঃ।
পুটপাকপ্রতীকাশো রামস্য করুণোরসঃ। (১)

এবং সুশীতল করিতেছে; স্রোতঃ পরিপক্ক ফলময় শ্যামজম্বুবনান্তে স্খলিত হওয়াতে শব্দিত হইতেছে। গিরিবিবরবাসী যুবা ভল্লূকদিগের থূৎকার শব্দ প্রতিধ্বনিতে গম্ভীর হইতেছে। এবং গজগণের দ্বারা ভগ্ন শল্লকীবৃক্ষের বিক্ষিপ্ত গ্রন্থি হইতে শীতল কটু কষায় সুগন্ধ বাহির হইতেছে।

(২) এই পর্ব্বত ক্রৌঞ্চাবত। এখানে অব্যক্তনাদী-কুঞ্জকুটীরবাসী পেচককুলে ঘূৎকারের ন্যায় শব্দায়মান বংশগুচ্ছের শব্দে ভীত হইয়া কাকেরা নিঃশব্দে আছে। এবং সর্পেরা, চঞ্চল ময়ূরগণের কেকা রবে ভীত হইয়া পুরাতন বটবৃক্ষের স্কন্ধে লুকাইয়া আছে। আর এই সকল দক্ষিণ পর্ব্বত। পর্ব্বত কুহরে গোদাবরী বারিরাশি গদ্গদ নিনাদ করিতেছে; শিরোদেশ মেঘ মালায় অলঙ্কৃত হইয়া নীল শোভা ধারণ করিয়াছে; আর এই গভীরজলশালিনী পবিত্রা নদীগণের সঙ্গম পরস্পরের প্রতিঘাতসঙ্কুল চঞ্চল তরঙ্গকোলাহলে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া রহিয়াছে।

(১) অবিচলিত গভীরত্ব হেতুক হৃদয় মধ্যে রুদ্ধ, এজন্য গাঢ়ব্যথ রামের সন্তাপ মুখবদ্ধ পাত্র মধ্যে পাকের সন্তাপের ন্যায় বাহিরে প্রকাশ পায় না।

এই রূপ মর্ম্ম মধ্যে রুদ্ধ সন্তাপে দগ্ধ হইয়া রাম, পরিক্ষীণ শরীরে রাজকর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন। রাজকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিলে, সে কষ্টের তাদৃশ বাহ্য প্রকাশ পায় না; কিন্তু আজি পঞ্চবটীতে আসিয়া রামের ধৈর্য্যাবলম্বনের সে উপায়ও নাই। এ আবার সেই জনস্থান; পদে২ সীতাসহবাসের চিহ্নপরিপূর্ণ। এই জনস্থানে কত কাল, কত সুখে, সীতার সহিত বাস করিয়াছিলেন, তাহা পদে২ মনে পড়িতেছে। রামের সেই দ্বাদশ বৎসরের রুদ্ধ শোকপ্রবাহ ছুটিয়াছে—সে প্রবাহবলে, এই গোদাবরী স্রোতোস্খলিত শিলাচয়ের ন্যায় রামের হৃদয়পাষাণ আজি কোথায় যাইবে, কে বলিতে পারে?

জনস্থানবাহিনী করুণাদ্রাবিতা নদী গুলিন দেখিল যে আজি বড় বিপদ। তখন মুরলা কলকল করিয়া গোদাবরীকে বলিতে চলিল, "ভগবতি! সাবধান থাকিও—আজ রামের বিপদ। দেখিও, রাম যদি মূর্চ্ছা যান, তবে তোমার জলকণাপূর্ণ শীতল তরঙ্গের বাতাসে মৃদু২ তাঁহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিও।" রঘুকুলদেবতা ভাগীরথী এই শোকতপনাতপসন্তাপ হইতে রামকে রক্ষা করিবার জন্য এক সর্ব্বসন্তাপসংহারিণী ছায়াকে জনস্থানে পাঠাইলেন। সেই ছায়ার স্নিগ্ধতায় অদ্যাপি ভারতবর্ষ মুগ্ধ রহিয়াছে। সেই ছায়া হইতে কবি এই তৃতীয়াঙ্কের নাম রাখিয়াছেন "ছায়া।"—এই ছায়া, সেই বহুকালবিস্মৃতা, পাতালপ্রবিষ্টা, শীর্ণ দেহমাত্রবিশিষ্টা হতভাগিনী রামমনোমোহিনী সীতার ছায়া।

সীতা লবকুশকে প্রসব করিলে পর, ভাগিরথী এবং পৃথিবী বালক দুইটিকে বাল্মীকির আশ্রমে রাখিয়া সীতাকে পাতালে লইয়া গিয়া রাখিয়াছিলেন। অদ্য কুশলবের জন্মতিথি—সীতাকে স্বহস্তচিত কুসুমাঞ্জলি দিয়া পতিকুলাদিপুরুষ সূর্য্যদেবের পূজা করিতে ভাগিরথী এই জনস্থানে পাঠাইলেন। এবং আপন দৈবশক্তিপ্রভাবে রঘুকুলবধূকে অদর্শনীয়া করিলেন। ছায়ারূপিণী সীতা সকলকে দেখিতে পাইতেছিলেন। সীতাকে কেহ দেখিতে পাইতেছিল না।

সীতা তখন জানেন না যে, রাম জনস্থানে আসিয়াছেন। সীতাও আসিয়া জনস্থানে প্রবেশ করিলেন। তখন তাঁহার আকৃতি কি রূপ? তাঁহার মুখ "পরিপাণ্ডুদুর্ব্বল-কপোলসুন্দর"—কবরী বিলোল—শারদাতপসন্তপ্ত কেতকী কুসুমান্তর্গত পত্রের ন্যায়, বন্ধনবিচ্যুত কিশলয়ের মত, সীতা সেই অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। জনস্থানে তাঁহার গভীর প্রেম! পূর্ব্বসুখের স্থান দেখিয়া বিস্মৃতি জন্মিল—আবার সেই দিন মনে পড়িল। যখন সীতা রামসহবাসে এই বনে থাকিতেন, তখন জনস্থান বনদেবতা বাসন্তীর সহিত তাঁহার সখীত্ব হইয়াছিল। তখন সীতা একটি করিশাবককে স্বহস্তে শল্লকীর পল্লবাগ্রভাগ ভোজন করাইয়া পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলেন। এখন সেই করিশাবকও ছিল। এইমাত্র সে বধূসঙ্গে জলপানে গিয়াছে। এক মত্ত-যূথপতি আসিয়া অকস্মাৎ তৎপ্রতি আক্রমণ করিল। সীতা তাহা দেখেন নাই। কিন্তু অন্যত্রস্থিতা বাসন্তী দেখিতে

পাইয়াছিলেন। বাসন্তী তখন উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, "সর্ব্বনাশ হইল, সীতার পালিত করিকরভকে মারিয়া ফেলিল!" রব সীতার কর্ণে গেল। সেই জনস্থান, সেই পঞ্চবটী! সেই বাসন্তী! সেই করিকরভ! সীতার ভ্রান্তি জন্মিল। পুত্রীকৃত হস্তিশাবকের বিপদে বিহ্বলচিত্ত হইয়া তিনি ডাকিলেন, "আর্য্য পুত্র! আমার পুত্রকে বাঁচাও!" কি ভ্রম! আর্য্য পুত্র? কোথায় আর্য্য পুত্র? আজি বার বৎসর সে নাম নাই! অমনি সীতা মুর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। তমসা তাঁহাকে আশ্বস্তা করিতে লাগিলেন। এ দিগে রামচন্দ্র লোপামুদ্রার আহ্বানানুসারে অগস্ত্যাশ্রমে যাইতেছিলেন। পঞ্চবটী বিচরণ করিবার মানসে সেই খানে বিমান রাখিতে বলিলেন। সে কথার শব্দ মূর্চ্ছিতা সীতার কাণে গেল। অমনি সীতার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল—সীতা ভয়ে, আহ্লাদে, উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, "একি এ? জলভরা মেঘের স্তনিতগম্ভীর মহাশব্দের মত কে কথা কহিল? আমার কর্ণবিবর যে ভরিয়া গেল! আজি কে আমা হেন মন্দভাগিনীকে সহসা আহ্লাদিত করিল?" দেখিয়া তমসার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। তমসা বলিলেন, "কেন বাছা একটা অপরিস্ফুট শব্দ শুনিয়া মেঘের ডাকে ময়ূরীর মত চমকিয়া উঠিলি?" সীতা বলিলেন, "কি বলিলে ভগবতি? অপরিস্ফুট? আমি যে স্বরেই চিনেছি আমার সেই আর্য্যপুত্র কথা কহিতেছেন।" তমসা তখন দেখিলেন, আর লুকান বৃথা—বলিলেন, "শুনিয়াছি মহারাজা রামচন্দ্র কোন শূদ্র তাপসের দণ্ড জন্য এই জন স্থানে আসিয়াছেন।" শুনিয়া সীতা কি বলিলেন? বার বৎসরের পর স্বামী নিকটে, নয়নের পুত্তলীর অধিক প্রিয়, হৃদয়ের শোণিতেরও অধিক প্রিয়, সেই স্বামী আজি বার বৎসরের পর নিকটে, শুনিয়া সীতা কি বলিলেন? শুনিয়া সীতা কিছুই আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন না—"কই স্বামী—কোথায় সে প্রাণাধিক?" বলিয়া দেখিবার জন্য তমসাকে উৎপীড়িতা করিলেন না, কেবল বলিলেন—

"দিঠ্ঠিআ অপরিহীনরাঅধম্মো ক্খু সো রাআ।"—"সৌভাগ্যক্রমে সে রাজার রাজধর্ম্ম পালনে ক্রটি হইতেছে না।"

যে কোন ভাষায় যে কোন নাটকে যাহা কিছু আছে,এতদংশ সৌন্দর্য্যে তাহার তুল্য, সন্দেহ নাই। "দিঠ্ঠিআ অপরিহীনরাঅধম্মো ক্খু সো রাআ।" এই রূপ বাক্য কেবল সেক্ষপীয়রেই পাওয়া যায়। রাম আসিয়াছেন শুনিয়া সীতা আহ্লাদের কথা কিছুই বলিলেন না, কেবল বলিলেন, "সৌভাগ্যক্রমে সে রাজার রাজধর্ম্ম পালনে ক্রটি হইতেছে না।" কিন্তু দূর হইতে রামের সেই বিরহক্লিষ্ট প্রভাতচন্দ্রমণ্ডলবৎ আকার দেখিয়া, "সখি, আমায় ধর" বলিয়া তমসাকে ধরিয়া বসিয়া পড়িলেন। এ দিকে রাম পঞ্চবটী দেখিতে২, সীতা বিরহ প্রদীপ্তানলে পুড়িতে২,"সীতে! সীতে!" বলিয়া ডাকিতে২,মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। দেখিয়া সীতাও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া তমসার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া ডাকিলেন,"ভগবতি তমসে! রক্ষা কর! রক্ষা কর! আমার স্বামিকে বাঁচাও!"

তমসা বলিলেন, "তুমিই বাঁচাও। তোমার স্পর্শে উনি বাঁচিতে পারেন।" শুনিয়া সীতা বলিলেন, "যা হউক তা হউক, আমি তাহাই করিব!" এই বলিয়া সীতা রামকে স্পর্শ করিলেন। (১) রাম চেতনা প্রাপ্ত হইলেন।

পরে সীতার পূর্ব্বকালের প্রিয়সখী, বনদেবতা বাসন্তী, সীতার পুত্ত্রীকৃত করিশাবকের সহায়ান্বেষণ করিতেং সেইখানে উপস্থিতা হইলেন। রামের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়ায়, রাম করিশিশুর রক্ষার্থ গেলেন। সেই হস্তিশিশু স্বয়ং শত্রুজয় করিয়া করিণীর সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিল। তদ্বর্ণনা অতি মধুর।

যেনোদ্গচ্ছদ্বিসকিশলয়স্নিগ্ধ দন্তাঙ্কুরেণ
ব্যাকৃষ্টস্তে সুতনুলবলীপল্লবঃ কর্ণপূরাঃ।
সোয়ং পুত্রস্তব মদমুচাং বারণানাং বিজেতা
যং কল্যানং বয়সিতরুণে ভাজনং তস্য জাতঃ।
সখি বাসন্তি পশ্য পশ্য কান্তানুবৃত্তিচাতুর্য্য
মপি শিক্ষিতং বৎসেন।

লীলোৎখাতমৃণালকাণ্ডকবলচ্ছেদেষু সম্পাদিতাঃ
পুষ্পাৎ পুষ্করবাসিতস্য পয়সো গণ্ডুষসক্রান্তনঃ
সেকঃ শীকরিণা করেণ বিহিত কামংবি-
রামেপুনর্যৎস্নেহাদনরালনিলনলিনীপত্রাপত্রং
ধৃতম্।(১)

এদিগে পুত্ত্রীকৃত করী দেখিয়া সীতার গর্ভজপুত্ত্রদিগকে মনে পড়িল। কেবল স্বামীদর্শনে বঞ্চিতা নহেন,—পুত্ত্রমুখ দর্শনেও বঞ্চিতা। সেই মাতৃমুখনির্গত পুত্ত্রমুখস্মৃতিব্যাক্য উদ্ধৃত করিয়া অদ্য বিরত হইব।

---

(১) "যা হউক তা হউক।" এই কথার কত অর্থ গাম্ভীর্য্য! বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বাক্যের টীকায় লিখিয়াছেন যে "আমার পাণিস্পর্শে আর্য্যপুত্র বাঁচিবেন কি না, জানি না; কিন্তু ভগবতী বলিতেছেন বলিয়া আমি স্পর্শ করিব।" ইহাতে এই বুঝিতে হইতেছে যে পাণিস্পর্শ সফল হইবে কি না, এই সন্দেহেই সীতা বলিলেন, "যা হউক তা হউক!" বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উত্তরচরিতের অর্থ বুঝাইতে প্রবৃত্ত হওয়া ধৃষ্টতার কার্য্য সন্দেহ নাই। কিন্তু কবির গৌরবার্থে আমাদিগকে সে দোষও স্বীকার করিতে হইল। সে সন্দেহে সীতা বলেন নাই যে, "যা হবার হউক!" সীতা ভাবিয়াছিলেন, "রামকে স্পর্শ করিবার আমার কি অধিকার? রাম আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি আমাকে বিনাপরাধে বিসর্জ্জন করিয়াছেন—বিসর্জ্জন করিবার সময়ে এক বার আমাকে ডাকিয়াও বলেন নাই যে আমি তোমাকে ত্যাগ করিলাম।—আজি বার বৎসর আমাকে ত্যাগ করিয়া সম্বন্ধ রহিত করিয়াছেন, আজি আবার তাঁহার প্রিয়পত্নীর মত তাঁহার গাত্রস্পর্শ করিব কোন্ সাহসে? কিন্তু তিনি ত মৃতপ্রায়! যা হউক তা হউক, আমি তাঁহাকে স্পর্শ করিব।" তাই ভাবিয়াই সীতাস্পর্শে রাম চেতনা প্রাপ্ত হইলে, সীতা বলিলেন "ভঅবদি তমসে! ওসরহ্ম জই দাবং মং পেক্‌খিস্সদি তদো অণব্ভণুণ্ণাদসন্নিধাণেণ অহিঅদরং মম মহারাও কুবিস্সদি।" তবু "মম মহারাও!"

(১) যে নবফুল্ল মৃণাল পল্লবের ন্যায় স্নিগ্ধ দন্তাঙ্কুরে তোমার কর্ণদেশ হইতে ক্ষুদ্রং লবলীপল্লব টানিয়া লইত, সেই তোমার পুত্র মদমত্ত বারনগণকে জয় করিল, সুতরাং এখনই সে যুবাবয়সের কল্যানভাজন হইয়াছে। * * সখি বাসন্তি দেখ, বাছা স্ত্রীর মন রাখিতেও শিখিয়াছে। খেলা করিতেং মৃণালকাণ্ড উৎপাটিত করিয়া তাহার গ্রাসের অংশে সুগন্ধিপদ্মসুবাসিত জলের গণ্ডূষ মিশাইয়া দিতেছে; এবং শুণ্ডের দ্বারা পর্য্যাপ্ত জলকণার দ্বারা তাহাকে সিক্ত করিয়া, স্নেহে অবক্রদণ্ড নলিনীপত্রের আতপত্র ধরিতেছে।

মমপুত্তকাণং ইসিবিরলকোমলধঅলদসণুজ্জল কবোলং অণুবন্ধমুদ্ধকাঅলিবিহসিদং ণিবদ্ধ-কাঅসিহণ্ডঅং অমলমুহপুণ্ডরীঅজুঅলং ণ পরিচুম্বিদং অজ্জউত্তেণ। (১)

বিষবৃক্ষ।

উপন্যাস।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অঙ্কুর।

দিন কয় মধ্যে, ক্রমে ক্রমে নগেন্দ্রের সরল চরিত্র পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। নির্ম্মল আকাশে মেঘ দেখা দিল—নিদাঘ কালের প্রদোষাকাশের মত, অকস্মাৎ সে চরিত্র মেঘারত হইতে লাগিল। দেখিয়া সূর্য্যমুখী গোপনে আপনার অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন।

সূর্য্যমুখী ভাবিলেন, "আমি কমলের কথা শুনিব। স্বামির চিত্তপ্রতি কেন আবিশ্বাসিনী হইব? তাঁহার চিত্ত অচলপর্ব্বত—আমিই ভ্রান্ত। বোধ হয় তাঁহার কোন ব্যামোহ হইয়া থাকিবে।" সূর্য্যমুখী বালির বাঁধ বাঁধিল।

বাড়ীতে একটী ছোট রকম ডাক্তার ছিল। সূর্য্যমুখী গৃহিনী। অন্তরালে থাকিয়া সকলের সঙ্গেই কথা কহিতেন। বারেণ্ডার পাশে এক চীক থাকিত; চীকের পশ্চাতে সূর্য্যমুখী থাকিতেন। বারেণ্ডায় সম্বোধিত ব্যক্তি থাকিত; মধ্যে এক দাসী থাকিত; তাহার মুখে সূর্য্যমুখী কথা কহিতেন। এই রূপে সূর্য্যমুখী ডাক্তারের সঙ্গে কথা কহিতেন। সূর্য্যমুখী তাহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"বাবুর অসুখ হইয়াছে, ঔষধ দাও না কেন?"

ডাক্তার। "কি অসুখ, তাহা ত আমি জানি না। আমি ত অসুখের কোন কথা শুনি নাই।"

সূ। "বাবু কিছু বলেন নাই?"

ডা। "না—কি অসুখ?"

সূ। "কি অসুখ, তাহা তুমি ডাক্তার, তুমি জান না—আমি জানি?"

ডাক্তার সুতরাং অপ্রতিভ হইল। "আমি গিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি," এই বলিয়া ডাক্তার প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছিল, সূর্য্যমুখী তাহাকে ফিরাইলেন, বলিলেন, "বাবুকে কিছু জিজ্ঞাসা করিও না—ঔষধ দাও।"

ডাক্তার ভাবিল, মন্দ চিকিৎসা নহে। "যে আজ্ঞা, ঔষধের ভাবনা কি," বলিয়া পলায়ন করিল। পরে ডিস্পেন্সরিতে গিয়া একটু সোডা, একটু পোর্ট ওয়াইন, একটু সিরপফেরিমিউরেটিস্, একটু মাতামুণ্ড মিশাইয়া, সিসি পুরিয়া, টিকিট মারিয়া, প্রত্যহ দুই বার সেবনের ব্যবস্থা

---

(১) আমার সেই পুত্রদুটির অমলমুখপদ্মযুগল, যাহাতে কপোলদেশ ঈষদ্বিরল এবং কোমল ধবল দশনে উজ্জ্বল, যাহাতে মৃদুমধুর হাসির অব্যক্তধ্বনি অবিরল লাগিয়া রহিয়াছে, যাহাতে কাকপক্ষ নিবদ্ধ আছে, তাহা আর্য্যপুত্রকর্ত্তৃক পরিচুম্বিত হইল না!

লিখিয়া দিল। সূর্য্যমুখী ঔষধ খাওয়াইতে গেলেন; নগেন্দ্র সিসি হাতে লইয়া পড়িয়া দেখিয়া একটা বিড়ালকে সিসি ছুড়িয়া মারিলেন—বিড়াল পলাইয়া গেল—ঔষধ তাহার ল্যাজ দিয়া গড়াইয়া পড়িতে পড়িতে গেল।

সূর্য্যমুখী বলিলেন, "ঔষধ না খাও—তোমার কি অসুখ, আমাকে বল?"

নগেন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কি অসুখ?"

সূর্য্যমুখী বলিলেন, "তোমার শরীর দেখ দেখি কি হইয়াছে?" এই বলিয়া সূর্য্যমুখী এক খানি দর্পণ আনিয়া নিকটে ধরিলেন। নগেন্দ্র তাঁহার হাত হইতে দর্পণ লইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত করিলেন। দর্পণ চূর্ণ হইয়া গেল।

সূর্য্যমুখীর চক্ষু দিয়া জল পড়িল। দেখিয়া নগেন্দ্র চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া উঠিয়া গেলেন। বহির্ব্বাটী গিয়া এক জন ভৃত্যকে বিনাপরাধে প্রহার করিলেন। সে প্রহার সূর্য্যমুখীর অঙ্গে বাজিল।

ইতি পূর্ব্বে নগেন্দ্র অত্যন্ত শীতলস্বভাব ছিলেন। এখন কথায়২ রাগ।

শুধু রাগ নয়। এক দিন, রাত্রে আহারের সময় অতীত হইয়া গেল, তথাপি নগেন্দ্র অন্তঃপুরে আসিলেন না। সূর্য্যমুখী প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন। অনেক রাত্রি হইল। অনেক রাত্রে নগেন্দ্র আসিলেন; সূর্য্যমুখী দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। নগেন্দ্রের মুখ আরক্ত, চক্ষু আরক্ত; নগেন্দ্র মদ্যপান করিয়াছেন। নগেন্দ্র কখন মদ্যপান করিতেন না। দেখিয়া সূর্য্যমুখী বিস্মিত হইলেন।

সেই অবধি প্রত্যহ ঐরূপ হইতে লাগিল। এক দিন সূর্য্যমুখী, নগেন্দ্রের দুইটী চরণে হাত দিয়া, গলদশ্রু কোন রূপে রুদ্ধ করিয়া, অনেক অনুনয় করিলেন; বলিলেন "কেবল আমার অনুরোধে, ইহা ত্যাগ কর।" নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দোষ?"

জিজ্ঞাসার ভাবেই উত্তর নিবারণ হইল। তথাপি সূর্য্যমুখী উত্তর করিলেন, "দোষ কি, তাহা ত আমি জানি না। তুমি যাহা জান না, তাহা আমিও জানি না। কেবল আমার অনুরোধ।"

নগেন্দ্র প্রত্যুত্তর করিলেন, "সূর্য্যমুখি, আমি মাতাল। মাতালকে শ্রদ্ধা হয়, আমাকে শ্রদ্ধা করিও। নচেৎ আবশ্যক করে না।"

সূর্য্যমুখী ঘরের বাহিরে গেলেন। ভৃত্যের প্রহার পর্য্যন্ত নগেন্দ্রের সম্মুখে আর চক্ষের জল ফেলিবেন না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।

দেওয়ান জী বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, "মাঠাকুরাণীকে বলিও—বিষয় গেল, আর থাকে না।"

"কেন?"

"বাবু কিছু দেখেন না। সদর মফঃস্বলের আমলা যাহা ইচ্ছা তাহা করিতেছে। কর্ত্তার অমনোযোগে আমাকে কেহ মানে না।" শুনিয়া সূর্য্যমুখী বলিলেন, "যাঁহার বিষয়, তিনি রাখেন, থাকিবে। না হয়, গেল গেলই। আমি আপনার বিষয় রাখিতে পারিলে বাঁচি।"

ইতি পূর্ব্বে নগেন্দ্র সকলই স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিতেন।

এক দিন তিন চারি হাজার প্রজা নগেন্দ্রের কাছারির দরওয়াজায় যোড়-

হাত করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। "দোহাই হুজুর—নাএব গোমস্তার দৌরাত্ম্যে আর বাঁচি না। সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইল। আপনি না রাখিলে কে রাখে?"

নগেন্দ্র হুকুম দিলেন, "সব টাকায় দেও।"

ইতি পূর্ব্বে তাঁহার এক জন গোমস্তা এক জন প্রজাকে মারিয়া একটী টাকা লইয়াছিল। নগেন্দ্র গোমস্তার বেতন হইতে দশটী টাকা লইয়া প্রজাকে দিয়াছিলেন।

হরদেব ঘোষাল নগেন্দ্রকে লিখিলেন, "তোমার কি হইযাছে? তুমি কি করিতেছ? আমি কিছু ভাবিয়া পাই না। তোমার পত্র ত পাই-ই না। যদি পাই, ত সে ছত্র দুই, তাহার মানে মাতা মুণ্ড কিছুই নাই। তাতে কোন কথাই থাকে না। তুমি কি আমার উপর রাগ করিযাছ? তা বল না কেন? মোকদ্দমা হারিয়াছ? তাই বা বল না কেন? আর কিছু বল না বল, শারীরিক ভাল আছ কি না বল।"

নগেন্দ্র উত্তর লিখিলেন, "আমার উপর রাগ করিও না—আমি অধঃপাতে যাইতেছি।"

হরদেব বড় বিজ্ঞ। পত্র পড়িয়া মনেং বলিলেন, "কি এ? অর্থচিন্তা? বন্ধু বিচ্ছেদ? দেবন্দ্র দত্ত? না কিছুই নয়—এ প্রেম?'

কমলমণি সূর্য্যমুখীর আর একখানি পত্র পাইলেন। তাহার শেষ এই, "এক বার এসো! কমলমণি! ভগিনি! তুমি বই আর আমার সুহৃৎ কেহ নাই। এক বার এসো।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

মহাসমর।

কমলমণির আসন টলিল। আর তিনি থাকিতে পারিলেন না। কমলমণি রমণীরত্ন। অমনি স্বামির কাছে গেলেন।

শ্রীশচন্দ্র অন্তঃপুরে বসিয়া, আপিসের আয় ব্যয়ের হিসাব কিতাব দেখিতেছিলেন। তাঁহার পাশে, বিছানায় বসিয়া এক বৎসরের পুত্র সতীশচন্দ্র ইংরাজি সংবাদ পত্রখানি অধিকার করিয়াছিল। সতীশচন্দ্র সংবাদপত্র খানি প্রথমে ভোজনের চেষ্টা দেখিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া এক্ষণে পাতিয়া বসিয়াছিল।

কমলমণি স্বামির নিকটে গিয়া গললগ্ন কৃতবাসা হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। এবং করযোড় করিয়া কহিলেন, "সেলাম পৌঁছে মহারাজ!"

(ইতিপূর্ব্বে বাড়ীতে গোবিন্দ অধিকারির যাত্রা হইয়া গিয়াছিল।)

শ্রীশ হাসিয়া বলিলেন, "আবার শশা চুরি নাকি?"

ক। "শশা কাঁকুড় নয়। এবার বড় ভারি জিনিস চুরি গিয়াছে।"

শ্রী। "কোথায় কি চুরি হলো?"

ক। "গোবিন্দপুরে চুরি হয়েছে। দাদার একটি সোণার কৌটায় এক কড়া কাণা কড়ি ছিল, তাই কে নিয়ে গিয়েছে।"

শ্রীশ বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, "তোমার দাদার সোণার কৌটা ত সূর্য্যমুখী—কাণা কড়ি টি কি?"

ক। "সূর্য্যমুখীর বুদ্ধি খানি।"

শ্রী। "তাই লোকে বলে যে, যে খেলে সে কাণা কড়িতে খেলে। সূর্য্যমুখী ঐ

কাণা কড়িতেই তোমার ভাইকে কিনে রেখেছে—আর তোমার এতটা বুদ্ধি থাকিতেও ভাই তোমার হাত ছাড়া হলো। তা কাণা কড়িটি চুরি কর্‌লে কে ?"

ক। "তাত জানি না—কিন্তু তার পত্র পড়িয়া বুঝিলাম যে সে কাণা কড়িটি খোওয়া গিয়াছে—নহিলে মাগি এমন পত্র লিখিবে কেন ?"

শ্রী। "পত্রখানি দেখিতে পাই ?"

কমলমণি শ্রীশচন্দ্রের হস্তে সূর্য্যমুখীর পত্র দিয়া কহিলেন, "এই পড়। সূর্য্যমুখী তোমাকে এসকল কথা বলিতে মানা করিয়াছে—কিন্তু যতক্ষণ তোমাকে সব না বলিতেছি, ততক্ষণ আমার প্রাণ খাবি খেতেছে। তোমাকে পত্র না পড়াইলে আমার আহার নিদ্রা হবে না—ঘূরণী রোগই বা উপস্থিত হয়।"

শ্রীশচন্দ্র পত্র হস্তে লইয়া চিন্তা করিয়া বলিলেন, "যখন তোমাকে নিষেধ করিয়াছে, তখন আমি এ পত্র দেখিব না, কথা টা কি তা শুনিতেও চাহিব না। এখন করিতে হইবে কি, তাই বল ?"

ক। "কর্‌তে হবে এই—সূর্য্যমুখীর বুদ্ধি টুকু গিয়াছে তার একটু বুদ্ধি চাই। বুদ্ধি দেয় এমন লোক আর কে আছে—বুদ্ধি যা কিছু আছে, তা সতীশ বাবুর। তাই সতীশ বাবুকে একবার গোবিন্দপুর যেতে তার মামী লিখে পাঠিয়েছে।"

সতীশবাবু ততক্ষণ একটা ফুলদানি ফুল সমেত উলটাইয়া ফেলিয়াছিলেন, এবং তৎপরে দোয়াতের উপর নজর করিতেছিলেন। দেখিয়া শ্রীশচন্দ্র কহিলেন, "উপযুক্ত বুদ্ধিদাতা বটে। তা যা হোক, এতক্ষণে বুঝিলাম—ভাজের বাড়ী মশাইয়ের নিমন্ত্রণ। সতীশকে যেতে হলেই সুতরাং কমলমণিও যাবে। তা সূর্য্যমুখীর কাণা কড়িটি না হারালে আর এমন কথা লিখ্‌বে কেন ?"

ক। "শুধু কি তাই। সতীশের নিমন্ত্রণ, আমার নিমন্ত্রণ, আর তোমার নিমন্ত্রণ।"

শ্রী। "আমার নিমন্ত্রণ কেন ?"

ক। "আমি বুঝি একা যাব ? আমাদের সঙ্গে গাড়ু গামছা নিয়ে যায় কে ?"

শ্রী। "এ সূর্য্যমুখীর বড় অন্যায়। শুধু গাড়ু গামছা বহিবার জন্য যদি ঠাকুর জামাইকে দরকার হয়, তবে আমি দুদিনের জন্য একটা ঠাকুর জামাই দেখিয়া দিতে পারি।"

কমলমণির বড় রাগ হইল। তিনি ভ্রূকুটি করিলেন, শ্রীশকে ভেঙ্গাইলেন, এবং শ্রীশচন্দ্র যে কাগজ খানায় লিখিতেছিলেন, তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। শ্রীশ হাসিয়া বলিলেন, "তা লাগ্‌তে এসো কেন ?"

কমলমণি কৃত্রিম কোপ সহকারে কহিলেন, "আমার খুসি, লাগ্‌বো।"

শ্রীশচন্দ্রও কৃত্রিম কোপ সহকারে কহিলেন, "আমার খুসি বল্‌বো।"

তখন কোপযুক্তা কমলমণি শ্রীশকে একটি কিল দেখাইলেন। কুন্দদন্তে অধর টিপিয়া, ছোট হাতে একটি ছোট কিল দেখাইলেন।

কিল দেখিয়া, শ্রীশচন্দ্র কমলমণির খোঁপা খুলিয়া দিলেন। তখন বর্দ্ধিতরোষা কমলমণি, শ্রীশচন্দ্রের দোয়াতের কালি পিকদানিতে ঢালিয়া ফেলিয়া দিলেন।

রাগে শ্রীশচন্দ্র দ্রুতগতি ধাবমান হইয়া কমলমণির মুখচুম্বন করিলেন। রাগে কমলমণিও অধীরা হইয়া শ্রীশ-চন্দ্রের মুখচুম্বন করিলেন।

দেখিয়া সতীশচন্দ্রের বড় প্রীতি জন্মিল। তিনি জানিতেন যে মুখচুম্বন তাঁহারি ইজারা মহল। অতএব তাহার ছড়াছড়ি দেখিয়া রাজভাগ আদায়ের অভিলাষে মার জানু ধরিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন; এবং উভয়ের মুখ পানে চা-হিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসির লহর তুলিলেন। সে হাসি কমলমণির কর্ণে কি মধুর বাজি-ল! কমলমণি তখন সতীশকে ক্রোড়ে উঠাইয়া লইয়া ভূরি২ মুখচুম্বন করি-লেন। পরে শ্রীশচন্দ্র কমলের ক্রোড় হইতে তাহাকে লইলেন, এবং ভূরি২ মুখচুম্বন করিলেন। সতীশ বাবু এইরূপে রাজভাগ আদায় করিয়া যথাকালে অবতরণ করিলেন, এবং পিতার স্বুবর্ণময় পেন্‌সিলটি দেখিতে পাইয়া অপহরণ মানসে ধাবমান হইলেন। পরে হস্ত-গত করিয়া উপাদেয় ভোজ্য বিবেচনায় পেন্‌সিল্‌টি মুখে দিয়া লেহন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কালে ভগদত্ত এবং অর্জ্জুনে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ভগদত্ত অ-র্জ্জুনপ্রতি অনিবার্য্য বৈষ্ণবাস্ত্র নিক্ষেপ করেন; অর্জ্জুনকে তন্নিবারণে অক্ষম জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বক্ষঃ পাতিয়া সেই অস্ত্র গ্রহন করিয়া তাহার শমতা করেন। সেই রূপ,কমলমণি ও শ্রীশচন্দ্রের এই বি-ষম যুদ্ধে, সতীশচন্দ্র মহাস্ত্র সকল আপন বদনমণ্ডলে গ্রহণ করায় যুদ্ধের শমতা হইল। কিন্তু ইহাঁদের এরূপ সন্ধিবিগ্রহ বাদলের বৃষ্টির মত—দণ্ডে২ হইত, দণ্ডে২ যাইত।

শ্রীশচন্দ্র তখন কহিলেন, "তা সত্য? সত্যই কি তোমায় গোবিন্দপুরে যেতে হবে? আমি একা থাকিব কি প্রকারে?"

ক। "তোমায় যেন আমি একা থাকি-তে সাধ্‌তেছি। আমিও যাব, তুমিও যাবে। তা যাও, সকাল সকাল আপিস সারিয়া আইস, আর দেরি কর ত, সতীশে আমাতে দুদিগে দুজনে কাঁদ্‌তে বস্‌বো।"

শ্রী। "আমি যাই কি প্রকারে? আ-মাদের এই তিসি কিনিবার সময়। তুমি তবে একা যাও।"

ক। "আয়, সতীশ! আয়, আমরা দুজনে দুদিগে কাঁদ্‌তে বসি।"

মার আদরের ডাক সতীশের কানে গেল—সতীশ অমনি পেন্‌সিলভোজন ত্যাগ করিয়া লহর তুলিয়া আহ্লাদের হাসি হাসিল। সুতরাং কমলের এবার কাঁদা হলো না। তৎপরিবর্ত্তে সতীশের মুখচুম্বন করিলেন,—দেখাদেখি শ্রীশও তাহাই করিলেন। সতীশ আপনার বাহাদুরি দেখিয়া আর এক লহর তুলিয়া হাসিল। এই সকল বৃহৎ ব্যাপার সমাধা হইলে, কমল আবার কহিলেন,—

"এখন কি হুকুম হয়?"

শ্রী। "তুমি যাও,মানা করি না। কিন্তু তিসির মৌসুমটায় আমি কি প্রকারে যাই?"

শুনিয়া, কমলমণি মুখ ফিরাইয়া ম্লানে বসিলেন। আর কথা কহেন না।

শ্রীশচন্দ্রের কলমে একটু কালি ছিল। শ্রীশ সেই কলম লইয়া পশ্চাৎ হইতে

গিয়া কমলের কপালে একটি টীপ্ কাটিয়া দিলেন।

তখন কমল হাসিয়া বলিলেন,"প্রাণাধিক, আমি তোমায় কত ভাল বাসি।" এই বলিয়া, কমল শ্রীশচন্দ্রের স্কন্ধ বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া তাঁহার মুখচুম্বন করিলে, সুতরাং টিপের কালি, সমুদায়টাই শ্রীশের গালে লাগিয়া রহিল।

এই রূপে এবারকার যুদ্ধে জয় হইলে পর, কমল বলিলেন, "যদি তুমি একান্তই যাইবে না, তবে আমার যাইবার বন্দবস্ত করিয়া দাও।"

শ্রী। "ফিরিবে কবে?"

ক। "জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? তুমি যদি গেলে না, তবে আমি কয় দিন থাকিতে পারিব?"

শ্রীশচন্দ্র কমলমণিকে গোবিন্দপুরে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু আমরা নিশ্চিত সম্বাদ রাখি যে সেবার শ্রীশচন্দ্রের সাহেবেরা তিসির কাজে বড় লাভ করিতে পারেন নাই। হৌসের কর্ম্মচারিরা আমাদিগের নিকট গোপনে বলিয়াছে যে সে শ্রীশ বাবুরই দোষ। তিনি ঐ সময়টা কাজ কর্ম্মে বড মন দেন নাই। কেবল ঘরে বসিয়া কড়ি গুণিতেন। এ কথা শ্রীশচন্দ্র এক দিন শুনিয়া বলিলেন,"হবেই ত! আমি তখন লক্ষ্মীছাড়া হইয়াছিলাম।" শ্রোতারা শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, "ছি! বড় স্ত্রৈণ্য!" কথাটা শ্রীশের কাণে গেল। তিনি শুনিয়া হৃষ্টমনে ভৃত্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে, ভাল করিয়া আহারের উদ্যোগ কর্। বাবুরা আজ এখানে আহার করিবেন।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ধরা পড়িল।

গোবিন্দপুরে দত্তদিগের বাড়ীতে যেন অন্ধকারে একটি ফুল ফুটিল। কমলমণির হাসি মুখ দেখিয়া সূর্য্যমুখীরও চক্ষের জল শুকাইল। কমলমণি বাড়ীতে পা দিয়াই সূর্য্যমুখীর চুলের গোছা লইয়া বসিয়া গেলেন। অনেক দিন সূর্য্যমুখী কেশ রচনা করেন নাই। কমলমণি বলিলেন, "দুটো ফুল গুঁজিয়া দিব?" সূর্য্যমুখী তাহার গাল টিপিয়া ধরিলেন। "না! না।" বলিয়া কমলমণি লুকাইয়া দুটা ফুল দিয়া দিলেন। লোক আসিলে বলিলেন, "দেখেছ, মাগী বুড়া বয়সে মাতায় ফুল পরে।"

আলোকময়ীর আলো নগেন্দ্রের মুখমণ্ডলের মেঘেও ঢাকা পড়িল না। নগেন্দ্রকে দেখিয়াই কমলমণি ঢিপ করিয়া প্রণাম করিল। নগেন্দ্র বলিলেন, "কমল কোথা থেকে?" কমল, মুখ নত করিয়া, নিরীহ ভাল মানুষের মত বলিলেন "আজ্ঞে,খোকা ধরিয়া আনিল।" নগেন্দ্র বলিলেন, "বটে! মার পাজি কে!" এই বলিয়া খোকাকে কোলে হইয়া দণ্ডস্বরূপ তাহার মুখচুম্বন করিলেন। খোকা কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহার গায়ে লাল দিল, আর গোঁপ ধরিয়া টানিল।

কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে কমলমনির ঐ রূপ আলাপ হইল "ওলো কুঁদী—কুঁদী মুদী ঢুঁদী—ভাল আছিস ত কুঁদী?"

কুঁদী অবাক হইয়া রহিল। কিছুকাল ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, "আছি।"

"আছি দিদি—আমায় দিদি বল্বি—না বলিস্ ত ঘুমিয়া থাকিবি আর তোর

চুলে আগুন ধরিয়া দিব। আর নহিলে গায়ে আরসুলো ছাড়িয়া দিব।"

কুন্দ দিদি বলিতে আরম্ভ করিল। যখন কলিকাতায় কুন্দ কমলের কাছে থাকিত, তখন কমলকে কিছু বলিত না। বড় কথাও কহিত না। কিন্তু কমলের যে প্রকৃতি, চিরপ্রেমময়ী, তাহাতে সে তখন হইতেই তাঁহাকে ভাল বাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মধ্যে কয় বৎসর অদর্শনে কতক২ ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে কমলের স্বভাবগুনে, কুন্দেরও স্বভাবগুণে, সেই ভালবাসা নূতন হইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

প্রণয় গাঢ় হইল। এদিকে কমলমণি স্বামির গৃহে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, সূর্য্যমুখী বলিলেন, "না ভাই! আর দুদিন থাক! তুমি গেলে আমি আর বাঁচিব না। তোমার কাছে সকল কথা বলাও সোয়াস্তি।" কমল বলিলেন, "তোমার কাজ না করিয়া যাইব না।" সূর্য্যমুখী বলিলেন "আমার কি কাজ করিবে!" কমলমণি মুখে বলিলেন "তোমার শ্রাদ্ধ," মনে২ বলিলেন, "তোমার কণ্টকোদ্ধার।"

কুন্দনন্দিনী কমলের যাওয়ার কথা শুনিয়া আপনার ঘরে গিয়া লুকাইযা কাঁদিল. কমলমণি লুকাইয়া২ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন। কুন্দনন্দিনী বালিশে মাতা দিয়া কাঁদিতেছে, কমলমণি তাহার চুল বাঁধিতে বসিলেন। চুল বাঁধা কমলের একটা রোগ।

চুল বাঁধা সমাপ্ত হইলে, কুন্দের মাতা তুলিয়া, কমল তাহার মস্তক আপনার কোলে রাখিলেন। অঞ্চল দিয়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিলেন। এই সব কাজ শেষ করিয়া শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুঁদি, কাঁদিতেছিলি কেন?"

কুন্দ বলিল, "তুমি যাবে কেন?"

কমলমণি একটু হাসিলেন। কিন্তু ফোঁটা দুই চক্ষের জল সে হাঁসি মানিল না—না বলিয়া কহিয়া তাহারা কমলমণির গণ্ড বহিয়া হাসির উপর আসিয়া পড়িল।

কমলমণি বলিলেন, "তাতে কাঁদিস্ কেন?"

কুন্দ। "তুমিই আমায় ভাল বাস।"

কম। "কেন—আর কেহ কি ভাল বাসে না?"

কুন্দ চুপ করিয়া রহিল।

কম। "কে ভাল বাসে না? বউ ভাল বাসে না—না? আমায় লুকুস্‌নে।"

কুন্দ নীরব।

কমল। "দাদা ভাল বাসে না?"

কুন্দ নীরব।

কমল বলিলেন, "যদি আমি তোমায় ভাল বাসি—আর তুমি আমায় ভাল বাস, তবে কেন আমার সঙ্গে চল না?"

কুন্দ তথাপি কিছু বলিল না। কমল বলিলেন, "যাবে?"

কুন্দ ঘাড় নাড়িল। "যাব না।"

কমলের প্রফুল্ল মুখ গম্ভীর হইল। মনে মনে ভাবিলেন, "ভাল কথা ত নয়। ইট্‌টি মারিলেই পাটিখেলটি খেতে হয়। দাদা ইট খেয়েছেন—ছুঁড়ি পাটখেল খেয়ে বসে আছে। আমার শ্রীশচন্দ্র মন্ত্রীবর কাছে নাই—কাহাকেই বা পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি?"

তখন কমলমণি সস্নেহে কুন্দনন্দিনীর

মস্তক বক্ষে তুলিয়া লইয়া ধারণ করিলেন, এবং সস্নেহে তাহার গণ্ডদেশ গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "কুন্দ, সত্য বলিবি ?"

কুন্দ বলিল "কি ?"

কমল বলিলেন, "যা জিজ্ঞাসা করিব ? আমি তোর দিদি—আমি তোকে বোনের মত ভাল বাসি—আমার কাছে লুকুস্‌নে—আমি কাহারও কাছে বলিব না।" কমল মনে মনে রাখিলেন, "যদি বলি ত রাজমন্ত্রী শ্রীশ বাবুকে। আর খোকার কাণে কাণে।"

কুন্দ বলিলেন, "কি বল ?"

ক। "তুই দাদাকে বড় ভাল বাসিস্। —না ?"

কুন্দ উত্তর দিল না। কমলমণির হৃদয়মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

কমল বলিলেন, "বুঝিয়াছি—মরিয়াছ। মর তাতে ক্ষতি নাই—কিন্তু সঙ্গে২ অনেকে মরে যে ?"

কুন্দনন্দিনী মস্তকোত্তলন করিয়া কমলের মুখপ্রতি স্থিরদৃষ্টি করিয়া রহিল। কমলমণি প্রশ্ন বুঝিলেন। বলিলেন, "পোড়ারমুখী চোকের মাতা খেয়েছ ? দেখিতে পাও না যে দাদা তোকে ভাল বাসে ?"

ঘুরিয়া সেই উন্নত মস্তক আবার কমলমণির বক্ষের উপর পড়িল। কুন্দনন্দিনীর অশ্রুজলে কমলমণির হৃদয় প্লাবিত হইল। কুন্দনন্দিনী অনেক ক্ষণ নীরবে কাঁদিল—বালিকার ন্যায় বিবশা হইয়া কাঁদিল। সে কাঁদিল, আবার পরের চক্ষের জলে তাহার চুল ভিজিয়া গেল।

ভাল বাসা কাহাকে বলে, সোণার কমল তাহা জানিত। অন্তঃকরণের অন্তঃকরণ মধ্যে, কুন্দনন্দিনীর দুঃখে, দুঃখী, সুখে সুখী হইল। কুন্দনন্দিনীর চক্ষু মুছিয়া কহিল, "কুন্দ ?"

কুন্দ আবার মাতা তুলিয়া চাহিল।

ক। "আমার সঙ্গে চল।"

কুন্দের চক্ষে আবার জল পড়িতে লাগিল। কমল বলিল,

"নহিলে নয়। চক্ষের আড়াল হইলে, দাদাও ভুলিবে, তুইও ভুলিবি। নহিলে তুই বয়ে গেলি, দাদা বয়ে গেল, বউ বয়ে গেল—সোণার সংসার ছার খার গেল।"

কুন্দ কাঁদিতে লাগিল। কমল বলিলেন, "যাবি ? মনে করিয়া দেখ্—দাদা কি হয়েছে, বউ কি হয়েছে ?"

কুন্দ অনেকক্ষণ পরে চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "যাব।"

অনেকক্ষণ পরে কেন ? কমল তাহা বুঝিল। বুঝিল যে, কুন্দনন্দিনী পরের মঙ্গলমন্দিরে আপনার প্রাণের প্রাণ বলি দিল। সেই জন্য অনেকক্ষণ লাগিল। আপনার মঙ্গল ? কমল বুঝিয়াছিলেন যে কুন্দনন্দিনী আপনার মঙ্গল বুঝিতে পারে না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

হীরা।

এমত সময় হরিদাসী বৈষ্ণবী আসিয়া গান করিল।

"কাঁটা বনে তুল্‌তে গেলাম কলঙ্কেরি ফুল,
গো সখি, কালকলঙ্কেরি ফুল।
মাথায় পর্‌লেম মালা গেঁথে, কাণে
পর্‌লেম দুল।
সখি কলঙ্কেরি ফুল।"*

(*) রাগিণী শঙ্করা—আড় খেমটা।

এ দিন সূর্য্যমুখী উপস্থিত। তিনি কমলকে গান শুনিতে ডাকিতে পাঠাইলেন। কমল কুন্দকে সঙ্গে করিয়া গান শুনিতে আসিলেন। বৈষ্ণবী গায়িতে লাগিল।

"মরি মরব কাঁটা ফুটে,
ফুলের মধু খব লুটে,
খুঁজে বেড়াই কোথায় ফুটে,
নবীন মুকুল।"

কমলমণি ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "বৈষ্ণবী দিদি—তোমার মুখে ছাই পড়ুক—আর তুমি মর। আর কি গান জান না?"

হরিদাসী বলিল, "কেন?" কমলের আরও রাগ বাড়িল; বলিলেন, "কেন? একটা বাবলার ডাল আন্‌ত রে—কাঁটা ফোটা কত সুখ মাগিকে দেখিয়ে দিই।"

সূর্য্যমুখী মৃদুভাবে হরিদাসীকে বলিল, "ও সব গান আমাদের ভাল লাগে না—গৃহস্থবাড়ী ভাল গান গাও।"

হরিদাসী বলিল "আচ্ছা" বলিয়া গায়িতে আরম্ভ করিল,

স্মৃতিশাস্ত্র পড়্‌ব আমি ভট্টাচার্য্যের পায়ে ধোরে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম শিখে নিব, কোন্ বেটী বা নিন্দে করে॥

কমল ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, "ভাই, বউ—তোমার প্রবৃত্তি হয়, তোমার বৈষ্ণবীর গান তুমিই শোন, আমি চলিলাম।" এই বলিয়া কমল চলিয়া গেলেন—সূর্য্যমুখীও মুখ অপ্রসন্ন করিয়া উঠিয়া গেলেন। আর২ স্ত্রী লোকেরা আপন২ প্রবৃত্তিমতে কেহ উঠিয়া গেল, কেহ রহিল। কুন্দনন্দিনী রহিল। তাহার কারণ, কুন্দনন্দিনী গানের মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারে নাই—বড় শুনেও নাই—অন্য মনে ছিল, এই জন্য যেখানকার সেই খানে রহিল। হরিদাসী তখন আর গান করিল না। এ দিক সেদিক বাজে কথা আরম্ভ করিল। গান আর হইল না দেখিয়া আর সকলে উঠিয়া গেল। কুন্দ কেবল উঠিল না—চরণে তাহার গতিশক্তি ছিল কি না সন্দেহ। তখন কুন্দকে বিরলে পাইয়া হরিদাসী তাহাকে অনেক কথা বলিল। কুন্দ কতক বা শুনিল, কতক বা শুনিল না।

সূর্য্যমুখী ইহা সকলই দূর হইতে দেখিতেছিলেন। যখন উভয়ে গাঢ় মনঃসংযোগের সহিত কথা বার্ত্তা হওয়ার চিহ্ন দেখিলেন, তখন সূর্য্যমুখী কমলকে ডাকিয়া দেখাইলেন। কমল বলিল,

"কি তা? কথা কহিতেছে কহুক না। মেয়ে বই ত আর পুরুষ না।"

সূর্য্য। "মেয়ে কি পুরুষ তার ঠিক কি?"

কমল বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি?"

সূর্য্য। "আমার বোধ হয় কোন ছদ্মবেশী পুরুষ। তাহা এখনই জানিব—কিন্তু কুন্দ কি পাপিষ্ঠ!"

কমল। "রসো। আমি একটা বাবলার ডাল আনি। মিন্সেকে কাঁটা ফোটার সুখটো দেখাই।" এই বলিয়া কমল বাবলার ডালের সন্ধানে গেল। পথে সতীশের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল—সতীশ মামীর সিন্দুরকৌটা অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন—এবং সিন্দুর লইয়া আপনার গালে, নাকে, দাড়িতে, বুকে, পেটে বিলক্ষণ করিয়া অঙ্গরাগ করিতেছিলেন—দেখিয়া কমল, বৈষ্ণবী বাবলার ডাল

কুন্দনন্দিনী প্রভৃতি সব ভুলিয়া গেলেন।

তখন সূর্য্যমুখী হীরা দাসীকে ডাকাইলেন।

হীরার নাম একবার উল্লেখ হইয়াছে; তাহার কিছু বিশেষ পরিচয় আবশ্যক।

নগেন্দ্র এবং তাঁহার পিতার বিশেষ যত্ন ছিল যে গৃহের পরিচারিকারা বিশেষ সৎস্বভাববিশিষ্টা হয়। এই অভিপ্রায়ে উভয়েই পর্য্যাপ্ত বেতনদান স্বীকার করিয়া, একটু ভদ্র ঘরের স্ত্রী লোকগণকে দাসীত্বে নিযুক্ত করিতে চেষ্টা পাইতেন। তাঁহাদিগের গৃহে পরিচারিকারা সুখে ও সম্মানে থাকিত, সুতরাং অনেক দারিদ্র্যগ্রস্ত ভদ্র লোকের কন্যারা তাঁহাদের দাস্যবৃত্তি স্বীকার করিত। এই প্রকার যাহারা ছিল, তাহাদের মধ্যে হীরা প্রধানা। অনেক গুলিন পরিচারিকা কায়স্থ কন্যা—হীরাও কায়স্থ। নগেন্দ্রের পিতা হীরার মাতামহীকে গ্রামান্তর হইতে আনয়ন করেন। প্রথমে তাহার মাতামহীই পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়াছিল—হীরা তখন বালিকা, মাতামহীর সঙ্গে আসিয়াছিল। পরে হীরা সমর্থা হইলে প্রাচীনা দাসিবৃত্তি ত্যাগ করিয়া আপন সঞ্চিত ধনে একটী সামান্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া গোবিন্দপুরে বাস করিল —হীরা দত্তগৃহে চাকরি করিতে প্রবৃত্ত হইল।

এক্ষণে হীরার বয়স বিংশতি বৎসর। বয়সে সে প্রায় অন্যান্য দাসীগণ অপেক্ষা কনিষ্ঠা। তাহার বুদ্ধির প্রভাবে এবং চরিত্রগুণে সে দাসী মধ্যে শ্রেষ্ঠা বলিয়া গণিত হইয়াছিল।

হীরা বালবিধবা বলিয়া গোবিন্দপুরে পরিচিতা। কেহ কখন তাহার স্বামির কোন প্রসঙ্গ শুনে নাই। কিন্তু হীরার চরিত্রেও কেহ কোন কলঙ্ক শুনে নাই। তবে হীরা অত্যন্ত মুখরা, সধবার ন্যায় বেশবিন্যাস করিত, এবং বেশবিন্যাসের বিশেষ প্রিয় ছিল।

হীরা আবার সুন্দরী—উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী, পদ্মপলাশলোচনা। দেখিতে খর্ব্বাকৃতা; মুখখানি যেন মেঘ ঢাকা চাঁদ; চুল গুলি যেন সাপ ফণা ধরিয়া ঝুলিয়া রহিয়াছে। হীরা আড়ালে বসে গান করে; দাসীতে দাসীতে ঝকড়া বাধাইয়া তামাসা দেখে; পাচিকাকে অন্ধকারে ভয় দেখায়; ছেলেদের বিবাহের আবদার করিতে শিখাইয়া দেয়; কাহাকে নিদ্রিত দেখিলে চুণ কালি দিয়া সং সাজায়।

কিন্তু হীরার অনেক দোষ। তাহা ক্রমে জানা যাইবে। আপাততঃ বলিয়া রাখি হীরা আতর গোলাপ দেখিলেই চুরি করে।

সূর্য্যমুখী হীরাকে ডাকিয়া কহিলেন, 'ঐ বৈষ্ণবীকে চিনিস্?'

হীরা। 'না। আমি কখন পাড়ার বাহির হই না—আমি বৈষ্ণব ভিখারী কিসে চিনিব? ঠাকুরবাড়ীর মাগীদের ডেকে জিজ্ঞাসা কর না। করুণা কি শীতলা জানিতে পারে।'

সূ। "এ ঠাকুর বাড়ির বৈষ্ণবী নয়। এ বৈষ্ণবী কে, তোকে জান্‌তে হবে। এ বৈষ্ণবীই বা কে, আর বাড়ীই বা কোথায়? আর কুন্দের সঙ্গে এত ভাব বা কেন? এই সকল কথা যদি ঠিক জেনে এসে বলিতে পারিস্ তবে তোকে

নুতন বাণারসী পরাইয়া সং দেখিতে পাঠাইয়া দিব।"

নুতন বাণারসীর কথা শুনিয়া হীরার পাঁচ হাত বুক হইল, জিজ্ঞাসা করিল, "কখন জানিতে যেতে হবে?"

সূর্য্য। "তোর যখন খুসি। কিন্তু এখন ওর পাছুং না গেলে ঠিকানা পাবিনা।"

হীরা। "আচ্ছা।"

সূর্য্য। "কিন্তু দেখিস্ যেন বৈষ্ণবী কিছু বুঝিতে না পারে। আর কেহ কিছু বুঝিতে না পারে।"

এমত সময়ে কমল ফিরিয়া আসিল। সূর্য্যমুখী তাঁহাকে পরামর্শের কথা সব বলিলেন। শুনিয়া কমল খুসী হইলেন। হীরাকে বলিলেন, "আর পারিস্ ত মাগীকে দুটো বাবলার কাঁটা ফুটিয়ে দিয়ে আসিস্।"

হীরা বলিল, "সব পারিব, কিন্তু শুধু ঢাকাই নিবনা।"

সূ। "কি নিবি?"

কমল বলিল "ও একটি বর চায়। ওর একটী বিয়ে দাও।"

সূ। "আচ্ছা তাই হবে—ঠাকুরজামাইকে মনে ধরে? বল, তা হলে কমল সম্বন্ধ করে।"

হী। "তবে দেখ্‌বো। কিন্তু আমার মনের মত ঘরে একটি বর আছে।"

সূ। "কে লো?"

হী। "যম।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

"না।"

সেই দিন প্রদোষ কালে, উদ্যান মধ্যস্থ বাপীতটে বসিয়া, কুন্দনন্দিনী। এই দীর্ঘিকা অতি সুবিস্তৃতা; তাহার জল অতি পরিষ্কার, এবং সর্ব্বদা নীলপ্রভ। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, এই পুষ্করিণীর পশ্চাতে পুষ্পোদ্যান। পুষ্পোদ্যান মধ্যে এক শ্বেতপ্রস্তররচিতহর্ম্ম্য লতামণ্ডপ ছিল। সেই লতামণ্ডপের সম্মুখেই, পুষ্করিণীতে অবতরণ করিবার সোপান। সোপান প্রস্তরবৎ ইষ্টকে নির্ম্মিত, অতি প্রশস্ত এবং পরিষ্কার। তাহার দুই ধারে, দুইটি বহুকালের বড় বকুল গাছ। সেই বকুলের তলায়, সোপানের উপরে কুন্দনন্দিনী, অন্ধকার প্রদোষে একাকিনী বসিয়া, স্বচ্ছসরোবর হৃদয়ে প্রতিফলিত নক্ষত্রাদি সহিত আকাশ প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। কোথাও কতকগুলিন নাল ফুল অন্ধকারে অস্পষ্ট লক্ষ্য হইতেছিল। দীর্ঘিকার অপর তিন পার্শ্বে, আম্র, কাঁঠাল, জাম, লেবু, লীচু, নারিকেল, কুল, বেল, প্রভৃতি ফলবান ফলের গাছ, ঘনশ্রেণীবদ্ধ হইয়া অন্ধকারে অসমশীর্ষ প্রাচীরবৎ দৃষ্ট হইতেছিল। কদাচিৎ তাহার শাখায় বসিয়া মাচাড় পাখি বিকট রব করিয়া সরোবরের শব্দহীনতা ভঙ্গ করিতেছিল। শীতল বায়ু, সরোবর পার হইয়া, ইন্দীবরকোরককে ঈষন্মাত্র বিধুত করিয়া, আকাশচিত্রকে স্বল্পমাত্র কম্পিত করিয়া, কুন্দনন্দিনীর শিরস্থ বকুলপত্রমালায় মর্ম্মরশব্দ করিতেছিল। এবং নিদাঘপ্রস্ফুটিত বকুল পুষ্পের গন্ধ চারিদিকে বিকীর্ণ করিতেছিল—বকুল পুষ্প সকল নিঃশব্দে কুন্দনন্দিনীর অঙ্গে এবং চারিদিগে ঝরিয়া পড়িতেছিল। পশ্চাৎ হইতে অসংখ্য মল্লিকা, যুথিকা, এবং কামিনীর সুগন্ধ আসিতেছিল। চারি-

দিগে, অন্ধকারে, খদ্যোতমালা স্বচ্ছবারির উপর উঠিতেছে, পড়িতেছে, ফুটিতেছে, নিবিতেছে। দুই একটা বাদুড় ডাকিতেছে, দুই একটা শৃগাল অন্য পশু তাড়াইবায় তাহাদিগের যে শব্দ সেই শব্দ করিতেছে—দুই এক খানা মেঘ আকাশে পথ হারাইয়া বেড়াইতেছে—দুই একটা তারা মনের দুঃখে খসিয়া পড়িতেছে। কুন্দনন্দিনী মনের দুঃখে ভাবিতেছেন। কি ভাবনা ভাবিতেছেন? এইরূপ। "ভাল, সবাই আগে মলো-মা মলো, দাদা মলো, বাবা মলো, আমি মলেম না কেন? যদি না মলেম ত এখানে এলাম কেন? ভাল, মানুষ কি মরিয়া নক্ষত্র হয়?" পিতার পরলোক যাত্রার রাত্রে কুন্দ যে স্বপ্ন দেখিয়াছিল, কুন্দের আর তাহা কিছুই মনে ছিল না; কখন মনে হইত না; এখনও তাহা মনে হইল না। কেবল আভাসমাত্র মনে আসিল। এই মাত্র মনে হইল, যেন সে কবে মাতাকে স্বপ্ন দেখিয়াছিল, তাহার মা যেন তাহাকে নক্ষত্র হইতে বলিয়াছিলেন। কুন্দ ভাবিতে লাগিল, "ভাল, মানুষ মরিলে কি নক্ষত্র হয়? তা হলে ত বাবা, মা, সবাই নক্ষত্র হয়েছেন? তবে তাঁরা কোন্ নক্ষত্র গুলি? ঐটি? না ঐটি? কোন্‌টি কে? কেমন করিয়া জানিব? তা যেটিই যিনি হউন, আমায় ত দেখিতে পেতেছেন? আমি যে এত কাঁদি—তা দূর হউক ও আর ভাবিব না—বড় কান্না পায়। কেঁদে কি হবে? আমার ত কপালে কান্নাই আছে—নহিলে মা—আবার ঐ কথা! দূর হউক—ভাল, মরিলে হয় না? কেমন করিয়া! জলে ডুবিয়া? বেশ ত? মরিলে নক্ষত্র হব—তা হলে—হব ত? দেখিতে পাব—রোজ রোজ দেখিতে পাব—কাকে? কাকে, মুখে বলিতে পারিনে কি? আচ্ছা নাম মুখে আনিতে পারিনে কেন? এখন ত কেহ নাই—কেহ শুনিতে পাবে না। একবার মুখে আনিব? কেহ নাই—মনের সাধে নাম করি। ন—নগ—নগেন্দ্র! নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, নগেন্দ্র নগেন্দ্র! নগেন্দ্র, আমার নগেন্দ্র! আ মলো! আমার নগেন্দ্র? আমি কে? সূর্য্যমুখীর নগেন্দ্র। কতই নাম করিতেছি—হলেম কি? আচ্ছা—সূর্য্যমুখীর সঙ্গে বিয়ে না হয়ে যদি আমার সঙ্গে হতো—দূর হউক—ডুবেই মরি। আচ্ছা যেন এখন ডুবিলেম—কাল ভেসে উঠবো—তবে সবাই শুনবে, শুনে নগেন্দ্র—নগেন্দ্র!—নগেন্দ্র!—নগেন্দ্র—আবার বলি—নগেন্দ্র নগেন্দ্র নগেন্দ্র! নগেন্দ্র শুনে কি বলিবেন? ডুবে মরা হবে না—ফুলে পড়িয়া থাকিব—দেখিতে রাক্ষসীর মত হব। যদি তিনি দেখেন, ত বিষ খেয়ে ত মরিতে পারি? কি বিষ খাব? বিষ কোথা পাব—কে আমায় এনে দিবে? দিলে যেন—মরিতে পারিব কি? পারি—কিন্তু আজি না—একবার আকাঙ্ক্ষা ভরিয়া মনে করি—তিনি আমায় ভাল বাসেন। আচ্ছা, সে কথা কি সত্য! কমল দিদি ত বলিল—কিন্তু কমল জানিল কিসে? আমি পোড়ারমুখী জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। ভাল বাসেন? কিসে ভাল বাসেন? কি দেখে ভাল বাসেন, রূপ না গুণ? রূপ—দেখি?" (এই বলিয়া কালামুখী সচ্ছ সরোবরে

আপনার প্রতিবিম্ব দেখিতে গেল, কিন্তু কিছুই দেখিতে না পাইয়া আবার পূর্ব্ব-স্থানে আসিয়া বলিল) "দূর হউক যা নয় তা ভাবি কেন? আমার চেয়ে সূর্য্যমুখী সুন্দর, আমার চেয়ে হরমণি সুন্দর; বিশু সুন্দর: মুক্ত সুন্দর; চন্দ্র সুন্দর; প্রসন্ন সুন্দরী; বামা সুন্দর; প্রমদা সুন্দর; আমার চেয়ে হীরা দাসীও সুন্দর। হীরাও আমার চেয়ে সুন্দর? হাঁ; শ্যামবর্ণ হলে কি হয়—মুখ আমার চেয়ে সুন্দর। তা রূপ ত গোল্লাই গেল—গুণ কি? আচ্ছা দেখি দেখি ভেবে।—কই, মনে ত হয় না। কমলের মন রাখা কথা—আমায় কেন ভাল বাসিবেন? তা, কমল মন রাখা কথা বল্‌বে কেন? কে জানে! কিন্তু মরা হবে না, ঐ কথা ভাবি। মিছে কথা! ত মিছেই কথাই ভাবি। মিছে কথাকে সত্য বলিয়া ভাবিব। কিন্তু কলিকাতায় যেতে হবে যে, তা ত যেতে পারিব না। দেখিতে পাব না যে। আমি যেতে পারব না। পার্‌ব না—পার্‌ব না। তা না গিয়াই বা কি করি? যদি কমলের কথা সত্য, তবে ত যারা আমার জন্য এত করেছে, তাদের ত অসুখী করিতেছি। সূর্য্যমুখীর মনে কিছু হয়েছে, বুঝিতে পারি। সত্য হউক, মিথ্যা হউক, কাজে কাজেই আমায় যেতে হবে। তা পারিব না। তবে ডুবে মরি। মরিবই মরিব। বাবা গো! তুমি কি আমাকে ডুবিয়া মরিবার জন্য রাখিয়া গিয়াছিলে;"—

কুন্দ তখন দুই চক্ষে হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিল। সহসা, অন্ধকার গৃহে প্রদীপ জ্বালার ন্যায়, কুন্দের সেই স্বপ্ন বৃত্তান্ত সম্পষ্ট মনে পড়িল। কুন্দ তখন বিদ্যুৎস্পৃষ্টার ন্যায় গাত্রোত্থান করিল। "আমি সকল ভুলিয়া গিয়াছি—আমি কেন ভুলিলাম? মা আমাকে দেখা দিয়াছিলেন—মা আমার কপালের লিখন জানিতে পারিয়া আমাকে ঐ নক্ষত্র লোকে যাইতে বলিয়াছিলেন—আমি কেন তাঁর কথা শুন্‌লেম না—আমি কেন গেলেম ন!—আমি কেন মলেম না! আমি এখনও বিলম্ব করিতেছি কেন? আমি এখনও মরিতেছি না কেন? আমি এখনই মরিব।" এই ভাবিয়া কুন্দ ধীরে ধীরে সেই সরোবর সোপান অবতরণ আরম্ভ করিল। কুন্দ নিতান্ত অবলা—নিতান্ত ভীরুস্বভাবসম্পন্না—প্রতি পদার্পণে ভয় পাইতে ছিল—প্রতি পদার্পণে তাহার অঙ্গ শিহরিতেছিল। তথাপি অস্খলিত সংকল্পে সে মাতার আজ্ঞা পালনার্থ ধীরে ধীরে যাইতেছিল। এমত সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে অতি ধীরে২ তাহার পৃষ্ঠে অঙ্গুলি স্পর্শ করিল। বলিল, "কুন্দ!" কুন্দ দেখিল—সে অন্ধকারে দেখিবা মাত্র চিনিল—নগেন্দ্র। কুন্দের সে দিন আর মরা হলোনা।

আর নগেন্দ্র? এই কি তোমার এত কালের সুচরিত্র! এই কি তোমার এত কালের শিক্ষা! এই কি তোমার সূর্য্যমুখীর প্রাণপণ প্রণয়ের প্রতিফল! ছি ছি! দেখ, তুমি চোর! তুমি চোরের অপেক্ষায়ও হীন। চোর সূর্য্যমুখীর কি করিত? তাহার গহনা চুরি করিত, অর্থ হানি করিত, কিন্তু তুমি তাহার প্রাণ হানি করিতে আসিয়াছ। চো-

রকে সূর্য্যমুখী কখন কিছু দেয় নাই; তবু সে চুরি করিলে চোর হয়। আর সূর্য্যমুখী তোমাকে সর্ব্বস্ব দিয়াছে—তবু তুমি চোরের অধিক চুরি করিতে আসিয়াছ! নগেন্দ্র, তুমি মরিলেই ভাল হয়। যদি সাহস থাকে, তবে তুমি গিয়া ডুবিয়া মর!

আর ছি! ছি! কুন্দনন্দিনি! তুমি চোরের স্পর্শে কাঁপিলে কেন? ছি! ছি! কুন্দনন্দিনি—! চোরের কথা শুনিয়া তোমার গায়ে কাঁটা দিল কেন? কুন্দনন্দিনি—দেখ! পুষ্করিণীর জল পরিষ্কার, সুশীতল, সুবাসিত—বায়ুর হিল্লোলে তাহার নীচে তারা কাঁপিতেছে। ডুবিবে? ডুবিয়া মর না? কুন্দনন্দিনী মরিতে চাহে না।

চোর বলিল, "কুন্দ! কালি কলিকাতায় যাইবে?"

কুন্দ কথা কহিল না—চক্ষু মুছিল—কথা কহিল না।

চোর বলিল, "কুন্দ! ইচ্ছাপূর্ব্বক যাইতেছ?

ইচ্ছা পূর্ব্বক! হরি, হরি! কুন্দ আবার চক্ষু মুছিল—কথা কহিল না।

"কুন্দ—কাঁদিতেছ কেন?" কুন্দ এবার কাঁদিয়া ফেলিল! তখন নগেন্দ্র বলিতে লাগিলেন,

"শুন কুন্দ! আমি বহুকষ্টে এত দিন সহ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু আর পারিলাম না। কি কষ্টে যে বাঁচিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আপনি ক্ষত বিক্ষত হইয়াছি। ইতর হইয়াছি। মদ্যপ হইয়াছি। আর পারি না। তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি না। শুন কুন্দ! এখন বিধবা বিবাহ চলিত হইতেছে—আমি তোমাকে বিবাহ করিব। তুমি বলিলেই বিবাহ করি।"

কুন্দ এবার কথা কহিল। বলিল "না।"

আবার নগেন্দ্র বলিল, "কেন কুন্দ! বিধবার বিবাহ কি অশাস্ত্র?" কুন্দ আবার বলিল "না।"

নগেন্দ্র বলিল, "তবে না কেন? বল বল—বল—আমার গৃহিণী হইবে কি না? আমায় ভাল বাসিবে কি না?"

কুন্দ বলিল, "না।"

তখন নগেন্দ্র যেন সহস্র মুখে, অপরিমিত প্রেম পরিপূর্ণ মর্ম্মভেদী কত কথা বলিলেন। কুন্দ বলিল "না।"

তখন নগেন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন পুষ্করিণী নির্ম্মল, সুশীতল—কুসুমবাসসুবাসিত—পবন হিল্লোলে তন্মধ্যে তারা কাঁপিতেছে—ভাবিলেন "উহার মধ্যে শয়ন কেমন?"

অন্তরীক্ষে কুন্দ বলিতে লাগিল "না!" বিধবার বিবাহ শাস্ত্রে আছে। তাহার জন্য নয়। তবে ডুবিয়া মরিল না কেন? স্বচ্ছ বারি—শীতলজল—নীচে নক্ষত্র নাচিতেছে—কুন্দ ডুবিয়া মরিল না কেন?

ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত।*

প্রথম সংখ্যা।

ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস নাই, একথা সকলেই যুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। প্রাচীন রোমক এবং গ্রীকগণ পুরাবৃত্ত রচনায় অতীব নিপুণতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু হিন্দুরা কাব্যপ্রিয়, তাঁহারা প্রকৃত ঘটনা সমূহ অলৌকিক বর্ণনায় এত পরিপূর্ণ করিয়াছেন যে তাহা হইতে সার ভাগ উদ্ধৃত করা দূরপরাহত। ইতিহাস নিচয় গদ্যে রচনা করাই বিধেয়। পদ্যে কোন প্রস্তাব রচিত হইলে তাহা নানা অলঙ্কারে ভূষিত করিতে হয়, সুতরাং তাহা অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইয়া থাকে। হিন্দুরা অভিধান, চিকিৎসাশাস্ত্র, ইতিহাস, প্রভৃতি যে সকল প্রস্তাব গদ্যে রচনার যোগ্য, তাহা সমুদায় কণ্ঠস্থ রাখিবার জন্য শ্লোকে রচনা করিয়া গিয়াছেন। গদ্যে যে সকল বিষয় সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সুগম হয়, পদ্যে তাহা হয় না। পুরাণনিচয় আমাদিগের প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস। তাহা এত অসার, অযৌক্তিক এবং কাল্পনিক বিবরণে পরিপূর্ণ যে,তাহার মধ্য হইতে অণুমাত্র সত্য পাওয়া যায় কি না সন্দেহ, এবং পুরাণের পরস্পর মতভেদ ও অনৈক্য থাকা প্রযুক্ত তাহাতে কোন প্রকারে বিশ্বাস হইবার পথ নাই। হিন্দুরা প্রকৃত ইতিহাস রচনা প্রণালী জানিতেন না বলিয়া আমরা মহাবীর, ও পণ্ডিতগণের জীবন চরিত সংগ্রহ করিতে পারি নাই। চৈতন্যদেব, জয়দেব গোস্বামী, গৌড়েশ্বর সেন রাজগণ আমাদিগের দেশে কএক শত বৎসর হইল বর্ত্তমান ছিলেন, কিন্তু আমরা তাঁহাদিগের জীবন চরিত সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য বিষয় কিছুই অবগত নহি।

প্রাচীন লেখকগণ একজন সাধারণ ক্ষত্রিয় রাজাকেও "সাগরাম্বরা ধরণীমণ্ডলের অধীশ্বর" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বেদব্যাস যদি এ কালে জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে মহারাজ্ঞী বিক্টোরিয়া ও ইংরাজ জাতির কিরূপ প্রতাপ বর্ণনা করিতেন, তাহা বলিতে পারি না।

ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিতে হইলে, প্রথমে ঋগ্বেদসংহিতার উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। ঋগ্বেদের ন্যায় প্রাচীনগ্রন্থ ভূমণ্ডলে নাই। বেদে মানবজাতির রচনাকুসুম প্রথম প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, এ জন্য হিন্দুরা চতুর্ব্বেদ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার রচিত বলিয়া যথোচিত সম্মান করিয়া থাকেন, এবং এজন্যই জর্ম্মন দেশোদ্ভব সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী মহামহোপাধ্যায়গণ একমাত্র বেদাধ্যয়নে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। বৈদিক গ্রন্থ চারি অংশে বিভক্ত—ছন্দ—মন্ত্র—ব্রাহ্মণ এবং সূত্র। ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিৎ মাক্ষমূলর স্থির করিয়াছেন যে, ছন্দো ভাগ ১২০০ হইতে ১০০০, মন্ত্র ভাগ

---

* লঘু ভারত। কলীতিহাস। ১২ খণ্ড। শ্রীগোবিন্দ কান্ত বিদ্যাভূষণ প্রণীত। বোয়ালিয়া ও তমোঘ্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

১০০০ হইতে ৮০০, ব্রাহ্মণ ভাগ ৮০০ হইতে ৬০০, এবং সূত্র ভাগ ৬০০ হইতে ২০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। এই চারি অংশের রচনা পরস্পর বিভিন্ন। ছন্দোভাগে ভারতবর্ষীয় সমাজের শৈশবাবস্থার প্রতিকৃতি ও বৈদিক ধর্ম্মের অসম্পূর্ণতা, এবং মন্ত্র ভাগে বৈদিক উপাসনার সম্পূর্ণত্ব লক্ষিত হয়। ব্রাহ্মণ ভাগে উপাসনার বিবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, এবং সূত্রভাগে বেদার্থ প্রকাশক ব্রাহ্মণ সম্বন্ধীয় গুহ্য কথা সকল প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমুদয় অংশ শ্রুতি নামে প্রসিদ্ধ—মন্ত্র ভাগ পদ্যে ও ব্রাহ্মণ ভাগ গদ্যে রচিত।

বৈদিক মন্ত্র বা সংহিতা ভাগ ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, উষা, মরুৎ, অশ্বিনীকুমার, সূর্য্য, পূষা, রুদ্র, মিত্র প্রভৃতি দেবতার স্তোত্র পরিপূর্ণ। ঋগ্বেদ সংহিতা আলোচনায় অবগত হওয়া যায়, আর্য্যেরা মধ্য এসিয়া হইতে আগমন করিয়া ভারতবর্ষের আদিমবাসী দস্যু, রাক্ষস, অসুর, বা পিশাচ প্রভৃতি কৃষ্ণবর্ণ বর্ব্বরজাতিদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তাহারা অতীব সাহস সহকারে আর্য্যগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। সম্বর নামক তাহাদিগের জনৈক প্রধান সেনাপতি একশত নগরীর অধিপতি হইয়া পরম সুখে পার্ব্বতীয় প্রদেশে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিল। আর্য্যগণ ভারতবর্ষীয় নিবিড় অরণ্য মালা অগ্নি সংযোগদ্বারা ক্রমে ভস্মসাৎ করত প্রাচীন অসভ্য জাতিদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রথমে কৃষি কার্য্যদ্বারা উদর পোষণ করিতেন, এবং বেদুইন আরব গণের ন্যায় দেশে২ পর্য্যটন করিতেন। তাঁহাদিগের কোন নির্দ্দিষ্ট বাসভূমি ছিল না। মেষ পালন ও পশুহনন তাঁহাদিগের প্রধান ব্যবসা ছিল, এবং দৈনিক কার্য্য সমাধা করণান্তর কিঞ্চিৎ অবকাশ পাইলেই বেদ রচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। যুদ্ধাদি উপস্থিত হইবামাত্র বল্কল ও মৃগচর্ম্ম পরিধান করত অস্ত্র লইয়া অকুতোভয়ে বর্ব্বর জাতির সহিত মহাসমরে নিযুক্ত হইতেন। পরে ক্রমে কৃষিকার্য্যের উন্নতি সহকারে নগর নির্ম্মাণ আরম্ভ হইল। তাঁহারা পোতারোহণে নানা দেশ হইতে ব্যবহারোপযোগী বাণিজ্য সামগ্রী আনয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ভারতবর্ষের ক্রমে২ উন্নতি হইতে লাগিল; ভীষণ শ্বাপদপূর্ণ অরণ্যানি সকল পরিষ্কৃত হইয়া জনপদের আবাস ভূমি হইয়া উঠিল। ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম অষ্টক, সপ্তদশ অনুবাক, অষ্টম বর্গের প্রথম সূক্তে লিখিত আছে, তুগ্ররাজ দ্বীপবাসী কোন শত্রু কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হওয়াতে তাহার দমনার্থ তৎপুত্র ভুজ্যকে সুসজ্জিত রণপোতারোহণে প্রেরণ করেন, কিন্তু প্রবল ঝটিকায় পোত সমুদ্রে মগ্ন হইয়া যায়, এবং কুমার ভুজ্য মহাকষ্টে প্রাণধারণ করিয়া উপকূলে নীত হয়েন; এতৎপ্রমাণে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, আর্য্যগণ ফিনিসিয়ান দিগের পূর্ব্বে পোত নির্ম্মাণ কৌশল অবগত ছিলেন। তাঁহারা প্রথমে সপ্তসিন্ধু অর্থাৎ পঞ্জাব রাজ্যে বাস করিতেন। মনুসংহিতা পাঠে অবগত হওয়া যায়, কিছুকাল তাঁহারা তথায় অবস্থিতি

করিয়া সরস্বতী নদীর পরপারে দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে যাত্রা করিয়াছিলেন ; এই সময় তাঁহাদিগের দ্বারা বহুসংখ্যক অসভ্য আদিমবাসিগণ সমরে পরাজিত হইয়া স্বং আবাস ভূমি পরিত্যাগ করিয়াছিল। প্রথমে তাঁহারা সরস্বতী হইতে গঙ্গার উপকূলস্থ ব্রহ্মর্ষি দেশে বাস করত মধ্যদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং ক্রমেং ভারতবর্ষ আর্য্যগণের বাসস্থল হইয়া উঠিল। ইতিপূর্ব্বে কোন জাতিভেদ ছিল না ; পরে সভ্যতার বৃদ্ধি সহকারে বৈদিক মহর্ষিগণ ঋগ্বেদ পুরুষসূক্তে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি প্রকাশ করিলেন। মনুসংহিতায় প্রত্যেক বর্ণের কর্ত্তব্য ও উপাস্য দেবতার বিষয় সবিস্তার লিখিত হইয়াছে। বেদ ও মনুসংহিতা পাঠে ভারতবর্ষের প্রাচীন অবস্থা এবং নৃপতিগণের রাজ্য শাসন প্রণালী কিছুই উত্তম রূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না। বাল্মীকির রামায়ণ অতি প্রাচীন গ্রন্থ, ইহাতে রাম রাবণের যুদ্ধ এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন বিবরণও কিঞ্চিৎ২ সংগৃহীত হইয়াছে। মহাভারত কুরুপাণ্ডবগণের যুদ্ধবৃত্তান্ত ও বহুজানপদের বিবরণে পরিপূর্ণ। এ সময় হিন্দুগণ সভ্যতার উচ্চাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। হিন্দুগণের যুদ্ধবিদ্যা, রাজ্যশাসন প্রণালী, শিল্প নৈপুণ্য প্রভৃতির উত্তম পরিচয় মহাভারতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইন্দ্রপ্রস্থের সুচারু প্রাসাদবর্ণনা হিন্দু আবালবৃদ্ধ বনিতা, সকলেই অবগত আছে। বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া পাণ্ডবেরা স্বীয় রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে পুরোচন নামক যবন (গ্রীক) জতুগৃহ নির্ম্মাণ করে, এবং সৈনিক কার্য্যেও এই সকল শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ, পহ্লব, প্রভৃতি ভিন্ন জাতিগণ নিয়োজিত হইত। ইন্দ্রপ্রস্থ আধুনিক দিল্লীর এক ক্রোশ ব্যবধানে পুরাণ কেল্লা নামক দুর্গ সন্নিকটে ছিল। এস্থান এক্ষণে মুসলমান নৃপতিগণের নগরীর ভগ্নাবশেষে পূর্ণিত রহিয়াছে। হিন্দু ভূপতিগণের প্রাসাদাদির কিছুমাত্র চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। কালে এই মহাতেজা কুরুপাণ্ডবদিগের কীর্ত্তিকলাপ একেবারে লোপ হইল। এক্ষণে বোধ হইতেছে—

"ভীষ্ম দ্রোণকর্ণসীরে,কে জানিত যুধিষ্ঠিরে,
যদি ব্যাস না বর্ণিত গানে।"

উষা।

১

অদিতি নন্দিনী, উষা বিনোদিনী,
প্রফুল্ল বদনা, মধুর ভাষিণী,
আলোক বসনা, কুসুম মালিনী,
এস তুমি, দেবি, অবনীতলে,
হাসিতে হাসিতে, নয়ন ভঙ্গিতে
আনন্দের ধারা ঢালিতে ঢালিতে,
স্বর্গীয় সৌরভ শ্রীঅঙ্গ হইতে
বর্ষিতে বর্ষিতে করুণাবলে;

২

যথা স্বয়ংবরে নবীনা যুবতী,
রূপের আভায় পূরিয়া জগতী,
চলে সভা তলে মৃদু মন্দ গতি,
নানা অলঙ্কার পরিয়া অঙ্গে;
কিংবা রে যেমতি পতির মিলনে
যায় রূপবতী সহাস্য বদনে,
সাজাইয়া দেহ বিবিধ ভূষণে,
ভাসিতে ভাসিতে সুখ তরঙ্গে;

৩

অথবা যেরূপ সলিল হইতে
সরোবর কুল শোভিতে শোভিতে,
উঠে একাকিনী সুন্দরী নিভৃতে,
রম্যতর কান্তি সরসী স্নানে;
কিম্বা যথা আশা সাহস নন্দিনী,
অঙ্গের আলোকে উজলি মেদিনী,
ধায় তাড়াইতে দুখের যামিনী,
মোহিয়া সকলে মধুর গানে।

৪

প্রণয়ের রাগে রঞ্জিত তপন,
মধুরতাময়, সতেজ দর্শন,
ছুটে পিছে পিছে উৎসুক লোচন,
চুম্বিতে তোমার বিকচ মুখে;
ভরসার ভরে আসিয়া সত্বরে,
অম্বরে তোমায় প্রেমানন্দে ধরে,
প্রাণের মিত্রের হেম কলেবরে,
মিশহ অমনি পরম সুখে।

৫

দেখেছ যদিও যুগ যুগান্তর,
অনন্ত যৌবনা তুমি নিরন্তর;
প্রত্যহ নবীনা নববেশ ধর,
সাজাতে নিয়ত নূতন অঙ্গ।
রাশি চক্রে ঘুরি উঠি প্রতি দিন,
দেখিতেছ ক্রমে কত জাতি ক্ষীণ,
কত বংশাবলী ক্রমশঃ বিলীন,
অবনী মণ্ডলে কালের রঙ্গ।

৬

বিচক্ষণ বুদ্ধি বৃদ্ধ শ্বেতকেশ
কৃতান্ত কবলে করিছে প্রবেশ;
উঠি তার স্থলে যুবক বীরেশ
নবদম্ভ ভরে শাসিছে ধরা;
সেও লুকাইছে কিছু দিন পরে,
তার পদে আসি উঠিছে অপরে;
এই রূপে ভাসি কাল স্রোতোপরে
চলিছে শৈশব, যৌবন, জরা।

৭

প্রতাপে প্রমত্ত কত নরপতি
তুলি জয়কেতু মৃত্যুর সংহতি,
সমরে অমর, কীর্ত্তির সন্ততি,
তোমার সমক্ষে পাইছে ক্ষয়;

বৃহৎ সাম্রাজ্য বীর-বিভূষিত
ধরণী মণ্ডল করিয়া কম্পিত
তোমার সম্মুখে কত বিগলিত,
হেরিতেছ তুমি কালের জয়।

৮

কিন্তু নারে কাল জিনিতে তোমারে,
আদি হৈতে তুমি আছ একাকারে,
হাসিতে হাসিতে প্রত্যহ ধরারে
নব নব বেশ দিতেছ তুমি,
অমর মাধুরী, অচল যৌবনা,
নূতন বসনা, নূতন ভূষণা,
নিয়ত নবীনা, প্রফুল্ল বদনা,
অটল-বিমল-লাবণ্য-ভূমি।

৯

নক্ষত্র-কুসুম নীলাম্বর-শিরে,
শ্যামাঙ্গী যামিনী লুকায় অচিরে
তোমার প্রভায়, যবে ধীরে ধীরে
উঁকি তুমি দাও উদয়াচলে।
ধরণীর দেহ করি পরিহার
পলাইয়া যায় ঘোর অন্ধকার,
নূতন সৌন্দর্য্য ছুটে অনিবার,
মুক্ত যেন শশী রাহু-কবলে।

১০

জীবের জীবন তুমি অবনীতে;
তব আগমনে উঠে আচম্বিতে
মৃত্যু-সহোদরা-নিদ্রাঙ্ক হইতে
জাগি জীব-কুল সুখ-হিল্লোলে।
বসি তরু-ডালে বিহঙ্গমগণে
সংগীত বরষে নিকুঞ্জে, কাননে;
মনের বাসনা পূরিতে যতনে
মিশে গিয়া লোকে কর্ম্ম-কল্লোলে।

১১

অর্থের আকাঙ্ক্ষা, পদের লালসা,
জয়ের প্রত্যাশা. প্রেমের ভরসা,
কীর্ত্তির কামনা, সম্ভ্রমের তৃষা,
আনন্দের বাঞ্ছা, বিদ্যানুরাগ,
এই রূপ কত বাসনার বশে,
মায়ার বাজারে নরগণ পশে,
জাগি উঠি সবে তোমার পরশে,
তব বাক্যে করি আলস্য ত্যাগ।

১২

তোমার প্রসাদে ছুটে নববল,
উঠে কর্ম্ম স্থলে করম সকল,
ফুটে কাম্যবনে আহ্লাদ কমল,
জগতে নূতন শোভা বিরাজে।
তোমার কৃপায় কবিতা উদিত,
মনোহর শিল্প রঙ্গে বিকশিত,
বিজ্ঞান নিয়ত নব পল্লবিত,
ধরম নূতন ভূষণে সাজে।

১৩

উদয় অচলে উঠিতে উঠিতে
পূরাকালে তুমি পাইতে দেখিতে
উৎসুক উল্লাসে তোমায় পূজিতে,
আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ।
চাহি দেখ, দেবি, এখন আবার,
তোমার চরণে দিতে উপহার,
আনিয়াছে নব কবিতার হার,
এই দীন হীন অধম জন।

১৪

পুরাকালে তুমি যেমন হাসিতে,
এখনো হাসিছ ভারত ভূমিতে,
পুরাকালে যথা সৌন্দর্য্য বর্ষিতে,
এখনো বর্ষিছ প্রত্যহ আসি।

এখনো তেমনি সুমধুর স্বরে,
গায় তব গুণ বিহঙ্গ নিকরে,
গাইত যেমন ভারত ভিতরে,
পুরাকালে সুখ সাগরে ভাসি।

১৫

সেই হিমাচল তুষার মণ্ডিত,
অলংঘ্য প্রাচীর উত্তরে শোভিত,
সেই সপ্ত-সিন্ধু পশ্চিমে বাহিত,
পুরাকালে যাহা দেখিতে তুমি।
এখনো তেমনি ভীষণ সাগর,
রক্ষিছে দক্ষিণ দিক্‌ নিরন্তর,
পূর্ব্বে ব্রহ্ম পুত্র তেমনি প্রখর,
পূর্ব্বেতে যেমন হেরিতে তুমি।

১৬

পুরাকালে তুমি যেমন দেখিতে,
প্রকৃতি তেমনি আছে চারি ভিতে,
ভারত-নিবাসী আর্য্যগণ চিতে
নাহি কেন তবে পূর্ব্বের বল ?
কেন দীন-ভাবে পড়ি কর্ম্মস্থলে,
অচেতন প্রায়, কি পাপের ফলে,
কি নিদ্রার বশে, কি মায়ার বলে,
শূর-কুলোদ্ভত হিন্দুর দল ?

১৭

এ সুপ্ত নিস্তেজ অবস্থা হইতে,
পারিবে গো উষা কবে জাগাইতে,
পারিবে কি উষা কভু জাগাইতে,
বীর্য্যহীন আর্য্য সন্তানগণে ?
কবে ভারতের এ দুখ শর্ব্বরী,
হবে অবসান, হে সুরসুন্দরি ?
পূর্ব্বের মহিমা কখনো কি স্মরি,
ধাবে হিন্দুসুত কীর্ত্তি সদনে ?

স্বস্বভাবানুবর্ত্তিতা।

মনুষ্যজাতির স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম এই যে, সূক্ষ্ম কথাটি বুঝিতে পারিবার অগ্রে স্থূলং কথা গুলি বুঝিয়া লয়। পরের দ্রব্য অপহরণ করা অনুচিত, একথা সকলেই জানে, কিন্তু কি কারণে অনুচিত, তাহা লইয়া অদ্যাপি অনেক বিতণ্ডা চলিতেছে। প্রত্যহ "প্রাতে গৃহ মার্জ্জন করাইবে, এবং আপনি দন্ত ধাবনাদি প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিবে"—যত লোকে এই নিয়ম প্রতিপালন করে, তাহারা সকলেই কিছু পরিষ্কার থাকার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারে না।

ফলতঃ সভ্যতার প্রথমাবস্থায় সামান্য লোকে সদাচরণ করিবে, এ জন্য অনেক নিয়ম নিবদ্ধ থাকে। তখন তাহারা সে সকল নিয়মের নিগূঢ় মর্ম্ম অনুভব করিতে পারে না। দণ্ড কি লোকনিন্দা ভয়ে তাহা প্রতিপালন করিতে থাকে, এবং ক্রমশঃ বুদ্ধিবৃত্তির চালনা সহকারে তাহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য অনুসন্ধানে

প্রবৃত্ত হয়। তখন,পরদ্রব্য অপহরণ করা অন্যায়—পরকে আঘাত করা নিষিদ্ধ, ইত্যাদি নিয়মের পরিবর্ত্তে—পরের ক্ষতি করা অন্যায়, ইত্যাকার ধারণাই প্রবল হইয়া উঠে। তদ্রূপ প্রাতঃকৃত্য সমাধানের নিয়ম গুলি অভ্যস্ত হইলে তৎপরিবর্ত্তে লোকে স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ে চিন্তা করিতে আরম্ভ করে।

এই রূপে সভ্যতার উন্নতির সঙ্গেং বহুসংখ্যক বিশেষ বিধির পরিবর্ত্তে এক একটী সাধারণ বিধি প্রচলিত হইয়া উঠে। ইহাতে সমাজের মঙ্গল হয়, কারণ যে সকল বিষয়ে বিশেষ বিধির অভাব থাকে, সাধারণ বিধি প্রবল হইলে তাহা দূরীকৃত হয়। যাহারা শৌচ বিষয়ক নিয়ম এত অভ্যাস করিয়াছে যে, শুচি বায়ুগ্রস্ত বলিয়া গণ্য হয়; এবং পরের ক্ষতি সংক্রান্ত নিষেধ গুলিও যথাযোগ্য মতে প্রতিপালন করিয়া থাকে, তাহারাও একথাটী বুঝেনা যে জলপানার্থ-অভিপ্রেত-পুষ্করিণীতে দেহ বস্ত্রাদি ধৌত করা অন্যায়। এবিষয়ে বিশেষ-বিধি প্রচলিত না থাকাতে এই রূপ হইয়াছে। স্বাস্থ্যবিষয়ক জ্ঞান না জন্মিলে ইহার প্রতিবিধান হইবেক না।

এতদ্ভিন্ন দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভিন্নং দেশে অথবা ভিন্নং ধর্ম্মে বিশেষ বিধিগুলি অনেক স্থলে বিভিন্ন থাকে, কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে প্রকাশ হয় যে, সকলের মধ্যে এক এক সাধারণ বিধি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা সর্ব্বত্র সমান।

আমাদিগের দেশে মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান অদ্যাপি এত দূর প্রবল আছে যে, সাধারণ লোক ঐ সকল নিয়ম প্রতিপালন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে, তাহার নিগূঢ় মর্ম্মের প্রতি কেহ লক্ষ্য করে না।

কিছুকাল পূর্ব্বে যখন ইউরোপ খণ্ডে খৃষ্টানদিগের মধ্যে সর্ব্বত্র রোমান ক্যাথলিক মত প্রচলিত ছিল, তখন তথায়ও বিশেষ বিধির প্রাধান্য দৃষ্ট হইত। পরে প্রটেষ্টান্ট মত প্রচার হইলে ঐ সকল বিধি লইয়া এবং অন্যান্য নানা বিষয়ে ঘোরতর বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। পরিশেষে ফরাসি দেশের রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় হইতে ইউরোপে এক প্রকার মহা প্রলয় উপস্থিত হইয়াছে। যে কোন নিয়মই হউক, তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম না বুঝিলে চিন্তাশক্তি-বিশিষ্ট একজন মনুষ্যও তাহা প্রতিপালন করিতে সম্মত হয়েন না।

খৃষ্টানেরা আপনাদিগের ধর্ম্ম ঈশ্বরাদিষ্ট বলিয়াই গণনা করিয়া থাকেন, সুতরাং স্বভাবতঃ ঐ ধর্ম্মাবলম্বী কেহই পূর্ব্বে আপন শাস্ত্রীয় কথার যুক্তি লইয়া আন্দোলন করিতেন না, কিন্তু ইদানীং তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকে প্রতিপক্ষগণকে নিরস্ত করণোদ্দেশে ঈশ্বরাদেশের নিগূঢ় মর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। তাঁহারা বলেন যে, আমাদিগের ধর্ম্মবিধিগুলি সর্ব্বতোভাবে যুক্তিসঙ্গত। তবে যেন যুক্তিসঙ্গত না হইলে ঈশ্বরাদেশ অবহেলা করাতে দোষ নাই। একথার বিচার করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে; কিন্তু ইহারদ্বারা স্পষ্ট উপলব্ধ হইতেছে যে, এইক্ষণ সকল কার্য্য ও নিয়মের যুক্তি অবধারণ করা অত্যাবশ্যক হইয়াছে।

আবার যাঁহারা কোন ধর্ম্মকেই ঈশ্বরা-

দিষ্ট বলিয়া গণ্য করেন না, তাঁহাদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নিয়ম নির্দ্দেশার্থ কতক গুলি মূল কথা স্থির করা অত্যাবশ্যক। সেই গুলি সর্ব্ববাদীসম্মত হইলে যিনি যেরূপ বিশেষ বিধি প্রতিপালন করুন, মৌলিক কথার সহিত সম্মত হইলেই তাহার প্রতি কেহ আপত্তি করিতে পারিবেন না।

এই প্রকার সর্ব্ববাদীসম্মত কতক গুলি মৌলিক নিয়ম স্থির করা যে অতীব কঠিন তাহা বলা বাহুল্য। ফলতঃ অদ্যাপি এমত একটী নিয়মও স্থির হয় নাই যে, তদনুসারে সকলেই স্বং কার্য্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা নির্ণয় করিতে ইচ্ছা করিবেক।

উপস্থিত প্রস্তাবে এই রূপ একটী মৌলিক নিয়মের আলোচনা করিতে সংকল্প করা গিয়াছে। ইহা শ্রীযুক্ত জন ষ্টুয়ার্ট মিল কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার অভিপ্রায় আমরা অবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রকাশ করিতে পারিব এত দূর সাহস হয় না, তবে যৎকিঞ্চিৎ যাহা লিপিবদ্ধ করা গেল, তাহা মূল গ্রন্থের অনুরূপ বলিয়া গ্রাহ্য হইলেই আমাদিগের শ্রম সার্থক হইবেক।

মিল বলেন যে জনসমাজে কোন ব্যক্তির স্বেচ্ছাচার নিবারণের প্রস্তাব হইলে কেবল এই বিচার করা উচিত যে, কথিত আচরণের দ্বারা অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষতি হয় কি না। ক্ষতি হইলে তাহা নিবারণ করা আবশ্যক। নতুবা তাহার নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বা পুণ্য বৃদ্ধির উদ্দেশে দণ্ডবিধির দ্বারাই হউক, বা গুরুতর লোক নিন্দার দ্বারাই হউক, তাহার স্বেচ্ছাচার প্রতিবিধান করিবার অধিকার অন্য ব্যক্তি মাত্রেরই নাই।

মিল আপন মত সমর্থন জন্য যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম, এবং স্থল বিশেষে এতদ্দেশের পুরাবৃত্ত ও ব্যবহার প্রণালী সহযোগে প্রতিপাদন পূর্ব্বক প্রকাশ করা যাইতেছে।

সচরাচর সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে বুদ্ধিই মনুষ্যের পরম পদার্থ; যে ব্যক্তি বুদ্ধি চালনা করে না—কেবল অন্যের অনুকরণ করিয়াই কার্য্য করে, তাহাকে তাবতেই হেয় জ্ঞান করিয়া থাকেন। সেই বুদ্ধি প্রত্যেকেরই নিজের আয়ত্ত থাকা আবশ্যক। বুদ্ধি চালনাতে ভ্রম উপস্থিত হইয়া কিঞ্চিৎ দোষ ঘটিলেও লোকে মার্জ্জনা করিয়া থাকেন, কিন্তু ক্ষতি বৃদ্ধি না বুঝিয়া দেশাচার প্রতিপালন করাতে কোন প্রশংসা নাই। পরন্তু বুদ্ধি চালনার প্রতি লোকে যেমন প্রসন্নচিত্ত, মনের বাসনা পূরণ বিষয়ে তাদৃশ নহেন। প্রত্যুত, বাসনা তীব্র হইলে সকলেই নানা বিপত্তির আশঙ্কা করেন। কিন্তু বুদ্ধি যেমন, বাসনাজনিত-প্রবৃত্তি গুলিও তদনুরূপ, মনের অঙ্গ বিশেষ। তাবতের মনে সর্ব্বপ্রকার স্পৃহারই মূল আছে, তৎসমুদায় তুল্যরূপে পরিবর্দ্ধিত না হইলেই তন্মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব ঘটিয়া বিপদ উপস্থিত হয়। ফলতঃ, ব্যক্তি বিশেষে যে কুকর্ম্মানুরত হয়, ইহার হেতু এই যে, তাহাদিগের সদসৎ বিচারের ক্ষমতা দুর্ব্বল, নতুবা স্পৃহার আতিশয্যেই যে তাহা ঘটে, এ রূপ বলিতে পারা যায় না।

কোন ব্যক্তির বাসনাগুলি অপেক্ষা-

কৃত সতেজ হইলে,যদিও তৎকর্ত্তৃক কোন কোন অহিত ঘটনা হইলেও হইতে পারে, তথাচ তাহার দ্বারা অনেক বিশেষ২ হিত সাধন হওয়াও সম্ভাবিত, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাহার তেজ থাকে, সে সকল বিষয়েই আপনার স্পৃহার স্থল দেখিতে পায়, যাহার কোন বিষয়ে স্পৃহা হয় না,তাহার তেজ নাই। স্পৃহার তীব্রতা তেজের লক্ষণ। তেজীয়ান পুরুষ সৎ কি অসৎ যে কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে নিশ্চয়ই নিস্তেজ ব্যক্তি অপেক্ষা প্রাধান্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি কার্য্যের সময় আপনার ইচ্ছার অনুগামী হইতে অক্ষম, সে ঘড়ির ন্যায় জড় পদার্থ বিশেষ, তাহাতে মনুষ্যত্ব নাই।

মিল এতদ্বিষয়ে উইলিয়ম হম্বোল্টের একটী বচনের প্রতি অনেক নির্ভর দিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই—মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক গুণসমূহের মধ্যে পরস্পরের সামঞ্জস্য রক্ষা পূর্ব্বক তাহাদিগের সমুন্নতি করাই জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। হম্বোল্টের মতে ইহা আমাদিগের ক্ষণভঙ্গুর অভিলাষ বিশেষ মাত্র নহে—ইহা মনুষ্যের বিবেক শক্তির অনিবার্য্য প্রসব স্বরূপ, কদাচ অন্যথা হইবার নহে।

মনুষ্যকে স্বভাবতঃ স্বেচ্ছা পরিপূরণ জন্য ব্যগ্র দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সামাজিক ও ধর্ম্মসংক্রান্ত বিধি পরম্পরা দ্বারা তাহার প্রতিরোধ হইয়া থাকে; এই জন্য মিল বলেন যে, মনোবৃত্তির উন্নতি সাধন অভিপ্রেত হইলে এরূপ বিধি পরম্পরা যত সংক্ষিপ্ত হয়, ততই ভাল। কেননা পদে পদে ইচ্ছাকে বাধা দিলে মনোবৃত্তি নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হইয়া যাইবেক।

মনুষ্য একটী নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে২ তাহা এতদূর অভ্যস্ত হইয়া যায় যে, তদ্বিপরীত ইচ্ছা আর মনে উদয়ও হয় না। নিয়মের সংখ্যা যত অধিক হয়, ততই তদনুসারী ব্যক্তিগণের বিভিন্নতা হ্রাস ও সাদৃশ্য বৃদ্ধি হয়। তখন লোকে নিয়ম গুলির মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য ভুলিয়া কেবল তাহার বাহ্যিক অঙ্গগুলি প্রতিপালন করিতে থাকে। যেমন এতদ্দেশে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাত্রিকালে গৃহের প্রত্যেক কুঠরিতে দীপ রক্ষার নিয়মের স্থলে, এই ক্ষণ, এক ব্যক্তি একটী প্রদীপ লইয়া একবার তাবৎ কুঠরী ভ্রমণ করিলেই যথেষ্ট বলিয়া গণ্য হয়।

অতএব মিল বলেন যে,প্রত্যেক ব্যক্তির স্পৃহাগুলি সুপ্রণালী মতে বিকাস প্রাপ্ত হইলে সকল মনুষ্যই বিভিন্নপ্রকৃতি এবং স্ব২ প্রধান হইবেন। প্রত্যেকেই অন্যের পক্ষে এক একটী স্বতন্ত্র আদর্শ স্বরূপ হইবেন। সামান্য ব্যক্তিরা তাঁহাদিগকে দেখিয়া স্বপ্রকৃতি পরিপালনের জন্য যত্ন করিতে এবং তাহার উন্নতি সাধনের উপায় করিতে পারিবে। অপিচ, সকলে এক নিয়মাবলীর অধীন না হইয়া প্রত্যেকে ভিন্ন২ পথে স্ব২ প্রবৃত্তির অনুসরণ করিলে রাজ্যের শাসন প্রণালীর অত্যাচার নিবারিত হইবে।

কোন দেশে রাজাই সর্ব্বময় কর্ত্তা, কোথাও সম্প্রদায় বিশেষ অপর লোককে বলপূর্ব্বক আপনাদিগের মতের অনুগত করিয়া রাখেন। কোন দেশে

রাজ্যের অধিক সংখ্যক লোক যাহা বলিবেন, অল্প সংখ্যক ব্যক্তিগণের পক্ষে তাহা সহস্র প্রকারে অনভিমত হইলেও তাহার অন্যথা হইবার উপায় নাই। এরূপ রাজক্ষমতাধারী ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জেদ না করিলে তাঁহাদিগের অত্যাচারের ইয়ত্তা থাকে না। কিন্তু সতেজ প্রবৃত্তি না থাকিলে জেদ করা যায় না, আর আপন প্রকৃতিকে পরিপালন না করিলে প্রবৃত্তি সতেজ হয় না। অতএব, স্বং স্পৃহার অনুবর্ত্তী হওয়াই আপন প্রকৃতি পরিপালনের এক মাত্র উপায়। এই রূপ, আপন প্রকৃতি পরিপালন করিবার গুণকে ইন্ডিবিজুয়ালিটি অর্থাৎ স্বস্বভাবানুবর্ত্তিতা কহে।

অনন্তর মিল এই প্রকার স্বস্বভাবানুবর্ত্তিতার একটী দোষ দেখাইয়াছেন। এই গুণ বশতঃ যাঁহারা স্বনামে ধন্য হয়েন, তাঁহারা অন্যের সমকক্ষতা সহ্য করিতে পারেন না। তাবৎ লোকের উপরে শ্রেষ্ঠতা লাভের ইচ্ছা করেন, এবং পারিলে নিকৃষ্ট ব্যক্তি গণকে আপনাদিগের ক্ষমতাধীন করিয়া ফেলেন। এরূপ লোককে কথঞ্চিৎ নিবারণ না করিলে নিকটস্থ সামান্য ব্যক্তিরা আত্মোৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করিতে পারে না; সুতরাং যে গুণের মাহাত্ম্যে এরূপ লোক জগতের রত্ন হইয়া উঠেন, তাহ'তেই সামান্য ব্যক্তিগণ বঞ্চিত হইবার উপক্রম হয়। অতএব স্বস্বভাবানুবর্ত্তিতা সম্বন্ধে এই নিয়ম আবশ্যক যে, আপন বাসনা পুরণের জন্য অন্যের স্পৃহার ব্যাঘাত জন্মাইতে নাই।

মিল কহেন যে, ইহার দ্বারা প্রত্যেকের মনোবৃত্তির উন্নতি সাধন বিষয়ে কিয়ৎ পরিমাণ ক্ষতি হইবেক বটে, কিন্তু তদ্বিনিয়মে দুটী প্রত্যুপকার দৃষ্ট হইতেছে।

এক, স্বস্বভাবানুবর্ত্তী স্বনামেধন্য ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি হইবেক। অপর, যাঁহারা পরের সাধ মিটাইবার জন্য আপনাদিগের স্পৃহা দমন করিবেন, তাঁহাদিগের পরোপকারিতাবৃত্তির চালনা হইবেক।

নিয়মের দাস হওয়া অপেক্ষা স্পৃহা সেবা যে শ্রেষ্ঠ, মিল এসিয়া এবং ইউরোপ খণ্ডের পরস্পর তুলনার দ্বারা তাহার এক প্রমাণ দর্শাইয়াছেন।

তিনি বলেন যে, চীন ও ভারতবর্ষে সকল কার্য্যেরই এক একটী বিশেষ বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে। কেহ তাহা উল্লঙ্ঘন করিলে তাহাকে সমাজভ্রষ্ট হইতে হয়। কিন্তু ইহার ফল এই যে, ঐ দুই রাজ্য এই ক্ষণ নিস্প্রদীপ' হইয়াছে। এখানে যে সমস্ত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে বোধ হয় যে, এক সময়ে সভ্যতার বিলক্ষণ উন্নতি ছিল, অতএব তাহার উদ্ভাবন কালে অবশ্যই অনেক মহাপুরুষও এখানে জন্মিয়া থাকিবেন। কিন্তু এইক্ষণ আর সেরূপ লোক হয় না। সেই মহাত্মারা নিজং ক্ষমতাতে যে সকল কার্য্য বিধান করিয়া গিয়াছেন, তাহাই এক্ষণকার অন্ধদিগের পথপ্রদর্শক হইয়াছে। চীন ভারতের ঋষিরা ইউরোপের মহাপুরুষগণ অপেক্ষা কিছুতেই নিকৃষ্ট ছিলেন না; তবে কেন ইউরোপের এত প্রাধান্য? মিলের বিবেচনায় ইহার এক মাত্র হেতু এই যে;—

ইউরোপের মধ্যে ভিন্নং দেশের

ভিন্নং জাতিই বল, কি এক জাতির ভিন্নং ব্যক্তিই বল, প্রত্যেকেই অন্যের সঙ্গে নানা প্রকারে বিভিন্ন। প্রত্যেকেই নিজ বুদ্ধি বিবেচনার প্রতি নির্ভর করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। কিন্তু চীন ভারতবর্ষে শাস্ত্র ও দেশাচারের এরূপ প্রবলতা যে, তাবৎ লোকে প্রায় সকল বিষয়েই পরস্পরের অনুরূপ। ইউরোপে যে সকল মহৎ লোক জন্ম গ্রহন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বিভিন্ন উপায়ের দ্বারা সমাজের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করাতে অনেক সময়ে পরস্পরের মধ্যে, এবং তাঁহাদিগের শিষ্য পরম্পরার মধ্যে, নানা বিরোধ ও এক দল কর্ত্তৃক অন্যের গতি রোধের চেষ্টা হইয়াছে বটে, কিন্তু ফলে কেহই অতিরিক্ত প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন নাই, বরং সমুদায় লোক বিভিন্নমতাবলম্বীদিগের সমগ্র উপদেশের ক্ষীরগ্রাহী হইয়াছেন। অতএব এই রূপে বিভিন্ন পথে উন্নতি লাভের চেষ্টা করাতেই ইউরোপীয়েরা জগতে অগ্রগণ্য হইয়াছেন।

মিল বলেন যে, মতের ঐক্য বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্তু যেখানে লোকে সকল প্রকার বিভিন্ন মত পরীক্ষা করিয়া একটী অবলম্বন করে, সেই খানেই এক মত ভাল। কারণ, একই বিষয়ে দেশকালপাত্র ভেদে মতের বিভিন্নতা হইতে পারে। অতএব যত কারণে কোন মতের বিভিন্নতা হওয়া সম্ভব, সে গুলি যত দিন বুঝা না যায়, তত দিন অসঙ্গত অযৌক্তিক বলিয়া কোন মতের প্রতি দোষারোপ করা অবিধেয়। তত দিন বিভিন্ন মতসমূহ প্রকটিত হইলে, কেবল সত্যেরই শ্রীবৃদ্ধি হয়, এবং অবস্থানুসারে কত প্রকার কথা ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে, কেবল তাহাই প্রকাশ হয়।

এইক্ষণ মিল আশঙ্কা করিতেছেন যে, ইউরোপেও স্বস্বভাবানুবর্ত্তিতা ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। ইংরাজ ফরাসি জাতির মধ্যে পূর্ব্বে যত বিভিন্ন প্রকৃতির লোক দেখা যাইত, এইক্ষণে আর সে রূপ দৃষ্ট হয় না, বরং অনেক বিষয়ে অনেকের মধ্যে সাদৃশ্যই দেখা যায়; ইহার হেতু এই যে, ইদানীন্তন, লোকের অবস্থা বিষয়ে অনেক সমতা হইয়াছে। এইক্ষন বড়ং সহরে শ্রেণী বিশেষের বাসস্থান পৃথক রূপে নির্দ্দিষ্ট নাই। মুদ্রাযন্ত্রের প্রসাদে সকলে একই পুস্তক সংবাদপত্রাদি পাঠ করেন—সুতরাং সমাজশাস্ত্র, রাজনীতি ও ধর্ম্মশাস্ত্র আদি বিষয়ের আলোচনা সকলের মনে একই প্রকারের হইতেছে। রেলরোড ষ্টীমার আদির দ্বারা সকলে অনায়াসে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেছে—সুতরাং দেশ ভ্রমণ জন্য পূর্ব্বে লোকের জ্ঞান বুদ্ধির যে ইতর বিশেষ হইত, এই ক্ষন তাহাও ক্রমশ বিলুপ্ত হইতেছে। বাণিজ্য ও কারখানার শ্রীবৃদ্ধিতে ছোট বড় তাবৎ লোক নির্বিশেষে একই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া তুল্য রূপ ফলভোগী হইতেছে। এতৎ প্রসঙ্গে মিল আর একটী কারণকে অতি প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই ক্ষণ উল্লিখিত দুই দেশে জনসাধারণের অভিপ্রায় সর্ব্বোচ্চ-শ্রেষ্ঠ-পদ পাইয়াছে। গোপনে যে যাহা বলুক, যখন কোন বিষয়ে অনেক লোক প্রকাশ্যভাবে একটী অভি-

প্রায় ব্যক্ত করে, তখন তাহার অন্যথা করা কাহারও সাধ্য নাই। এই দুর্গতি নিবারণের কোন উপায়ও হয় না,কারণ এমন কোন সম্প্রদায় নাই যে, কেবল এই অত্যাচার নিবারণ জন্য সর্ব্বপ্রকার বিরুদ্ধমতাবলম্বীদিগকে আশ্রয় দান করে।

প্রাগুক্ত দেশদ্বয়ে যেমত-কার্য্য বিষয়ে, ঐরূপ মতামতের বিষয়েও লোকের বিভিন্নতা হ্রাস দেখিতে পাওয়া যায়। যখন রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টান্ট মত লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়,তৎকালে তাবৎ লোকেই তর্কপ্রিয় এবং বিবেচক হইয়া উঠিয়াছিল। এইক্ষণ ধর্ম্মশাস্ত্রবিষয়ে আর সে রূপ মতভেদ নাই, ইহাতে সাধারণ লোকে কেবল মতটী জানিয়া ক্ষান্ত হয়, তাহার স্বপক্ষ বিপক্ষের কথার প্রতি অনুধাবন করেনা, এবং কেহ তর্ক করিতে উদ্যত হইলে ইহারা আপন মতের যথাযোগ্য পোষকতা করিতে ও পারে না।

ফলতঃ সভ্যতার উন্নতি সহকারে উল্লিখিত ঐক্য অবশ্যই পরিবর্দ্ধিত হইবেক। মিল তাহা অস্বীকার করেন না; তিনি কেবল এই মাত্র কহেন যে, ঐক্যের বহুবিধ মঙ্গলের সহিত এই দোষ অনিবার্য্য এবং মতভেদের সহস্র দোষের সহিত এই মঙ্গলটী স্বীকার করা উচিত যে ঐক্যের হ্রাস বৃদ্ধিতে স্বস্বভাবানুবর্ত্তিতাগুণের ইতর বিশেষ হয়,এবং তত্তৎ কারণে আমাদিগের ভবিষ্যৎ উন্নতির পক্ষেও ব্যাঘাত অথবা তদ্বিপরীত ফল হয়। সভ্যতাজনিত এই অমঙ্গলের প্রতিকারার্থ মিল পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থার প্রস্তাব করিয়াছেন যে, পরের ক্ষতি ভিন্ন অন্য কোন কারণে, কোন উপায়ের দ্বারা কাহারও স্বেচ্ছাচার প্রতিরোধ করা অনুচিত। ইহা দুই অংশে বিভক্ত। যথা;—

১। লোকের মতামত সম্বন্ধে কোন প্রকার নিয়ম করাই দূষণীয়। সকলে স্ব২ জ্ঞান ও বিবেচনানুসারে যে মত ইচ্ছা তাহাই অবলম্বন করিবে, তাহাতে প্রচলিত মতের বিরোধীদিগের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করা অন্যায়।

২। লোকে স্ব২ মতানুসারে কার্য্য করিলে যে পর্য্যন্ত অন্যের ক্ষতি না হয়, তদবধি কোন প্রকারে তাহাদিগের কার্য্য রোধ করা কর্ত্তব্য নহে।

উত্তরচরিত।

চতুর্থ সংখ্যা।

সেই গোদাবরীশীকরশীতল পঞ্চবটীর বনে, রাম, বাসন্তীর আহ্বানে উপবেশন করিলেন। দূরে, গিরিগহ্বরগত গোদাবরীর বারিরাশির গদ্গদ নিনাদ শুনা যাইতেছে। সম্মুখে পরস্পর প্রতিঘাতসঙ্কুল উত্তালতরঙ্গ সরিৎসঙ্গম দেখা যাইতেছে। দক্ষিণে শ্যামচ্ছবি অনন্তকাননশ্রেণী চলিয়া গিয়াছে। চারি দিকে সীতার পূর্ব্বসহবাসচিহ্ন সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। তথায়, একটি কদলীবনমধ্যবর্ত্তী শীলাতলে, পূর্ব্বপ্রবাসকালে, রাম সীতার সঙ্গে শয়ন করিতেন; সেই খানে বসিয়া সীতা হরিণশিশুগণকে তৃণ খাওয়াইতেন; এখনও হরিণেরা সেই প্রেমে সেই খানে ফিরিয়া বেড়াইতেছে। বাসন্তী সেই খানে রামকে বসিতে বলিলেন। রাম সেখানে না বসিয়া, অন্যত্র উপবেশন করিলেন। সীতা, পূর্ব্বে পঞ্চবটী বাসকালে একটি ময়ূরশিশু প্রতিপালন করিয়াছিলেন। একটি কদম্বরক্ষ সীতা স্বহস্তে রোপণ করিয়া, স্বয়ং বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। রাম দেখিলেন, যে সেই কদম্ব রক্ষে দুই একটি নবকুসুমোদ্গম হইয়াছে। তদুপরি আরোহণ করিয়া সীতাপালিত সেই ময়ূরটি নৃত্যান্তে ময়ূরী সঙ্গে রব করিতেছিল। বাসন্তী রামকে সেই ময়ূরটি দেখাইলেন। দেখিয়া রামের মনে পড়িল, সীতা তাহাকে করতালী দিয়া নাচাইতেন, নাচাইবার সময়ে তালের সহিত সীতার চক্ষুও পল্লবমধ্যে ঘুরিত। এই রূপে বাসন্তী রামকে পূর্ব্বস্মৃতিপীড়িত করিয়া, সখীনির্ব্বাসনজনিত রাগেই এই রূপ পীড়িত করিয়া, প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! কুমার লক্ষ্মণ ভাল আছেন ত?" কিন্তু সে কথা রামের কানে গেল না—তিনি সীতাকরকমলবিকীর্ণ জলে পরিবর্দ্ধিত রক্ষ, সীতাকরকমলবিকীর্ণ নীবারে পুষ্ট পক্ষী, সীতাকরকমলবিকীর্ণ তৃণে প্রতিপালিত হরিণগণকেই দেখিতেছিলেন। বাসন্তী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! কুমার লক্ষ্মণ কেমন আছেন?" এবার রাম কথা শুনিতে পাইলেন, কিন্তু ভাবিলেন, বাসন্তী "মহারাজ!" বলিয়া সম্বোধন করিলেন কেন? এ ত নিষ্প্রণয় সম্বোধন। আর কেবল কুমার লক্ষ্মণের কথাই জিজ্ঞাসিলেন, তবে বাসন্তী সীতাবিসর্জ্জনরত্তান্ত জানেন। রাম প্রকাশ্যে কেবল বলিলেন, "কুমারের কুশল," এই বলিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। বাসন্তী তখন মুক্তকণ্ঠা হইয়া কহিলেন, "দেব! এত কঠিন হইলে কি প্রকারে?

ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং
ত্বং কৌমুদী নয়নযোরমৃতং ত্বমঙ্গে।

তুমি আমার জীবন, তুমি আমার দ্বিতীয় হৃদয়, তুমি নয়নের কৌমুদী, অঙ্গে তুমি আমার অমৃত,—এইরূপ শতং প্রিয় সম্বোধনে যাহাকে ভুলাইতে তাহাকে—" বলিতেং সীতাস্মৃতিমুগ্ধা

বাসন্তী আর বলিতে পারিলেন না। অচেতন হইলেন। রাম তাঁহাকে আশ্বস্তা করিলেন। চেতনা পাইয়া বাসন্তী কহিলেন, "আপনি কেমন করিয়া একাজ করিলেন?"

রাম। লোকে বুঝে না বলিয়া।

বাসন্তী। কেন বুঝে না?

রাম। তাহারাই জানে।

তখন বাসন্তী আর সহিতে পারিলেন না। বলিলেন, "নিষ্ঠুর! দেখিতেছি, কেবল যশঃ তোমার অত্যন্ত প্রিয়!"

এই কথোপকথনের প্রশংসা করা বৃথা। সীতাবিসর্জ্জন জন্য বাসন্তী রাম-প্রতি ক্রোধযুক্তা হইয়াছিলেন, তিনি মানসিক যন্ত্রণাস্বরূপ সেই অপরাধের দণ্ড প্রণীত করিলেন; সহজেই রামের শোকসাগর উছলিয়া উঠিল। রামের যে একমাত্র শোকোপশমের উপায় ছিল—আত্মপ্রসাদ,—তাহাও বিনষ্ট করিলেন। রাম জানিতেন যে তিনি প্রজারঞ্জনরূপ কুলধর্ম্মের রক্ষার্থই সীতাবিসর্জ্জনরূপ মর্ম্মচ্ছেদী কার্য্য করিয়াছেন।—মর্ম্মচ্ছেদ হউক, ধর্ম্ম রক্ষা হইয়াছে। বাসন্তী দেখাইলেন যে সে ধর্ম্মরক্ষা কেবল স্বার্থপরতার পৃথক একটি নামমাত্র। সে কুলধর্ম্ম রক্ষার বাসনা কেবল রূপান্তরিত যশোলিপ্সা মাত্র। কেবল যশোলাভের স্বার্থপর বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া রাম এই কাজ করিয়াছেন। বাসন্তী আরও দেখাইলেন যে, যে যশের আকাঙ্ক্ষায় তিনি এই নিষ্ঠুর কার্য্য করিয়াছিলেন, সে আকাঙ্ক্ষাও ফলবতী হয় নাই। তিনি এক প্রকার যশের লাভ লালসায় পত্নীবধরূপ গুরুতর অপযশের ভাগী হইয়াছেন। বনমধ্যে সীতার কি হইল, তাহার স্থিরতা কি? ইহার অপেক্ষা গুরুতর অপযশ আর কি হইতে পারে?

তখন রামের শোকপ্রবাহ আবার অসম্বরণীয় বেগে ছুটিল। সীতার সেই জ্যোৎস্নাময়ী মৃদুমুগ্ধমৃণালকল্প দেহলতিকা কোন হিংস্র পশু কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এই ভাবিয়া রাম "সীতে! সীতে!" বলিয়া সেই অরণ্যমধ্যে রোদন করিতে লাগিলেন। কখন বা, যে কলঙ্ককুৎসাকারক পৌরজনের কথায় সীতা বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহাদিগের উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন, "আমি অনেক সহ্য করিয়াছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।" বাসন্তী, ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে বলিলেন। রাম বলিলেন, "সখি, আবার ধৈর্য্যের কথা কি বল? আজি দ্বাদশ বৎসর সীতাশূন্য জগৎ—সীতা নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে—তথাপি আমি বাঁচিয়া আছি—আবার ধৈর্য্য কাহাকে বলে?" রামের অত্যন্ত যন্ত্রণা দেখিয়া বাসন্তী তাঁহাকে জনস্থানের অন্যান্য প্রদেশ দেখিতে অনুরোধ করিলেন। রাম উঠিয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাসন্তীর মনে সখীবিসর্জ্জন দুঃখ জ্বলিতেছিল—কিছুতেই ভুলিলেন না। বাসন্তী দেখাইলেন;—

অস্মিন্নেব লতাগৃহে ত্বমভবস্তন্মার্গদত্তেক্ষণঃ
সা হংসৈঃ কৃতকৌতুকা চিরমভূদ্গোদাবরী সৈকতে।
আয়ান্ত্যা পরিদুর্ম্মনায়িতমিব ত্বাং বীক্ষ্যবদ্ধ স্তয়া
কাতর্য্যাদরবিন্দকুট্মলনিভোমুগ্ধঃপ্রণামাঞ্জলিঃ।(১)

(১) সীতা গোদাবরী সৈকতে হংস লইয়া কৌতুক করিতে করিতে বিলম্ব করিতেন; তখন তুমি এই লতাগৃহে থাকিয়া তাঁহার পথ চাহিয়া রহিতে। সীতা

আর রাম সহ্য করিতে পারিলেন না। ভ্রান্তি জন্মিতে লাগিল। তখন উচ্চৈঃস্বরে রাম ডাকিতে লাগিলেন, "চণ্ডি জানকি, এই যে চারি দিকে তোমাকে দেখিতেছি —কেন দয়া কর না? আমার বুক ফাটিতেছে; দেহবন্ধ ছিঁড়িতেছে; জগৎ শূন্য দেখিতেছি; নিরন্তর অন্তর জ্বলিতেছে; আমার বিকল অন্তরাত্মা অবসন্ন হইয়া অন্ধকারে ডুবিতেছে; মোহ আমাকে চারিদিগ হইতে আচ্ছন্ন করিতেছে; আমি মন্দভাগ্য—এখন কি করিব?" বলিতে২ রাম মূর্চ্ছিত হইলেন।

ছায়ারূপিণী সীতা তমসার সঙ্গে আদ্যোপান্ত নিকটে ছিলেন। বাসন্তী রামকে পীড়িত করিতেছেন দেখিয়া, সীতা পুনঃ২ তাঁহাকে তিরস্কার করিতেছিলেন—কতবার রামের রোদন শুনিয়া আপনি মর্ম্মপীড়িতা হইতেছিলেন, আবার সীতা রামচন্দ্রের দুঃখের কারণ হইলেন বলিয়া, কত কাতরোক্তি করিতেছিলেন। আবার রামকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া সীতা কাঁদিয়া উঠিলেন, "আর্য্যপুত্র! তুমি যে সকল জীবলোকের মঙ্গলাধার! তুমি এ মন্দভাগিনীকে মনে করিয়া বার২ সংশয়িতজীবন হইতেছ? আমি যে মলেম!" এই বলিয়া সীতাও মূর্চ্ছিতাপ্রায়! তমসা এবং বাসন্তী তাঁহাকে উঠাইলেন—"রামকে বাঁচাও" বলিয়া উঠাইলেন। সীতা সসম্ভ্রমে রামের ললাটস্পর্শ করিলেন। কি স্পর্শসুখ! রাম যদি মৃৎপিণ্ড হইয়া থাকিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার চেতনা হইত। আনন্দনিমীলিতলোচনে স্পর্শসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন, তাঁহার শরীরধাতু অন্তরে বাহিরে অমৃতময় প্রলেপ যেন লিপ্ত হইল—জ্ঞান লাভ করিলেও আনন্দেতে আর এক প্রকার মোহ তাঁহাকে অভিভূত করিল। রাম বাসন্তীকে বলিলেন, "সখি বাসন্তি! আমাদের কপাল ভাল!"

বাসন্তী। কিসে?

রাম। আর কি সখি! সীতাকে পাইয়াছি।

বাসন্তী। কৈ তিনি?

রাম। আমি স্পর্শসুখেই জানিয়াছি। দেখ দেখি, তিনি সম্মুখে কি না?

বাসন্তী। এমনতর মর্ম্মচ্ছেদ দারুণ প্রলাপে কি ফল? আমি একে প্রিয় সখীর দুঃখে জ্বলিতেছি, আবার এ হতভাগিনীকে কেন জ্বালাইলেন?

রাম বলিলেন, "সখি, প্রলাপ কই? বিবাহকালে যে হাত আমি কঙ্কণসহিত ধরিয়াছিলাম—আর যে হাতের অমৃতশীতল স্বেচ্ছালব্ধ সুখস্পর্শে চিনিতে পারিতেছি, এ ত সেই হাত! সেই বর্ষাকরকতুল্য শীতল ললিতলবঙ্গকন্দলীনিভ হস্তই আমি পাইয়াছি!

এই বলিয়া রাম তাঁহার ললাটস্থ সীতার অদৃশ্যহস্ত গ্রহণ করিলেন। সীতা ইতিপূর্ব্বেই রামের আনন্দমোহ দেখিয়া অপসৃত হইবেন বিবেচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই চিরসম্ভাবসৌম্য শীতল স্বামিস্পর্শে তিনিও মুগ্ধা হইলেন। অতি যত্নে সেই রামললাটস্থিতহস্তকে ধরিয়া রাখিলেও সে হস্ত কাঁ

আসিয়া তোমাকে বিশেষ দুর্ম্মনায়মান দেখিয়া, তোমাকে প্রণাম করিবার জন্য পদ্মকলিকা তুল্য অঙ্গুলির দ্বারা কি সুন্দর অঞ্জলিবদ্ধ করিতেন!

পিতে লাগিল, ঘামিতে লাগিল, এবং জড়বৎ হইয়া অবশ হইয়া আসিতে লাগিল! যখন রাম, সীতার হস্তের চিরপরিচিত অমৃতশীতল সুখস্পর্শের কথা বলিলেন, সীতা মনে২ বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, আজিও তুমি সেই আর্য্যপুত্রই আছ!" শেষে যখন রাম সীতার করগ্রহণ করিলেন, তখন সীতা দেখিলেন, স্পর্শমোহে প্রমাদ ঘটিল। কিন্তু রাম সে হাত ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না; আনন্দে তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল অবশ হইয়া আসিয়াছিল, তিনি বাসন্তীকে বলিলেন, "সখি, তুমি এক বার ধর।" সীতা সেই অবকাশে হাত ছাড়াইয়া লইলেন। লইয়া, স্পর্শসুখজনিত স্বেদরোমাঞ্চকম্পিতকলেবরা হইয়া পবনকম্পিত নবজলকণাসিক্ত স্ফুটকোরক কদম্বের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। মনে করিলেন, "কি লজ্জা, তমসা দেখিয়া কি মনে করিতেছেন। ভাবিতেছেন, এই ইহাঁকে ত্যাগ করিয়াছেন, আবার ইহাঁর প্রতি এই অনুরাগ।"

রাম ক্রমে জানিতে পারিলেন, যে কই, কোথা সীতা—সীতা ত নাই। তখন রামের শোকপ্রবাহ দ্বিগুণ ছুটিল। রোদন করিয়া, ক্রমে শান্ত হইয়া বাসন্তীকে বলিলেন, "আর কত ক্ষণ তোমাকে কাঁদাইব? আমি এখন যাই।" শুনিয়া সীতা উদ্বেগের সহিত তমসাকে অবলম্বন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভগবতি তমসে! আর্য্যপুত্র কেন চলিলেন?" তমসা বলিলেন, "চল, আমরাও যাই।" সীতা বলিলেন, "ভগবতি প্রসীদ! আমি ক্ষণকাল এই দুর্লভ জনকে দেখিয়া লই।" কিন্তু বলিতে২ এক বজ্রতুল্য কঠিন কথা সীতার কানে গেল। রাম বাসন্তীর নিকটে বলিতেছেন, "অশ্বমেধের জন্য আমার এক সহধর্ম্মিণী আছে—" সহধর্ম্মিণী! সীতা কম্পিতকলেবরা হইয়া মনে২ বলিলেন, "আর্য্যপুত্র! কে সে?" এই অবসরে রামও কথা সমাপ্ত করিলেন, "সে সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি।" শুনিয়া সীতার চক্ষের জল পড়িতে লাগিল; "বলিলেন, আর্য্যপুত্র! এখন তুমি তুমি হইলে। এত দিনে আমার পরিত্যাগ লজ্জাশল্য বিমোচন করিলে!" রাম বলিতেছেন, "তাহারই দ্বারা আমার বাষ্পদিগ্ধচক্ষুর বিনোদন করি।" শুনিয়া সীতা বলিলেন, "তুমি যার এত আদর কর, সেই ধন্য। তোমার যে বিনোদন করে, সেই ধন্য। সে জীবলোকের আশানিবন্ধন হইয়াছে।"

রাম চলিলেন। দেখিয়া সীতা করযোড়ে, "ণমো ণমো অপুব্বপুণ্ণজণিদদংসণাণং অজ্জউত্তচরণকমলাণং" এই বলিয়া প্রণাম করিতে মুর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। তমসা তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন। সীতা বলিলেন, "আমার এ মেঘান্তরে ক্ষণকালজন্য পূর্ণিমাচন্দ্র দেখা মাত্র!"

তৃতীয়াঙ্কের সার মর্ম্ম এই। এই অঙ্কের অনেক দোষ আছে। ইহা নাটকের পক্ষে নিতান্ত অনাবশ্যক। নাটকের যাহা কার্য্য, বিসর্জ্জনান্তে রাম সীতার পুনর্ম্মিলন, তাহার সঙ্গে ইহার কোন সংশ্রব নাই। এই অঙ্ক পরিত্যক্ত হইলে নাটকের কার্য্যের কোন

হানি হয় না। সচরাচর এরূপ একটি সুদীর্ঘ নাটকাঙ্ক নাটক মধ্যে সন্নিবেশিত হওয়া, বিশেষ রসভঙ্গের কারণ হয়। যাহা কিছু নাটকে প্রতিকৃত হইবে, তাহা উপসংহৃতির উদ্যোজক হওয়া উচিত। এই অঙ্ক কোন অংশে তদ্রূপ নহে। বিশেষ, ইহাতে রামবিলাপের দৈর্ঘ্য এবং পৌনঃপুন্য অসহ্য। তাহাতে রচনা-কৌশলের বিপর্য্যয় হইয়াছে। কিন্তু অনেকেই মুক্তকণ্ঠে বলিবেন, যে অন্য অনেক নাটক একবারে বিলুপ্ত হয়, বরং তাহাও স্বীকর্ত্তব্য, তথাপি উত্তরচরিতের এই তৃতীয়াঙ্ক ত্যাগ করা যাইতে পারে না। নাটকাংশে ইহা যতই দূষ্য হউক না কেন, কাব্যাংশে ইহার তুল্য রচনা অতি দুর্ল্লভ।

উত্তরচরিত সমালোচন ক্রমে এত দীর্ঘায়ত হইয়া উঠিয়াছে, যে আর ইহাতে অধিক স্থান নিয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। অতএব অবশিষ্ট কয় অঙ্কের সমালোচনা অতি সংক্ষেপে করিব।

এ দিকে বাল্মীকি প্রচার করিলেন যে তিনি এক অভিনব নাটক রচনা করিয়াছেন। তদভিনয় দর্শন জন্য সকল লোককে নিমন্ত্রিত করিলেন। তদ্দর্শনার্থ বশিষ্ঠ, অরুন্ধতী, কৌশল্যা, জনক, প্রভৃতি বাল্মীকির আশ্রমে আসিয়া সমবেত হইলেন। তথায় লবের সুন্দর কান্তি এবং রামের সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া কৌশল্যা অত্যন্ত ঔৎসুক্যপরবশ হইয়া, তাঁহার সহিত আলাপ করিলেন। দুহিতৃবিয়োগে জনকের শোকক্লিষ্টদশা, কৌশল্যার সহিত তাঁহার আলাপ; লবের সহিত কৌশল্যার আলাপ, ইত্যাদি অতি মনোহর, কিন্তু সে সকল উদ্ধৃত করিবার আর অবকাশ নাই।

চন্দ্রকেতু, অশ্বমেধের অশ্বরক্ষক সৈন্য লইয়া বাল্মীকির আশ্রম সন্নিধানে উপনীত হইলেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে সৈন্যদিগের সহিত লবের বচসা হওয়ায় লব অশ্ব হরণ করিলেন, এবং যুদ্ধে চন্দ্রকেতুর সৈন্যদিগকে পরাস্ত করিলেন। চন্দ্রকেতু আসিয়া তাঁহাদিগের রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। চন্দ্রকেতু এবং লব পরস্পরের প্রতি বিপক্ষতাচরণ কালে এত দূর উভয়ে উভয়ের প্রতি সৌজন্য এবং সদ্ব্যবহার করিলেন যে ইহা, নাটকের এতদংশ পড়িয়া বোধ হয় যে, সভ্যতার চূড়াপদবাচ্য কোন ইউরোপীয় জাতি কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে। ভবভূতির সময়ে ভারতবর্ষীয়েরা সামাজিক ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, ইহা তাহার এক প্রমাণ।

আকাশে যেরূপ নক্ষত্র ছড়ান, ভবভূতির রচনা মধ্যে সেইরূপ কবিত্ব-রত্ন ছড়ান আছে। চতুর্থ এবং পঞ্চম অঙ্ক হইতে এই সকল রত্ন আহরণ করিতে পারিলাম না, তথাপি পঞ্চম হইতে দুই একটি উদাহরণ না দিয়া থাকিতে পারা যায় না। লব চন্দ্রকেতুর সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, এমন সময়ে চন্দ্রকেতু তাঁহাকে যুদ্ধে আহ্বান করাতে তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া চন্দ্রকেতুর দিকে ধাবমান হইলেন, "স্তনযিত্নুরবাদিভাবলীনামবমর্দ্দাদিব দৃপ্তসিংহশাবঃ।" (১) তিনি চন্দ্রকেতুর দিগে আসিতেছেন,

(১) যেমন মেঘের শব্দ শুনিয়া, সুপ্ত সিংহশিশুও হস্তি বিনাশ হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই রূপ।

পরাজিত সৈন্যগণ তখন তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে;—

দর্পেণ কৌতুকবতা ময়ি বদ্ধ লক্ষ্যঃ
পশ্চাদ্বলৈরনুসৃতোঽযমুদীর্ণ ধন্বা।
দ্বেধা সমুদ্ধতমরুত্তরলস্য ধত্তে
মেঘস্য মাঘবতচাপধরস্য লক্ষ্মীম্॥ (১)

নিঃসহায় পাদচারী বালকের প্রতি বহুসেনা ধাবমান দেখিয়া চন্দ্রকেতু তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। দেখিয়া লব ভাবিলেন, "কথমনুকম্পতে মাম্?" ভারতবর্ষীয় কোন গ্রন্থে এরূপ বাক্য প্রযুক্ত আছে, একথা অনেক ইউরোপীয়ে সহজে বিশ্বাস করিবেন না।

লব কর্ত্তৃক জৃম্ভকাস্ত্র প্রয়োগ বর্ণনা অস্বাভাবিক, অতিপ্রাকৃত, এবং অস্পষ্ট হইলেও, আমরা তাহা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না;—

পাতালোদরকুঞ্জপুঞ্জিততমঃশ্যামৈর্নভোজৃম্ভকৈ-
রুত্তপ্তস্ফুরদারকূটকপিলজ্যোতির্জ্বলদ্দীপ্তিভিঃ
কল্পাক্ষেপকঠোরভৈরবমরুদ্ব্যস্তৈরবস্তীর্য্যতে
মীলম্মেঘতড়িৎকড়ারকুহরৈর্বিন্ধ্যাদ্রিরকূটৈ-
রিব।(২)

লবের সহিত রামের রূপসাদৃশ্য দেখিয়া, সুমন্ত্রের মনে এক বার আশা জন্মিয়াই, সীতা নাই, এই কথা মনে পড়াতে সে আশা তখনই নিবারিত হইল। ভাবিলেন, "লতায়াং পূর্ব্বলূনায়াং প্রসুনস্যাগমঃ কুতঃ!" বৃদ্ধ সুমন্ত্রের মুখে এই বাক্য শুনিয়া, সহৃদয় পাঠকের রোমিও সম্বন্ধে বৃদ্ধ মন্টাগুর মুখে কীটদংশিত কুসুমকোরকের উপমা মনে পড়িবে।

ষষ্ঠাঙ্কের বিষ্কম্ভকটি বিশেষ মনোহর। বিদ্যাধরমিথুন, গগন মার্গে থাকিয়া লবচন্দ্রকেতুর যুদ্ধ দেখিতেছিলেন। যুদ্ধ তাঁহাদিগের কথোপকথনে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন যে ভবভূতির কাব্যের "মধ্যে২ সংস্কৃতে এবং প্রাকৃতে এমত দীর্ঘ সমাস ঘটিত রচনা আছে, যে তাহাতে অর্থ বোধ ও রসগ্রহ সম্বন্ধে ব্যাঘাত ঘটিয়া উঠে।" ভবভূতির অসাধারণ দোষ নির্ব্বাচনকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় এই কথা বলিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বে যাহা উত্তরচরিত হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি, তন্মধ্যে এই রূপ দীর্ঘ সমাসের অনেক উদাহরণ পাওয়া যাইবে। এই বিষ্কম্ভক মধ্যে ঐ রূপ দীর্ঘ সমাসের বিশেষ আধিক্য। আমরা কয়েকটি উদ্ধৃত করিতেছি, যথা পুষ্পবৃষ্টিঃ;—

"অবিরলললিতবিকচকনককমল কমনীয় সন্ততিঃঅমরতরুতরুণমণিমুকুলনিকরমকরন্দসুন্দরঃ পুষ্প নিপাতঃ

পুনশ্চ, বাণসৃষ্ট অগ্নি;—

"উচ্চণ্ডবজ্রখণ্ডাবস্ফোটপটুতরস্ফুলিঙ্গবিকৃতিঃ উত্তালতুমুললেলিহানজ্বালা সম্ভারভৈরবো ভগবান্ উষর্ব্বুধঃ"

পুনশ্চ, বারুণাস্ত্র সৃষ্ট মেঘ;—

"অবিরলবিলোলধুম্মস্তবিজ্জুল্লদাবিলা-

(১) সকৌতুক দর্পে আমার প্রতি বদ্ধলক্ষ্য হইয়া ধনু উত্থিত করিয়া, সৈন্যের দ্বারা পশ্চাতে অনুসৃত হইয়া, ইনি, দুই দিগ হইতে বায়ু সঞ্চালিত এবং ইন্দ্রধনু শোভিত মেঘের মত দেখাইতেছেন।

(২) পাতালাভ্যন্তরবর্ত্তী কুঞ্জমধ্যে রাশীকৃত অন্ধকারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ এবং উত্তপ্ত প্রদীপ্ত পিত্তলের পিঙ্গলবৎ জ্যোতিঃবিশিষ্ট জৃম্ভকাস্ত্রগুলির দ্বারা আকাশমণ্ডল ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়কালীন দুর্নিবার ভৈরব বায়ুর দ্বারা বিক্ষিপ্ত এবং মেঘমিলিত বিদ্যুৎ কর্ত্তৃক পিঙ্গল বর্ণ এবং গুহাযুক্ত বিন্ধ্যাদ্রিশিখর ব্যাপ্তবৎ দেখাইতেছে।

সমণ্ডিদেহিং মত্তমোরকণ্ঠসামলেহিং জলহরেহিং।"

এবং তৎকালে সৃষ্টির অবস্থা;—

"প্রবলবাতাবলিক্ষোভগম্ভীরগুণগুণায়মানমেঘমেদুরান্ধকারনীরন্ধ্রনিবদ্ধম্ একবারবিশ্বগ্রসনবিকচবিকরাল কালকণ্ঠকণ্ঠকন্দরবিবর্ত্তমানমিব যুগান্তযোগনিদ্রানিরুদ্ধসর্ব্বদ্বারনারায়ণোদরনিবিষ্টমিব ভূতজাতং প্রবেপতে।"

ঈদৃশ দীর্ঘ সমাস যে রচনার দোষমধ্যে গণ্য, তাহা আমরা স্বীকার করি। যাহা কিছুতে অর্থ বোধের বিঘ্ন হয়, তাহাই দোষ। ঈদৃশ সমাসে অর্থ বোধের হানি, সুতরাং ইহা দোষ। নাটকে ইহা যে বিশেষ দোষ, তাহাও স্বীকার করি, কেননা ইহাতে নাটকের অভিনয়োপযোগিতার হানি হয়। এ সকল কথা স্বীকার করিয়াও আমরা বরং উত্তরচরিতের অনেক সরলাংশ পরিত্যাগ করিতে পারি, তথাপি এই সমাস গুলিন ত্যাগ করিতে পারি না। কেন পারি না? যিনি এ কথার উত্তর জনিতে চাহেন, তিনি এই সমাস গুলিন ত্যাগ করিয়া সরল পদে তন্নিবিষ্ট ভাব ব্যক্ত করিতে যত্ন করুন। দেখুন, কয় পৃষ্ঠা লাগে। দেখুন, তাহাতে রসের হানি হয় কি না। (১) যদি হয়, তবে ভবভূতির দীর্ঘ সমাস নিন্দনীয় নহে। ভবভূতির এই কয় সমাসের মধ্যে যে কবিত্ব শক্তি আছে, রত্নাবলী নাটকের একটি সমগ্র অঙ্কমধ্যে তাহা আছে কি না, সন্দেহ।

(১) সেই আশঙ্কায় আমরা এই কয়েকটি পদের অনুবাদে প্রবৃত্ত হই নাই, বা অন্যের কৃত অনুবাদ গ্রহণ করি নাই।

স্বস্বভাবানুবর্ত্তিতা।

দ্বিতীয় সংখ্যা।

কোন মত অবলম্বন করিয়া তাহা গোপন করিলে কপটাচরণ করা হয়। যে ব্যক্তি আপনার মতকে অন্যের বিবেচনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করে, স্বভাবতঃ তাহার এই ইচ্ছা হয় যে, সকলেই তাহার অনুগামী হউক। সুতরাং মতগ্রহণ বা মত উদ্ভাবন বিষয়ে স্বাধীনতা দিতে গেলে তাহার প্রকটন পক্ষেও তদ্রূপ করিতে হয়। অতএব যদি প্রকটনের সঙ্গে সঙ্গে পরের ক্ষতিজনক কোন কার্য্য না হয়, তবে কেহ প্রচলিতমতের বিরুদ্ধ কোন কথা প্রকাশ করিলে তাহাকে নিবারণ করা অবৈধ হইতেছে।

প্রচলিতমতের বিরুদ্ধ কথা তিন শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে। (১) ন্যায় সঙ্গত। (২) সর্ব্বতোভাবে ন্যায় বিরুদ্ধ এবং (৩) ন্যায় অন্যায় উভয়মিশ্রিত অর্থাৎ বিরুদ্ধ মতের কতক সত্য এবং কতক অমূলক হইতে পারে।

১। যখন বিরুদ্ধমত ন্যায্য হয়।—নূতনমত ন্যায্য হইলে তাহা নিবারণ

করা যে ক্ষতি জনক, এ কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। ফলত প্রচলিত মতের বিরুদ্ধ কথা যুক্তি সিদ্ধ হওয়া অসম্ভাবিত নহে। যত দিন মনুষ্য দেবতুল্য না হয়েন, তত দিন কেহই এমন স্পর্দ্ধা করিতে পারেন না যে, আমার ভুল নাই এবং আমার ভ্রান্তি প্রদর্শন করিতে কি আমার বিরুদ্ধে নূতন কথা প্রকাশ করিতে কাহারও সাধ্য নাই।

বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রেই আপনাদিগের মতি স্থির করিবার অগ্রে বিবেচ্য বিষয়ে যত প্রকার তর্ক উপস্থিত হইতে পারে, তৎ সমুদায়ের প্রতি অনুধাবন করিয়া থাকেন। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে প্রচলিত মতের বিরুদ্ধ কথার প্রতি যত্ন পূর্ব্বক কর্ণপাত করা অত্যাবশ্যক। কারণ ঐ সকল মত-স্থাপকেরা বর্ত্তমান থাকিলেও ঐ রূপ করিতেন।

এতদ্বিষয়ে মিল জন্‌সনের একটী আপত্তির উল্লেখ ও খণ্ডন করিয়াছেন।

আপত্তি। নূতনমতের উদ্ভাবকদিগকে যতই যন্ত্রণা দেও, তাহাদিগের কথা সত্য হইলে কালসহকারে তাহা অবশ্যই প্রবল হইবেক। কিন্তু ন্যায়বিরুদ্ধ কথা উত্থাপিত হইলে পীড়নের দ্বারা সত্বরই সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করা যায়; অতএব বিরুদ্ধমত নির্যাতনের দ্বারা এক প্রকার মঙ্গল হইয়া থাকে, এ কথা স্বীকার করিতে হইবেক।

খণ্ডন। যদি এ কথাটী সত্য হয়, তবে মনুষ্য সমাজের বড়ই দুরদৃষ্ট। যে ব্যক্তি নূতন মত প্রকাশ করিয়া তাবতের মঙ্গল সাধন করেন তাঁহাকে, কষ্ট দিলেই কি পৃথিবীর মঙ্গল হইবেক? কোথায় এরূপ ব্যক্তি জগন্মান্য হইবেন, না অগ্নি-পরীক্ষার দ্বারা তাঁহার মত সাব্যস্ত করা আবশ্যক! বাস্তবিক তর্কটী সত্য নয়। কোন মতের জন্য যন্ত্রণা সহ্য করা কেবল তৎপ্রতি অনুরাগের লক্ষণ। যে মতের প্রতি সম্যক প্রকারে বিশ্বাস ও মায়া জন্মে,সত্যাই হউক বা মিথ্যাই হউক তাহা সমর্থন জন্য অনেকে প্রাণত্যাগ পর্য্যন্তও স্বীকার করিয়া থাকেন।

ইহার প্রমাণ এতদ্দেশেও পাওয়া যায়। যথা, বৌদ্ধ ও বৈদিক ধর্ম্মের বিরোধ। বৌদ্ধধর্ম্ম এতদ্দেশ হইতে দূরীকৃত হইয়া চীন ব্রহ্মে অধিষ্ঠান করিলেন। আবার মুসলমানদিগের প্রাদুর্ভাবকালীন কত হিন্দু সনাতন ধর্ম্মও ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যদি বৌদ্ধ ধর্ম্ম সত্য হয়, তবে ভারতবর্ষে শাক্যমুনির নাম লোপ হওয়া আশ্চর্য্য ঘটনা। যদি মিথ্যা হয়, তবে চীনে গৌতমের আধিপত্য হওয়াও তদ্রূপ। আবার যদি বৈদিক ধর্ম্ম সত্য হয়, তবে মুসলমান ধর্ম্ম কিরূপে অদ্যাপি সজীব রহিয়াছে? যদি মিথ্যা হয়, তবে বৌদ্ধ মতকে কি প্রকারে পরাস্ত করিল?

এই জন্যই মিল বলেন, সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, বলপূর্ব্বক কোনও মত রহিত করা কর্ত্তব্য নহে।

২। যখন বিরুদ্ধমত অন্যায় হয়।—মনে করা যাউক যে, প্রচলিত মতই সর্ব্বতোভাবে ন্যায্য এবং ঋষি-নির্দ্দিষ্ট অথবা ঈশ্বরাদিষ্ট; আর নূতন মত নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। এরূপ স্থলেও বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিতে নিবারণ করা মিলের বিবেচনায় অকর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ। প্রকাশ করিতে না দিলে

বিরুদ্ধ কথা ভ্রান্ত কি না, তাহা জানা যায় না। যদি বল যে, যে সকল কথা ঈশ্বরাদিষ্ট, তাহার বিরুদ্ধ কথা যে ভ্রান্ত, ইহাতে সন্দেহ কি? অতএব তাহা ব্যক্ত করিতে দেওয়া অনুচিত। কিন্তু কোন্ কথাটী ঈশ্বরাদিষ্ট এবং তুমি ঈশ্বরাদেশের যে অর্থ বুঝিয়াছ, তাহা সত্য কি না, সে বিষয়ে ত মত বিরোধ অবশ্যই হইতে পারে। ঈশ্বরাদেশের মধ্যে ভুল থাকিতে পারে না বটে, কিন্তু তোমার মতের ভুল প্রকাশ হইলে তাহা ঈশ্বরাদিষ্ট নহে, এই কথাই প্রতিপন্ন হইবেক; সুতরাং প্রচলিত মতানুসারে যে কথা গুলি ঈশ্বরাদিষ্ট বলিয়া গণ্য, তাহার বিপরীত কথা সত্য হওয়া অসম্ভব নহে; অতএব যত ক্ষণ প্রচলিত মতের বিরুদ্ধ কথা ন্যায়সঙ্গত হইবার পক্ষে বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা আছে, তত ক্ষণ এতাদৃশ কথা প্রকটনের প্রতি কোনও প্রতিবন্ধক থাকা মঙ্গলদায়ক হইতে পারে না।

মিল লিখিয়াছেন যে, এতদ্বিষয়ে কোন কোন প্রতিপক্ষেরা বলিতে পারেন যেনূতন কথার বিচার করিবার জন্য পণ্ডিত নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য, এবং তাঁহাদিগের বিবেচনায় অভ্রান্ত স্থির হইলে ইহা সাধারণের গোচর করা উচিত; নতুবা এতদ্দ্বারা অনর্থক সামান্য লোকের চিত্তচাঞ্চল্য জন্মিবেক। এ কথাটী মিলের মতে উপস্থিত প্রস্তাব সম্বন্ধে গৌণ কথা। কারণ, ইহা বিরুদ্ধমত প্রকাশের প্রণালী বিষয়ক বিচার হইতেছে, এবং ইহাতে মত প্রকাশের প্রতি আপত্তি না থাকাই বোধগম্য হয়। ফলতঃ ইহাঁর বিবেচনায় এই উপায়ের দ্বারা উভয় দিক রক্ষা করাও দুঃসাধ্য। যদি পণ্ডিত ভিন্ন অন্য লোকের নিকট ব্যক্ত করিতে না দেও, তাহা হইলে নূতনমতাবলম্বী এবং পণ্ডিতগণের মধ্যে বাদানুবাদ ভালরূপে হইবেক না, সকল কথার পরিষ্কার উত্তর প্রত্যুত্তর চলিবেক না। এবং দুর্ব্বলপক্ষ বলবানের নিকট অন্যায় মতে নিরস্ত হইবেন। আবার যদি এই সকল দোষের প্রতিবিধান করা যায়, তাহা হইলে উভয় পক্ষের কথ সর্ব্বসাধারণের নিকট অধিক কাল গুপ্ত থাকিবেক না।

দ্বিতীয়তঃ। ভ্রান্তিমূলক নব্যমত প্রকাশ হইলে কেহ না কেহ অবশ্য তাহার খণ্ডন করিয়া দিবেন, এবং এই প্রকারে যত কথা অসঙ্গত বলিয়া সিদ্ধান্ত হইবেক, ততই প্রচলিত এবং ন্যায়সঙ্গত মত উত্তরোত্তর সর্ব্বসাধারণের মনে দৃঢ়ীভূত হইবেক। নাস্তিকদিগকে সমাজ হইতে দূরীকৃত করিয়া দিলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে লোকের যে প্রকার বিশ্বাস থাকে, তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিলে, সেই বিশ্বাস গাঢ়তর হয়, সন্দেহ নাই। অতএব যখন কোন বিষয়ে দুই জন অধ্যাপক ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা দেন, তখন হীনবল ব্যক্তিকে উপহাস বা অবরুদ্ধ না করিয়া বরং উভয়কে সুপ্রণালীমতে তর্ক করিতে দেওয়াই ভাল; কারণ একটী মত প্রকাশ্যরূপে অপসারিত না হইলে অন্যটীর প্রতি লোকে সম্পূর্ণ প্রত্যয় করিতে পারে না। সুতরাং সত্য মিথ্যা উভয়েই প্রায় তুল্য রূপ ধারণ করে। যেমন কোন নৈয়ায়িক দিগ্বিজয়ী হইতে বাসনা করিলে

প্রতিপক্ষদিগের নিকট তাঁহার গৃহদ্বার সর্ব্বদাই মুক্ত রাখা কর্ত্তব্য, নতুবা তাঁহাকে বিচারে পরাঙ্মুখ বলিয়া সন্দেহ জন্মিতে পারে। সেইরূপ বিরুদ্ধমতের পথ মুক্ত না রাখিলে সত্য কদাচ দিগিজয়ী বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। দিগ্বিজয়ী না হইলে সত্যের মাহাত্ম্য নিঃসংশয় হয় না। অতএব সত্যের জয় হউক, এই উদ্দেশেও ভ্রান্তমতাবলম্বীদিগকে আশ্রয় দান করা অতীব কর্ত্তব্য।

তৃতীয়তঃ। ভ্রান্তচিত্ত বিরুদ্ধমতাবলম্বিদিগকে আশ্রয় দান করা পদ্ধতি থাকিলে চলিত-মত সমর্থন জন্য তাবৎকে সর্ব্বদাই জাগরূক থাকিতে হয়; সর্ব্বদাই আত্মপক্ষের বক্তব্য কথা গুলির আন্দোলন করিতে হয়; নতুবা কুতর্কীরা সত্য মতকেও পরাজিত করে।

আমরা দেখিতেছি যে, এতদ্দেশে খ্রীষ্টানদিগের সমাগম হইলে প্রথমতঃ কেবল হিন্দুধর্ম্মের দোষই প্রকাশ হইয়াছিল। অনেক বিষয়ে লভ্যের আশয়ে তৎসংযুক্ত অপরিত্যজ্য ক্ষতিগুলি অগত্যা বহন করিতে হইয়া থাকে। কিন্তু হিন্দু ও খ্রীষ্টান ধর্ম্মের কোন্ কোন্ স্থলে কি কি গুণের সহিত কি২ দোষ মিশ্রিত আছে, তাহা যত দিন বুঝা না যায়, তত দিন ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে কাহাকেও অন্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করা যায় না। গোঁড়া এবং ছিদ্রান্বেষী উভয়ই মন্দ; কিন্তু দুই না থাকিলে প্রকৃত কথা ব্যক্ত হয় না। অতএব ন্যায়সঙ্গত কথা কালসহকারে হীনবল না হয়, এ জন্যেও কুতর্ক ও কুতর্কীদিগকে আশ্রয় দান করা কর্ত্তব্য।

৩। উল্লিখিত তৃতীয় শ্রেণীস্থ বিরুদ্ধমত সম্পূর্ণরূপে সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে। পৃথিবীতে যত প্রকার কথা উত্থাপিত হইয়া থাকে, তাহার অধিকাংশই এই শ্রেণিভুক্ত। কিছু গুণ না থাকিলে লোকে কখনই নূতন মত অবলম্বন করে না। অতএব সেই কণামাত্র সত্য প্রদর্শনের জন্যও বিরুদ্ধ মতকে আশ্রয় দেওয়া আবশ্যক। বিভিন্ন মতের উভয় পক্ষেই কিছু কিছু ন্যায্য কথা থাকে, নতুবা, সর্ব্বতোভাবে অমূলক হইলে তাহা অল্পকালের মধ্যেই পরিত্যক্ত হয়। কারণ সময়, বুদ্ধির পরম সহকারী; অতি মূর্খ ব্যক্তিও কালবিলম্বে কাল্পনিক কথার হেয়তা বুঝিয়া লয়।

একটী নূতন কথা প্রচার হইলে প্রথমকল্পে নব্য ও প্রাচীনমতাবলম্বিদিগের মধ্যে ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত হয়। কিন্তু তাহা অল্প দিন পরেই শান্তিলাভ করে। তখন উভয় পক্ষই আপনাপন ভ্রম ও প্রতিপক্ষের গুণ দেখিতে পান। মনুষ্য সর্ব্বদাই নিজের ভ্রম সংশোধনের জন্য সচেষ্ট। এই গুণ না থাকিলে আমরা অদ্যাপি আদিম বর্ব্বরাবস্থাতেই থাকিতাম। অতএব প্রচলিত মতের ভ্রম সংশোধন জন্য তাহার বিরোধিদিগকে উৎসাহ দেওয়াই কর্ত্তব্য।

বলিতে সাহস হয় না, কিন্তু বোধ হয়, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবেই বৈদিকদিগের যজ্ঞকালীন-হত্যাকাণ্ড এবং জাতিগর্ব্ব অনেক দূর খর্ব্ব হইয়াছিল। এবং শাক্ত বৈষ্ণবের বিরোধেই বামাচারিদিগের মত প্রায় অদৃশ্য হইয়া উঠিয়াছে।

ফলতঃ মিলের বিবেচনায় বিরুদ্ধমত ভ্রান্তই হউক বা অভ্রান্তই হউক, ইহাকে আশ্রয় দিলে সকলেই তাহা খণ্ডন করিবার চেষ্টা করে। তদর্থে স্ব স্ব বক্তব্য কথা গুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে হয়। এই রূপে তর্কানুশীলনে পটু হইলে সকলেই আপন বুদ্ধির প্রতি নির্ভর করিতে শিখে। কেহ পরের বুদ্ধিতে চলে না, কেহ নিষ্প্রয়োজন নিয়মের দাস হইয়া থাকে না। সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠে। ইহাতে মনোবৃত্তির উন্নতি ও মানব প্রকৃতির বিভিন্নতা সাধন, দুই উদ্দেশ্যই বিলক্ষণরূপে সম্পন্ন হয়।

এই স্থলে বিরুদ্ধমতাবলম্বিদিগের সহিত কি প্রণালীতে বিচার করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে কয়েকটী কথা লেখা আবশ্যক। মুখে২ বিচার করাই এতদ্দেশের পদ্ধতি। অন্যত্র মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে লিখিত-বিচারও বিলক্ষণ প্রচলিত আছে।

মুখে২ বিচারের দোষ এই যে, কোন পক্ষ আপনমত সমর্থন জন্য জেদ্ করিলে উভয় পক্ষের মধ্যে সহসা আন্তরিক বিরোধ এবং কুৎসিত বচসা হইয়া উঠে। আর সকলে তর্কের সময় মনোগত কথা গুলি সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারে না, সুতরাং সত্যেরও পরাজয় হইয়া যায়।

আদালতের উকিলদিগের বাদানুবাদ বাচনিক বিচারের আদর্শস্বরূপ। কিন্তু কত সময়ে এক পক্ষের চাতুর্য্যে অপর পক্ষ অকারণ নিরুত্তর হইয়া যান এবং বিচারপতিও অমূলক কথা গ্রাহ্য করেন। পরন্তু উকিলদিগের মহৎ গুণ এই যে, তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে বচসা কি আন্তরিক বিরোধ উপস্থিত হয় না। আমাদিগের ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের পক্ষে এই গুণটী অতিশয় বাঞ্ছনীয়।

ইহার কৌশল এই যে, প্রতিপক্ষের কোন দোষ প্রদর্শন করিতে হইলে কেবল সেই দোষটীকে বিশ্লিষ্ট করতঃ তদ্বিষয়ক বক্তব্য কথা তৃতীয় ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে হয়। আদালতে বিচারপতি, ইংরাজি প্রণালীর সভাতে সভাপতি এবং লিখিত বিচারে সর্ব্বসাধারণ সেই তৃতীয় ব্যক্তির পদে অভিষিক্ত হয়েন। নতুবা কেবল প্রতিপক্ষকেই সম্বোধন করিয়া বলিলে তিনি এবং বক্তা উভয়েরই মনোমোলিন্য বৃদ্ধি হইতে পারে। ইহার উদাহরণ এতদ্দেশীয় দলাদলির বিচার। এই জন্য এক্ষণকার ভদ্রমণ্ডলী দলাদলির বিচারকে অত্যন্ত ঘৃণা করিয়া থাকেন। কিন্তু ইংরাজি দলাদলির বিলক্ষণ গৌরব দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজেরা দলাদলির স্থলে কেহই আপন মত প্রকাশ করিতে আশঙ্কা করেন না। আমরা গুরুজন, সাহেব, কি স্বজাতীয় উচ্চপদারূঢ় ব্যক্তিকে সমীহা করিয়া থাকি। এই জন্য তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে সকল বক্তব্য কথা প্রকাশ করিতে পারি না। ইহার এই কারণ অনুমান হয় যে, উভয় পক্ষের মধ্যেই এই রূপ সংস্কার আছে যে মতভেদ প্রকাশ করিলে শত্রুতাচরণ করা হইবেক। ফলতঃ ইহাকে ভীরুতার লক্ষণ মনে করা অন্যায়!

সম্প্রতি বাঙ্গালিরা ইংরাজদিগের অনুকরণ পূর্ব্বক যে সকল সভা করিয়া থাকেন, তাহাতে আমাদিগের স্বভাবসিদ্ধদোষ বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়। সভাতে বিভিন্ন

মত হইলেই যাঁহারা হীনবল, তাঁহারা কোন কথা না বলিয়া কিছু কালের মধ্যে সভ্যশ্রেণী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। এত কাল এক বাক্যে শাস্ত্র পালন করাতে আমরা কখনই মতভেদ জানিতাম না। এক্ষণ অনেক স্থলে বর্ত্তমান-অবস্থাগুণে নানাপ্রকার মতভেদ হইয়া উঠিয়াছে; সুতরাং এতাদৃশ স্থলে কি কর্ত্তব্য,তাহাও শিখিতে পারি নাই। কলিকাতা অঞ্চলে ইংরাজ সংসর্গের আধিক্য বশতঃ মতামত বিষয়ে লোকের স্বতন্ত্রতা পূর্ব্বপ্রদেশ অপেক্ষা অধিকতর প্রবল হইয়াছে। কিন্তু দলবদ্ধ করিলে যে বল হয়, তাহাতে পূর্ব্বদেশবাসিরা অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ।

যাহাদিগের উদ্দেশ্য এক নহে,তাহারা কখনই একত্রে কার্য্য করিতে পারে না। অতএব সভাস্থাপন বা দলবাঁধিবার অগ্রে তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য স্থির করা কর্ত্তব্য। এবং তাহাতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে আপনাপন মনোগত অভিপ্রায় গুলিও বুঝিয়া দেখা আবশ্যক। উদ্দেশ্য বিষয়ে ঐক্য হইতে না পারিলে, সভার দ্বারা কোন কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে না। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মনের গোলযোগ না থাকিলে তাহার সাধনোপায় লইয়া বড় একটা মতভেদ হয় না। উপায় স্থির করিবার সময় স্বস্বভাবানুবর্ত্তিতা কথঞ্চিৎ দমন করিবার আবশ্যকতা হইয়া থাকে। বাঙ্গালিদিগের প্রকৃতি এই যে, প্রবল কারণ উপস্থিত না হইলে আপন মত রক্ষা করিবার জন্য আগ্রহ জন্মে না— কিন্তু জন্মিলে তাহাকে শাসন করিয়া রাখিতে পারে না।

এতদ্বিষয়ে ইউরোপের যুদ্ধ ব্যবসায়িদিগের এক মহৎগুণ আছে। যুদ্ধের সময় বিপদ উপস্থিত হইলে প্রধান সৈনিক কর্ম্মচারিরা সমবেত হইয়া পরামর্শ করেন। তৎকালে নানাপ্রকার বিরুদ্ধমতই প্রকাশ হয়, কিন্তু পরিণামে যে মত স্থির হইয়া যায়, বিরুদ্ধমতাবলম্বিরাও তাহা স্বকীয় বলিয়া গণ্য করেন এবং ঐকান্তিকচিত্তে তাহার সম্পাদন করেন। এরূপ স্থলে বাঙ্গালিরা কেহ বা প্রথমতঃ “দাদার মতে” সম্মত হইয়া পরে কার্য্য সম্পাদন কালে গুপ্ত ভাবে তাহার ব্যাঘাত জন্মান এবং কেহ বা শিথিলচিত্ত হইয়া বেগার দেন। সুতরাং আমাদিগের কখনই মঙ্গল হয় না।

উদ্দেশ্য স্থির করিবার সময় অথবা উপায় সংক্রান্ত পরামর্শ কালে স্বাতন্ত্র্য ধর্ম্মরক্ষাপূর্ব্বক যুক্তকণ্ঠে স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য; কিন্তু উপায় স্থির হইবার পরে কোন কথা বস্তুত অননুমোদিত হইলেও তদ্রূপ জ্ঞান না করিয়া তৎপ্রতি কায়মনোবাক্যে যত্ন করাই উচিত; তখন আপন মতের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করিলে কেবল অনর্থের মূল হয়।

আমাদিগের দলাদলির কার্য্যবিধান এই যে, তাবতে এক বাক্য না হইলে কোন কর্ম্ম করা হইবেক না। ইংরাজদিগের দলাদলিতে অধিকাংশের মত তাবতের মান্য। মিল ইংরাজি নিয়মের এক দোষ দেখাইয়াছেন যে, এতদ্দ্বারা অধিকাংশ সংখ্যার অসঙ্গত প্রাধান্য হইয়া উঠে। আমাদিগের নিয়মে তাহা হইতে পারে না বটে, কিন্তু কার্য্য

চালান দুর্ঘট হয়। অথবা পদে পদে দল ভাঙ্গিয়া সকলেই হীনবল হইয়া যায়।

লিখিত বিচার। ইহার গুন এই যে, অনেক লোকের সহিত একবারে বিচার করা যায়, বক্তব্য কথা গুলি মনে করিবার অনেক সময় পাওয়া যায় এবং গুরুতর বিরোধ জন্মে না। দোষ এই যে, মনের ভাব গোপন করিবার অনেক সুযোগ হয়, সুতরাং ফাঁকির সমূহ প্রাদুর্ভাব ঘটে। এবং পরস্পরের মুখ দেখিলে যেমন পরিষ্কার রূপে অভিপ্রায় গুলি বুঝা যায়, লিপিতে তাহা হইতে পারে না। ফলতঃ যে সকল বিষয়ে রাজ্যের সমস্ত লোকের অভিলাষ জানা আবশ্যক,তাহাতে লিপি ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। মুদ্রাযন্ত্র না থাকিলে লিখিত বিচার চলিতে পারে না, এবং লোকের পাঠানুরাগ না থাকিলে মুদ্রাযন্ত্রের দ্বারা বিশেষ ফল দর্শে না। আমাদিগের দেশে এখনও মুদ্রাযন্ত্রের সম্যক উন্নতি হয় নাই। কেহ এক খানি বহি লিখিলে সঙ্গতি অভাবে তাহা ছাপান হয় না। ইউরোপ অঞ্চলেও পূর্ব্বে ঐ রূপ হইত। না জানি, কতই কাব্য কবির দারিদ্র্য বশত কীট পতঙ্গের গ্রাসে পতিত হইয়াছে! ধনবান ব্যক্তিরা যশঃ লাভের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে পারেন এবং করিয়াও থাকেন। যদি দরিদ্র লেখকদিগের গ্রন্থ ছাপাইয়া তাঁহারা প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইলে বোধ হয়, কাল সহকারে এ দেশেও মুদ্রাযন্ত্রের দ্বারা বাদানুবাদ চলিতে পারিবেক। ফলতঃ ইংরাজেরা এই রূপ যশকে মান্য জ্ঞান করেন বলিয়া আমাদিগেরও সেইরূপ করা কর্ত্তব্য নহে।

অনন্তর মিল বলিয়াছেন যে, লোককে কেবল মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিলেই হয় না—তদনুসারে কার্য্য করিতে দেওয়াও অত্যাবশ্যক। যেখানে অন্যের ক্ষতি হইতে পারে, এরূপ স্থলে কার্য্য বা মতপ্রকাশ উভয়ই নিবারণ করা উচিত। কিন্তু যাহাতে কেবল কর্ত্তা বা মত প্রকাশকের নিজেরই ক্ষতি বৃদ্ধি হয়, তাহাতে এরূপ করা অন্যায়।

সকল লোকের অভিরুচি সমান নহে, একটী কার্য্য কাহারও মনে ভাল এবং কোন ব্যক্তির মনে মন্দ, দুই প্রকার বোধ হইতে পারে। হয় ত, উভয়ের মধ্যে এক জন একটী দোষ এবং অপর ব্যক্তি প্রস্তাবিত বিষয়ের একটী গুণ দেখিতে পান নাই। যদি সকল দোষ গুণ প্রকাশ হইবার পরে উভয়ে একমতাবলম্বী হয়েন, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু এক জন যে আপন বুদ্ধি বিবেচনায় জলাঞ্জলি দিয়া পরের মত গ্রহণ করিবেন, ইহা কদাচ বাঞ্ছনীয় নহে।

কার্য্য বিষয়েও ঠিক এই রূপ। কেহ এক প্রকার, কেহ অন্য প্রকার সুখবাসনা করে। না ঠেকিলে কেহই আপনার দোষ গুণ বুঝিতে পারে না। মনুষ্য প্রকৃতির কিছুই ধ্বংস করা কর্ত্তব্য নহে, কোন্ প্রকৃতির লোকের দ্বারা পৃথিবীর কি কি মঙ্গল হইতে পারে, কি প্রকার আচরণ করিলে লোকের সুখ বৃদ্ধি হইবেক, তাহা কেহই বলিতে পারে না—অতএব কাহারও ক্ষতি না হইলে কোন ব্যক্তির আচরণ গর্হিত অথবা তাহার প্রকৃতি

মন্দ বলিয়া, তাহার ইচ্ছারোধ করা কর্ত্তব্য নহে।

এতদ্বিষয়ে ইংরাজদিগের অনেক দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ড আমেরিকা এত যে সভ্য, কিন্তু তথায় যদি এক জন মুসলমান কোন রাস্তাতে দাঁড়াইয়া খ্রীষ্টীয়মতের কুৎসা করেন এবং তাবৎ লোককে মহম্মদের অনুগামী হইতে বলেন, তবে তাঁহার বস্ত্রাদি দূরে থাকুক, হস্তপদাদি অক্ষতভাবে প্রত্যানয়ন করা দুষ্কর হয়। এতদ্দেশে ইংরাজদিগের আধিপত্যের পূর্ব্বেও খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকেরা আসিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের প্রতি কোন অত্যাচারের কথা শুনা যায় নাই। আমরা শুনিয়াছি যে এক বার বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে এখানকার একজন সাহেব কোট পেন্টলুনের পরিবর্ত্তে ধুতি চাদর পরিধান করিয়া কাছারি করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু সহসা এত দূর সাহস না করিয়া তাঁহার উপরিস্থ সাহেবকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন যে,এমত করিলে দোষ আছে কি? তিনি বলিলেন, "দোষ আর কি, তবে তোমাকে লাট সাহেব পদচ্যুত করিবেন, কি পাগলা গারদে পাঠাইবেন, আমি তাহাই ভাবিতেছি।"

স্বেচ্ছাচারমতে কার্য্য করিবার প্রসঙ্গে মিল বলিয়াছেন যে, ইহাতে কিঞ্চিৎ সুখোৎপত্তি হইয়া থাকে, অতএব যদি কাহারও ক্ষতি না হয়, তবে লোকে কেনই সেই সুখে বঞ্চিত হইবেক? বেকন্ বলিয়াছেন যে, কোন স্ত্রীলোক আত্মীয় স্বজনের পরামর্শ অবহেলা পূর্ব্বক বিবাহ করিলে কদাচ দুর্ব্বৃত্ত কি কাপুরুষ পতির নিন্দা করে না। কথাটী মিথ্যা নয়। অতএব যদি এমনই মনুষ্যের প্রকৃতি, তবে লোককে কেবল পরামর্শ দিয়া ক্ষান্ত থাকাই কর্ত্তব্য। অজ্ঞান ব্যক্তিকে উপদেশ দেওয়া আবশ্যক; কিন্তু যে স্থলে কোন ব্যক্তি উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া কার্য্য করে,সেখানে এই বিবেচনা করিতে হইবেক যে, উপদেশ-পাত্র উপদেশক অপেক্ষা দূরদর্শী, অথবা নিতান্ত অদূরদর্শী। দূরদর্শী হইলে কোন কথাই নাই। কিন্তু অদূরদর্শী ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ না দেখিলে জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। জ্ঞানের অভাব থাকিলে পরের সাহায্যে কত দিন চলে? সুতরাং বল পূর্ব্বক মনুষ্যের দুরভিলাষ ক্ষান্ত রাখা অসম্ভব। যে জন পরামর্শ বুঝে না, তাহাকে স্বেচ্ছাচারী হইতে দেওয়াই ভাল। কারণ স্বকার্য্যের ফল প্রত্যক্ষ করিলে, পরিণামে তাহার জ্ঞান জন্মিবে।

অনন্তর মিল ইউরোপীয় পুরাবৃত্তের উদাহরণ দিয়া অকারণ আত্মসংযমের দোষ দেখাইয়াছেন।

এতদ্দেশেও কেহ কেহ এমত বিবেচনা করেন যে, আত্মসংযমই জীবনের সার কর্ম্ম। আমার অম্ল ভাল লাগে, তবে অম্লের অধীন থাকা ভাল নহে; পীড়াদায়ক না হইলেও আমার অম্লত্যাগ কর্ত্তব্য।—কেহ বলেন, গুরুসেবার ন্যায় ধর্ম্ম নাই; গুরু যাহা বলেন, তাহাতে দ্বিধা করা অকর্ত্তব্য। যদি কেহ গুরু অনুরোধে অধর্ম্মাচরণ করিতে অসম্মত হয়েন, তবে এরূপ লোকের নিকট তাঁহার অপযশের সীমা থাকে না।—কত সময়ে আত্মীয় অন্তরঙ্গের অনুরোধ ন্যায়বিরুদ্ধ

হইলেও তাঁহাদিগকে স্পষ্ট বাক্যে "না" বলা অসাধ্য হইয়া উঠে। অনুরোধের স্থলে "আমার ক্ষতি হইবেক," একথা বলিলেও অব্যাহতি পাওয়া যায়—কিন্তু "অনভিপ্রেত" বলিলে আর রক্ষা থাকে না। যদি বাঙ্গালিরা কেবল কুপ্রবৃত্তি গুলি এইরূপে দমন করিতে পারিতেন, তবে স্বস্বভাবানুবর্ত্তিতাগুণের অভাব জন্য তাদৃশ দুঃখ থাকিত না। কিন্তু ভাল মন্দ কোন ইচ্ছাই আমরা সম্পন্ন করিতে পারি না। কত অসন্তোষজনক বস্তু মন্দ হইলেও আমরা তাহা সহ্য করি। এই জন্য রাজদ্বারেও আমরা হতাদর হইয়াছি।

ফলতঃ মিলের মতে মনুষ্যের মনোবৃত্তি গুলি স্বপ্নবৎ অসার নহে; তৎসমুদায়ের পরিবর্দ্ধন ও উন্নতি সাধন করিলে মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের মনে অসন্তোষ না জন্মিয়া বরং প্রীতিরই উদয় হইতে পারে।

মোক্ষ লাভের জন্য অসৎ কামনা ত্যাগ করা কর্ত্তব্য, ইহাই বলিতে পারা যায়। যে ব্যক্তি অসতের সঙ্গে সৎপ্রবৃত্তি গুলিকেও নির্ব্বাণ করেন, তাঁহার প্রশংসা করা যায় না। হিন্দুশাস্ত্রে মায়াজালের অনেক নিন্দা আছে, কিন্তু সংসারের তাবৎ বস্তুকে মায়াচ্ছন্ন জ্ঞান করিলে মুক্তিলাভেচ্ছাকেও ভ্রম বলিতে হয়। তুমি যদি শাস্ত্রাধ্যয়ন ও রিপু সংযম করিয়া পরিশেষে পরোপকার ধর্ম্মও পরিত্যাগ কর, তোমাতে আর থাকিবে কি? তুমি মুক্তিলাভ করিবে, তোমার পুনর্জ্জন্ম হইবেক না। হে পরমহংস, যদি ইহা সত্যও হয়, তথাপি তুমি নিতান্ত স্বার্থপর। তোমার সঙ্গে আমাদিগের কোন সম্পর্ক নাই। তুমি মহাপুরুষ; কিন্তু আমাদিগের পক্ষে তোমার জীবন মৃত্যু দুই তুল্য। আমরা দুর্ব্বহ জীবনভারে ক্লান্ত হইতেছি, কিন্তু তোমাকে প্রতিকারের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে তুমি বাঙ্‌নিষ্পত্তি কর না। তোমার অনুগামী হওয়া সামান্য ব্যক্তির সাধ্যাতীত। এবং আমি যদি ইহাতে কৃতকার্য্য হইতেও পারি, তবে কেবল আমিই তোমার ন্যায় বেদনা শূন্য হইব; কিন্তু আমার পীড়িত ভ্রাতৃবর্গের কি হইবে? হে পরমহংস, তুমি ও তোমার উপদেশক উভয়েই অতি নিষ্ঠুর!

হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝা ভার। যে ধর্ম্মে একটী পিপীলিকাকে দয়া করিতে উপদেশ দেয়, তাহাতেই বলে যে তোমার স্ত্রীপুত্র কেহই নহে; ইহাদিগের মঙ্গলের জন্য উৎকণ্ঠিত হইও না। কিন্তু যদি অক্রবাণ সন্তানগণকে প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য হয়, অবলা স্ত্রীভগিনীকে আশ্রয় দেওয়া মনুষ্যত্বের লক্ষণ হয় এবং বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবা করা মানবজাতির গৌরবের স্থল হয়, তবে আত্মাকে সর্ব্বত্যাগী করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। আত্মাতে পদার্থ রাখিতে হইলে আত্ম-প্রকৃতির পরিশীলন করা অত্যাবশ্যক। এবং যাহাতে সংসারের মঙ্গল হয়, সর্ব্বদা সেই চিন্তাতে মগ্ন থাকা কর্ত্তব্য। ভূমণ্ডল মানবজাতির আবাস। যেমন গৃহসংস্কার না করিলে লোক বাস করিতে পারে না, সেই রূপ মনুষ্যজাতির মঙ্গলার্থ পার্থিব বিষয়ে মনোনিবেশ করা অত্যাবশ্যক। উহা পরিত্যাগ করিলে ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রয়োজন থাকে না। অতএব

বিশিষ্ট কারণ বিনা আত্মসংযম করিলে, কোন পুণ্য হয় না।

প্রাগুক্ত বিষয়ে মিলের পরামর্শ এই যে, সকলকে স্ব২ মত প্রকাশ করিতে এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিতে দেওয়া উচিত। এতদ্দ্বারা তাবৎ লোকের জীবন সার্থক হইবেক।

অনন্তর এই আপত্তি হইতে পারে যে, এই প্রকার স্বেচ্ছাচারের সীমা কোথায়? মিল্ ইহার প্রতি উত্তর এই ভাবে দিয়াছেন।

লোকালয়ে থাকিলে সকলেই পরস্পরের নিকট অনেক উপকার পাইয়া থাকেন। পৃথিবীতে জীবিকা নির্ব্বাহের তাবৎ পদার্থ বিনিময়ের দ্বারাই সংগৃহীত হইয়া থাকে বটে; কিন্তু মূল্য ও পণ্য দ্রব্যের মধ্যে অনেক প্রভেদ। যে দ্রব্য হইতে মনুষ্যের যত পরিমাণে সুখোৎপত্তি হয়, তাহাই ঐ দ্রব্যের উপযুক্ত মূল্য। টাকা যে কখনই ধান্যের তুল্য মূল্য হইতে পারে না, তাহা কেবল দুর্ভিক্ষের সময়েই জানা যায়। যে মহর্ষি লোকালয় ত্যাগ করিয়া একাকী গিরিগহ্বরে ফলমূলাহার করিয়া প্রাণধারণ করেন, তিনিও মনুষ্য জাতির নিকট অঋণী হইতে পারেন না। যত দিন দেহ মধ্যে অন্তরেন্দ্রিয় ধারণ করিবেন এবং চিন্তা কালীন ভাষা প্রয়োগ করিবেন, তত দিন তাঁহাকে অন্ততঃ ভাষাপ্রণেতা পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিতে হইবেক। শুকদেব গোস্বামী পৃথিবীর কিছুই জানিতেন না, কিন্তু পৈতৃক ভাষা পাইলেন কোথায়? ভাষা এক জনের সৃষ্টি নহে, এবং পুরুষানুক্রমে সজীব না রাখিলে কেহই তাহা অভ্যাস করিতে পারেন না। অতএব যাঁহারা ভাষার সৃজন, প্রতিপালন এবং উন্নতি সাধন করেন, তাঁহারা সকলেই জনসমাজের ঋণদাতা। যাহাঁরা সমাজে থাকেন, তাঁহারা সকলেই এই রূপ বহুতর ঋণ গ্রহণে বাধ্য হয়েন। সেই ঋণ পরিশোধ জন্য তাবতের সমাজ রক্ষার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এবং সমাজ রক্ষার্থ যে সকল ক্ষতি স্বীকার করা আবশ্যক, তাবৎ লোকেই তাহা সহ্য করিতে বাধ্য আছেন।

এই জন্য মিল বলেন যে, যাহাতে অন্য কাহার সুখের ব্যাঘাত হয়, অথবা সমাজস্থ অধিকাংশ লোকের অসুখ জন্মে, অথবা যেখানে প্রত্যেকের কিছু কিছু কষ্ট বা ক্ষতি সহ্য না করিলে সমাজ রক্ষা হয় না, এরূপ স্থলে স্বেচ্ছাচার এবং স্বস্বভাবানুবর্ত্তিতা নিবারণ জন্য বলপ্রয়োগ করা অন্যায় নহে।

মনে কর, যেন শত্রুজাতির হস্ত হইতে স্বদেশ রক্ষার্থ কোন রাজ্যে বিংশতি বৎসর হইতে চল্লিশ বৎসর বয়স্ক তাবৎ অরোগী পুরুষের অস্ত্রধারণ করা আবশ্যক হইয়াছে—এমত স্থলে প্রাণের আশঙ্কা কিম্বা পতিপুত্রের প্রতি স্নেহ বিষয়ে কোন ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য মান্য করা শুভজনক হইতে পারে না।

সর্ব্ব সাধারণ কর্ত্তৃক ব্যক্তি বিশেষের স্বেচ্ছাচার প্রতিষেধ বিষয়ে মিল তিনটী স্থল দর্শাইয়াছেন—

১। যেখানে একজনের কার্য্যের দ্বারা অন্য এক কি অধিক লোকের ক্ষতি হয়।

এরূপ স্থলে মিলের মতে দণ্ডপ্রয়োগ নিষিদ্ধ নহে।

২। যেখানে এক জনের কার্য্য এরূপ হয় যে, তাহা দৃষ্টি করিলে অন্যের মনে বিরক্তি, ঘৃণা অথবা দয়াবশতঃ তন্নিবারণ ইচ্ছা উপস্থিত হয়।

এরূপ স্থলে সকলেই স্বেচ্ছামতে তাহার সংসর্গ ত্যাগ করিতে পারেন এবং তদর্থে অন্যকে অনুরোধও করিতে পারেন অথবা দয়া করিয়া তাহাকে সৎপরামর্শ দিতেও পারেন; কিন্তু যদ্দ্বারা তাহার গ্রাসাচ্ছাদন অথবা বসবাসের ব্যাঘাত জন্মিতে পারে, এরূপ কোন কার্য্য করা কর্ত্তব্য নহে।

৩। যেখানে কোন রূপ কার্য্যের সম্ভাবিত ফল, অপর ব্যক্তির পক্ষে অনর্থকর বলিয়া আশঙ্কার বিষয় হয়।

এরূপ স্থলে সেই সম্ভাবিত দুর্ঘটনা উপস্থিত হইলে পর তাহারই হেতু বলিয়া সেই ব্যক্তির যথাযোগ্য দণ্ডবিধান হইতে পারে। নতুবা অন্য কোন কার্য্যকে সেই ঘটনার মূল অনুমান পূর্ব্বক ঐ কার্য্যকে মুখ্য দোষ গণ্য করা এবং তজ্জন্য সেই ব্যক্তিকে নিগ্রহ করা কর্ত্তব্য নহে। এরূপ ঘটনা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে তাহা অনিশ্চিত বলিয়াই গণ্য হইতে পারে।

এতৎ প্রসঙ্গে মিল জনসমাজের একটী দোষ দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন যে,যে কোন অপরাধীই হউক,সে তরুণবয়সে অবশ্যই সর্ব্বতোভাবে সমাজের কর্ত্তৃত্বাধীন থাকে। তখন অন্যান্য লোকের স্বেচ্ছামত তাহার চরিত্র সংস্কারের চেষ্টা করা হয়; সেই চেষ্টা বিফল না হইলে সেই ব্যক্তি কখনই সমাজ বহির্ভূত আচরণ করে না। অতএব যদি সম্ভাবিত ফলের জন্য কোন প্রকার আচরণ দূষণীয় হয়, তবে সেই সমাজনিন্দিত আচরণের জন্য অপরাধীর চরিত্র সংস্কারকেরাও দোষী।

সমাজ আত্মরক্ষার জন্য অপরাধী ব্যক্তির দণ্ড করিয়া থাকেন। বৈরনির্যাতন করা দণ্ডবিধির উদ্দেশ্য নহে; অতএব যাবৎ ক্ষতি দৃষ্ট না হয়, তাবৎ কাহারও প্রতি দণ্ডবিধান করা অন্যায়। কারণ ভাবী ক্ষতির বিষয় মনুষ্যের অনুমান নিতান্ত অনিশ্চিত। তুমি বল যে, কন্যাকালে বিবাহ না দিলে ব্যভিচার দোষ ঘটিবেক; আমি বলি যে, তাহা নহে, বরং অপ্রাপ্তবয়সে পত্নীত্বপদ পাওয়াতে নানাপ্রকার অনর্থ ঘটিতেছে এবং কুলোকের শঠতা না বুঝিতে পারিয়া সহসা কুপথগামিনী হইতেছে। অতএব ইহার মীমাংসার উপায় কি? প্রত্যক্ষ ফল? ফলের দ্বারা যখন কারণের গুণাগুণ নিরাকৃত হইবেক, তখন তোমাতে আমাতে মতভেদ থাকিবে না। কিন্তু আপাততঃ বলপ্রয়োগ করিলে উভয় দিকেই দোষ। যদি আমি তোমার প্রতি এই জোর করি যে, যৌবনের পূর্ব্বে তোমার কন্যার বিবাহ দিতে পারিবে না—তবে কন্যা কালে বিবাহ দিবার ফল প্রত্যক্ষ হইবেক না। আবার তোমার মতানুসারে কার্য্য হওয়াতে স্ত্রী জাতি চিরকাল অক্রুবাণ শিশুর ন্যায় থাকিতেছে, তাহাদিগের বুদ্ধি পরিণত হইলে সমাজের কি কি মঙ্গল হইতে পারে, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। সুতরাং এরূপ স্থলে কোন প্রকার দণ্ডবিধি না থাকাই ভাল। কিন্তু যাবৎ এক

পক্ষের ভ্রম দূরীকৃত না হইবেক, তাবৎ পরস্পরের দোষানুসন্ধানে নিযুক্ত থাকিতে হইবেক।

পরিণামে একটী কথা বলা আবশ্যক যে, মিল স্বস্বভাবানুবর্ত্তিতা বিষয়ে যে কোন বিধানের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কেবল সভ্যতম জাতিগণেরই উপযোগী, এই কথা বলিয়াছেন। আমরা সেই শ্রেণীর মধ্যে গণ্য কি না, তদ্বিষয়ে অনেক মতভেদ হইতে পারে। আর মিলের মতই যে সর্ব্ববাদী সম্মত, একথাও বলা যায় না; অন্য কি, লেখক নিজেই এই প্রবন্ধের সকল কথা আন্তরিক অবলম্বন করেন না। কিন্তু মিল অতি প্রধান ব্যক্তি, তাঁহার মত সর্ব্বসাধারণের গোচর হইলে কোন প্রকার অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই। তিনি যে ভাবে এই বিষয়ের অনুধাবন করিয়াছেন, সেই ভাবেই এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে।

বিষবৃক্ষ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ। [১]

যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ।

হরিদাসী বৈষ্ণবী উপবনগৃহে আসিয়া হঠাৎ দেবেন্দ্রবাবু হইয়া বসিল। পাশে এক দিগে আলবোলা। বিচিত্র রৌপ্য শৃঙ্খলদলমালাময়ী, কলকল কল্লোলনিনাদিনী, আলবোলা সুন্দরী দীর্ঘ ওষ্ঠ চুম্বনার্থ বাড়াইয়া দিলেন—মাতার উপর সোহাগের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। আর এক দিগে স্ফটিক পাত্রে, হেমাঙ্গী এক্‌শাকুমারী টল টল করিতে লাগিলেন। সম্মুখে, ভোক্তার ভোজনপাত্রের নিকট উপবিষ্ট গৃহমার্জ্জারের মত, এক জন চাটুকার প্রসাদাকাঙ্ক্ষায় নাক বাড়াইয়া বসিলেন। হুক্কা বলিতেছে, "দেখ! দেখ! মুখ বাড়াইয়া আছি! ছি! ছি! মুখ বাড়াইয়া আছি!" এক্‌শাকুমারী বলিতেছে, আগে "আমায় আদর কর! দেখ, আমি কেমন রাঙ্গা! ছি! ছি! আগে আমায় খাও!" প্রসাদাকাঙ্ক্ষির নাক বলিতেছে, "আমি যার, তাকে একটু দিও।"

দেবেন্দ্র সকলের মন রাখিলেন। আলবোলার মুখচুম্বন করিলেন—তাহার প্রেম ধুঁয়াইয়া উঠিতে লাগিল। এক্‌শানন্দিনীকে উদরস্থ করিলেন, সে ক্রমে মাতায় উঠিতে লাগিল। গৃহমার্জ্জার মহাশয়ের নাককে পরিতুষ্ট করিলেন—নাক দুই চারি গেলাসের পর ডাকিতে আরম্ভ করিল। ভৃত্যেরা নাসিকাধিকা-

(১) বঙ্গদর্শনের চতুর্থ সংখ্যায় বিষবৃক্ষের যে কয়টী পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা ভ্রম ক্রমে একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ এবং পঞ্চদশ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ক্রমান্বয়ে দ্বাদশ হইতে ষোড়শ পর্য্যন্ত লিখিত হওয়া উচিত ছিল।

রিকে "গুরু মহাশয়২" করিয়া স্থানান্তরে রাখিয়া আসিল।

তখন সুরেন্দ্র আসিয়া দেবেন্দ্রের কাছে বসিলেন, এবং তাঁহার শারীরিক কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর বলিলেন, "আবার আজি তুমি কোথায় গিয়াছিলে?"

দে। ইহারই মধ্যে তোমার কানে গিয়েছে?

সু। এই তোমার আর একটি ভ্রম। তুমি মনে কর, সব তুমি লুকিয়ে কর—কেহ জানিতে পারে না, কিন্তু পাড়ায়২ ঢাক বাজে।

দে। দোহাই ধর্ম্ম! আমি কাহাকেও লুকাতে চাহি না—কোন্ শালাকে লুকাব?

সু। সেও একটা বাহাদুরি মনে করিও না। তোমার যদি একটু লজ্জা থাকিত, তাহা হইলে আমাদেরও একটু ভরসা থাকিত। লজ্জা থাকিলে আর তুমি বৈষ্ণবী সেজে গ্রামে২ ঢলাতে যাও?

দে। কিন্তু কেমন রসের বৈষ্ণবী, দাদা! রসকলিটি দেখে, ঘুরে পড়োনি ত?

সু। আমি সে পোড়ার মুখ দেখি নাই, দেখিলে দুই চাবুকে বৈষ্ণবীর বৈষ্ণবীযাত্রা ঘুচিয়ে দিতাম।

পরে দেবেন্দ্রের হস্ত হইতে মদ্যপাত্র কাড়িয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন, "এখন একটু বন্ধ করিয়া, জ্ঞান থাকিতে২ দুটো কথা শুন। তার পর গিলো।"

দে। বল, দাদা! আজ যে বড় চটা চটা দেখি—হৈমবতীর বাতাস গায়ে লেগেছে না কি?

সুরেন্দ্র দুর্ম্মুখের কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, "বৈষ্ণবী সেজেছিলে কার সর্ব্বনাশ কর্‌বার জন্য?"

দে। তা কি জান না? মনে নাই, তারা মাষ্টারের বিয়ে হয়েছিল এক দেবকন্যার সঙ্গে? সেই দেবকন্যা এখন বিধবা হয়ে ও গাঁয়ের দত্তবাড়ী রেঁধে খায়। তাই তাকে দেখ্‌তে গিয়াছিলাম।

সু। কেন, এত দুর্ব্বৃত্তিতেও তৃপ্তি জন্মাল না যে, সে অনাথা বালিকাকে অধঃপাতে দিতে হবে! দেখ, দেবেন্দ্র, তুমি এত পাপিষ্ঠ, এত বড় নৃশংস, এমন অত্যাচারী, যে বোধ হয়, আর আমরা তোমার সহবাস করিতে পারি না।

সুরেন্দ্র এরূপ দার্ঢ্য সহকারে এই কথা বলিলেন, যে দেবেন্দ্র নিস্তব্ধ হইলেন। পরে গাম্ভীর্য্য সহকারে কহিলেন;—

"তুমি আমার উপর রাগ করিও না। আমার চিত্ত আমার বশ নহে। আমি সকল ত্যাগ করিতে পারি, এই স্ত্রীলোকের আশা ত্যাগ করিতে পারি না। যে দিন প্রথম তাহাকে তারাচরণের গৃহে দেখিয়াছি, সেই দিন অবধি আমি তাহার সৌন্দর্য্যে অভিভূত হইয়া আছি। আমার চক্ষে এত সৌন্দর্য্য আর কোথাও নাই। জ্বরে যেমন তৃষ্ণায় রোগিকে দাহ করে, সেই অবধি উহার জন্য লালসা আমাকে সেইরূপ দাহ করিতেছে। সেই অবধি আমি উহাকে দেখিবার জন্য কত কৌশল করিতেছি, তাহা বলিতে পারি না। এপর্য্যন্ত পারি নাই—শেষে এই বৈষ্ণবী-সজ্জায় সফল হইয়াছি। তোমার কোন আশঙ্কা নাই—সে স্ত্রীলোক অত্যন্ত সাধ্বী।"

সু। তবে যাও কেন?

দে। কেবল তাহাকে দেখিবার জন্য। তাহাকে দেখিয়া, তাহার সঙ্গে কথা কহিয়া, তাহাকে গান শুনাইয়া আমার যে কি পর্য্যন্ত তৃপ্তি হয়, তাহা বলিতে পারি না।

সু। তোমাকে আমি সত্য বলিতেছি—উপহাস করিতেছি না। তুমি যদি এই দুষ্প্রবৃত্তি ত্যাগ না করিবে—তুমি যদি সে পথে আর যাইবে—তবে আমার সঙ্গে তোমার আলাপ এই পর্য্যন্ত বন্ধ। আমিও তোমার শত্রু হইব।

দে। তুমি আমার একমাত্র সুহৃদ্। আমি অর্দ্ধেক বিষয় ছাড়িতে পারি, তবু তোমাকে ছাড়িতে পারি না। কিন্তু তোমাকেও যদি ছাড়িতে হয়, সেও স্বীকার, তবু আমি কুন্দনন্দিনীকে দেখিবার আশা ছাড়িতে পারিব না।

সু। তবে তাহাই হউক। তোমার সঙ্গে আমার এই পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ।

এই বলিয়া সুরেন্দ্র দুঃখিতচিত্তে উঠিয়া গেলেন। দেবেন্দ্র, একমাত্র বন্ধুবিচ্ছেদে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া, কিয়ৎকাল বিমর্ষ ভাবে বসিয়া রহিলেন। শেষ, ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, "দূর হউক! এ সংসারে কে কার! "আমিই আমার!" এই বলিয়া পাত্র পূর্ণ করিয়া, ব্রাণ্ডি পান করিলেন। তাহার বশে আশু চিত্তপ্রফুল্লতা জন্মিল। তখন দেবেন্দ্র, শুইয়া পড়িয়া, চক্ষু মুদিয়া গান ধরিলেন।

আমার নাম হীরে মালিনী।
আমি থাকি রাধার কুঞ্জে, কুব্জ আমার ননদিনী।
রাবণ বলে চন্দ্রাবলি,
তুমি আমার কমল কলি,
শুনে কীচক মেরে কৃষ্ণ,
উদ্ধারিল যাজ্ঞসেনী।

আর একজন কোথা হতে গায়িল;—

আমার নাম হীরা মালিনী।
মাতাল হয়ে বাচাল হলো, দেখিতে নারি আমি ধনী।

দেবেন্দ্র জড়ীভূত কণ্ঠে বলিলেন, "বা! তুমি ধনী কে? ভূত না প্রেতিনী?"

তখন ঠুন! ঠুন! ঝনাৎ! প্রেতিনী আসিয়া বাবুর কাছে বসিল। প্রেতিনীর ঢাকাই সাড়ী পরা, হাতে বাজু বালা, কালোচুড়ী; গলায় চিক, কণ্ঠমালা; কানে ঝুমকা; কাঁকালে গোট; পায়ে ছয় গাছা মল। গায়ে আতর গোলাবের গন্ধ ভুরভুর করিতেছ। দেবেন্দ্র প্রেতিনীর মুখের কাছে আলো ধরিলেন। চিনিতে পারিলেন না। চুপিং মদের ঝোঁকে বলিলেন, "বাবাঃ, কোন্ গাছে থেকে?" আবার আর এক দিগে আলো ধরিয়া দেখিয়া, সেই রূপ স্বরে বলিলেন, "তুমি কাদের পেতনী গা?" শেষে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া বলিলেন, "পার্‌লেম না বাপ! আজ ফিরে যাও. অমাবস্যায় লুচি পাঁটা দিয়ে পূজো দেব—যাও বাপ! আজ একটু কেবল ব্রাণ্ডি খেয়ে যাও," এই বলিয়া মদ্যপ আগতা স্ত্রীলোকের মুখের কাছে ব্রাণ্ডির গেলাস ধরিল।

স্ত্রীলোকটা তাহা গ্রহন না করিয়া নামাইয়া রাখিল, এবং মৃদুহাসি হাসিয়া স্বচ্ছন্দে দেবেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল;—

"ভাল আছ বৈষ্ণবী দিদি?"

তখন মাতাল বলিল, "বৈষ্ণবী দিদি! ও বাবা! ও গাঁয়ের দত্ত বাড়ীর পেত্নী নাকি?" এই বলিয়া আবার আলো

স্ত্রীলোকের মুখের কাছে লইয়া গেল। এদিক ওদিক চারিদিগে আলোটা ফিরাইয়া ফিরাইয়া গম্ভীরভাবে হীরাকে নিরীক্ষণ করিয়া, শেষ হঠাৎ আলোটা ফেলিয়া দিয়া গান ধরিল,—"তুমি কে বট হে, তোমায় চেনং করি—কোথাও দেখেছি হে।"

হীরা কহিল, "আমি হীরা।"

"Hurrah! Three Cheers for হীরা।" বলিয়া মাতাল লাফাইয়া উঠিল। তখন আবার ভূমিষ্ঠ হইয়া হীরাকে প্রণাম করিয়া গ্লাস হস্তে তাহার স্তব করিতে আরম্ভ করিল;—

"নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমঃ নমঃ।
যা দেবী বটবৃক্ষেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমঃ নমঃ॥
যা দেবী দত্তগৃহেষু হীরারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমঃ নমঃ।
যাদেবী পুকুরঘাটেষু চুপ্‌ড়ি হস্তেন সংস্থিতা
নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমঃ নমঃ॥
যাদেবী ঘরদ্বারেষু ঝাঁটা হস্তেন সংস্থিতা।
নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমঃ নমঃ॥
যাদেবী মমগৃহেষু পেত্নীরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্মৈ সমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমঃ নমঃ।

তার পর—মালিনী মাসি—কি মনে কোরে?"

হীরা ইতি পূর্ব্বেই বৈষ্ণবীর সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া দিনমানে জানিয়া গিয়াছিল, যে হরিদাসী বৈষ্ণবী ও দেবেন্দ্র বাবু একই ব্যক্তি। কিন্তু কেন দেবেন্দ্র বৈষ্ণবী বেশে দত্তগৃহে যাতায়াত করিতেছে? এ কথা জানা সহজ নহে। হীরা মনেং অত্যন্ত দুঃসাহসিক সঙ্কল্প করিয়া, এই সময়ে স্বয়ং দেবেন্দ্রের গৃহে আসিল। মনেং হীরার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল যে, জলে হউক, আগুনে হউক, সে অপরিহীন সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিবে, রাখিয়া উন্মত্ত দেবেন্দ্রের মনের কথা জানিয়া যাইবে। হীরা ভিন্ন এত সাহস আর কাহারও হইত না।

হীরা বলিল, "মনে কোরে আর কি? দত্তের বাড়ী এক ডাকাতে দিনে ডাকাতি করিয়া এসেছে, তাই ডাকাত ধব্‌তে এয়েছি।"

শুনিয়া বাবু গান ধরিলেন।

"আমার আঁটা ঘরে সিধঁ মেরেছে,
কোন্ ডাকাতের এ ডাকাতি।
যৌবনের জেল খানাতে রাখ্‌বো তারে
দিবা রাতি॥
মন বাক্‌শ তার লজ্জা তালা,
কল কোরে তার ভাঙ্গলে ডালা,
লুটে নিলে প্রেমনিধি তার,
ভাঙ্গা বাক্‌শে মেরে নাতি।

তা, ডাকাতি কর্‌তে গিয়ে থাকি, গিয়েছি বাপ—কিন্তু হীরা মতির জন্যে নয়, কেবল ফুলটা ফলটা খুঁজি।"

হীরা। কি ফুল—কুন্দ?

দে। Hurrah! কুন্দ কলি!—Three Cheers for কুন্দনন্দিনী! বন্দ্যতে মন্দজাতিকং! কুন্দনন্দি-ন্দি-ন্দিনী! বলিয়াই গীত।—

কুন্দকলি মন্দ বলি নিন্দে করে কাল ভ্রমরা—

তবে—ঘেঁটু বনের মেঠো মালিনী মাসি, কি মনে কোরে?

হী। কুন্দনন্দিনীর কাছে থেকে।

দে। Hurrah! Hurrah! for কুন্দনন্দিনী। বল, বলত, বলত কি বলিয়া পাঠিয়েছে? মনে পড়েছে? না হবে কেন? আজ তিন বৎসরের পীরিত!

হীরা বিস্মিত হইল। আরও বিশেষ শুনিবার ইচ্ছায় জিজ্ঞাসা করিল ;—

"এত দিনের পীরিত, তাহা জানিতেম না। প্রথম পীরিত হলো কেমন কোরে ?"

দে। আরে, ভারি নাকি শক্ত কথা! তারার সহিত বন্ধুতা থাকাতে তাকে বলিলাম, বউ দেখা—তা সে বউ দেখালে। সেই অবধি পীরিত। কিন্তু এক গেলাস খাও বাপ, সুধু মুখে আর ভাল লাগে না।

দেবেন্দ্র তখন একপাত্র ব্রাণ্ডি হীরার হাতে দিল। হীরা তাহা হাতে করিয়া আবার নামাইয়া রাখিল। জিজ্ঞাসা করিল, "তার পর।"

দে। তার পর তোমাদের গিন্নীর জ্বালায় দিন কত দেখা শুনা হয় নাই। তার পর এখন বৈষ্ণবী হয়ে যাতায়াত করিতেছি। ছুঁড়ি বড় ভয় তরাসে; কিছুতে কথা কয় না। তবে আজি যে রকম ফুশ্‌লে এয়েছি, তাতে ছাড়ায় না—না হবে কেন—আমি দেবেন্দ্র।—অহং দেবেন্দ্র বাবু—হেউ! শিখে হো ছল ভেলা নট নাগর—তার পর মালিনী মাসি? কি বলিয়া পাঠিয়েছে? ভাল আছ ত, মালিনী মাসি? প্রাতঃপ্রণাম।

হীরা প্রায়াবরুদ্ধ কণ্ঠ হইতে দেবেন্দ্রের এই সকল কথা বাহির হইতে শুনিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। পরে হাসি সম্বরণ করিয়া বলিল, "রাত্রি ঢের হইল, এখন প্রণাম হই।" এই বলিয়া, হীরা মৃদুহাসি হাসিয়া, দণ্ডবৎ হইয়া, প্রস্থান করিল। দেবেন্দ্র তখন, ঝিমকিনি মারিয়া গায়িতে লাগিল ;—

বয়স তাহার বছর ষোল,
দেখ্‌তে শুনতে কালো কোলো,
পিলে অগ্নু মাসে ষোলো,
আমি তখন খানায় পোড়ে।
যেতেছিল বলদ একটা,
ভেঠেঙ্গো এক ঘোড়ায় চোড়ে।

সে রাত্রে হীরা আর দত্তবাড়ী গেল না, আপন গৃহে গিয়া শয়ন করিয়া রহিল। পরদিন প্রাতে গিয়া সূর্য্যমুখীর নিকট, দেবেন্দ্রের কথিত মত, তাহার সহিত কুন্দনন্দিনীর তিন বৎসর অবধি প্রণয়ের বৃত্তান্ত বিবৃত করিল এবং ইহাও প্রতিপন্ন করিল, যে এক্ষণে দেবেন্দ্র কুন্দনন্দিনীর জার স্বরূপ বৈষ্ণবী বেশে যাতায়াত করিতেছে।

শুনিয়া সূর্য্যমুখীর নীলোৎপললোচন রাঙ্গা হইয়া উঠিল। তাঁহার কপালে, শিরা স্থূলতা প্রাপ্ত হইয়া প্রকটিত হইল। কমলও সকল শুনিলেন। কুন্দকে সূর্য্যমুখী ডাকাইলেন। সে আসিলে পরে বলিলেন ;—

"কুন্দ! হরিদাসী বৈষ্ণবী কে, আমরা চিনিয়াছি। আমরা জানিয়াছি যে, সে তোর উপপতি। তুই যা, তা জানিলাম। আমরা এমন স্ত্রীলোককে বাড়ীতে স্থান দিই না। তুই বাড়ী হইতে এখনই দূর হ। নহিলে হীরা তোকে ঝাঁটা মারিয়া তাড়াইবে।"

কুন্দের গা কাঁপিতে লাগিল। কমল দেখিলেন যে, সে পড়িয়া যায়। কমল তাহাকে ধরিয়া শয্যা গৃহে লইয়া গেলেন। শয্যা গৃহে থাকিয়া আদর করিয়া সান্ত্বনা করিলেন, এবং বলিলেন, "বউ যাহা বলে, বলুক ; আমি উহার একটি কথাও বিশ্বাস করি না।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

অনাথিনী।

গভীর রাত্রে গৃহস্থ সকলে নিদ্রিত হইলে কুন্দনন্দিনী শয়নাগারের দ্বার খুলিয়া বাহির হইল। এক বসনে সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগ করিয়া গেল। সেই গভীর রাত্রে এক বসনে সপ্তদশ বর্ষীয়া, অনাথিনী সংসার সমুদ্রে একাকিনী ঝাঁপ দিল।

রাত্রি অত্যন্ত অন্ধকার। অল্পং মেঘ করিয়াছে, কোথায় পথ ?

কে বলিয়া দিবে, কোথায় পথ ? কুন্দনন্দিনী কখন দত্তদিগের বাটীর বাহির হয় নাই। কোন্ দিকে কোথা যাইবার পথ, তাহা জানে না। আর, কোথায়ই বা যাইবে ?

অট্টালিকার বৃহৎ অন্ধকারময় কায়া, আকাশের গায়ে লাগিয়া রহিয়াছে—সেই অন্ধকার বেষ্টন করিয়া কুন্দনন্দিনী বেড়াইতে লাগিল। মানস, একবার নগেন্দ্রনাথের শয়ন কক্ষের বাতায়ন পথের আলো দেখিয়া যায়। এক বার সেই আলো দেখিয়া চক্ষু জুড়াইয়া যাইবে।

তাঁহার শয়নাগার চিনিত—ফিরিতেং তাহা দেখিতে পাইল—বাতায়ন পথে আলো দেখা যাইতেছে। কবাট খোলা —সাসী বন্ধ—অন্ধকার মধ্যে তিনটি জানেলা জ্বলিতেছে। তাহার উপর পতঙ্গজাতি উড়িয়া উড়িয়া পড়িতেছে। আলো দেখিয়া উড়িয়া পড়িতেছে, কিন্তু রুদ্ধপথে প্রবেশ করিতে না পারিয়া,কাঁচে ঠেকিয়া ফিরিয়া যাইতেছে। কুন্দনন্দিনী এই ক্ষুদ্র পতঙ্গদিগের জন্য হৃদয় মধ্যে পীড়িতা হইল।

কুন্দনন্দিনী মুগ্ধ লোচনে সেই গবাক্ষ পথপ্রেরিত আলোক দেখিতে লাগিল —সে আলো ছাড়িয়া যাইতে পারিল না। শয়নাগারের সম্মুখে কতক গুলিন ঝাউ গাছ ছিল—কুন্দনন্দিনী তাহার তলায় গবাক্ষ প্রতি সম্মুখ করিয়া বসিল। রাত্রি অন্ধকার,চারিদিগ অন্ধকার, গাছেং খদ্যোতের চাকচিক্য সহস্রেং ফুটিতেছে, মুদিতেছে, মুদিতেছে ফুটিতেছে। আকাশে কালো মেঘের পশ্চাতে কালো মেঘ ছুটিতেছে—তাহার পশ্চাৎ আরও কালো মেঘ ছুটিতেছে—তৎপশ্চাতে আরও কালো। আকাশে দুই একটি নক্ষত্র মাত্র, কখন মেঘে ডুবিতেছে, কখন ভাসিতেছে। বাড়ীর চারি দিকে ঝাউ গাছের শ্রেণী, সেই মেঘময় আকাশে মাতা তুলিয়া, নিশাচর পিশাচের মত দাঁড়াইয়া আছে। বায়ুর স্পর্শে সেই করালবদনা নিশীথিনী অঙ্কে থাকিয়া, তাহারা আপনং পৈশাচী ভাষায় কুন্দনন্দিনীর মাতার উপর কথা কহিতেছে। পিশাচেরাও করাল রাত্রির ভয়ে, অল্প শব্দে কথা কহিতেছে। কদাচিৎ বায়ুর সঞ্চালনে, গবাক্ষের মুক্ত কবাট প্রাচীরে বারেক মাত্র আঘাত করিয়া শব্দ করিতেছে। কাল পেচা সৌধোপরি বসিয়া ডাকিতেছে। কদাচিৎ একটা কুক্কুর, অন্য পশু দেখিয়া, সম্মুখ দিয়া অতি দ্রুত বেগে ছুটিতেছে। কদাচিৎ ঝাউয়ের পল্লব অথবা ফল, খসিয়া পড়িতেছে। দূরে নারিকেল বৃক্ষের অন্ধকার, শিরোভাগ অন্ধকারে মন্দং হেলিতেছে; দূর হইতে তাল বৃক্ষের পত্রের তরং মর্ম্মর শব্দ কর্ণে আসিতেছে; সর্ব্বোপরি

সেই বাতায়ন শ্রেণীর উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে—আর পতঙ্গদল ফিরিয়া২ আসিতেছে। কুন্দনন্দিনী সেই দিকেই চাহিয়া রহিল।

ধীরে২ একটী গবাক্ষের সাসী খুলিল। এক মনুষ্যমূর্ত্তি আলোকপটে চিত্রিত হইল। হরি! হরি! সে নগেন্দ্রের মূর্ত্তি। নগেন্দ্র—নগেন্দ্র! যদি ঐ ঝাউতলার অন্ধকারের মধ্যে ক্ষুদ্র কুন্দ কুসুমটি দেখিতে পাইতে! যদি তোমাকে গবাক্ষ পথে দেখিয়া, তাহার হৃদয়াঘাতের শব্দ ঢুপ! ঢুপ! শব্দ—যদি সে শব্দ শুনিতে পাইতে—যদি জানিতে পারিতে, যে তুমি আবার এখনই সরিয়া অদৃশ্য হইবে, এই ভয়ে তাহার দেখার সুখ হইতেছে না! নগেন্দ্র! দীপের দিগে পশ্চাৎ করিয়া দাঁড়াইয়াছ—একবার দীপ সম্মুখে করিয়া দাড়াও! তুমি দাঁড়াও, সরিও না—কুন্দ বড় দুঃখিনী। দাঁড়াও—তাহা হইলে, সেই পুষ্করিণীর স্বচ্ছ শীতল বারি—তাহার তলে নক্ষত্রচ্ছায়া—তাহার আর মনে পড়িবে না।

ঐ শুন! কাল পেচা ডাকিল! তুমি সরিয়া যাইবে, আর কুন্দনন্দিনীর ভয় করিবে! দেখিলে বিদ্যুৎ! তুমি সরিও না—কুন্দনন্দিনীর ভয় করিবে। ঐ দেখ, আবার কালো মেঘ পবনে চাপিয়া যেন যুদ্ধে ছুটিতেছে। ঝড় বৃষ্টি হইবে। কুন্দকে কে আশ্রয় দিবে?

দেখ, তুমি গবাক্ষ মুক্ত করিয়াছ, ঝাঁকে২ পতঙ্গ আসিয়া তোমার শয্যাগৃহে প্রবেশ করিতেছে। কুন্দ মনে করিতেছে, কি পুণ্য করিলে পতঙ্গ জন্ম হয়। কুন্দ! পতঙ্গ যে পুড়িয়া মরে! কুন্দ তাই চায়। মনে করিতেছে, "আমি পুড়িলাম—মরিলাম না কেন?"

নগেন্দ্র সাসী বন্ধ করিয়া সরিয়া গেলেন। নির্দ্দয়! ইহাতে কি ক্ষতি! না, তোমার রাত্রি জাগিয়া কাজ নাই—নিদ্রা যাও—শরীর অসুস্থ হইবে। কুন্দনন্দিনী মরে, মরুক। তোমার মাতা না ধরে, কুন্দনন্দিনীর কামনা এই।

এখন আলোকময় গবাক্ষ যেন অন্ধকার হইল। চাহিয়া, চাহিয়া, চাহিয়া, চক্ষের জল মুছিয়া, কুন্দনন্দিনী উঠিল। সম্মুখে যে পথ পাইল—সেই পথে চলিল। কোথায় চলিল? নিশাচর পিশাচ ঝাউ গাছেরা সর২ শব্দ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কোথায় যাও?" তালগাছেরা তর২ শব্দ করিয়া বলিল, "কোথা যাও?" পেচক গম্ভীর নাদে বলিল, "কোথায় যাও?" উজ্জ্বল গবাক্ষ শ্রেণী বলিতে লাগিল, "যায় যাউক—আমরা আর নগেন্দ্র দেখাইব না।" তবু কুন্দনন্দিনী—নির্ব্বোধ কুন্দনন্দিনী, ফিরিয়া২ সেই দিকে চাহিতে লাগিল।

ও সূর্য্যমুখি! রাক্ষসি! ওঠ! দেখ আপনার কীর্ত্তি দেখ্! অনাথিনীকে ফেরাও!

কুন্দ চলিল, চলিল—কেবল চলিল। আকাশে আরও মেঘ ছুটিতে লাগিল—মেঘ সকল একত্র হইয়া আকাশেও রাত্রি করিল—বিদ্যুৎ হাসিল—আবার হাসিল—আবার! বায়ু গর্জ্জাইল, মেঘ গর্জ্জাইল—বায়ুতে মেঘেতে একত্র হইয়া গর্জ্জাইল। আকাশ আর রাত্রি একত্র হইয়া গর্জ্জাইল। কুন্দ! কুন্দ! কোথায় যাইবে?

ঝড় উঠিল। প্রথমে শব্দ, পরে ধূলি

উঠিল, পরে গাছের পাতা ছিঁড়িয়া লইয়া বায়ু স্বয়ং আসিল! শেষে পিট পিট!—পট পট!—হু হু! বৃষ্টি আসিল, একবসনা কুন্দ! কোথায় যাইবে?

বিদ্যুতের আলোকে পথপার্শ্বে কুন্দ একটি সামান্য গৃহ দেখিল। গৃহের চতুঃপার্শ্বে মৃৎপ্রাচীর; মৃৎপ্রাচীরে ছোট চাল। কুন্দনন্দিনী আসিয়া, তাহার আশ্রয়ে, দ্বারের নিকট বসিল। দ্বারে পিঠ রাখিয়া বসিল। দ্বার পিঠের স্পর্শে শব্দিত হইল। গৃহস্থ সজাগ, দ্বারের শব্দ তাহার কানে গেল। গৃহস্থ মনে করিল, ঝড়; কিন্তু তাহার দ্বারে একটা কুক্কুর শয়ন করিয়া থাকে—সেটা উঠিয়া ডাকিতে লাগিল। গৃহস্থ তখন ভয় পাইল। মন্দ আশঙ্কায় দ্বার খুলিয়া দেখিতে আইল। দেখিল, আশ্রয়হীনা স্ত্রীলোকমাত্র। জিজ্ঞাসা করিল, "কে গা তুমি?"

কুন্দ কথা কহিল না।

"কেরে মাগি!"

কুন্দ বলিল, "বৃষ্টির জন্য দাঁড়াইয়াছি।"

গৃহস্থ ব্যগ্রভাবে বলিল, "কি? কি? কি? আবার বল ত?" কুন্দ বলিল, "বৃষ্টির জন্য দাঁড়াইয়াছি।"

গৃহস্থ বলিল, "ও গলা যে চিনি। বটে? ঘরের ভিতর এসো ত।"

গৃহস্থ কুন্দকে ঘরের ভিতর লইয়া গেল। আগুন করিয়া আলো জ্বালিল। কুন্দ তখন দেখিল—হীরা।

হীরা বলিল, "বুঝিয়াছি, তিরস্কারে পলাইয়াছ। ভয় নাই। আমি কাহারও সাক্ষাতে বলিব না। আমার এই খানে দুই দিন থাক।"

ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্ত।

দ্বিতীয় সংখ্যা।

পুরাণে কোন কোন হিন্দু নৃপতির বর্ণনা দৃষ্ট হয়। শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণু পুরাণে শূদ্ররাজা নন্দবংশীয় নৃপতিগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্ত পুরাণে ভবিষ্যদ্বাণী-স্বরূপ লিখিত আছে, "মহানন্দির ঔরসে ও শূদ্রানীর গর্ব্ভে মহাবীর্য্যবান্ কুমার মহাপদ্ম নন্দির জন্ম হইবে। তাহার সময় হইতে ক্ষত্রীয় ভূপালগণের অবনতি ও ক্রমেং ভারত রাজ্য শূদ্র নৃপবর্গের কর কমলস্থ হইবেক। তিনি স্বীয় অসাধারণ শৌর্য্য বীর্য্য প্রভাবে একছত্র ধরণীমণ্ডলে অধীশ্বর হইয়া দ্বিতীয় ভার্গবের ন্যায় রাজ্য শাসন করিবেন। তাঁহার সুমাল্য প্রভৃতি অষ্টপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া এক শত বৎসর পৃথিবী শাসন করিবে। কৌটিল্য নামক জনৈক ব্রাহ্মণের ক্রোধহুতাশন প্রদীপ্ত হইয়া এই নব নন্দবংশ ধ্বংস হইবে এবং তৎকর্ত্তৃক ময়ুরীয় নৃপতি চন্দ্রগুপ্ত পাটলীপুত্রের সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন। বৃহৎকথা নামক গ্রন্থে পাটলীপুত্রের ও যোগানন্দের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থ ১০৫৯ খ্রীঃ অঃ সোমদেব ভট্ট কাশ্মীরাধিপতি

হর্ষদেবের পিতামহীর মনোরঞ্জনার্থ রচনা করেন। বিশাখদত্ত মুদ্রারাক্ষস নামক নাটকে, চাণক্য পণ্ডিতের অসাধারণ বুদ্ধিপ্রভাবে চন্দ্র গুপ্তের পাটলীপুত্রের সিংহাসনারোহণ ও নন্দবংশের ধ্বংস এবং রাক্ষসের প্রভুপরায়ণতার অতি উত্তম বর্ণন করিয়াছেন। চন্দ্র গুপ্ত মহানন্দের মুরা নাম্নী নীচজাতীয়া দাসীগর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। মগধদেশস্থ পাটলীপুত্র নগরী ইহাঁর রাজধানী ছিল। মুদ্রারাক্ষসে পাটলীপুত্রের অপর নাম কুসুমপুর লিখিত আছে। বায়ুপুরাণের মতানুসারে কুসুমপুর বা পাটলীপুত্র, অজাত শত্রুর পৌত্র রাজা উদয় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু মহাবংশের বর্ণনানুসারে উদয়, অজাত শত্রুর পুত্র ছিলেন। এই নগরী শোণ বা হিরণ্যবাহু নদীতীরে স্থাপিত ছিল,* সুতরাং আধুনিক পাটনা, প্রাচীন পাটলীপুত্র নামের অপভ্রংশ মাত্র। প্রথমাবস্থায় চন্দ্র গুপ্ত পঞ্জাবে অবস্থিতি করিতেন, ও এই প্রদেশে তক্ষশিলানিবাসী চাণক্য পণ্ডিতের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত অগণ্য হিন্দু নৃপতিগণের সহযোগে আলেক্জণ্ডারের গ্রীক সৈন্যগণকে এককালে ভারতবর্ষের শেষ সীমা হইতে দূরীভূত করিয়া দিয়াছিলেন। হিন্দু ভূপালবর্গের একতানিবন্ধন আলেকজণ্ডারের ন্যায় দিগ্বিজয়ী বীর ভারতবর্ষের কোন প্রধান নগরাধিকার করিতে পারেন নাই। কেবল পঞ্জাবের কিয়দংশ মাত্র জয় করিয়াছিলেন। চন্দ্র গুপ্ত পাটলীপুত্রের সিংহাসনারোহণ করিলে চাণক্যকে প্রধান অমাত্য পদাভিষিক্ত করেন। তাঁহার উপদেশ ভিন্ন সহসা কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। মহাবীর আলেকজণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রধান সেনাপতি সিল্যুকস্ সিরিয় হইতে বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে চন্দ্রগুপ্তকে দমন করণার্থ মগধাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু চন্দ্র গুপ্ত অসীম সাহস সহকারে তাঁহার গতি অবরোধ করায় তিনি সসৈন্য আর্য্যভূমি পরিত্যাগ করেন—এবং অবশেষে চন্দ্রগুপ্তের সহিত সন্ধিস্থাপিত হয়। তাঁহার একটী রূপলাবণ্যবতী দুহিতাকে চন্দ্র গুপ্তের সহিত বিবাহ দিলেন। চন্দ্রগুপ্ত যবনকন্যা সাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক বিবাহ করাতে হিন্দু গ্রন্থকারগণ তাহা লিপিবদ্ধ করেন নাই; কিন্তু গ্রীক পুরাবৃত্ত লেখক স্ত্রাবো এ বিষয় প্রকারান্তরে উল্লেখ করিয়াছেন। মেগাস্থিনিস্ গ্রীক রাজদূত স্বরূপ, পাটলীপুত্রে অবস্থিতি করিতেন। তাঁহার দ্বারায় গ্রীকগণের সহিত চন্দ্র গুপ্তের বন্ধুত্ব ক্রমে বদ্ধমূল হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত বাবিলন নগরীতে সেল্যুকাসের সমীপে সর্ব্বদা বহু মূল্য উপহার প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতেন। এ বিষয় সুবিখ্যাত যবন ইতিহাস লেখক জস্তিন, প্লুতার্ক, আরিয়ান প্রভৃতি স্ব২ ইতিহাসে লিখিয়া গিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্ত তৎকালে ভারতবর্ষীয় সকল নৃপতির শিরোরত্নস্বরূপ ছিলেন। তিনি ২৪ বৎসর রাজ্য শাসন করিয়া লোকান্তর গমন করেন। তাঁহার পুত্র বিন্দুসার ২৯১ খ্রীঃ পূঃ রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন। তাঁহার রাজ্য-

*শোণো হিরণ্য বাহুঃস্যাৎ-ইত্যমরকোষঃ।

কালে গ্রীকরাজদূত দ্যোনিসস্, নৃপতি টলমিফিলেদেলফস কর্ত্তৃক প্রেরিত হই-য়াছিলেন। ২৮০ খ্রীঃ পূঃ বিন্দুসার স্বীয় উপযুক্ত তনয় অশোকবর্দ্ধনকে তক্ষশিলায় নিযোজিত করেন। তিনি খশনামক অসভ্য জাতিদিগকে পরাজিত করিয়া তাঁহার পিতার আজ্ঞানুসারে উজ্জয়িনীর শাসন কর্ত্তার পদ প্রাপ্ত হইলেন। ২৬৩ খ্রীঃ পূঃ বিন্দুসারের মৃত্যু হইল। এবং অশোক রাজ্য লোভে অন্ধ হইয়া তাঁহার সহোদর তিষ্য ভিন্ন সকল ভ্রাতাকে বিনাশ করত মগধাধিপতি হইয়া নিষ্কন্টকে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। এই নিষ্ঠুর কার্য্য করায় তাঁহাকে সকলে চণ্ডাশোক বলিত। মহা-বংশে লিখিত আছে, ইনি তিন বৎসর কাল যাবৎ হিন্দুধর্ম্মে প্রবল বিশ্বাস অনু-সারে প্রত্যহ ৬০০০০ ষষ্টি সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন। অশোক বৌদ্ধ যতিগণের সহিত সর্ব্বদা ধর্ম্ম বিষয়ক তর্ক বিতর্ক করাতে হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেন, এবং প্রত্যহ ৬০০০০ ষষ্টি সহস্র ব্রাহ্মণের পরিবর্ত্তে ৬৪০০০ বৌদ্ধ গুরুকে অতীব ভক্তি-সহকারে ভোজন করাইতেন। বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিতে তিনি স্থানে স্থানে আচার্য্যবর্গকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন, এবং কিয়ৎকালের মধ্যে হিন্দু ধর্ম্ম ক্রমে তিরোহিত এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিশেষ সমুন্নতি হইতে লাগিল। কথিত আছে, তিনি ৮৪০০০ বিহার এবং কীর্ত্তিস্তম্ভ ভারতবর্ষের সকল স্থানে নির্ম্মাণ করিয়া-ছিলেন। আমরা কাশী, প্রয়াগ এবং দিল্লীতে তাঁহার স্তম্ভগুলি দর্শন করি-য়াছি। এক২ খণ্ড প্রস্তর নির্ম্মিত সুদীর্ঘ স্তম্ভের অঙ্গে, পালি ভাষায় পশুহিংসা নিবারণ, ধর্ম্মশালা সংস্থাপন, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার, প্রভৃতি সৎকার্য্য করিতে প্রজা-বর্গের প্রতি নৃপতি অশোকের আজ্ঞা, খোদিত রহিয়াছে। অশোককে প্রজাগণ অসীম ভক্তি করিত এবং তিনিও তাহা-দিগকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতেন। তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষের যৎপরোনাস্তি উন্নতি হইয়াছিল। তিনি সমুদয় ভার-তবর্ষ এবং তাতার দেশ পর্য্যন্ত অধি-কার করিয়াছিলেন; তাঁহার খোদিতা পালিভাষা লিপি কাবুলে কপর্দ্দগিরি নামক অদ্রি অঙ্গ শোভিত করিয়াছিল। এই লিপি মধ্যে আন্তোকস্, টলেমি, অন্তিগোনস এবং মগাযবন নৃপতির নাম পাওয়া গিয়াছে। ও সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের এত উন্নতি হইয়াছিল যে, সৈবিরিয়া, চীন, গ্রীক, প্রভৃতি বিদেশীয়গণও এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। গ্রীক যতিগণকে "যবনধর্ম্ম রক্ষিত" বলিত। ধর্ম্মপ্রচারক-গণ অকুতোভয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করি-য়া মহিলাবর্গকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করি-তেন। এই রূপ বৌদ্ধধর্ম্মের বহুল প্রচার হওয়াতে পাপকার্য্য এককালে ভারতভূমি হইতে তিরোহিত হইল। পাণ্ডবগণ কিম্বা অন্য কোন ভূপতির সময়ে ভারত ভূমির এতাদৃশ উন্নতি কখনই হয় নাই। গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, ধর্ম্মশালা, বিহার, চৈত্য সংস্থাপিত এবং জলাশয়, প্রশস্ত প্রস্তর-নির্ম্মিত রথ্যা সেতু প্রভৃতি নির্ম্মিত হই-য়াছিল। এক্ষণে অশোক, পালিভাষায় "দেবানাম্ পিয় পিয়দশি" অর্থাৎ দেব-

তার প্রিয় প্রিয়দর্শী এবং ধর্ম্মাশোক নামে খ্যাত হইলেন। দ্বীপ বংশে এবং মহাবংশে লিখিত আছে, অশোকপুত্র মহামহেন্দ্র ঈত্তেয়, উত্তেয়, সম্বল, ভাদ্র শাল নামক স্থবির সমভিব্যাহারে সিংহল দ্বীপে পোতারোহণে গমন করিয়া তাঁহার খুল্লতাত নৃপতি তিষ্য এবং সমুদয় প্রজাকে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী করিয়াছিলেন। অশোকের সময়ে মগধদেশে বৌদ্ধ আচার্য্যগণের তিনটী সভা হইয়াছিল। এই সভায় শাক্য সিংহের উপদেশ সূত্রনিচয় সটীক লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। এই সংগ্রহের নাম ত্রিপিটক। বুদ্ধঘোষ নামক জনৈক মৈথিলি ব্রাহ্মণ, ইহার অর্থকথা পালিভাষায় সিংহলদ্বীপবাসীগণের জন্য প্রস্তুত করেন।

২২২ খ্রীঃ পূঃ নৃপতি অশোকের মৃত্যু হয়। ইনি ৪১ বৎসর রাজ্য করিয়াছিনে। বিষ্ণু পুরাণ, ভাগবত, বায়ু পুরাণ, এবং মৎস্য পুরাণে ইহাঁর বিবরণ লিখিত আছে। তাঁহার মৃত্যুর পর ময়ূরীয় সপ্ত জন বৌদ্ধ নৃপতি সুখস্বচ্ছন্দে ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহারা হীনবল হইয়া আসিলে, সঙ্গবংশীয় নৃপতিগণ পাটলীপুত্রের সিংহাসনারূঢ় হয়েন। এই বংশীয় রাজা পুষ্পমিত্র ১৮৮ খ্রীঃ পূঃ একটী প্রকাণ্ড বুদ্ধস্তূপ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। দেবাভূতি সঙ্গবংশের শেষ নৃপতি, ও তাঁহার মৃত্যুর পর কণ্বংশীয় ভূপালগণ ৩১ খ্রীঃ পূঃ পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়াছিলেন। এ সময় হিন্দু ধর্ম্মের প্রবল জ্যোতিঃ দিন দিন বিকীর্ণ হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মকে মলিন করিয়াছিল। অশোকের পরে কেহই ভারতবর্ষের একেশ্বর হইতে পারেন নাই। মগধরাজ্য কিছুকাল গুপ্ত বংশীয় নৃপতিগণের অধীনে ছিল। মহারাজ গুপ্ত, গুপ্ত বংশের আদি পুরুষ। তাঁহার রাজ্যকাল হইতে ৩১৯ খ্রীঃ অঃ গুপ্ত অব্দের প্রথম বর্ষ গণনা করা যায়। এলাহাবাদ ও ভিটারীর লাট প্রস্তরে প্রখোদিত লিপি পাঠে অবগত হওয়া যায়, "মহারাজ অধিরাজ" সমুদ্র গুপ্ত ভারতবর্ষের একজন প্রবলপরাক্রান্ত ভূপতি ছিলেন। ইনি গুপ্ত বংশীয় চতুর্থ নৃপতি। সমুদ্রগুপ্ত শত্রুবর্গের কৃতান্তস্বরূপ এবং সজ্জনের সাক্ষাৎ জনিতা স্বরূপ ছিলেন। তিনি নিজ অসীম ভুজবলে সিংহল, সৌরাষ্ট্র, নেপাল, আসাম প্রভৃতি বিবিধ রাজ্যে স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করেন। এক্ষণ হইতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি পৃথক২ রাজ্য ভিন্ন২ নৃপতির শাসনাধীনে ছিল।

উজ্জয়িনীর অধিপতি বিক্রমাদিত্য অতি বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার রাজ্যকালে উৎকৃষ্ট২ কাব্য, নাটক, প্রচারিত হইয়া সংস্কৃত সাহিত্যসংসার উজ্জ্বল করিয়াছে; তিনি ৭৮ খ্রীঃ পূঃ শকদিগকে দমন করিয়াছিলেন। কান্যকুব্জের রাজসিংহাসনে যে সকল হিন্দু নৃপতি আসীন ছিলেন, তাহার মধ্যে হর্ষবর্দ্ধনের নাম ভুবনবিখ্যাত। জনৈক বৌদ্ধপরিব্রাজক হিয়াঙ্গ সাঙ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি আপন ভ্রমণবৃত্তান্ত মধ্যে লিখিয়াছেন যে, হর্ষবর্দ্ধন প্রায় ৩৫ বৎসর সুখে রাজ্য করিয়া ৩৫০ খ্রীঃ অঃ মানবলীলা সম্বরণ করেন।

বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থকার ধারানগরাধিপতি ভোজ রাজের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ভোজরাজ বিবিধ বিদ্যাবিশারদ ছিলেন, এবং স্বীয় অসীম কবিত্ব শক্তি প্রভাবে "সরস্বতী কণ্ঠাভরণ" নামক প্রসিদ্ধ অলঙ্কার গ্রন্থ রচনা করেন। বল্লাল কৃত "ভোজপ্রবন্ধে" লিখিত আছে, "ধারানগরে কোন মূর্খ ছিল না। শ্রীমন ভোজরাজকে সতত বররুচি, সুবন্ধু, বাণ, ময়ূর, বামদেব, হরিবংশ, শঙ্কর, বিদ্যাবিনোদ, কোকিল, তারেন্দ্র প্রভৃতি ৫০০ শত বিদ্বান ব্যক্তি বেষ্টন করিয়া থাকেন।" পাল বংশীয়, এবং গঙ্গাবংশীয় ভূপালবর্গ গৌড় ও উড়িষ্যার অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহাদিগের বিস্তারিত বিবরণ সংস্কৃত কোন গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া প্রাচীন তাম্র শাসন, প্রস্তর ফলকে প্রখোদিত বংশাবলী বর্ণন, স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রভৃতি হইতে এই সকল বংশের বিবরণ কথঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া ইতিহাস মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। চীন দেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফাহিয়ান ও হিয়ান্থ সাঙ ভারতবর্ষের সকল প্রসিদ্ধ স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া হিন্দু ও বৌদ্ধ নৃপতিগণের অনেক বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের গ্রন্থ সকল ফ্রেঞ্চ ও ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত হওয়াতে আমরা অনেক বিবরণ জানিতে পারিতেছি। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় তাম্র শাসন পত্র হইতে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ, "সোম বংশীয়" গৌড় দেশস্থ সেনরাজাদিগের বংশাবলীর প্রকৃত ইতিহাস প্রকাশ করিয়া সর্ব্বসাধারণের ভ্রম নিরসন করিয়াছেন। এক্ষণে সেন রাজারা বৈদ্য বলিয়া কাহার ভ্রম হইবে না। কলীতিহাস ১০৭ পৃষ্ঠায় সেন বংশোপাখ্যানে, তাঁহাদিগকে গ্রন্থকার মহাশয় বৈদ্য স্থির করিয়াছেন, কিন্তু তাম্র শাসন মধ্যে তাঁহারা ক্ষত্রিয় ছিলেন, এ বিষয় স্পষ্ট সপ্রমাণিত হইয়াছে।

সংস্কৃত ভাষার ইতিহাস মধ্যে রাজতরঙ্গিণী অতীব প্রামাণিক। কাশ্মীর দেশের পুরাবৃত্ত ইহার প্রথমাংশ। ১১৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাশ্মীরেতিহাস কহ্লণ পণ্ডিত বিরচিত। দ্বিতীয়াংশ রাজাবলী যোণরাজ কৃত। এই অংশ খণ্ডিত পাওয়া গিয়াছে। তৃতীয়াংশ যোণরাজছাত্র শ্রীধর পণ্ডিত বিরচিত, এবং চতুর্থাংশ প্রাজ্য ভট্ট প্রণীত। শেষাংশে আকবরপ্রেরিত কাসিম খাঁ কর্ত্তৃক কাশ্মীর জয় ও শাহা আলমের রাজ্য শাসন পর্য্যন্ত বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। এই কাশ্মীর দেশীয় রাজকীয় ইতিহাস মৃত মুর্করাফক* সাহেব কাশ্মীর নিবাসী শিবস্বামীর নিকট হইতে বহু যত্নে সংগ্রহ করেন। পরে আসিয়াটিক সোসাইটী কর্ত্তৃক ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে চারি অংশ একত্রে মুদ্রিত হয়। পারিস নগরীতে ট্রয়র সাহেবও ইহার কিয়দংশ ফ্রেঞ্চ ভাষার অনুবাদসহ মুদ্রিত করিয়াছেন। কহ্লণ প্রণীত প্রথমাংশে বিখ্যাত হিন্দু নৃপতিগণের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। ১১১৫ খ্রীঃ অব্দে কহ্লণ, চম্পকতনয় সিংহদেব ভূপ-

* Moorcroft.

তির কাশ্মীর শাসন কালে এই গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি নীলপুরাণ ও অপর একাদশ খানি প্রাচীন গ্রন্থ, ধর্ম্ম শাস্ত্র, তাম্র শাসন পত্র প্রভৃতি হইতে এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। কহ্লণ রাজ-তরঙ্গিণীর প্রথমে পৌরানিক বিবরণ, তৎপরে ২৪৪৮ খ্রীঃ পূঃ গোনর্দ্দ ভুপতির রাজ্যকাল হইতে ৯৪৯ শকে সংগ্রাম-দেবের রাজ্য শাসন পর্য্যন্ত ইতিহাস লিখিয়াছেন। কাশ্মীররাজ শ্রীহর্ষদেব রত্নাবলী ও নাগানন্দ রচনা করেন। রাজতরঙ্গিণীপ্রণেতা তাঁহার কবিত্ব-শক্তির প্রশংসা করিয়াছেন। ললিতা-দিত্য মধ্যআসিয়া পর্য্যন্ত জয় করিয়া-ছিলেন, এবং গোপাদিত্য নরেন্দ্রাদিত্য রণাদিত্য প্রভৃতি হিন্দু ভুপালবর্গ কর্ত্তৃক অতি সুনিয়মে কাশ্মীর রাজ্য শাসিত হইয়াছিল।

বঙ্গদেশের একখানি মাত্র সংস্কৃত ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এখানি নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভা-সদ জনৈক ব্রাহ্মণের রচিত ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত। কবিবর ভারতচন্দ্র এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া মান সিংহ রচনা করিয়াছেন। প্রাচীন সংস্কৃত এবং পালিগ্রন্থে তথা প্রস্তরফলক ও তাম্র শাসনে যে সকল প্রধান ভারত-বর্ষীয় নৃপতির বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ অদ্য পাঠক-বর্গকে উপহার দিলাম।

দেবনিদ্রা।

১

কোন মহামতি মানবসন্তান,
বুঝিতে বিধির শাসন-বিধান,
অধীর হইল বাসনানলে ;—
"অবনী ত্যজিয়া অমর-আলয়ে
প্রবেশি দেখিব দেবতানিচয়ে—
দেব পুরন্দর, রবি, হুতাশন,
বায়ু, হরি, হর, মরালবাহন,
দেখিব ভাসিছে কারণ জলে।

২

"দেখিব কারণ সলিলে ভাসিয়া,
চলেছে কিরূপে নাচিয়া নাচিয়া,
পরমাণু-রেণু সময় বয়ে।
দেখিব কিরূপে আয়ুর সঞ্চার,
দেহের প্রকৃতি, কালের আকার,
জ্যোতিঃ, অন্ধকার, জগতস্বরূপ,
নিয়তি-শৃঙ্খল, দেখিব কিরূপ"—
ভাবিতে লাগিল অধীর হয়ে।

৩

"আয় রে মানব" হলো দৈবধ্বনি,
বাজিল দুন্দুভি, ডাকিল অশনি,
খুলিল অমর-আলয় দ্বার ;
ছুটিল আলোক ত্রিলোক পূরিয়া,
অপূর্ব্ব সৌরভ জগত ব্যাপিয়া
তরঙ্গ বহিল,—শ্রবণ ভরিল
অমর-সঙ্গীত সুধার ভার।

৪

মানবনন্দন, অমরভবনে,
আসিয়া তখন পুলকিত মনে,
দেখিল চাহিয়া অমরালয় ;
গগনমণ্ডলে নিয়ত কেবলি,
মধুর নিনাদে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী,

দেখিল ছুটিছে,—আশে পাশে তার,
পরিকন্যাগণ করিয়া ঝঙ্কার,
সাধিছে বাদন মাধুরীময়।

৫

জ্বলিছে তপন গগন-প্রাঙ্গণে,
অনল-সমুদ্র যেন বা কিরণে,
শিখার তরঙ্গ ছুটে বেড়ায়।
দেখিল আনন্দে তাহাতে আসিয়া,
সুবর্ণ-কলস কিরণে পূরিয়া,
দৈত্যসুতাগণ করে পলায়ন,
কিরণরজ্জুতে করিয়া ধারণ,
আদিত্য বাঁধিছে গ্রহের গায়।

৬

আদিত্য ঘেরিয়া চলেছে ঘুরিয়া,
বিধুর মণ্ডল দেখিল আসিয়া,
দেখিল তাহাতে সুধার হ্রদ;
সে হ্রদ-সুধাতে পিপাসা মিটাতে,
প্রণয়বিধুর, হৃদয় ব্যথাতে,
অসংখ্য অমর দানবমণ্ডলী,
কূলেতে বসিয়া হয়ে কুতূহলী,
তুষিছে অমিয়া মধুর মদ।

৭

সুখে নিদ্রা যায় দেবতা সকলে,
গিরি, উপবন, কানন, কমলে,
ত্রিদশমণ্ডলে সৌরভ বয়।—
অমর নীরব, নাহি কলরব,
শূন্যেতে কেবলি মধুর সুরব
সঙ্গীত ঝরিছে, ত্রিদিব পূরিছে,—
"শান্তি—শান্তি" শবদ হয়।

৮

দেব অট্টালিকা চন্দ্রাতপ তলে,
দেব আখণ্ডল পারিজাত গলে,
অতুল মহিমা বদনে ভাতি;
অপূর্ব্ব শয়নে সুখে নিদ্রা যায়,
পদতলে ইন্দ্র-মাতঙ্গ ঘুমায়,
চৌদিক ঘেরিয়া দামিনী বেড়ায়,
পুষ্কর প্রভৃতি মেঘের পাঁতি।

৯

মহা তেজস্কর, প্রচণ্ড ভাস্কর
ঘুমায় অম্বরে, খুলিয়া সুন্দর
সহস্রকিরণ কিরীটী ভূষা!
ধরিয়া কিরণ-বরণ সুষমা,
জলধনু তনু জিনিয়া উপমা,
শ্বেত, পীত, নীল, রক্তিমা সঙ্গেতে,
সুবর্ণ ঝরিয়া পড়িছে অঙ্গেতে—
নিকটে স্যন্দন, অরুণ, ঊষা।

১০

খুলে মৃগ-চিহ্ন, অতুলিত শোভা,
অমল সুন্দর তনু মনোলোভা,
শশাঙ্ক ভাসিছে কিরণ জালে।
সে তনু দেখিতে কিন্নর-কুমার,
শত শত দল, অপূর্ব্ব আকার,
রয়েছে দাঁড়ায়ে বিস্ময়ে পূরিয়া—
সুধার সুগন্ধে আনন্দে মাতিয়া,
উড়িছে চকোর অযুত পালে।

১১

শশীতনুছটা পড়িছে উথলি,
দেব-ক্রীড়াবন নন্দন উজলি—
মেরু, মন্দাকিনী, তরু—চূড়ায়;
কুসুম আকৃতি অপ্সরা, কিন্নরী,
কর, বক্ষ, ক্রোড়ে, বাদ্য যন্ত্র ধরি,
শুয়ে সারি সারি লতা পুষ্প পরে,
বিমল চন্দ্রমা কিরণে বিহরে,—
মন্দার কুসুমে সচী ঘুমায়।

১২

ত্রিদিব জুড়িয়া দেবতা নিদ্রিত,
সহসা মানব সভয়ে চকিত,
শুনিল গম্ভীর জীমূতনাদ।
দেখিল আতঙ্কে, নয়ন ফিরিয়া
গগন উপান্তে, একত্রে মিশিয়া,
খেলিছে অসংখ্য বিজুলি ছাঁদ।

১৩

অধঃতলে তার, অনন্ত বিস্তার,
কারণ জলধি পরি বীচিহার,

উথলিছে রঙ্গে, ছড়ায়ে তরঙ্গে
অনন্ত প্রবাহ বহিছে তার।
গহ্বরে গহ্বরে, উপকূল ধারে,
প্রচণ্ড হুঙ্কারে মারুত প্রহারে,
ছিঁড়িতে বন্ধন শৃঙ্খল ভার।

১৪

উপকূল ধারে, অনল কুণ্ডেতে,
শিখর প্রমাণ, শিখার শুণ্ডেতে,
অনল উঠিছে গগনভালে,
ছুটিয়া পবনে, গভীর গর্জ্জনে,
যেন ঐরাবত, কর আকর্ষণে,
জল-স্তম্ভ ধরি শুণ্ডেতে উগরি,
ফেলিছে তুলিছে জলদজালে।

১৫

কারণসাগরে, পরমাণু করে,
অনাদি—পুরুষ বসি ধ্যান ভরে,
ছাড়িছে নিশ্বাস—জন্মিয়া তায়,
অসংখ্য অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড ফুটিয়া,
অসীম অনন্ত আকাশে উঠিয়া,
ছুটিছে অনল-স্ফুলিঙ্গ প্রায়।

১৬

কত সূর্য্য, তারা, কত বসুমতী,
স্বর্গ, মর্ত কত, অস্ফুট মুরতি,
ভাসিয়া চলেছে কারণ জলে;—
কত বসুন্ধরা, রবি, শশী, তারা,
জগতব্রহ্মাণ্ড, হয়ে রূপ হারা,
খসিয়া পড়িছে, সলিলে ডুবিছে,
কারণ-বারিধি অতল তলে।

১৭

সে বারিধি নীরে এসেছে মিশিয়া,
দেখিল মানব পুলকে পূরিয়া,
কালের তরঙ্গ বিপুল কায়;
বহিছে দ্বিধারে, দ্বিবিধ প্রকারে,
এক ধারা পরে, মানব-আকারে,
কতই পরাণী ভাসিছে তায়।

১৮

অমল কমলে ভাসিছে সকলে,
ধনুঃধারী কেহ, কারো করতলে
লেখনী, পুস্তক ছড়ান রয়।
ত্রিদিব জুড়িয়া দেবতা নিদ্রিত,
সুপ্ত ইহারা জগতে জাগ্রত,
" মা ভৈ—মা ভৈ " গভীর উচ্ছ্বাসে,
স্বজাতি ডাকিয়া চলেছে উল্লাসে,—
কালের তরঙ্গ করিয়া জয়।

১৯

সে নরমণ্ডলে মানব কুমার,
স্বজাতি হেরিল কত আপনার,
পুলকে পূরিল মোহিত হয়ে;—
বাজিল দুন্দুভি, সহসা অমনি,
সুদূর গগনে হলো দৈববাণী,—
"দেখ্‌রে, মানব, এ দিকে চেয়ে!"

২০

দেখিল চমকি কালনদীতীরে,
গভীর চিন্তায় চলে ধীরে ধীরে,
বাহিয়া দ্বিতীয় বেণীর ধারা,
" মা ভৈ " নিনাদ শুনিতে শুনিতে,
মানব ক জন, পুলকিত চিতে,
দেবতনু-ছটা বদনে ভরা।

২১

পশ্চাতে পশ্চাতে করি জয়ধ্বনি,
চলেছে মানব, মানবনন্দিনী,
তূরি, শঙ্খনাদে পূরিছে অবনী,
সাগর কল্লোলে উঠিছে গীত;
উঠিছে সঙ্গীত নিনাদ গভীর—
হোক্ না কেন এ মাটীর শরীর,
মানবের জাতি হবে না ত লীন,
তারা, সূর্য্য, শশী আছে যত দিন—
তবে রে, মানব, কেন ভাবিত?"
ডাকিছে আবার আনন্দ আরবে—
"সময় বিজয়ী আয় জীব সবে,
"গাহিয়া আনন্দে অমর গীত।—

২২

"দেব অংশে জন্ম, পর দেবমালা,
"কর মর্ত্তভূমি জগতে উজালা;
"দনুজারি তেজে অবনী—অঙ্কেতে,
"কর সিংহনাদ বিজয় শঙ্খেতে,

"জাগুক জগতে মানব নাম;
জাগুক ত্রিদিবে দেবতামণ্ডলী,
দানব গন্ধর্ব্ব হয়ে কুতূহলী,
দেখুক চাহিয়া, ভবিষ্য খুলিয়া,
ত্রিলোক উজ্জ্বল মানব-ধাম!"

২৩

সে গীতের সহ ঘন ঘোর স্বরে,
বাজে শৃঙ্গনাদ, শুনিল অন্তরে,
দেখিল চাহিয়া নরকুমার—
শত শত দলে, মানব সকলে,
করে সিংহনাদ, মহা গর্ব্বে চলে,
বলে উচ্চৈঃস্বরে এ ধরা মণ্ডলে—
" স্বাধীনতা সম কি আছে আর।"

২৪

"স্বাধীনতা তরে দেবাসুর মরে
"কোরে ঘোর রণ, অমরা ভিতরে,
"দৈত্য কুলনাশ করে, মুণ্ড মালা
"পরে মহাকালী, দনুজারিবালা,
"নিঃদৈত্য করিয়া অমর বাস।
"স্বাধীনতা গুণে, এ মর ভবনে,
"কত মহাজন প্রাণ দিয়া রণে,
"গেল স্বর্গে চলি, দিয়া নরবলি,
"অবনী-দানবে করিয়া নাশ।

২৫

"এ মর্ত্ত্য পুরীতে সেই ধন্য জাতি,
"স্বাধীনতা—জ্যোতি বদনেতে ভাতি,
"তেজোগর্ব্ব ধরি থাকে নিজ বাসে,
"হেরে পুত্র, দারা, প্রাণের হরষে,
"হাসিতে, কাঁদিতে করে না ভয়।
"করে না কখন পাদ্যঅর্ঘ দান
"পর পদ-তলে, হয়ে ম্রিয়মাণ,
"কৃতাঞ্জলি করে, ভীরুতার স্বরে,
"বলে না কখন ঘাতকে জয়।

২৬

"কার তরে বল এ ধন সম্বল,
"অরে পরাধীন, পরেরি সকল.
"দারা, পুত্র, গৃহ কি হবে তোর।
"স্বাধীনতা বিনে, আলয় বিপিনে,
"জীবনের সুখ, পাবিনে পাবিনে—
"দিবস, শর্ব্বরী, সকলি ঘোর।"

২৭

কুসুমিত তনু, কদম্বের প্রায়,
মানবনন্দন দেখে পুনরায়,
সেই জ্যোতির্ম্ময় দেব-আকৃতি,
আবার ক জন, প্রফুল্ল নয়ন,
প্রকৃতি-প্রতিমা করেছে ধারণ,
করেছে ধারণ বায়ু, জলধারা,
শনি, শুক্র, বুধ, বসু, গুহ, তারা,
রাহু, রবি, কেতু, শশীর পরিধি,
কেহ বা ধরেছে পৃথিবী, জলধি,—
গাহিছে নিসর্গ নিয়ম-গীতি।

২৮

"তেজোপিণ্ডবৎ, ধূম, বাস্প ময়,(১)
"ছিল এ ধরণী ধাতু, শঙ্খালয়,
"ক্রমে মৃণময়, মীন, কূর্ম্মবাস,
"তৃণ, তরু, মৃগ, মনুর আবাস,—
" সাজিল ধরণী অপূর্ব্ব কায়।
"চল চল যাই পৃথিবীর সনে,
"দিবাকর পাশে দেখিব গগনে,
"এই শশধর, আরো কত ক্ষিতি,
"চারি চন্দ্র শোভা ঘেরে বৃহস্পতি;
"জ্যোতি-উপবীত পরে মনোহর,
"লয়ে সপ্ত শশী ভ্রমে শনৈশ্চর;
"ভ্রমে কেতুমালা তপনে বেড়িয়া,
"অনন্ত গগনে পরিধি আঁকিয়া;
"তারকা-কুসুম ছড়ান তায়।

২৯

"ধরিব গগনে পবনের গতি,
"তরল বায়ুতে শবদ-মূরতি
"রাখিব বাঁধিয়া, দেখিব খুলিয়া
"রবির কিরণ গঠন-প্রথা;
"আনিব নামায়ে ভীষণ অশনি,
"পৃথিবী উপরে, —বাসবশিঞ্জিনী

(১) এক্ষনকার বৈজ্ঞানিকদিগের মতে আদিতে পৃথিবী জলময় ছিল; কিন্তু এ বিষয়ে এখনও স্থির হয় নাই।

"ধরিব সুন্দর দামিনী-লতা।
"চল চল যাই পৃথিবীর সনে,
"দিবাকর পাশে দেখিব গগনে,
"তারকা কুসুম ছড়ান তায়।"

গাহিতে গাহিতে চলেছে সকলে
এই মহাগীত, ভীম কোলাহলে,—
নিয়তি শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া পায়।
(অসম্পূর্ণ।)

বঙ্গদেশের কৃষক।

প্রথম পরিচ্ছেদ।—দেশের শ্রীবৃদ্ধি।

আজি কালি বড় গোল শুনা যায় যে, আমাদের দেশের বড় শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। এত কাল আমাদিগের দেশ উচ্ছন্ন যাইতেছিল, এক্ষণে ইংরাজের শাসন কৌশলে আমরা সভ্য হইতেছি। আমাদের দেশের বড় মঙ্গল হইতেছে।

কি মঙ্গল, দেখিতে পাইতেছ না? ঐ দেখ, লৌহবর্ত্মে লৌহতুরঙ্গ, কোটি উচ্চৈঃশ্রবাকে বলে অতিক্রম করিয়া, এক মাসের পথ এক দিনে যাইতেছে। ঐ দেখ, ভাগীরথীর যে উত্তাল তরঙ্গমালায় দিগগজ ভাসিয়া গিয়াছিল, অগ্নিময়ী তরণি ক্রীড়াশীল হংসের ন্যায় তাহাকে বিদীর্ণ করিয়া বাণিজ্য দ্রব্য বহিয়া ছুটিতেছে। কাশীধামে তোমার পিতার অদ্য প্রাতে সাংঘাতিক রোগ হইয়াছে—বিদ্যুৎ আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া তোমাকে সম্বাদ দিল, তুমি রাত্রিমধ্যে তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলে। সে রোগ পূর্ব্বে আরাম হইত না, এখন নবীন চিকিৎসাশাস্ত্রের গুণে ডাক্তারে তাহা আরাম করিল। যে ভূমিখণ্ড, নক্ষত্রময় আকাশের ন্যায় অট্টালিকাময় হইয়া এখন হাসিতেছে, আগে উহা ব্যাঘ্র ভল্লূকের আবাস ছিল। ঐ যে দেখিতেছ, রাজপথ, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ঐ স্থানে সন্ধ্যার পর, হয় কাদার পিছলে পা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া থাকিতে, না হয় দস্যুহস্তে প্রাণত্যাগ করিতে; এখন সেখানে গ্যাসের প্রভাবে কোটিচন্দ্র জ্বলিতেছে। তোমার রক্ষার জন্য পাহারা দাঁড়াইয়াছে, তোমাকে বহনের জন্য গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। যেখানে বসিয়া আছ, তাহা দেখ। যেখানে আগে ছেঁড়া কাঁথা, ছেঁড়া সপ ছিল, এখন সেখানে কার্পেট, কৌচ, ঝাড়, কাণ্ডেলাব্রা, মারবেল, আলাবাষ্টার,—কত বলিব? যে বাবু দূরবীন কষিয়া বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহগণের গ্রহণ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে জন্মিলে উনি এত দিন চাল কলা ধুপ দীপ দিয়া বৃহস্পতির পূজা করিতেন। আর আমি যে হতভাগা, চেয়ারে বসিয়া ফুলিস্কেপ কাগজে বঙ্গদর্শনের জন্য সমাজতত্ত্ব লিখিতে বসিলাম, এক শত বৎসর পূর্ব্বে হইলে, আমি এতক্ষণ ধরাসনে পশুবিশেষের মত বসিয়া ছেঁড়া তুলট্ নাকের কাছে ধরিয়া নবমীতে লাউ খাইতে আছে কি না,

সেই কচ কচিতে মাতা ধরাইতাম। তবে কি দেশের বড় মঙ্গল হইতেছে না? দেশের বড় মঙ্গল—তোমরা একবার মঙ্গলের জন্য জয়ধ্বনি কর!

এই মঙ্গল ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটা কথা জিজ্ঞাস্য আছে, কাহার্ এত মঙ্গল? ঐ যে হাসিম শেখ, আর রামা কৈবর্ত্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে, খালি মাতায়, খালি পায়ে, এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট বলদে, ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চসিতেছে, উহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? উহাদের এই ভাদ্রের রৌদ্রে মাতা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, তাহার নিবারণজন্য অঞ্জলি করিয়া মাঠের কর্দ্দম পান করিতেছে; ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে, কিন্তু এখন বাড়ী গিয়া আহার করা হইবে না, এই চাসের সময়। সন্ধ্যা বেলা গিয়া উহারা ভাঙ্গা পাতরে রাঙ্গা২ বড়২ ভাত, লুন লঙ্কা দিয়া আধ পেটা খাইবে। তাহার পর ছেঁড়া মাদুরে, না হয়, ভূমে, গোহালের এক পাশে শয়ন করিবে—উহাদের মশা লাগে না। তাহার পর দিন প্রাতে আবার সেই এক হাঁটু কাদায় কাজ করিতে যাইবে—যাইবার সময়, হয় জমীদার, নয় মহাজন, পথ হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়া দেনার জন্য বসাইয়া রাখিবে, কাজ হইবে না। নয়ত, চসিবার সময় জমীদার জমীখানি কাড়িয়া লইবে, তাহা হইলে সে বৎসর কি করিবে? উপবাস—সপরিবারে উপবাস। বল দেখি, চষ্‌মা নাকে বাবু! ইহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? তুমি লেখা পড়া শিখিয়া ইহাদিগের কি মঙ্গল সাধিয়াছ? আর তুমি, ইংরাজ বাহাদুর! তুমি যে মেজের উপরে এক হাতে হংস পক্ষ ধরিয়া বিধির সৃষ্টি ফিরাইবার কল্পনা করিতেছ, আর অপর হস্তে ভ্রমরকৃষ্ণ শ্মশ্রু গুচ্ছ কণ্ডূয়িত করিতেছ—তুমি বল দেখি, যে তোমাহইতে এই হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত্তের কি উপকার হইয়াছে?

আমি বলি, অনুমাত্র না, কণামাত্রও না। তাহা যদি না হইল, তবে আমি তোমাদের সঙ্গে মঙ্গলের ঘটায় হুলুধ্বনি দিব না। দেশের মঙ্গল? দেশের মঙ্গল, কাহার্ মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয় জন? আর এই কৃষিজীবী কয় জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয় জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ—দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তোমাহইতে আমাহইতে কোন কার্য্য হইতে পারে? কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে? কি না হইবে? যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই।

দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, স্বীকার করি। আমরা এই প্রবন্ধে একটী উদাহরণের দ্বারা প্রথমে দেখাইব যে, দেশের কি প্রকারে শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। পরে দেখাইব যে, কৃষকেরা সে শ্রীবৃদ্ধির ভাগী নহে। পরে দেখাইব যে, তাহা কাহার্ দোষ।

ব্রিটিশ অধিকারে রাজ্য সুশাসিত। পরজাতীয়েরা জনপদপীড়া উপস্থিত করিয়া যে দেশের অর্থাপহরণ করিবে, সে আশঙ্কা বহুকাল হইতে রহিত হইয়াছে। আবার স্বদেশীয়, স্বজাতীয়ের মধ্যে পর-

স্পরে যে সঞ্চিতার্থ অপহরণ করিবে, সে ভয়ও অনেক নিবারণ হইয়াছে। দস্যু-ভীতি, চৌর ভীতি, বলবানকর্তৃক দুর্ব্বলের সম্পত্তি হরণের ভয়, এ সকলের অনেক লাঘব হইয়াছে। আবার রাজা বা রাজপুরুষেরা প্রজার সঞ্চিতার্থ সংগ্রহলালসায় যে বলে ছলে কৌশলে লোকের সর্ব্বস্বাপহরণ করিবেন, সে দিনও নাই। অতএব যদি কেহ অর্থসঞ্চয়ের ইচ্ছা করে, তবে তাহার ভরসা হয় যে, সে তাহা ভোগ করিতে পারিবে, এবং তাহার উত্তরাধিকারিরাও তাহা ভোগ করিতে পারিবে। যেখানে লোকের এরূপ ভরসা থাকে, সেখানে লোকে সচরাচর সংসারী হয়। যেখানে পরিবার প্রতিপালনশক্তি সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা, সেখানে লোকে সংসার ধর্ম্মে বিরাগী। পরিণয়াদিতে সাধারণ লোকের অনুরাগের ফল প্রজাবৃদ্ধি। অতএব ব্রিটিশ শাসনে প্রজাবৃদ্ধি হইয়াছে। প্রজাবৃদ্ধির ফল, কৃষিকার্য্যের বিস্তার। যে দেশে লক্ষ লোকের মাত্র আহারোপযোগী শস্যের আবশ্যক, সে দেশে কেবল তদুপযুক্ত ভূমিই কর্ষিত হইবে,—কেননা অনাবশ্যক শস্য—যাহা কেহ খাইবে না, ফেলিয়া দিতে হইবে,—তাহা কে পরিশ্রম স্বীকার করিয়া উৎপাদন করিতে যাইবে? দেশের অবশিষ্ট ভূমি পতিত বা জঙ্গল বা তদ্রূপ অবস্থাবিশেষে থাকিবে। কিন্তু প্রজাবৃদ্ধি হইয়া যখন সেই এক লক্ষ লোকের স্থানে দেড় লক্ষ লোক হয়, তখন আর বেশী ভূমি আবাদ না করিলে চলে না। কেননা যে ভূমির উৎপন্নে লক্ষ লোকমাত্র প্রতিপালিত হইত, তাহার শস্যে দেড় লক্ষ কখন চিরকাল জীবন ধারণ করিতে পারে না। সুতরাং প্রজাবৃদ্ধি হইলেই চাস বাড়িবে। যাহা পূর্ব্বে পতিত বা জঙ্গল ছিল, তাহা ক্রমে আবাদ হইবে। ব্রিটিশ শাসনে প্রজাবৃদ্ধি হওয়াতে সেইরূপ হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে অনেক ভূমি কর্ষিত হইতেছে।

আর এক কারণে চাসের বৃদ্ধি হইতেছে। সেই দ্বিতীয় কারণ বাণিজ্যবৃদ্ধি। বাণিজ্য বিনিময় মাত্র। আমরা যদি ইংলণ্ডের বস্ত্রাদি লই, তবে তাহার বিনিময়ে আমাদের কিছু সামগ্রী ইংলণ্ডে পাঠাইতে হইবে, নহিলে আমরা বস্ত্র পাইব না। আমরা কি পাঠাই? অনেকে বলিবেন, "টাকা;" তাহা নহে, সেটি আমাদের দেশীয় লোকের একটি গুরুতর ভ্রম। সত্য বটে, ভারতবর্ষের কিছু টাকা ইংলণ্ডে যায়,—সেই টাকাটি ভারতব্যাপারে ইংলণ্ডের মুনাফা। কিন্তু সে টাকা, ইংলণ্ড হইতে প্রাপ্তসামগ্রীর কোন অংশের মূল্য কি না, সন্দেহ। অধিকাংশের বিনিময়ে আমরা কৃষিজাত দ্রব্য সকল পাঠাই—যথা, চাউল, রেশম, কার্পাশ, পাট, নীল, ইত্যাদি। ইহা বলা বাহুল্য যে, যে পরিমাণে বাণিজ্যবৃদ্ধি হইবে, সেই পরিমাণে এই সকল কৃষিজাত সামগ্রীর আধিক্য আবশ্যক হইবে। সুতরাং দেশে চাসও বাড়িবে। ব্রিটিশ রাজ্য হইয়া পর্য্যন্ত এ দেশের বাণিজ্য বাড়িতেছে—সুতরাং বিদেশে পাঠাইবার জন্য বৎসর২ অধিক কৃষিজাত সামগ্রীর আবশ্যক হইতেছে, অতএব এ দেশে প্রতি বৎসর চাস বাড়িতেছে।

চাস বৃদ্ধির ফল কি? দেশের ধন-বৃদ্ধি—শ্রীবৃদ্ধি। যদি পূর্ব্বে ১০০ বিঘা জমী চাস করিয়া বার্ষিক ১০০ টাকা পাইয়া থাকি, তবে ২০০ বিঘা চাস করিলে, ন্যূনাধিক * ২০০ টাকা পাইব, ৩০০ শত বিঘা চাস করিলে, তিন শত টাকা পাইব। বঙ্গদেশে দিন২ চাসের বৃদ্ধিতে দেশের কৃষিজাত ধনবৃদ্ধি পাইতেছে।

আর একটা কথা আছে। সকলে মহা-দুঃখিত হইয়া বলিয়া থাকেন, এক্ষণে দিনপাত করা ভার—দ্রব্য সামগ্রী বড় দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিতেছে। এই কথা নির্দ্দেশ করিয়া অনেকেই প্রমাণ করিতে চাহেন যে, বর্ত্তমান সময় দেশের পক্ষে বড় দুঃসময়, ইংরাজের রাজ্য প্রজাপীড়ক রাজ্য, এবং কলিযুগ অত্যন্ত অধর্ম্মাক্রান্ত যুগ—দেশ উচ্ছন্ন গেল! ইহা যে গুরুতর ভ্রম, তাহা সুশিক্ষিত সকলেই অবগত আছেন। বাস্তবিক, দ্রব্যের বর্ত্তমান সাধারণ দৌর্ম্মূল্য দেশের অমঙ্গলের চিহ্ন নহে, বরং একটি মঙ্গলের চিহ্ন। সত্য বটে, যেখানে আগে আট আনায় এক মন চাউল পাওয়া যাইত, সেখানে এখন আড়াই টাকা লাগে; যেখানে টাকায় তিন সের ঘৃত ছিল; সেখানে টাকায় তিন পোয়া পাওয়া ভার। কিন্তু ইহাতে এমত বুঝায় না যে, বস্তুতঃ চাউল বা ঘৃত দুর্ম্মূল্য হইয়াছে, টাকা সস্তা হইয়াছে, ইহাই বুঝায়। সে যাহাই হউক, এক টাকার ধান এখন যে দুই তিন টাকার ধান হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইহার ফল এই যে, যে ভূমিতে কৃষক এক টাকা উৎপন্ন করিত, সে ভূমিতে দুই তিন টাকা উৎপন্ন হয়। যে ভূমিতে দশ টাকা হইত, তাহাতে ২০ কি ৩০ টাকা হয়। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই বা অধিকাংশ স্থানে এইরূপ হইয়াছে, সুতরাং এই এক কারণে বঙ্গদেশের কৃষিজাত বার্ষিক আয়ের বৃদ্ধি হইয়াছে।

আবার পূর্ব্বেই সপ্রমাণ করা গিয়াছে, কর্ষিত ভূমিরও আধিক্য হইয়াছে। তবে দুই প্রকারে কৃষিজাত আয়ের বৃদ্ধি হইয়াছে; প্রথম, কর্ষিত ভূমির আধিক্যে, দ্বিতীয়, ফসলের মূল্য বৃদ্ধিতে। যেখানে এক বিঘা ভূমিতে তিন টাকার ফসল হইত, সেখানে সেই এক বিঘায় ছয় টাকা জন্মে, আবার আর এক বিঘা জঙ্গল পতিত আবাদ হইয়া, আর ছয় টাকা; মোটে তিন টাকার স্থানে বার টাকা জন্মিতেছে।

এইরূপে বঙ্গদেশের কৃষিজাত আয় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে এ পর্য্যন্ত তিন চারিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে, বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই বেশী টাকাটা কার্ ঘরে যায়? কে লইতেছে?

এ ধন কৃষিজাত—কৃষকেরই প্রাপ্য—পাঠকেরা হঠাৎ মনে করিবেন, কৃষকেরাই পায়। বাস্তবিক তাহারা পায় না। কে পায়, আমরা দেখাইতেছি।

কিছু রাজভাণ্ডারে যায়। গত সন ১৮৭০।৭১ শালের যে বিজ্ঞাপনী কলিকাতা রেবিনিউ বোর্ড হইতে প্রচার হইয়াছে, তাহাতে কার্য্যাধ্যক্ষ সাহেব লিখেন,

* সমাজতত্ত্ববিদেরা বুঝিবেন, এখানে "ন্যূনাধিক" শব্দটি ব্যবহার করিবার বিশেষ তাৎপর্য্য আছে, কিন্তু সাধারণ পাঠ্যে এই প্রবন্ধে তাহা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই।

১৭৯৩ শালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে যে প্রদেশে ২,৮৫,৮৭,৭২২ টাকা রাজস্ব ধার্য্য ছিল, সেই প্রদেশ হইতে এক্ষণে ৩,৫০, ৪১,২৪৮ টাকা রাজস্ব আদায় হইতেছে। অনেকে অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, যে কর চিরকালের জন্য অবধারিত হইয়াছে, তাহার আবার বৃদ্ধি কি? শক্ সাহেব বৃদ্ধির কারণ সকলও নির্দ্দেশ করিয়াছেন—যথা, তৌফির বন্দোবস্ত, লাখেরাজ বাজেআপ্ত, নূতন "পয়স্তি" ভূমির উপর কর সংস্থাপন, খাসমহলের কর বৃদ্ধি ইত্যাদি। অনেকে বলিবেন, ঐ সকল বৃদ্ধি যাহা হইবার হইয়াছে, আর বড় অধিক হইবে না। কিন্তু, শক্ সাহেব দেখাইয়াছেন, এই বৃদ্ধি নিয়মিতরূপে হইতেছে। পূর্ব্বাবধারিত করের উপর বেশী যাহা এক্ষণে গবর্ণমেন্ট পাইতেছেন—সাড়ে বাষট্টি লক্ষ টাকা—তাহা কৃষিজাত ধন হইতেই পাইতেছেন।

এ ধন অন্যান্য পথেও রাজভাণ্ডারে যাইতেছে। আফিমের আয়ের অধিকাংশই কৃষিজাত। কষ্টমহৌসের দ্বার দিয়াও রাজভাণ্ডারে কৃষিজাত অনেক ধন যায়।

শক্ সাহেব বলেন, এই কৃষিজাত ধনবৃদ্ধি অধিকাংশই বণিক্ এবং মহাজনদিগের হস্তগত হইয়াছে। বণিক্ এবং মহাজন সম্প্রদায় যে ইহার কিয়দংশ হস্তগত করিতেছে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কৃষকের সংখ্যা বাড়িয়াছে, সুতরাং মহাজনের লাভও বাড়িয়াছে। এবং যে বণিকেরা মাঠ হইতে ফসল আনিয়া বিক্রয়ের স্থানে বিক্রয় করে, কৃষিজাত ধনের কিয়দংশ যে তাহাদের লাভ স্বরূপে পরিণত হয়, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু, কৃষিজাত ধনের বৃদ্ধির অধিকাংশই যে তাহাদের হস্তগত হয়, ইহা শক্ সাহেবের ভ্রমমাত্র। এ ভ্রম কেবল শক্ সাহেবের একার নহে। "ইকনমিষ্ট" এই মতাবলম্বী। "ইকনমিষ্টের" ভ্রম " ইণ্ডিয়ান অবজরবরের " নিকট ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। সে তর্ক এখানে উত্থাপনের আবশ্যক নাই।

অধিকাংশ টাকাটা ভূস্বামিরই হস্তে যায়। ভূমিতে অধিকাংশ কৃষকেরই অধিকার অস্থায়ী; জমীদার ইচ্ছা করিলেই তাহাদের উঠাইতে পারেন। দখলের অধিকার অনেক স্থানেই অদ্যাপি আকাশকুসুম মাত্র। যেখানে আইন অনুসারে প্রজার অধিকার আছে, সেখানে কার্য্যে নাই। অধিকার থাক বা না থাক, জমীদার উঠিতে বলিলেই উঠিতে হয়। কয়জন প্রজা জমীদারের সঙ্গে বিবাদ করিয়া ভিটায় থাকিতে পারে? সুতরাং যে বেশী খাজানা স্বীকৃত হইবে, তাহাকেই জমীদার বসাইবেন। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ নাই বটে, কিন্তু ইহা অনুভবের দ্বারা সিদ্ধ। প্রজাবৃদ্ধি হইলেই জমীর খাজানা বাড়িবে। যে ভূমির আগে এক জন প্রার্থী ছিল, প্রজাবৃদ্ধি হইলে তাহার জন্য দুই জন প্রার্থী দাঁড়াইবে। যে বেশী খাজানা দিবে, জমীদার তাহাকেই জমী দিবেন। রামা কৈবর্ত্তের জমীটুকু ভাল, সে এক টাকা হারে খাজানা দেয়। হাসিম শেখ, সেই জমী চায়—সে দেড় টাকা হার স্বীকার

বিষবৃক্ষ।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

হীরার রাগ।

হীরার বাড়ী পাচির আঁটা। দুইটি ঝর্ ঝোরে মেটে ঘর। তাহাতে আল্‌পনা—পথ আঁকা—পাকি আঁকা—ঠাকুর আঁকা। উঠান নিকান—এক পাশে রাঙ্গা শাক, তার কাছে দোপাটি, মল্লিকা, গোলাপ ফুল। বাবুর বাড়ীর মালী আপনি আসিয়া চারা আনিয়া ফুলগাছ পুতিয়া দিয়া গিয়াছিল—হীরা চাহিলে, চাই কি বাগান শুদ্ধই উহার বাড়ী তুলিয়া দিয়া যায়। মালীর লাভের মধ্যে এই, হীরা আপন হাতে তামাকু সাজিয়া দেয়। হীরা কালো চুড়ি পরা হাতখানিতে হুঁকা ধরিয়া মালির হাতে দেয়, মালী বাড়ী গিয়া রাত্রে তাই ভাবে!

হীরার বাড়ী হীরার আয়ী থাকে, আর হীরা। এক ঘরে আয়ী, এক ঘরে হীরা শোয়। হীরা কুন্দকে আপনার কাছে বিছানা করিয়া রাত্রে শুয়াইল। কুন্দ শুইল—ঘুমাইল না। পরদিন তাহাকে সেই খানে রাখিল। বলিল, "আজি কালি দুই দিন থাক; দেখ, রাগ না পড়ে, পরে যেখানে ইচ্ছা, সেখানে যাইও।" কুন্দ রহিল। কুন্দের ইচ্ছানুসারে তাহাকে লুকাইয়া রাখিল। ঘরে চাবি দিল, আয়ী না দেখে। পরে বাবুর বাড়ীতে কাজে গেল। দুই প্রহর বেলা আয়ী যখন স্নানে যায়, তখন আসিয়া কুন্দকে স্নানাহার করাইল। আবার চাবি দিয়া চলিয়া গেল। রাত্রে আসিয়া চাবি খুলিয়া উভয়ের শয্যা রচনা করিল।

"টিট্—কিট্—খিট্—খিটি—খাট্" বাহির দুয়ারের শিকল সাবধানে নড়িল। হীরা বিস্মিত হইল। এক জনমাত্র কখনং রাত্রে শিকল নাড়ে। সে বাবুর বাড়ীর দ্বারবান্, রাত ভিত ডাকিতে আসিয়া শিকল নাড়ে। কিন্তু তাহার হাতে শিকল অমন মধুর বলে না, তাহার হাতে শিকল নড়িলে, বলে, "কট কট কটাং, তোর মাথা মুণ্ড উঠা, কড়্ কড়্ কড়াং, খিল খোল নয় ভাঙ্গি ঠ্যাং।" তাত শিকল বলিল না। এ শিকল বলিতেছে, "কিট্ কিট কিটী, দেখি কেমন আমার হীরেটি, খিট খাট ছন্, উঠলো আমার হীরামন্। ঠিট্ ঠিট্ ঠিঠি ঠিনিক্—আয়রে আমার হীরা মাণিক।" হীরা উঠিয়া দেখিতে গেল। বাহির দুয়ার খুলিয়া দেখিল, স্ত্রীলোক। প্রথমে চিনিতে পারিল না, পরেই চিনিল—"কে ও, গঙ্গাজল! একি ভাগ্য!" হীরার গঙ্গাজল মালতী গোয়ালিনী। মালতী গোয়ালিনীর বাড়ী দেবীপুর—দেবেন্দ্র বাবুর বাড়ীর কাছে—বড় রসিক স্ত্রীলোক। বয়স বৎসর ত্রিশ বত্রিশ, সাড়ী পরা, হাতে রুলি, মুখে পানের রাগ। মালতী গোয়ালিনী প্রায় গৌরাঙ্গী—একটু রৌদ্র পোড়া—মুখ ভাঙ্গা, নাক খাঁদা—কপালে উলকী। রুসে তামাকু পোড়া টেপা আছে। মা-

লতী গোয়ালিনী দেবেন্দ্র বাবুর দাসী নহে—আশ্রিতাও নহে—অথচ তাঁহার বড় অনুগত—অনেক ফরমায়েস—যাহা অন্যের অসাধ্য—তাহা মালতী সিদ্ধ করে। মালতীকে দেখিয়া চতুরা হীরা বলিল, "ভাই গঙ্গাজল! অন্তিমকালে যেন তোমায় পাই! কিন্তু এখন কেন?"

গঙ্গাজল চুপি চুপি বলিল, "তোকে দেবেন্দ্র বাবু ডেকেছে।"

হীরা ক... (?)খে, হাসিয়া বলিল, "তুই কিছু পাবি না...কি?"

মালতী দুই অঙ্গুলের দ্বারা হীরাকে মারিল, বলিল, "মরণ আর কি! তোর মনের কথা তুই জানিস্! এখন চ।"

হীরা ইহাই চায়। কুন্দকে বলিল, "আবার বাবুর বাড়ী যেতে হলো—ডাকিতে এসেছে। কে জানে কেন?" বলিয়া প্রদীপ নিবাইল এবং অন্ধকারে কৌশলে বেশ ভূষা করিয়া, মালতীর সঙ্গে যাত্রা করিল। দুই জনে অন্ধকারে গলা মিলাইয়া—

"মনের মতন রতন পেলে যতন করি তায়।
সাগর ছেঁচে তুলব নাগর পতন কর্‌ব্যে কায়॥"

ইতি গীত গায়িতে গায়িতে চলিল।

দেবেন্দ্রের বৈঠকখানায় হীরা একা গেল। দেবেন্দ্র দেবীর আরাধনা করিতেছিলেন, কিন্তু আজি সরু কাটিতেছিলেন। জ্ঞান টনটনে। হীরার সঙ্গে আজি অন্য প্রকার সম্ভাষণ করিলেন। স্তব স্তুতি কিছুই নাই। বলিলেন, "হীরে, সে দিন আমি অধিক মদ খাইয়া তোমার কথার মর্ম্ম কিছুই গ্রহণ করিতে পারি নাই। কেন আসিয়াছিলে? সেই কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইয়াছি। তুমি বলিয়াছিলে, কুন্দনন্দিনী তোমাকে পাঠাইয়াছিল। কিন্তু সে কি বলিয়াছিল, তাহা কিছুই বলিয়া যাও নাই। বোধ হয়, আমাকে বিবশ দেখিয়া সে সকল কথা বল নাই। আজি বলিতে পার।

হী। কুন্দনন্দিনী কিছুই বলিয়া পাঠান নাই।

দে। তবে তুমি কেন আসিয়াছিলে?

হি। কেবল আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলাম।

দেবেন্দ্র হাসিলেন। বলিলেন, "তুমি বড় বুদ্ধিমতী। ভাগ্যক্রমে নগেন্দ্র বাবু তোমার মত দাসী পেয়েছেন। বুঝিলাম, কুন্দনন্দিনীর কথা ছল মাত্র। তুমি হরিদাসী বৈষ্ণবীর তত্ত্বে এসেছিলে। আমার মনের কথা জানিতে এসেছিলে। কেন আমি বৈষ্ণবী সাজি, কেন দত্তবাড়ী যাই, এই কথা জানিতে আসিয়াছিলে। তাহা, এক প্রকার জানিয়াও গিয়াছ। আমিও তোমার কাছে সে কথা লুকাইব না। তুমি প্রভুর কাজ করিয়া প্রভুর কাছে পুরস্কার পাইয়াছ, সন্দেহ নাই। এখন আমার একটি কাজ কর, আমিও পুরস্কার করিব।"

মহাপাপে নিমগ্ন যাহাদিগের চরিত্র, তাহাদিগের সকল কথা স্পষ্ট করিয়া লেখা বড় কষ্টকর। দেবেন্দ্র, হীরাকে বহুল অর্থের লোভ প্রদর্শন করিয়া, কুন্দকে বিক্রয় করিতে বলিলেন। শুনিয়া ক্রোধে, হীরার পদ্মপলাশ চক্ষু রক্তময় হইল—কর্ণরন্ধ্রে অগ্নিরষ্টি হইল। হীরা গাত্রোত্থান করিয়া কহিল, "মহাশয়! আমি দাসী বলিয়া এরূপ কথা বলিলেন।

ইহার উত্তর আমি দিতে পারিব না। আমার মুনিবকে বলিব। তিনি ইহার উপযুক্ত উত্তর দিবেন।”

এই বলিয়া হীরা বেগে প্রস্থান করিল। দেবেন্দ্র ক্ষণেক কাল অপ্রতিভ এবং ভগ্নোৎসাহ হইয়া নীরব হইয়াছিলেন। পরে প্রাণ ভরিয়া ছুই গ্লাস ব্রাণ্ডি পান করিলেন। তখন প্রকৃতিস্থ হইয়া মৃদু মৃদু গাহিলেন।

“এসেছিল বকনা গোরু পর গোয়ালে জাবনা খেতে—”

বিংশতি পরিচ্ছেদ।

হীরার দ্বেষ।

প্রাতে উঠিয়া হীরা কাজে গেল। দত্তের বাড়ীতে ছুই দিন পর্য্যন্ত বড় গোল; কুন্দকে পাওয়া যায় না। বাড়ীর সকলেই জানিল যে, সে রাগ করিয়া গিয়াছে, পাড়া প্রতিবাসীরা কেহ জানিল, কেহ জানিল না। নগেন্দ্র শুনিলেন যে, কুন্দ গৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে—কেন গিয়াছে,কেহ তাঁহাকে শুনাইল না। নগেন্দ্র ভাবিলেন, আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা শুনিয়া কুন্দ, আমার গৃহে আর থাকা অনুচিত বলিয়া চলিয়া গিয়াছে। যদি তাই, তবে কমলের সঙ্গে গেল না কেন? নগেন্দ্রের মুখ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া রহিল। কেহ তাঁহার নিকটে আসিতে সাহস করিল না। সূর্য্যমুখীর কি দোষ, তাহা কিছু জানিলেন না, কিন্তু সূর্য্যমুখীর সঙ্গে আলাপ বন্ধ করিলেন। গ্রামে২ পাড়ায়২ কুন্দনন্দিনীর সন্ধানার্থ স্ত্রীলোক চর পাঠাইলেন।

সূর্য্যমুখী রাগে বা ঈর্ষার বশীভূত হইয়া যাহাই বলুন, কুন্দের পলায়ন শুনিয়া অতিশয় কাতর হইলেন। বিশেষ কমলমণি বুঝাইয়া দিলেন যে, দেবেন্দ্র যাহা বলিয়াছিল, তাহা কদাচ বিশ্বাসযোগ্য নহে। কেননা দেবেন্দ্রের সহিত তিন বৎসর পর্য্যন্ত গুপ্ত প্রণয় হইলে কখন অপ্রচার থাকিত না। আর কুন্দের যেরূপ স্বভাব, তাহাতে কদাচ ইহা সম্ভব বোধ হয় না। দেবেন্দ্র মাতাল, মদের মুখে মিথ্যা বড়াই করিয়াছে। সূর্য্যমুখী এ সকল কথা বুঝিলেন, এজন্য অনুতাপ কিছু গুরুতর হইল। তাহাতে আবার স্বামির বিরাগে আরও মর্ম্ম ব্যথা পাইলেন। শতবার কুন্দকে গালি দিতে লাগিলেন, সহস্রবার আপনাকে গালি দিলেন। তিনিও কুন্দের সন্ধানে লোক পাঠাইলেন।

কমল কলিকাতা যাওয়া স্থগিত করিলেন। কমল কাহাকেও গালি দিলেন না—সূর্য্যমুখীকেও অণুমাত্র তিরস্কার করিলেন না। কমল গলা হইতে কণ্ঠহার খুলিয়া লইয়া গৃহস্থ সকলকে দেখাইয়া বলিলেন, “যে কুন্দকে আনিয়া দিবে, তাহাকে এই হার দিব।”

পাপ হীরা এই সব দেখে শুনে, কিন্তু কিছু বলে না। কমলের হার দেখিয়া এক একবার লোভ হইয়াছিল—কিন্তু সে লোভ সম্বরণ করিল। দ্বিতীয় দিন কাজ সারিয়া ছুই প্রহরের সময়ে, আয়ীর স্নানের সময় বুঝিয়া, কুন্দকে খাওয়াইল। পরে রাত্রে আসিয়া উভয়ে শয্যা রচনা করিয়া শয়ন করিল। কুন্দ বা হীরা কেহই নিদ্রা গেল না—কুন্দ আপনার

মনের দুঃখে জাগিয়া রহিল। হীরা আপন মনের সুখদুঃখে জাগিয়া রহিল। সেও কুন্দের ন্যায় বিছানায় শুইয়া চিন্তা করিতেছিল। যাহা চিন্তা করিতেছিল, তাহা মুখে অবাচ্য—অতি গোপন।

ও হীরে! ছি! ছি! হীরে! মুখখানিত দেখিতে মন্দ নয়—বয়সও নবীন, তবে হৃদয়মধ্যে এত খলকপট কেন? কেন? কেন, বিধাতা তাহাকে ফাঁকি দিল কেন? বিধাতা তাহাকে ফাঁকি দিয়াছে, সেও সকলকে ফাঁকি দিতে চায়। হীরাকে সূর্য্যমুখীর আসনে বসাইলে, হীরার কি খলকপট থাকিত? হীরা বলে, "না।" হীরাকে হীরার আসনে বসাইয়াছে বলিয়াই হীরা, হীরা। লোকে বলে, "সকলই দুষ্টের দোষ।" দুষ্ট বলে, "আমি ভাল মানুষ হইতাম—কিন্তু লোকের দোষে দুষ্ট হইয়াছি।" লোকে বলে, "পাঁচ কেন সাত হইল না?" পাঁচ বলে, "আমি সাত হইতাম—কিন্তু দুই আর পাঁচে সাত—বিধাতা, অথবা বিধাতার সৃষ্ট লোকে যদি আমাকে আর দুই দিত, তা হলেই আমি সাত হইতাম।" হীরা তাহাই ভাবিতেছিল।

হীরা ভাবিতেছিল—"এখন কি করি! পরমেশ্বর যদি সুবিধা করিয়া দিয়াছেন, তবে আপনার দোষে সব নষ্ট না হয়। এদিকে, যদি কুন্দকে দত্তের বাড়ী ফিরিয়া লইয়া যাই, তবে কমল হার দিবে, গৃহিণীও কিছু দেবেন—বাবুকেই কি ছাড়িব? আর যদি এদিকে কুন্দকে দেবেন্দ্র বাবুর হাতে দিই, তাহা হলে অনেক টাকা নগদ পাই। কিন্তু সে ত প্রাণ থাকিতে পারিব না। আচ্ছা, দেবেন্দ্র কুন্দকে কি এত সুন্দরী দেখেছে? আমরা গতর খাটিয়ে খাই; আমরাও যদি ভাল খাই, ভাল পরি, পটের বিবির মত ঘরে তোলা থাকি, তা হইলে আমরাও অমন হতে পারি। আর এটা মিন মিনে, ঘ্যান ঘেনে, প্যান পেনে, সে দেবেন্দ্র বাবুর মর্ম্ম বুঝিবে কি? পাঁক নইলে পদ্ম ফুল ফোটে না, আর কুন্দ নইলে দেবেন্দ্র বাবুর পীরিত হয় না! তা যার কপালে যা, আমি রাগ করি কেন? রাগ করি কেন? হাঃ কপাল। আর মনকে চোখ ঠারয়ে কি হবে! ভালবাসার কথা শুনিলে হাসিতাম। বলিতাম, ও সব মুখের কথা, লোকে একটা প্রবাদ আছে মাত্র। এখন আর ত হাসিব না। মনে করেছিলাম, যে ভালবাসে, সে বাসুক, আমি ত কখন কাহাকে ভাল বাসিব না। ঠাকুর বল্লে, রহ; তোরে মজা দেখাচ্ছি। শেষে বেগারের দৌলতে গঙ্গাস্নান। পরের চোর ধরতে গিয়া আপনার প্রাণটা চুরি গেল। কি মুখ খানি! কি গড়ন! কি গলা! অন্য মানুষের কি এমন আছে? আবার মিন্‌সে আমায় বলে, কুন্দকে এনে দে! আর বল্‌তে লোক পেলেন না! মারি মিনসের নাকে এক কিল। আহা, এমনই ভাল বাসিতে আরম্ভ করেছি, যে তার নাকে কিল মেরেও সুখ। দুর হোক, ওসব কথা যাক্। ওপথেও ত ধর্ম্মের কাঁটা। ইহজন্মের সুখ দুঃখ অনেক কাল ঠাকুরদের দিয়াছি। তাই বলিয়া কুন্দকে দেবেন্দ্রের হাতে দিতে পারিব না। সে কথা মনে হলেই গা জ্বালা করে। বরং কুন্দ যাহাতে কখন

তার হাতে না পড়ে, তাই করিব। কি করিলে তাহা হয়! কুন্দ যেখানে ছিল—সেই খানে থাকিলেই তার হাত ছাড়া। সে বৈষ্ণবীই সাজুক, আর বাসুদেবই সাজুক, সে বাড়ীর ভিতর দন্তস্ফুট হইবে না! তবে সেই খানে কুন্দকে ফিরিয়া রাখিয়া আসাই মত। কিন্তু কুন্দ যাইবে না—আর সে বাড়ী মুখো হইবার মত নাই। কিন্তু যদি সবাই মেলে বাপু বাছা বলে লইয়া যায়, তবে যাইতেও পারে। আর একটা আমার মনের কথা আছে, ঈশ্বর তাহা কি করবেন? সূর্য্যমুখীর থোতা মুখ ভোতা হবে? দেবতা করিলে হতেও পারে। আচ্ছা! সূর্য্যমুখীর উপর আমার এত রাগই বা কেন? সে ত কখন আমার কিছু মন্দ করে নাই; বরং ভালই বাসে, ভালই করে। তবে রাগ কেন? তা কি হীরা জানে না? হীরা না জানে কি? কেন বল্‌বো? সূর্য্যমুখী সুখী, আমি দুঃখী, এই জন্য আমার রাগ। সে বড়, আমি ছোট, সে মুনিব, আমি বাঁদী। সুতরাং তার উপরে আমার বড় রাগ। যদি বল, ঈশ্বর তাকে বড করিয়াছেন, তার দোষ কি? আমি তার হিংসা করি কেন? তাতে আমি বলি, ঈশ্বর আমাকে হিংসুকে করেছেন, আমারই বা দোষ কি? তা, আমি খামখা তার মন্দ করিতে চাই না, কিন্তু যদি তার মন্দ করিলে আমার ভাল হয়, তবে না করি কেন? আপনার ভাল কে না করে? তা, হিসাব করিয়া দেখি, কিসে কি হয়। এখন, আমার হলো কিছু টাকার দরকার, আর দাসীপনা পারি না। টাকা আসিবে কোথা থেকে? দত্ত বাড়ী বই আর টাকা কোথা? তা দত্তবাড়ীর টাকা নেবার ফিকির এই,—সবাই জানে যে কুন্দের উপর নগেন্দ্র বাবুর চোখ প’ড়েছে—বাবু এখন কুন্দমন্ত্রের উপাসক। বড় মানুষ লোক, মনে করিলেই পারে। পারে না কেবল সূর্য্যমুখীর জন্যে। যদি দুজনে একটা চটাচটি হয়, তাহলে আর বড় সূর্য্যমুখীর খাতির কব্‌বে না। এখন যাতে একটু চটাচটি হয়, সেই টা আমায় করিতে হবে।

"তা হলেই বাবু ষোড়শোপচারে কুন্দের পূজা আরম্ভ করিবেন। এখন কুন্দ হলো বোকা মেয়ে, আমি হলেম শিয়ানা মেয়ে; আমি কুন্দকে শীঘ্র বশ করিতে পারিব। এরি মধ্যে তাহার অনেক যোগাড় হয়ে রয়েছে। মনে করলে কুন্দকে যা ইচ্ছা করি, তাই করাতে পারি। আর যদি বাবু কুন্দের পূজা আরম্ভ করেন, তবে তিনি হবেন কুন্দের আজ্ঞাকারী। কুন্দকে ক’র্‌বো আমার আজ্ঞাকারী। সুতরাং পূজার ছোলাটা কলাটা আমিও পাব। যদি আর দাসীপনা করিতে না হয়, এমন টা হয়, তাহলেই আমার হলো। দেখি, দুর্গা কি করেন। নগেন্দ্রকে কুন্দনন্দিনী দেব। কিন্তু হঠাৎ না। আগে কিছু দিন লুকিয়ে রেখে দেখি। প্রেমের পাক বিচ্ছেদে। বিচ্ছেদে পড়িলেই বাবুর ভালবাসাটা পেকে আস্‌বে। সেই সময়ে কুন্দকে বাহির করিয়া দিব। তাতে যদি সূর্য্যমুখীর কপাল না ভাঙ্গে, তবে তার বড় জোর কপাল। তত দিন আমি বসে২ কুন্দকে উঠ্ বস্ করান মকশ করাই। আগে আয়ীকে কামারঘাটা

পাঠাইয়া দিই, নইলে কুন্দকে আর লুকিয়ে রাখা যায় না!"

এই রূপ কল্পনা করিয়া পাপিষ্ঠা হীরা সেই রূপ আচরণে প্রবৃত্ত হইল। ছল করিয়া, আয়ীকে কামারঘাটা গ্রামে কুটুম্ববাড়ী পাঠাইয়া দিল, এবং কুন্দকে অতি সঙ্গোপনে আপন বাড়ীতে রাখিল। কুন্দ, তাহার যত্ন ও সহৃদয়তা দেখিয়া ভাবিতে লাগিল, "হীরার মত মানুষ আর নাই। কমলও আমায় এত ভাল বাসে না।"

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

হীরার কলহ—বিষবৃক্ষের মুকুল।

তা ত হলো। কুন্দ বশ হবে। কিন্তু সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের দুই চক্ষের বিষ না হইলে ত কিছুতেই কিছু হবে না। গোড়ার কাজ সেই। হীরা এক্ষণে তাঁহাদের অভিন্ন হৃদয় ভিন্ন করিবার চেষ্টায় রহিল।

এক দিন প্রভাত হইলে পাপ হীরা মনিব বাড়ী আসিয়া গৃহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। কৌশল্যা নাম্নী আর এক জন পরিচারিকা দত্তগৃহে কাজ করিত, এবং হীরা প্রধানা বলিয়া ও প্রভুপত্নীর প্রসাদ পুরস্কারভাগিনী বলিয়া তাহার হিংসা করিত। হীরা তাহাকে বলিল, "কুশি দিদি! আজ আমার গা কেমন২ কর্‌তেছে, তুই আমার কাজ গুল কর না?" কৌশল্যা হীরাকে ভয় করিত, অগত্যা স্বীকার হইয়া বলিল, "তা করিব বই কি। সকলেরই ভাই শরীরের ভাল মন্দ আছে—তা এক মুনিবের চাকর,—করিব না?" হীরার ইচ্ছা ছিল যে, কৌশল্যা যে উত্তরই দিউক না, তাহাতেই ছল ধরিয়া কলহ করিবে। অতএব তখন মস্তক হেলাইয়া, তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া কহিল, "কি লা কুশি—তোর যে বড় আস্পর্দ্ধা দেখ্‌তে পাই? তুই গালি দিস্?" কৌশল্যা চমৎকৃত হইয়া বলিল, "আ মরি! আমি কখন গালি দিলাম?"

হীরা। আ মোলো! আবার বলে কখন গাল্ দিলাম? কেন শরীরের ভাল মন্দ কি লা? আমি কি মর্‌তে বসেছি না কি? আমাকে শরীরের ভাল মন্দ দেখাবেন, আবার লোকে বল্‌বে উনি আশীর্ব্বাদ কর্‌লেন! তোর শরীরের ভাল মন্দ হউক।

কৌ। হয় হউক। তা বন্ রাগ করিস্ কেন? মরিতে ত হবেই এক দিন—যম ত আর তোকেও ভুল্‌বে না, আমাকেও ভুল্‌বে না।

হীরা। তোমাকে যেন প্রাতঃবাক্যে কখন না ভোলে! তুমি আমার হিংসায় মর! তুমি যেন হিংসাতেই মর! তুমি শীগ্‌গির অপ্পাই যাও,নিপাত যাও, নিপাত যাও, নিপাত যাও! তুমি যেন দুটি চক্ষের মাতা খাও!

কৌশল্যা আর সহ্য করিতে পারিল না। তখন কৌশল্যাও আরম্ভ করিল। "তুমি দুটি চক্ষের মাতা খাও! তুমি নিপাত যাও! তোমায় যেন যম না ভোলে! পোড়ার মুখি! আবাগি! শতেক খোয়ারি!" কোন্দল বিদ্যায় হীরার অপেক্ষায় কৌশল্যা পটুতরা। সুতরাং হীরা পাটিখেলটি খাইল।

হীরা তখন প্রভুপত্নীর নিকট নালিশ করিতে চলিল। যাইবার সময় যদি হীরার মুখ কেহ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত, তবে দেখিতে পাইত যে, হীরার ক্রোধলক্ষণ কিছুই নাই, বরং অধরপ্রান্তে একটু হাসি আছে। হীরা সূর্য্যমুখীর নিকট যখন গিয়া উপস্থিত হইল, তখন বিলক্ষণ ক্রোধ লক্ষণ—এবং সে প্রথমেই স্ত্রীলোকের ঈশ্বরদত্ত অস্ত্র ছাড়িল, অর্থাৎ কাঁদিয়া দেশ ভাসাইল।

সূর্য্যমুখী নালিশী আরজি মোলাহেজা করিয়া, বিহিত বিচার করিলেন। দেখিলেন, হীরারই দোষ। তথাপি হীরার অনুরোধে কৌশল্যাকে যৎকিঞ্চিৎ অনুযোগ করিলেন। হীরা তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বলিল, "ও মাগীকে ছাড়াইয়া দাও, নহিলে আমি থাকিব না।"

তখন সূর্য্যমুখী হীরার উপর বড় বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, "হীরে, তোর বড় আদর বাড়িয়াছে! তুই আগে দিলি গাল্—দোষ সব তোর—আবার তোর কথায় ওকে ছাড়াইব? আমি এমন অন্যায় করিতে পারিব না—তোর যাইতে ইচ্ছা হয়, যা। আমি থাকিতে বলি না।"

হীরা ইহাই চায়। তখন "আচ্ছা চল্লেম," বলিয়া হীরা চক্ষুর জলে মুখ ভাসাইতে ভাসাইতে বহির্বাটীতে বাবুর নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

বাবু বৈঠকখানায় একা ছিলেন—এখন একাই থাকিতেন। হীরা কাঁদিতেছে দেখিয়া নগেন্দ্র বলিলেন, "হীরে, কাঁদিতেছিস্ কেন?"

হী। আমার মাহিয়ানা পত্র হিসাব করিয়া দিতে হুকুম করুন।

ন।—(সবিস্ময়ে) সেকি? কি হয়েছে?

হী। আমার জবাব হয়েছে। মা ঠাকুরাণী আমাকে জবাব দিয়াছেন।

ন। কি করেছিস্ তুই?

হী। কুশি আমাকে গালি দিয়াছিল—আমি নালিশ করিয়াছিলাম। তিনি তার কথায় বিশ্বাস করিয়া আমাকে জবাব দিলেন।

নগেন্দ্র মাতা নাড়িয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সে কাযের কথা নয়, হীরে, আসল কথা কি, বল্।"

হীরা তখন ঋজু হইয়া বলিল, "আসল কথা, আমি থাকিব না।"

ন। কেন?

হী। মা ঠাকুরাণীর মুখ বড় এলো মেলো হয়েছে—কারে কখন কি বলেন, ঠিকানা নাই।

নগেন্দ্র ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তীব্রস্বরে বলিলেন, "সে কি?"

হীরা যাহা বলিতে আসিয়াছিল, তাহা এই বার বলিল, "সে দিন কুন্দনন্দিনী ঠাকুরাণীকে কি না বলিয়াছিলেন। শুনিয়া কুন্দ ঠাকুরাণী দেশত্যাগী হয়েছেন। আমাদের ভয়, পাছে আমাদের সেই রূপ কোন্ দিন কি বলেন, —আমরা তাহলে বাঁচিব না। তাই আগে হইতে সরিতেছি।"

নগেন্দ্র। সে কি কথা?

হীরা। আপনার সাক্ষাতে লজ্জায় তা আমি বলিতে পারি না।

শুনিয়া নগেন্দ্রের ললাটে অন্ধকার হইল। তিনি হীরাকে বলিলেন, "আজ্ বাড়ী যা। কাল্ ডাকার।"

হীরার মনস্কাম সিদ্ধ হইল। সে এই জন্য কৌশল্যার সঙ্গে বচসা সৃজন করিয়াছিল।

নগেন্দ্র উঠিয়া সূর্য্যমুখীর নিকটে গেলেন। হীরা পা টিপিয়া টিপিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেল।

সূর্য্যমুখীকে নিভৃতে লইয়া গিয়া নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি হীরাকে বিদায় দিয়াছ?" সূর্য্যমুখী বলিলেন, "দিয়াছি।" অনন্তর হীরা কৌশল্যার বৃত্তান্ত সবিশেষ বিবরিত করিলেন। শুনিয়া নগেন্দ্র বলিলেন, "মরুক। তুমি কুন্দনন্দিনীকে কি বলিয়াছিলে?"

নগেন্দ্র দেখিলেন, সূর্য্যমুখীর মুখ শুকাইল। সূর্য্যমুখী অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "কি বলিয়াছিলাম?"

নগেন্দ্র। কোন দুর্ব্বাক্য?

সূর্য্যমুখী কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে যাহা বলা উচিত, তাহাই বলিলেন।

বলিলেন, "তুমি আমার সর্ব্বস্ব। তুমি আমার ইহকাল, তুমিই আমার পরকাল। তোমার কাছে আমি কেন লুকাইব? কখন কোন কথা তোমার কাছে লুকাই নাই, আজ কেন এক জন পরের কথা তোমার কাছে লুকাইব? আমি কুন্দকে কুকথা বলিয়াছিলাম। পাছে তুমি রাগ কর বলিয়া, তোমার কাছে ভরসা করিয়া বলি নাই। সে অপরাধ মার্জ্জনা করিও। আমি সকল বলিতেছি।"

তখন সূর্য্যমুখী হরিদাসী বৈষ্ণবীর পরিচয় হইতে কুন্দনন্দিনীর তিরস্কার পর্য্যন্ত অকপটে সকল বিবৃত করিলেন। বলিয়া, শেষ কহিলেন, "আমি কুন্দনন্দিনীকে তাড়াইয়া আপনার মরণে আপনি মরিয়া আছি। দেশে দেশে তাহার তত্ত্বে লোক পাঠাইয়াছি। যদি সন্ধান পাইতাম, ফিরাইয়া আনিতাম। আমার অপরাধ লইও না।"

নগেন্দ্র তখন বলিলেন, "তোমার বিশেষ অপরাধ নাই। তুমি যেরূপ কুন্দের কলঙ্ক শুনিয়াছিলে, তাহাতে কোন্ ভদ্র লোকের স্ত্রী তাকে মিষ্ট কথা বলিবে, কি ঘরে স্থান দিবে? কিন্তু একবার ভাবিলে ভাল হইত যে, কথাটা সত্য কি না? তুমি তারাচরণের কোন্ দিনের ঘরের খবর না জানিতে? কুন্দের সঙ্গে যে প্রকারে দেবেন্দ্রের যেরূপ তিন বৎসরের আলাপ, তাই কোন্ না শুনিয়াছ? তবে মাতালের কথায় বিশ্বাস করিলে কেন?"

সূর্য্য। তখন সে কথা ভাবি নাই। এখন ভাবিতেছি।

ন। ভাবিলে না কেন?

সূর্য্য। আমার মনের ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল। বলিতে২ সূর্য্যমুখী—পতিপ্রাণা সাধ্বী—নগেন্দ্রের চরণপ্রান্তে ভূতলে উপবেশন করিলেন, এবং নগেন্দ্রের উভয় চরণ দুই হস্তে গ্রহণ করিয়া নয়ন জলে সিক্ত করিলেন। তখন মুখ তুলিয়া বলিলেন, "প্রাণাধিক তুমি। কোন কথা এ পাপ মনের ভিতর থাকিতে তোমার কাছে লুকাইব না। আমার অপরাধ লইবে না?"

নগেন্দ্র বলিলেন, "তোমায় বলিতে হইবে না। আমি জানি, তুমি সন্দেহ করিয়াছিলে যে, আমি কুন্দনন্দিনীতে অনুরক্ত।"

সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের যুগল চরণে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আবার সেই শিশিরসিক্ত কমল তুল্য ক্লিষ্ট মুখমণ্ডল উন্নত করিয়া, সর্ব্বদুঃখাপহারী স্বামিমুখ প্রতি চাহিয়া, বলিলেন, "কি বলিব তোমায়? আমি যে দুঃখ পাইয়াছি—তাহা কি তোমায় বলিতে পারি? মরিলে পাছে তোমার দুঃখ বাড়ে, এই জন্য মরি নাই। নহিলে যখন জানিয়াছিলাম, অন্যা তোমার হৃদয়ভাগিনী—আমি তখন মরিতে চাহিয়াছিলাম। মুখের মরা নহে—যেমন সকলে মরিতে চাহে, তেমন মরা নহে; আমি যথার্থ, আন্তরিক অকপটে মরিতে চাহিয়াছিলাম। আমার অপরাধ লইও না।"

নগেন্দ্র অনেকক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া, শেষ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সূর্য্যমুখি! অপরাধ সকলই আমার। তোমার অপরাধ কিছুই নাই। আমি যথার্থ তোমার নিকট বিশ্বাসহন্তা। যথার্থই আমি তোমাকে ভুলিয়া কুন্দনন্দিনীতে—কি বলিব? আমি যে যন্ত্রণা পাইয়াছি, যে যন্ত্রণা পাইতেছি, তাহা তোমাকে কি বলিব? তুমি মনে করিয়াছ, আমি চিত্ত দমনের চেষ্টা করি নাই; এমত ভাবিও না। আমি যত আমাকে তিরস্কার করিয়াছি, তুমি কখনও তত তিরস্কার করিবে না। আমি পাপাত্মা—আমার চিত্ত বশ হইল না।

সূর্য্যমুখী আর সহ্য করিতে পারিলেন না, যোড় হাত করিয়া, কাতরস্বরে বলিলেন, "যাহা তোমার মনে থাকে, থাক্—আমার কাছে আর বলিও না। তোমার প্রতিকথায় আমার বুকে শেল বিঁধিতেছে। আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা ঘটিয়াছে—আর শুনিতে চাহি না। এ সকল আমার অশ্রাব্য।"

"না। তা নয়, সূর্য্যমুখি! আরও শুনিতে হইবে। যদি কথা পাড়িলে, তবে মনের কথা ব্যক্ত করিয়া বলি—কেননা অনেক দিন হইতে বলি বলি করিতেছি। আমি এ সংসার ত্যাগ করিব। মরিব না—কিন্তু দেশান্তরে যাইব। বাড়ী ঘর সংসারে আমার সুখ নাই। তোমাতে আমার আর সুখ নাই। আমি তোমার অযোগ্য স্বামী। আমি আর কাছে থাকিয়া তোমাকে ক্লেশ দিব না। কুন্দনন্দিনীকে সন্ধান করিয়া আমি দেশ দেশান্তরে ফিরিব। তুমি এগৃহে গৃহিণী থাক। মনে মনে ভাবিও, তুমি বিধবা—যাহার স্বামী এরূপ পামর, সে বিধবা নয় ত কি? কিন্তু আমি পামর হই আর যাই হই, তোমাকে প্রবঞ্চনা করিব না। আমি অন্যাগতপ্রাণ হইয়াছি—সে কথা তোমাকে স্পষ্ট বলিব না? এখন আমি দেশত্যাগ করিয়া চলিলাম। যদি কুন্দনন্দিনীকে ভুলিতে পারি, তবে আবার আসিব। নচেৎ তোমার সঙ্গে এই সাক্ষাৎ।"

এই শেলসম কথা শুনিয়া সূর্য্যমুখী কি বলিবেন? কয়েক মুহূর্ত্ত প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিবৎ পৃথিবী পানে চাহিয়া রহিলেন। পরে সেই ভূতলে অধোমুখে শুইয়া পড়িলেন। মাটীতে মুখ লুকাইয়া সূর্য্যমুখী কাঁদিলেন কি? হত্যাকারী

ব্যাঘ্র যেরূপ হতজীবের মৃত্যু যন্ত্রণা দেখে, নগেন্দ্র, সেই রূপ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন। মনে মনে বলিতেছিলেন, "সেই ত মরিতে হইবে—তার আজ কাল কি? জগদীশ্বরের ইচ্ছা,—আমি কি করিব? আমি কি মনে করিলে ইহার প্রতীকার করিতে পারি? আমি মরিতে পারি, কিন্তু তাহাতে কি সূর্য্যমুখী বাঁচিবে?"

না; নগেন্দ্র! তুমি মরিলে সূর্য্যমুখী বাঁচিবে না, কিন্তু তোমার মরাই ভাল ছিল।

দণ্ডেকপরে সূর্য্যমুখী উঠিয়া বসিলেন। আবার স্বামির পায়ে ধরিয়া বলিলেন,—

"এক ভিক্ষা।"

নগ। কি?

সূ। আর এক মাস মাত্র গৃহে থাক। ইতিমধ্যে যদি কুন্দনন্দিনীকে না পাওয়া যায়, তবে তুমি দেশত্যাগ করিও। আমি মানা করি না।

নগেন্দ্র মৌনভাবে বাহির হইয়া গেলেন। মনে মনে আর এক মাস থাকিতে স্বীকার করিলেন। সূর্য্যমুখী তাহা বুঝিলেন। তিনি গমনশীল নগেন্দ্রের মূর্ত্তিপ্রতি চাহিয়াছিলেন। সূর্য্যমুখী মনে মনে বলিতেছিলেন, "আমার সর্ব্বস্ব ধন! তোমার পায়ের কাঁটাটি তুলিবার জন্য প্রাণ দিতে পারি। তুমি পাপ সূর্য্যমুখীর জন্য দেশত্যাগী হইবে? তুমি বড়, না আমি বড়?"

উত্তরচরিত।

পঞ্চম সংখ্যা।

লব ও চন্দ্রকেতু যুদ্ধ করিতেছিলেন, এমন সময়ে রাম সেই স্থানে উপনীত হইলেন। তিনি উভয়কে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত করিলেন। লব তাঁহাকে রাজা রামচন্দ্র বলিয়া জানিতে পারিয়া, ভক্তিভাবে প্রণাম ও নম্রভাবে তাঁহার সহিত আলাপ করিলেন। কুশও যুদ্ধ সম্বাদ শুনিয়া সেস্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং লব কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া রামের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিলেন। রাম উভয়কে সস্নেহ আলিঙ্গন এবং পিতৃযোগ্য প্রণয় সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। পরে সকলে, বাল্মীকির আশ্রমে, তৎপ্রণীত নাটকাভিনয় দেখিতে গেলেন।

তথায় রামানুজ্ঞাক্রমে লক্ষ্মণ দ্রষ্টৃবর্গকে যথা স্থানে সন্নিবেশিত করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, পৌরগণ, জনপদবাসী প্রজা, ও দেবাসুর এবং ইতর জীব, স্থাবর জঙ্গম সকলে ঋষিপ্রভাববলে সমাগত হইয়া, লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক যথা স্থানে সন্নিবেশিত হইলেন। পরে অভিনয়ারম্ভ হইল। রাম ও লবকুশ দ্রষ্টৃবর্গ মধ্যে ছিলেন।

সীতা বিসর্জ্জন বৃত্তান্তই এই অদ্ভুত নাটকের প্রথমাংশ। সীতা লক্ষ্মণকর্ত্তৃক

পরিত্যক্ত হইলে, তাঁহার কাতরতা, গঙ্গা-প্রবাহে দেহ সমর্পণ, তন্মধ্যে যমলসন্তান প্রসব, গঙ্গা এবং পৃথিবীকর্ত্তৃক তাঁহার ও শিশুদিগের রক্ষা, ও তৎসঙ্গে সীতার প্রস্থান ইত্যাদি অভিনীত হইল। দেখিয়া রাম মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন লক্ষ্মণ উচ্চৈঃস্বরে বাল্মীকিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভগবন্! রক্ষা করুন! আপনার কার্য্যের কি মর্ম্ম?" নটদিগকে বলিলেন, "তোমরা অভিনয় বন্ধ কর।"

তখন সহসা দেবর্ষি কর্ত্তৃক অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত হইল! গঙ্গার বারিরাশি মথিত হইল। ভাগীরথী এবং পৃথিবীর সহিত, জল মধ্য হইতে উঠিলেন—কে? স্বয়ং সীতা। দেখিয়া লক্ষ্মণ বিস্মিত এবং আহ্লাদিত হইয়া রামকে ডাকিলেন, "দেখুন! দেখুন!" কিন্তু রাম তখনও অচেতন। তখন সীতা, অরুন্ধতীকর্ত্তৃক আদিষ্টা হইয়া রামকে স্পর্শ করিলেন। বলিলেন, "উঠ, আর্য্য পুত্র!"

রাম চেতনাপ্রাপ্ত হইলেন। পরে যাহা ঘটিল, বলা বাহুল্য। সেই সর্ব্বলোক সমারোহ সমক্ষে সীতার সতীত্ব দেবগণকর্ত্তৃক স্বীকৃত হইল। দেববাক্যে প্রজাগণ বুঝিল। সীতা লবকুশকেও পাইলেন। রামও তাঁহাদিগকে পুত্র বলিয়া চিনিলেন। পরে সপুত্রা ভার্য্যা গৃহে লইয়া গিয়া সুখে রাজ্য করিতে লাগিলেন।

নাটকের ভিতর এই নাটকখানি যিনি অভিনীত দেখিবেন বা পাঠ করিবেন, তিনিই যে অশ্রুপাত করিবেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু আমরা এতদংশ উদ্ধৃত করিলাম না। এই উপসংহার অপেক্ষা রামায়ণের উপসংহার অধিকতর মধুর এবং করুণ রসপূর্ণ। আমরা পাঠকের প্রীত্যর্থে তাহাই উদ্ধৃত করিতে বাসনা করি। বাল্মীকি কর্ত্তৃক সীতা অযোধ্যায় আনীতা হয়েন। যে সুচনায় ঋষি সীতাকে আনয়ন করেন, তদ্বিশেষ বঙ্গীয় পাঠকমাত্রেই "সীতার বনবাস" পাঠ করিয়া অবগত আছেন।—সতীত্ব সম্বন্ধে শপথ করিলে সীতাকে গ্রহণ করিবেন, রাম এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই কথা প্রচার হইলে পর, সীতাশপথ দর্শনার্থ বহুলোকের সমাগম হইল।

১০৯ সর্গ।

তস্যাং রজন্যাং ব্যুষ্টায়াং যজ্ঞবাটং গতোনৃপঃ
ঋষীন্ সর্ব্বান্ মহাতেজাঃ শব্দাপয়তি রাঘবঃ ॥
বশিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালি রথকাশ্যপঃ।
বিশ্বামিত্রোদীর্ঘতমা দুর্ব্বাসাশ্চ মহাতপাঃ ॥
পুলস্ত্যোপিতথা শক্তির্ভার্গবশ্চৈব বামনঃ।
মার্কণ্ডেয়শ্চদীর্ঘায়ুর্মৌদ্গল্যশ্চ মহাযশাঃ ॥
গর্গশ্চচ্যবনশ্চৈব শতানন্দশ্চ ধর্ম্মবিৎ।
ভরদ্বাজশ্চ তেজস্বী অগ্নিপুত্রশ্চসুপ্রভঃ ॥
নারদঃ পর্ব্বতশ্চৈব গৌতমশ্চ মহাযশাঃ।
এতেচান্যেচবহবোমুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥
কৌতূহল সমাবিষ্টাঃ সর্ব্বএব সমাগতাঃ।
রাক্ষসাশ্চমহাবীর্যা বানরাশ্চমহাবলাঃ ॥
সর্ব্বএব সমাজগ্মু র্মহাত্মানঃ কুতূহলাৎ।
ক্ষত্রিয়ায়েচ শূদ্রাশ্চ বৈশ্যাশ্চৈবসহস্রশঃ ॥
নানাদেশ গতাশ্চৈব ব্রহ্মণাঃ সংশিতব্রতাঃ।
সীতাশপথ বীক্ষার্থং সর্ব্বএব সমাগতাঃ ॥
তদাসমাগতং সর্ব্ব মশ্মভূতমিবাচলং।
শ্রুত্বামুনিবরস্তূর্ণং সসীতঃ সমুপাগমৎ ॥
তমৃষিং পৃষ্ঠতঃ সীতা অন্বগচ্ছদবাঙ্মুখী।
কৃতাঞ্জলির্বাষ্পাকুলা কৃত্বা রামং মনোগতং ॥
তাংদৃষ্টাশ্রুতিমায়াতীং ব্রহ্মাণামনুগামিনীং।
বাল্মীকেঃ পৃষ্ঠতঃসীতাং সাধুবাদোমহানভূৎ ॥
ততোহলহলাশব্দঃ সর্ব্বেষামেবমাবভৌ।
দুঃখজন্মবিশালেন শোকেনা কুলিতাত্মনাং ॥

সাধুরামেতি কেচিত্ত্ব সাধুসীতেতি চাপরে।
উভাবেবচত ত্রান্যে প্রেক্ষকাঃ সংপ্রচক্রুশুঃ॥
ততোমধ্যেজনৌঘস্য প্রবিশ্য মুনি পুঙ্গবঃ।
সীতাসহাযো বাল্মীকি রিতিহোবাচ রাঘবং॥
ইযং দাশরথে সীতা সুব্রতা ধর্ম্মচারিণী।
অপবাদাৎপরিত্যক্তা মমাশ্রম সমীপতঃ॥
লোকাপবাদ ভীতস্য তবরাম মহাব্রত।
প্রত্যয়ং দাস্যতে সীতা তামনুজ্ঞাতুমর্হসি॥
ইমৌতু জানকী পুত্রা বুভৌচযমজাতকৌ।
সুতৌতবৈব দুর্ধর্ষৌ সত্যমেতদ্ব্রবীমিতে॥
প্রচেতসোহং দশমঃ পুত্রোরাঘবনন্দন।
নস্মরাম্যনৃতং বাক্যমিমৌতু তব পুত্রকৌ॥
বহুবর্ষ সহস্রাণি তপশ্চর্য্যা ময়াকৃতা।
নোপাশ্নীয়াংফলন্তস্যাদুষ্টেযং যদিমৈথিলী॥
মনসাকর্ম্মণা বাচা ভূতপূর্ব্বং নকিল্বিষং।
তস্যাহং ফলমশ্নামি অপাপা মৈথিলী যদি॥
অহং পঞ্চসু ভূতেষুমনঃ ষষ্ঠেসু রাঘব।
বিচিন্ত্যসীতাশুদ্ধেতি জগ্রাহ বন নির্ঝরে॥
ইয়ংশুদ্ধ সমাচারা অপাপা পতিদেবতা।
লোকাপবাদ ভীতস্য প্রত্যয়ন্ত বদাস্যতি॥
তস্মাদিয়ং নরবরাত্মজ শুদ্ধ ভাবা।
দিব্যেনদৃষ্টি বিষয়েণ ময়া প্রদিষ্টা॥
লোকাপবাদ কলুষীকৃতচেতসাযৎ।
ত্যক্তাত্ত্বযা প্রিযতমা বিদিতাপি শুদ্ধা॥

১১০ সর্গ।

বাল্মীকেনৈব মুক্তস্ত রাঘবঃ প্রত্যভাষত।
প্রাঞ্জলির্জগতো মধ্যে দৃষ্ট্বাতাংদেববর্ণিনীং॥
এবমেতন্মহাভাগ যথাবদসি ধর্ম্মবিৎ।
প্রত্যযস্তুমমব্রহ্মংস্তববাক্যৈরকল্মষৈঃ॥
প্রত্যয়শ্চ পুরাদত্তো বৈদেহ্যা সুরসন্নিধৌ।
শপথশ্চকৃতস্তত্রতেন বেশ্ম প্রবেশিতা॥
লোকাপবাদোবলবান্ যেন ত্যক্তাহিমৈথিলী।
সেয়ংলোকভযাদ্ব্রহ্মন্নপাপেত্যভিজানতা॥
পরিত্যক্তা ময়া সীতা তদ্ভবান্ ক্ষন্তুমর্হতি।
জানামিচেমৌপুত্রৌ মেযমজাতৌকুশীলবৌ॥
শুদ্ধাযাংজগতোমধ্যে বৈদেহ্যাংপ্রীতিরস্তুমে।
অভিপ্রাযন্ত বিজ্ঞায় রামস্য সুরসত্তমাঃ॥
সীতাযাঃ শপথে তস্মিন্ সর্ব্বএব সমাগতাঃ।
পিতামহং পুরস্কৃত্য সর্ব্বএব সমাগতাঃ॥
আদিত্যা বসবো রুদ্রা বিশ্বেদেবা মরুদ্গণাঃ।
সাধ্যাশ্চদেবাঃ সর্ব্বেতে সর্ব্বেচ পরমর্ষযঃ॥
নাগাঃসুপর্ণাঃ সিদ্ধাশ্চ তে সর্ব্বেহৃষ্টমানসাঃ।
দৃষ্ট্বাদেবানৃষীংশ্চৈব রাঘবঃ পুনরব্রবীৎ॥
প্রত্যযোমেমুনিশ্রেষ্ঠ ঋষিবাক্যৈরকল্মষৈঃ।
শুদ্ধাযাংজগতো মধ্যে বৈদেহ্যাংপ্রীতিরস্তুমে॥
সীতা শপথ সংভ্রান্তাঃ সর্ব্বএব সমাগতাঃ।
ততোবাযুঃ শুভঃ পুণ্যো দিব্যগন্ধো মনোরমঃ॥
তংজনৌঘং সুরশ্রেষ্ঠা হ্লাদযামাস সর্ব্বতঃ॥
তদদ্ভুত মিবাচিন্ত্যং নিরৈক্ষন্ত সমাহিতাঃ।
মানবাঃ সর্ব্বরাষ্ট্রেভ্যঃপূর্ব্বং কৃতযুগে যথা॥
সর্ব্বান্ সমাগতা দৃষ্ট্বা সীতা কাষাযবাসিনী।
অব্রবীৎপ্রাঞ্জল বাক্যমধোদৃষ্টিরবাঙ্মুখী॥
যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি নচিন্তযে।
তথা মে মাধবীদেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা যথা রামং সমর্চযে।
তথামে মাধবীদেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মেবেদ্মি রামাৎপরং নচ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
তথাশপন্ত্যাং বৈদেহ্যাং প্রাদুরাসীত্তদদ্ভুতং।
ভূতলাদুত্থিতং দিব্যং সিংহাসনমনুত্তমং॥
ধ্রিযমাণং শিরোভিস্তু নাগৈরমিতবিক্রমৈঃ।
দিব্যং দিব্যেন বপুষা দিব্যরত্ন বিভূষিতৈঃ॥
তস্মিংস্তু ধরণীদেবী বাহুভ্যাং গৃহ্যমৈথিলীং।
স্বাগতে নাভিনন্দ্যেনামাসনে চোপবেশযৎ॥
তামাসনগতাং দৃষ্ট্বা প্রবিশন্তীং রসাতলং।
পুষ্পবৃষ্টিরবিচ্ছিন্না দিব্যা সীতামবাকিরৎ॥
সাধুকারশ্চ সুমহান্দেবানাং সহসোত্থিতঃ।
সাধুসাধ্বিতিবৈসীতে যস্যাস্তে শীলমীদৃশং॥
এবং বহুবিধাবাচোহ্যন্তরীক্ষ গতাঃ সুরাঃ।
ব্যাজহ্রুহৃষ্ট মনসো দৃষ্ট্বা সীতা প্রবেশনং॥
যজ্ঞবাট গতাশ্চাপি মুনযঃ সর্ব্বএবতে।
রাজানশ্চ নরব্যাঘ্রা বিস্ময়ান্নোপরেমিরে॥
অন্তরীক্ষেচ ভূমৌচ সর্ব্বেস্থাবর জঙ্গমাঃ।
দানবাশ্চ মহাকাযাঃ পাতালে পন্নগাধিপাঃ॥
কেচিদ্বিনে দুঃসংহৃষ্টাঃ কেচিদ্ধ্যান পরাযণাঃ।
কেচিদ্রামং নিরীক্ষন্তে কেচিৎ সীতামচেতসঃ॥

সীতা প্রবেশনং দৃষ্ট্বাত্তেষামাসীং সমাগমঃ।
তন্মুহূর্ত্ত মিবাত্যর্থং সমং সম্মোহিতংজগং॥

স্থানাভাব প্রযুক্ত আমরা এই দুই সর্গের অনুবাদ করিয়া দিতে পারিলাম না। সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠক মহাশয়েরা মার্জ্জনা করিবেন। এই সংস্কৃত অতি সরল—যাঁহারা অত্যল্প সংস্কৃত জানেন, তাঁহারাও বুঝিতে পারিবেন।

আমরা উত্তরচরিত নাটকের প্রকৃত সমালোচন করি নাই। পাঠকের সহিত আনুপূর্ব্বিক নাটক পাঠ করিয়া যেখানে২ ভাল লাগিয়াছে, তাহাই দেখাইয়া দিয়াছি। গ্রন্থের প্রত্যেক অংশ পৃথক্২ করিয়া পাঠককে দেখাইয়াছি। এরূপে গ্রন্থের প্রকৃত দোষগুণের ব্যাখ্যা হয় না। এক২খানি প্রস্তর পৃথক্২ করিয়া দেখিলে তাজমহলের গৌরব বুঝিতে পারা যায় না। একটি২ বৃক্ষ পৃথক করিয়া দেখিলে উদ্যানের শোভা অনুভূত করা যায় না। এক একটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বর্ণনা করিয়া মনুষ্যমূর্ত্তির অনির্ব্বচনীয় শোভা বর্ণন করা যায়না। কোটি কলস জলের আলোচনায় সাগর মাহাত্ম্য অনুভুত করা যায় না। সেইরূপ কাব্যগ্রন্থের। এস্থান ভাল রচনা, এই স্থান মন্দ রচনা, এইরূপ তাহার সর্ব্বাংশের পর্য্যালোচনা করিলে প্রকৃত গুণাগুণ বুঝিতে পারা যায় না। যেমন অট্টালিকার সৌন্দর্য্য বুঝিতে গেলে, সমুদায় অট্টালিকাটি এক কালে দেখিতে হইবে, সাগর গৌরব অনুভূত করিতে হইলে, তাহার অনন্তবিস্তার এক কালে চক্ষে গ্রহণ করিতে হইবে, কাব্য নাটক সমালোচনও সেই রূপ। মহাভারত এবং রামায়ণের অনেকাংশ এমত অপকৃষ্ট, যে তাহা কেহই পড়িতে পারে না। যে আণুবীক্ষণিক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবে, সে কখনই এই দুই ইতিহাসের বিশেষ প্রশংসা করিবে না। কিন্তু মোটের উপর দেখিতে গেলে বলিতে হইবে, যে এই দুই ইতিহাসের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাব্য পৃথিবীতে বুঝি আর নাই।

সুতরাং উত্তরচরিত সম্বন্ধে মোটের উপর দুই চারিটা কথা না বলিলে নয়। অধিক বলিবার স্থান নাই।

কবির প্রধান গুণ, সৃষ্টিক্ষমতা। যে কবি সৃষ্টিক্ষম নহেন, তাঁহার রচনায় অন্য অনেক গুণ থাকিলেও বিশেষ প্রশংসা নাই। কালিদাসের ঋতুসংহার, এবং টমসনের তদ্বিষয়ক কাব্যে, উৎকৃষ্ট বাহ্যপ্রকৃতির বর্ণনা আছে। উভয় গ্রন্থই আদ্যোপান্ত সুমধুর, প্রসাদগুণ বিশিষ্ট, এবং স্বভাবানুকারী। তথাপি এই দুই কাব্য প্রধান কাব্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না—কেননা তদুভয় মধ্যে সৃষ্টিচাতুর্য্য কিছুই নাই।

সৃষ্টিক্ষমতা মাত্রেই প্রশংসনীয় নহে। রেনল্ড্স্ নামক ইংরাজি আখ্যায়িকালেখকের রচনা মধ্যে নূতন সৃষ্টি অনেক আছে। তথাপি ঐ সকলকে অতি অপকৃষ্ট গ্রন্থ মধ্যে গণনা করিতে হয়। কেননা সেই সকল সৃষ্টি স্বভাবানুকারিণী এবং সৌন্দর্য্যবিশিষ্টা নহে। অতএব কবির সৃষ্টি স্বভাবানুকারী এবং সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট না হইলে, কোন প্রশংসা নাই।

সৌন্দর্য্য এবং স্বভাবানুকারিতা, এই দুয়ের একটি গুণ থাকিলেই, কবির সৃষ্টির কিছু প্রশংসা হইল বটে, কিন্তু

উভয়গুণ না থাকিলে কবিকে প্রধানপদে অভিষেক করা যায় না। আরব্য উপন্যাস বলিয়া যে বিখ্যাত আরব্য গ্রন্থের প্রচার হইয়াছে, তল্লেখকের সৃষ্টির মনোহারিত্ব আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে স্বভাবানুকারিতা না থাকায় "আলেফ লয়লা" পৃথিবীর অত্যুৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ মধ্যে গণ্য নহে।

কেবল স্বভাবানুকারিণী সৃষ্টিরও বিশেষ প্রশংসা নাই। যেমন জগতে দেখিয়া থাকি, কবির রচনা মধ্যে তাহারই অবিকল প্রতিকৃতি দেখিলে কবির চিত্রনৈপুণ্যের প্রশংসা করিতে হয়, কিন্তু তাহাতে চিত্রনৈপুণ্যেরই প্রশংসা, সৃষ্টিচাতুর্য্যের প্রশংসা কি? আর তাহাতে কি উপকার হইল? যাহা বাহিরে দেখিতেছি, তাহাই গ্রন্থে দেখিলাম; তাহাতে আমার লাভ হইল কি? যথার্থ প্রতিকৃতি দেখিয়া আমোদ আছে বটে—কেবল স্বভাবসঙ্গতি গুন বিশিষ্টা সৃষ্টিতে সেই আমোদ মাত্র জন্মিয়া থাকে। কিন্তু আমোদ ভিন্ন অন্য লাভ যে কাব্যে নাই, সে কাব্য সামান্য বলিয়া গণিতে হয়।

অনেকে এই কথা বিস্ময়পর বলিয়া বোধ করিবেন। কি এ দেশে, কি সুসভ্য ইউরোপীয় জাতি মধ্যে, অনেক পাঠকেরই এই রূপ সংস্কার যে, ক্ষণিক চিত্তরঞ্জন ভিন্ন কাব্যের অন্য উদ্দেশ্য নাই। বস্তুতঃ অধিকাংশ কাব্যে (বিশেষতঃ গদ্য কাব্যে বা আধুনিক নবেলে) এই চিত্ত রঞ্জন প্রবৃত্তিই লক্ষিত হয়—তাহাতে চিত্তরঞ্জন ভিন্ন গ্রন্থকারের অন্য উদ্দেশ্য থাকে না; এবং তাহাতে চিত্তরঞ্জনোপযোগিতা ভিন্ন আর কিছু থাকেও না। কিন্তু সে সকলকে উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া গণ্য যাইতে পারে না।

যদি চিত্তরঞ্জনই কাব্যের উদ্দেশ্য হইল, তবে বেন্থামের তর্কে দোষ কি?* কাব্যেও চিত্তরঞ্জন হয়, শতরঞ্চ খেলায়ও চিত্তরঞ্জন হয়। বরং অনেকেরই ঐবানুহো অপেক্ষা এক ব্যক্তি শতরঞ্চ খেলায় অধিক আমোদ হয়। তবে তাঁহাদের পক্ষে কাব্য হইতে শতরঞ্চ উৎকৃষ্ট বস্তু? এবং স্কট্ কালিদাসাদি অপেক্ষা এক জন পাকা খেলোয়ার বড় লোক? অনেকে বলিবেন যে, কাব্যে প্রদত্ত আনন্দ বিশুদ্ধ আনন্দ—সেই জন্য কাব্যের ও কবির প্রাধান্য। শতরঞ্চের আমোদ অবিশুদ্ধ কিসে?

এরূপ তর্ক যদি অযথার্থ না হয়, তবে চিত্তরঞ্জন ভিন্ন কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য আর কিছু অবশ্য আছেই আছে। সেটি কি?

অনেকে উত্তর দিবেন, "নীতিশিক্ষা।" যদি তাহা সত্য হয়, তবে, "হিতোপদেশ" রঘুবংশ হইতে উৎকৃষ্ট কাব্য। কেননা বোধ হয়, হিতোপদেশে রঘুবংশ হইতে নীতি বাহুল্য আছে। সেই হিসাবে কথামালা হইতে শকুন্তলা কাব্যাংশে অপকৃষ্ট।

কেহই এ সকল কথা স্বীকার করিবেন না। যদি তাহা না করিলেন, তবে কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য কি? কি জন্য শতরঞ্চ খেলা ফেলিয়া শকুন্তলা পড়িব?

কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে—কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষ সাধন—চিত্তশুদ্ধি জনন।

* বেন্থাম বলেন, আমোদ সমান হইলে কাব্যের এবং 'পুশ্পিন্' খেলার একই দর।

কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা—কিন্তু নীতিনির্ব্বাচনের দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও নীতিশিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথমোক্তটি গৌন উদ্দেশ্য, শেষোক্তটি মুখ্য উদ্দেশ্য।

কথাটা পরিষ্কার হইল না। যদিও উত্তরচরিত সমালোচন পক্ষে এ কথা আর অধিক পরিষ্কার করিবার প্রয়োজন নাই, তথাপি প্রস্তাবের গৌরবানুরোধে আমরা তাহাতে প্রবৃত্ত হইলাম।

চোর চুরি করে। রাজা তাহাকে বলিলেন, "তুমি চুরি করিও না; আমি তাহা হইলে তোমাকে অবরুদ্ধ করিব।" চোর ভয়ে প্রকাশ্য চুরি হইতে নিরস্ত হইল, কিন্তু তাহার চিত্তশুদ্ধি জন্মিল না। সে যখনই বুঝিবে, চুরি করিলে রাজা জানিতে পারিবেন না, তখনই চুরি করিবে।

তাহাকে ধর্ম্মোপদেশক বলিলেন, "তুমি চুরি করিও না—চুরি ঈশ্বরাজ্ঞা বিরুদ্ধ।" চোর বলিল, "তাহা হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর যখন আমার আহারের অপ্রতুল করিয়াছেন, তখন আমি চুরি করিয়াই খাইব।" ধর্ম্মোপদেশক বলিলেন, "তুমি চুরি করিলে নরকে যাইবে।" চোর বলিল, "তদ্বিষয়ে প্রমাণাভাব।"

নীতিবেত্তা কহিতেছেন, "তুমি চুরি করিও না, কেননা চুরিতে সকল লোকের অনিষ্ট, যাহাতে সকল লোকের অনিষ্ট, তাহা কাহারও কর্ত্তব্য নহে।" চোর বলিবে, "যদি সকল লোক আমার জন্য ভাবিত, আমি তাহা হইলে সকলের জন্য ভাবিতে পারিতাম। লোকে আমায় খেতে দিক্, আমি চুরি করিব না। কিন্তু যে খানে লোকে আমায় কিছু দেয় না, সে খানে তাহাদের অনিষ্ট হয় হউক, আমি চুরি করিব।"

কবি চোরকে কিছু বলিলেন না, চুরি করিতে নিষেধ করিলেন না। কিন্তু তিনি এক সর্ব্বজন মনোহর পবিত্র চরিত্র সৃজন করিলেন। সর্ব্বজনমনোহর, তাহাতে চোরেরও মন মুগ্ধ হইবে। মনুষ্যের স্বভাব, যে যাহাতে মুগ্ধ হয়, পুনঃ পুনঃ চিত্তপ্রীত হইয়া তদালোচনা করে। তাহাতে আকাঙ্ক্ষা জন্মে—কেননা লাভাকাঙ্ক্ষার নামই অনুরাগ। এইরূপে পবিত্রতার প্রতি চোরের অনুরাগ জন্মে। সুতরাং চুরি প্রভৃতি অপবিত্র কার্য্যে সে বীতরাগ হয়।

"আত্মপরায়ণতা মন্দ—তুমি আত্মপরায়ণ হইও না।" এই নৈতিক উক্তি রামায়ণ নহে। কথাচ্ছলে এই নীতি প্রতিপন্ন করিবার জন্য রামায়ণের প্রণয়ন হয় নাই। কিন্তু রামায়ণ হইতে পৃথিবীর আত্মপরায়ণতা দোষ যতদূর পরিহার হইয়াছে, ততদূর, ঈশা এবং বুদ্ধ ভিন্ন কোন নীতিবেত্তা, ধর্ম্মবেত্তা, সমাজকর্ত্তা, বা রাজা বা রাজকর্ম্মচারী-কর্ত্তৃক হয় নাই। সুবিবেচক পাঠকের এতক্ষণ বোধ হইয়া থাকিবেক, যে উদ্দেশ্য এবং সফলতা উভয় বিবেচনা করিলে, রাজা, রাজনীতিবেত্তা, ব্যবস্থাপক, সমাজতত্ত্ববেত্তা, ধর্ম্মোপদেষ্টা, নীতিবেত্তা, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক সর্ব্বাপেক্ষাই কবির শ্রেষ্ঠত্ব। কবিত্ব পক্ষে যে রূপ মানসিক

ক্ষমতা আবশ্যক,তাহা বিবেচনা করিলেও কবির সেই রূপ প্রাধান্য। কবিরা জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা, এবং উপকারকর্ত্তা, এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মানসিকশক্তিসম্পন্ন।

কি প্রকারে কাব্যকারেরা এই মহৎ কার্য্য সিদ্ধ করেন? যাহা সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করিবে, তাহার সৃষ্টি দ্বারা। সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করে সে কি? সৌন্দর্য্য; অতএব সৌন্দর্য্য সৃষ্টিই মনুষ্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। সৌন্দর্য্য অর্থে কেবল বাহ্য প্রকৃতির বা শারীরিক সৌন্দর্য্য নহে। সকল প্রকারের সৌন্দর্য্য বুঝিতে হইবেক। যাহা স্বভাবানুকারী নহে, তাহাতে কুসংস্কারাবিষ্ট লোক ভিন্ন কাহারও মন মুগ্ধ হয় না। এ জন্য স্বভাবানুকারিতা সৌন্দর্য্যের একটি গুণ মাত্র—স্বভাবানুকারিতা ছাড়া সৌন্দর্য্য জন্মে না। তবে যে আমরা স্বভাবানুকারিতা এবং সৌন্দর্য্য দুইটি পৃথক গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহার কারণ, সৌন্দর্য্যের অনেক অর্থ প্রচলিত আছে।

আর একটি কথা বুঝাইলেই হয়। এই জগৎ ত সৌন্দর্য্যময়—তাহার প্রতিকৃতি মাত্রই সৌন্দর্য্যময় হইবে। তবে কেন আমরা উপরে বলিয়াছি যে, যাহা প্রকৃতির প্রতিকৃতি মাত্র, সে সৃষ্টিতে কবির তাদৃশ গৌরব নাই? তাহার কারণ, সে কেবল প্রতিকৃতি—অনুলিপি মাত্র—তাহাকে "সৃষ্টি" বলা যায় না। যাহা সতের প্রতিকৃতি মাত্র নহে—তাহাই সৃষ্টি। যাহা স্বভাবানুকারী, অথচ স্বভাবাতিরিক্ত, তাহাই কবির প্রশংসনীয় সৃষ্টি। তাহাতেই চিত্ত বিশেষ রূপে আকৃষ্ট হয়। যাহা প্রাকৃত, তাহাতে তাদৃশ চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। কেননা, তাহা অসম্পূর্ণ, দোষ সংস্পৃষ্ট, পুরাতন, এবং অনেক সময়ে অস্পষ্ট। কবির সৃষ্টি তাঁহার স্বেচ্ছাধীন—সুতরাং সম্পূর্ণ, দোষশূণ্য, নবীন, এবং স্পষ্ট হইতে পারে।

এই রূপ যে সৌন্দয্য সৃষ্টি কবির সর্ব্বপ্রধান গুণ—সেই অভিনব, স্বভাবানুকারী, স্বভাবাতিরিক্ত সৌন্দর্য্য সৃষ্টিগুণে, ভারতবর্ষীয় কবিদিগের মধ্যে বাল্মীকি প্রধান। তৎ পরেই মহাভারতকারের নাম নির্দ্দিষ্ট হইবে। এক এক কাব্যে ঈদৃশ সৃষ্টিবৈচিত্র্য প্রায় জগতে দুর্লভ।

মহাভাবতের পর, বোধ হয়, শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লেখ করিতে হয়। তৎ পরে শকুন্তলার প্রণেতা। ভারতবর্ষের আর কোন কবিকে এ সম্বন্ধে অত্যুচ্চশ্রেণী মধ্যে গণা যাইতে পারে না।

এ সম্বন্ধে ভবভূতির স্থান কোথায়? তাহা তাঁহার তিন খানি নাটক পর্য্যালোচিত না করিলে অবধারিত করা যায় না। তাহা আমাদিগের উদ্দেশ্যও নহে। কেবল উত্তরচরিত দেখিয়া তাঁহাকে অতি উচ্চাসন দেওয়া যায় না। উত্তর চবিতে ভবভূতি অনেক দূর পর্য্যন্ত বাল্মীকির অনুবর্ত্তী হইতে বাধ্য হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সৃষ্টিমধ্যে নবীনত্বের অভাব, এবং সৃষ্টি চাতুর্য্যের প্রচার করিবাব পথও পান নাই। চরিত্র সৃজন সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে, যে রাম ও সীতা ভিন্ন কোন নায়ক নায়িকার প্রাধান্য নাই। সীতা, রামায়ণের সীতার প্রতিকৃতি মাত্র। রামের চরিত্র,

রামায়ণের রামের চরিত্রের উৎকৃষ্ট প্রতিকৃতিও নহে—ভবভূতির হস্তে সে মহচ্চিত্র যে বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করা গিয়াছে। সীতাও তাঁহার কাছে, অপেক্ষাকৃত পরসাময়িক স্ত্রীলোকের চরিত্র কতক দুর পাইয়াছেন।

তাই বলিয়া এমত বলা যায় না যে, উত্তর চরিতে চরিত্র-সৃষ্টি-চাতুর্য্য কিছুই লক্ষিত হয় না। বাসন্তী ভবভূতির অভিনব সৃষ্টি বটে, এবং এ চরিত্র অত্যন্ত মনোহর। আমরা বাসন্তীর চরিত্রের সবিশেষ পরিচয় দিয়াছি, সুতরাং তৎসম্বন্ধে আর বিস্তারের আবশ্যক নাই। এই পরদুঃখ কাতরহৃদয়া, স্নেহময়ী, বনচারিণী যে অবধি প্রথম দেখা দিলেন, সেই অবধিই তাঁহার প্রতি পাঠকের প্রীতি সঞ্চার হইতে থাকিল।

তদ্ভিন্ন চন্দ্রকেতু ও লবের চিত্রও প্রশংসনীয়। প্রাচীন কবিদিগের ন্যায় ভবভূতিও জড় পদার্থকে রূপবান করণে বিলক্ষণ সুচতুর। তমসা, মুরলা, গঙ্গা, এবং পৃথিবী এই নাটকে মানব রূপিণী। সেই রূপ গুলিন যে মনোহর হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

কবির সৃষ্টি—চরিত্র, রূপ, স্থান, অবস্থা কার্য্যাদিতে পরিণত হয়। ইহার মধ্যে কোন একটির সৃষ্টি কবির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে। সকলের সংযোগে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টিই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। চরিত্র, রূপ, স্থান, অবস্থা, কার্য্য, এ সকলের সমবায়ে যাহা দাঁড়াইল, তাহা যদি সুন্দর হইল, তবেই কবি সিদ্ধকাম হইলেন।

ভবভূতির চরিত্র সৃজনের ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছি। অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার সৃজনকৌশলের পরিচয় ছায়া নামে উত্তর চরিতের তৃতীয়াঙ্ক। আমাদিগের পরিশ্রম যদি নিষ্ফল না হইয়া থাকে, তবে পাঠক সেই ছায়ার মোহিনীশক্তি অনুভূত করিয়াছেন। ঈদৃশ রমণীয়া সৃষ্টি অতি দুর্লভ।

সৃষ্টি-কৌশল কবির প্রধান গুণ। কবির আর একটি বিশেষ গুণ রসোদ্ভাবন। রসোদ্ভাবন কাহাকে বলে, আমরা বুঝাইতে বাসনা করি, কিন্তু রস শব্দটি ব্যবহার করিয়াই আমরা সে পথে কাঁটা দিয়াছি। এ দেশীয় প্রাচীন আলঙ্কারিকদিগের, কেবল নিয়ম গুলিই অগ্রাহ্য এমত নহে, তাঁহাদিগের ব্যবহৃত শব্দ গুলিও পরিহার্য্য। ব্যবহার করিলেই বিপদ ঘটে। আমরা সাধ্যানুসারে তাহা বর্জ্জন করিয়াছি, কিন্তু এই রস শব্দটী ব্যবহার করিয়া বিপদ ঘটিল। নয়টি বৈ রস নয়, কিন্তু মনুষ্য চিত্তবৃত্তি অসংখ্য। রতি, শোক, ক্রোধ, স্থায়ীভাব; কিন্তু হর্ষ, অমর্ষ প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব। স্নেহ, প্রণয়, দয়া ইহাদের কোথাও স্থান নাই;—না স্থায়ী, না ব্যভিচারী,—কিন্তু একটি কাব্যানুপযোগী কদর্য্য মানসিক বৃত্তি আদিরসের আকার স্বরূপ স্থায়ীভাবে প্রথমে স্থান পাইয়াছে। স্নেহ, প্রণয়, দয়াদি-পরিজ্ঞাপক রস নাই; কিন্তু শান্তি একটি রস। সুতরাং এবম্বিধ পারিভাষিক শব্দ লইয়া সমালোচনার কার্য্য সম্পন্ন হয় না। আমরা যাহা বলিতে চাহি, তাহা অন্য কথায় বুঝাইতেছি—আলঙ্কারিকদিগকে প্রণাম করি।

মনুষ্যের কার্য্যের মূল তাহাদিগের

চিত্তবৃত্তি। সেই সকল চিত্তবৃত্তি অবস্থানুসারে অত্যন্ত বেগবতী হয়। সেই বেগের সমুচিত বর্ণন দ্বারা সৌন্দর্য্যের স্জন, কাব্যের উদ্দেশ্য। অস্মদ্দেশীয় আলঙ্কারিকেরা সেই বেগবতী মনোবৃত্তিগণকে "স্থায়ীভাব" নাম দিয়া এ শব্দের এরূপ পরিভাষা করিয়াছেন যে, প্রকৃত কথা বুঝা ভার। ইংরাজী আলঙ্কারিকেরা তাহাকে (Passions) বলেন। আমরা তাহার কাব্যগত প্রতিকৃতিকে রসোদ্ভাবন বলিলাম।

রসোদ্ভাবনে ভবভূতির ক্ষমতা অপরিসীম। যখন রস উদ্ভাবনের ইচ্ছা করিয়াছেন, তখনই তাহার চরম দেখাইয়াছেন। তাঁহার লেখনী মুখে স্নেহ উছলিতে থাকে—শোক দহিতে থাকে, দম্ভ স্ফুলিতে থাকে। ভবভূতির মোহিনীশক্তিপ্রভাবে আমরা দেখিতে পাই যে, রামের শরীর ভাঙ্গিতেছে; মর্ম্ম ছিঁড়িতেছে; মস্তক ঘুরিতেছে; চেতনা লুপ্ত হইতেছে—দেখিতে পাই, সীতা কখন বিস্ময়স্তিমিতা; কখন আনন্দোত্থিতা; কখন প্রেমাভিভূতা; কখন অভিমানকুণ্ঠিতা; কখন আত্মাবমাননা সঙ্কুচিতা; কখন অনুতাপ বিবশা; কখন মহাশোকে ব্যাকুলা। কবি যখন যাহা দেখাইয়াছেন, একবারে নায়ক নায়িকার হৃদয় যেন বাহির করিয়া দেখাইয়াছেন, যখন সীতা বলিলেন, "অম্মহে—জলভরিদমেহ থণিদগম্ভীর মংসলো কুদোণ্এসো ভারদী নিগ্‌ঘোসো! ভরিজ্জমাণকণ্ণবিবরং মং বি মন্দভাইণিং ঝত্তি উস্মাবেদি!" তখন বোধ হইল, জগৎসংসার সীতার প্রেমে পরিপূর্ণ হইল। ফলে রসোদ্ভাবনী শক্তিতে ভবভূতি পৃথিবীর প্রধান কবিদিগের সহিত তুলনীয়। একটী মাত্র কথা বলিয়া মানবমনোবৃত্তির সমুদ্রবৎ সীমাশূন্যতা চিত্রিত করা, মহাকবির লক্ষণ। ভবভূতির রচনা সেই লক্ষণাক্রান্ত। পরিতাপের বিষয় এই যে, সে শক্তি থাকিতেও ভবভূতি রামবিলাপের এত বাহুল্য করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার যশের লাঘব হইয়াছে।

আমাদিগের ইচ্ছা ছিল যে, এই রামবিলাপের সহিত, আর কয় খানি প্রসিদ্ধ নাটকের কয়েকটি স্থান তুলিত করিয়া তারতম্য দেখাই। কিন্তু স্থানাভাবে পারিলাম না। সহৃদয় পাঠক, শকুন্তলার জন্য দুষ্মন্তের বিলাপ, দেস্‌দিমোনার জন্য ওথেলোর বিলাপ, এবং ইউরিপিদিসের নাটকে আল্‌কেস্তিষের জন্য আদ্‌মিতসের বিলাপ, এই রামবিলাপের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিবেন।

বাহ্যপ্রকৃতির শোভার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ভবভূতির আর একটি গুণ। সংসারে যেখানে যাহা সুদৃশ্য, সুগন্ধ, বা সুখকর, ভবভূতি অনবরত তাহার সন্ধানে ফিরেন। মালাকার যেমন পুষ্পোদ্যান হইতে সুন্দর২ কুসুমগুলি তুলিয়া সভামণ্ডল রঞ্জিত করে, ভবভূতি সেইরূপ সুন্দর বস্তু অবকীর্ণ করিয়া এই নাটক খানি শোভিত করিয়াছেন। যেখানে সুদৃশ্য বৃক্ষ, প্রফুল্লকুসুম, সুশীতল সুবাসিত বারি,—যেখানে নীল মেঘ, উত্তুঙ্গ পর্ব্বত, মৃদুনিনাদিনী নির্ঝরিণী, শ্যামল কানন, তরঙ্গসঙ্কুলা নদী—যেখানে সুন্দর বিহঙ্গ, ক্রীড়াশীল করিশাবক, সরল স্বভাব কুরঙ্গ—সেই খানে কবি দাঁড়াইয়া

একবার তাহার সৌন্দর্য্য দেখাইয়াছেন। কবিদিগের মধ্যে এই গুণটি সেক্ষপীয়র ও কালিদাসের বিশেষ লক্ষণীয়। ভবভূতিরও সেই গুন বিশেষ প্রকাশমান।

ভবভূতির ভাষা অতি চমৎকারিণী! তাঁহার রচনা সমাসবহুলতা ও দুর্ব্বোধ্যতা দোষে কলঙ্কিতা বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়াছে। সে নিন্দা সমূলক হইলেও সাধারণতঃ যে ভবভূতির ব্যবহৃত সংস্কৃত ও প্রাকৃত অতিমনোহর, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। উইলসন বলিয়াছেন যে, কালিদাস ও ভবভূতির ভাষার ন্যায় মহতী ভাষা কোন দেশের লেখকেই দৃষ্ট হয় না।

উত্তরচরিতের যে সকল দোষ, তাহা আমরা যথাস্থানে বিবৃত করিয়াছি—পুনরুল্লেখের আবশ্যক নাই। আমরা এই নাটকের সমালোচনা সমাপন করিলাম। অন্যান্য দোষের মধ্যে দৈর্ঘ্য দোষে এই সমালোচন বিশেষ দূষিত হইয়াছে। এজন্য আমরা কুণ্ঠিত নহি। যে দেশে তিন ছত্রে সচরাচর গ্রন্থসমালোচনা সমাপ্ত করা প্রথা, সে দেশে একখানি প্রাচীন গ্রন্থের সমালোচন দীর্ঘ হইলে দোষটি মার্জ্জনাতীত হইবে না। যদি ইহার দ্বারা এক জন পাঠকেরও কাব্যানুরাগ বর্দ্ধিত হয়, বা তাঁহার কাব্যরসগ্রাহিণী শক্তির কিঞ্চিন্মাত্র সহায়তা হয়, তাহাহইলেই এই দীর্ঘ প্রবন্ধ আমরা সফল বিবেচনা করিব।

একান্নবর্ত্তী পরিবার।

যেমন জ্যোতিষ্ক সকল মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে পৃথক অথচ সংযুক্তরূপে নভোমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতেছে, তদ্রূপ মনুষ্যগণ পরস্পরের সহিত বিভিন্ন হইলেও কোন অদ্ভুত কারণে আকৃষ্ট হইয়া একত্র সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। অনেকেই সময়ে সময়ে মনে করেন যে, "একাকী আসিয়াছি, একাকী মরিতে হইবেক,"অতএব "পার্থিব সম্পর্ক নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর; " পরন্তু এতাদৃশ বৈরাগ্যভাব কেবল ভাবুকদিগের কল্পনা মাত্র। যদ্যপি পার্থিবসম্পর্ক বৃথাই হয়, এবং মৃত্যু কর্ত্তৃক তাহা একবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, তবে বিয়োগযন্ত্রণা এত অসহ্য এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী কেন? মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, পশু পক্ষী আদি নিকৃষ্ট জন্তু এবং নদী বৃক্ষ গৃহ পুষ্করিণী আদি নির্জ্জীব পদার্থের উপরেও মায়া সংস্থাপিত হয়। বহু দিন হইল পিতৃ মাতৃ হীন হইয়াছি, তথাপি " মাতা এই স্থানে বসিয়া আমাকে আদর করিয়াছেন, পিতা এইখানে একবার ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন এবং এইখানে বসিয়া তাঁহাদিগের অন্তিমকালে অশ্রু বিসর্জ্জন

করিয়াছি।" এই রূপ কথা মনে হ-ইলে কত সময়ে চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠে। অতএব কি রূপে বলিব যে, তাঁহাদিগের সহিত এখন আর সম্পর্ক নাই। সদ্যোপ্রসূত সন্তানই হউক, অথবা অতি দীন দুঃখী কিম্বা নিতান্ত দুর্বৃত্ত দুরাচারই হউক, কেহই মৃত্যুমাত্র সংসার হইতে সর্ব্বতোভাবে অপসারিত হইতে পারে না। দেহ পঞ্চত্ব পায়, জীবাত্মা কোথায় থাকেন, তদ্বিষয়ে অনেকের মতি স্থির নাই; তথাপি কোন২ জীবিত ব্যক্তির অন্তঃকরণে যে কিছুকাল থাকিতে হইবেক, তাহাতে কেহই সন্দেহ করেন না। এমন মনুষ্য নাই, যে কোন মৃত ব্যক্তিকেই স্মরণ করে না অথবা আপনি মরিলে স্মরণ করিবার লোক নাই বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। এই অদ্ভুত মায়াজাল কেহই ত্যাগ করিতে পারে না, কাহারও ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না—এবং পণ্ডিতেরা যাহাই বলুন, আমাদিগের বিবেচনায়—ইহা ত্যাগ করা কর্ত্তব্যও নহে। অতএব ইহা হইতে যে প্রকারে সমাজের মঙ্গল হয়, সেই রূপ বিধান করাই শ্রেয়ঃ। যাঁহারা ইহাকে ভাল মনে করেন, তাঁহাদিগের দ্বারা এই মায়া জাল বর্দ্ধিত হওয়াই উচিত এবং যাঁহারা ইহাকে মন্দ মনে করেন, তাঁহাদিগের পক্ষেও অগত্যা ইহার আনুষঙ্গিক দোষ দূরীকরণ পূর্ব্বক লোকের হিত চেষ্টা করা নিতান্ত বিধেয়।

"মনুষ্য জাতি যে পশুগণের ন্যায় যথেচ্ছা বিচরণ না করিয়া একত্র বস বাস করেন, তাহার আদি কারণ, বিবাহসংস্কার। শুদ্ধ নিজের আহারাচ্ছাদন লোকের উদ্দেশ্য হইলে, অতি অল্প আয়াসেই তাহা সম্পন্ন হইতে পারিত। কিন্তু মনুষ্য পরের চিন্তাতেই নিতান্ত ব্যস্ত। পরিবারের ভরণ পোষণ, এবং সন্ততিগণের ভাবি অবস্থা সকলের মনেই নিরন্তর জাগরূক রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন কেহ অন্যান্য আত্মীয়দিগের মঙ্গল, এবং কেহ বা স্বদেশবাসিদিগের হিত অথবা সমগ্র মনুষ্য সম্প্রদায়ের শুভানুধ্যানে সর্ব্বদা মগ্ন থাকেন। জনসমাজে বিবাহপ্রথা না থাকিলে ইহার কিছুই মনুষ্যের মনে উদয় হইত না। বিবাহ হইলেই স্ত্রীপুরুষের পূর্ব্বকালীন স্বাধীনভাব নির্ম্মূল হইয়া যায়, এবং উভয়ের মনেই আত্মচিন্তার পার্শ্বে পরচিন্তা আসিয়া আবির্ভূত হয়। তখন নিজের সম্বন্ধে যতই তাচ্ছল্য থাকুক, পতিপত্নীর মঙ্গলকামনা বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠে। এই রূপ চিন্তা উপস্থিত না হইলে, কেহ কোন সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। অতএব পরিবারের ভরণ পোষণ নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া যে ব্যক্তি কোন কুকর্ম্ম করে, তাহার জন্য 'মহামায়াকে' নিন্দা না করিয়া তাহার দারিদ্র্য নিবারণের উপায় চেষ্টা করাই যুক্তিসঙ্গত।

আবার বিবাহের পর সন্তান উৎপত্তি হইলে, পতি পত্নীর মধ্যে নূতন একটী শৃঙ্খল নিবদ্ধ হয়। যে দেশে বিবাহপ্রথা নাই,এবং স্ত্রীপুরুষেরা সকলেই এতদ্বিষয়ে স্বেচ্ছাচারী, সেখানে কেহ সন্তানলাভের সম্পূর্ণ সুখ অনুভব করিতে পারে না। জন্মদাতার সেই সন্তানে কোন অধিকার বর্ত্তে না, মাতাও তাহার জন্য আপনার

ভিন্ন অন্যের প্রতি নির্ভর করেন না; সুতরাং সন্তান স্ত্রী-পুরুষের প্রণয়বৃদ্ধিকারী না হইয়া বরং বিচ্ছেদের হেতু হয়। বিবাহ সংস্কারকে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে চুক্তি বিশেষ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে বটে, কিন্তু সন্তানের সহিত সম্পর্ক কখনই সে রূপ বোধ হয় না; অতএব ইহার প্রতি লক্ষ্য করিলেই বিবাহের নিগূঢ় মর্ম্মবোধ হইবেক। মহাভারতে লিখিত আছে যে, শ্বেতকেতু পিতৃ সমক্ষে আপন মাতাকে কোন অপরিচিত পুরুষের সহিত গমন করিতে দেখিয়া, এই নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন যে, স্ত্রীজাতি পতি ভিন্ন অন্য পুরুষের সেবা করিতে পারিবেন না। এই গল্পটী বিবাহ প্রথা সংস্থাপনের রূপকমাত্র। ইহার প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, পুত্রই মাতার স্বেচ্ছাচার নিবারণ করেন এবং পিতাকে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত করিয়া রাখেন। অতএব পতি পত্নী সম্বন্ধ শিথিল করা কর্ত্তব্য নহে বরং যত প্রগাঢ় হয়, ততই তদুভয় এবং পুত্রের পক্ষে মঙ্গল। আর এই মঙ্গলে সমস্ত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কালেরই মঙ্গল।

পতি পত্নীর চিরকাল একত্র থাকাই শ্রেয়। এ কথা স্বীকার করিলেও আর একটী পৃথক মীমাংসার প্রয়োজন হইতেছে যে, পুত্র কন্যারাও পিতৃসংসারে মাতার ন্যায় সংযুক্ত থাকিবেন কি না? কিন্তু যখন (নানাবিধ বিশিষ্ট কারণে) ভ্রাতা-ভগিনীতে বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে, তখন বিবাহান্তে পুত্র কন্যা উভয়েই কখন পিতৃ আবাসে থাকিতে পারেন না; হয় কন্যাকে পতিগৃহে যাইতে হইবেক,—নতুবা পুত্র পিতৃ গৃহ ত্যাগ করিয়া আপন শ্বশুরালয়ে থাকিতে বাধ্য হইবেন। আমাদিগের দেশে কেবল কন্যাই পিতৃগৃহ ত্যাগ করেন। কিন্তু ইউরোপীয়দিগের মধ্যে পুত্র কন্যা উভয়েই বিবাহিত হইলে স্বাধীনভাবে কালযাপন করেন। এই নিয়মে সমাজের মঙ্গল কি অমঙ্গল বৃদ্ধি হয়, তাহা স্থির করা কর্ত্তব্য। ফলতঃ ইহাই একান্নবর্ত্তী পরিবার বিষয়ক বিচারের মুল কথা।

বিবাহের সময়ে পৃথক-অন্ন হইলে গৃহত্যাগজনিত কোন দোষ বোধ হয় না। কিন্তু বিবাহ করিবার পরে পিতৃভবনে বাস করিলে স্বভাবতঃ পিতা পুত্রে এবং ভ্রাতৃগণের মধ্যে একান্নবর্ত্তী পরিবার নিবদ্ধ হইয়া যায়। তদনন্তর যাঁহারা পৃথক হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ন্যায্যমতে গৃহবিচ্ছেদের নিমিত্তক বলিয়া গণ্য হয়েন। অতএব যদ্যপি পৃথগন্ন হওয়াই বাঞ্ছনীয় হয়, তবে বিবাহের সময়েই তাহার বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য।

১। একান্নে থাকার এক মহৎগুণ এই যে, গৃহস্বামির মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা, তদভাবে পুত্র অথবা ভ্রাতুষ্পুত্র, কেহ না কেহ পরিবার রক্ষার ভারগ্রহণ করিতে পারেন। ইহাঁরা পৃথকালয়ে বাস করিলে, তাহার অনেক অসুবিধা জন্মে। বাঙ্গালির সংসারে পুরুষ অভিভাবক না থাকিলে, নানা ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, কারণ ইউরোপীয়দিগের ন্যায় আমাদিগের মহিলারা সকলের সঙ্গে কথা কহিতে ও ইচ্ছামত সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে পারেন না।

একান্নে থাকিলে সকলেই সময়ান্তরে বা ঘটনা বিশেষে পরস্পরের সাহায্য

করিতে বাধ্য হয়েন। ইহাতে ইচ্ছা না থাকিলেও কার্য্যগতিকে এক জনের দ্বারা অন্যের হিতসাধন হয়,এবং তাহা হইতে কখন কখন কার্য্য কারণের বিপর্য্যয় ঘটিয়া—স্নেহ হইতে যত্নের পরিবর্ত্তে, অগত্যা যত্ন করিতে২—লোকের মনে প্রকৃত ভক্তি, স্নেহ ও দয়ার উদ্রেক হইয়া থাকে। পিতা মাতার ত কথাই নাই; একান্নবর্ত্তী পরিবারে অন্যের প্রতিও কখন২ এতাদৃশ মমতা জন্মে যে, পৃথকান্নে থাকিলে মনোমধ্যে তাহার উদয় হইতেই পারে না। এতদ্ভিন্ন, তৃণ-নির্ম্মিত রজ্জুর ন্যায়, একান্নবর্ত্তী পরিবারের বল তুল্য সংখ্যক পৃথক সংসারের সমষ্টি অপেক্ষা অধিকতর হইবার সম্ভাবনা, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক।

কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গে একান্নবর্ত্তী পরিবারের অনেক গুলি দোষও স্পষ্ট দেখা যায়। বহু পরিবারের অভিভাবকেরা কেহই স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন না। একান্নবর্ত্তী পরিবারদিগের পরস্পরের প্রতি মায়া যেমন বৃদ্ধি, তেমনি হ্রাস হইবার সম্ভাবনাও অপেক্ষাকৃত অধিক। পিতা মাতার প্রতি পুত্রের ভক্তি সহজে বিনষ্ট হয় না বটে, কিন্তু সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, অন্যান্য পরিবারের মধ্যে গাঢ় প্রণয় না হইয়া বরং অসাধারণ বৈরিতা এবং ভয়ানক জ্ঞাতিবিরোধ জন্মে। পূর্ব্বকালে জ্যেষ্ঠ সহোদরকে কনিষ্ঠেরা পিতৃতুল্য মান্য করিতেন, সুতরাং সকল কার্য্যেই পরস্পরের মধ্যে আনুগত্য এবং মঙ্গলানুষ্ঠানের লক্ষণ দৃষ্ট হইত, এবং কোন বিষয়ে কাহারও মনে দ্বিধা উপস্থিত হইত না। কিন্তু এক্ষণে সকল লোকের ইচ্ছাগুলি পূর্ব্বাপেক্ষা এতাদৃশ নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে যে, জ্যেষ্ঠেরা কোন মতেই পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের মনের ভাব বুঝিয়া উঠিতে অথবা তদনুসারে কার্য্য করিতে পারেন না। অধিকন্তু কনিষ্ঠেরা তাহা প্রকাশ করিলে জ্যেষ্ঠের মনে বিরক্তি জন্মে। পূর্ব্বে স্ত্রীকে তাচ্ছল্য করাই স্বামির সচ্চরিত্রতার লক্ষণ ছিল; এক্ষণে পতি-পত্নীর প্রণয় দেখিলে কেহই দোষ দিতে পারেন না; অথচ এরূপ প্রণয় হইতে যে সকল কার্য্য উদ্ভাবিত হয়, তাহা প্রকাশ হইলে সামান্য লোকে পরিহাস করেন আর গৃহস্থের মনোবেদনা হয়। সকলেই জানেন, পুত্র কি কনিষ্ঠ সহোদর বিদেশ যাত্রা কালীন সস্ত্রীক গমনেচ্ছা প্রকাশ করিলে, গৃহস্বামী কিঞ্চিৎ অসুখী হয়েন। ইহা অভিভাবকের পক্ষে উচিত ব্যবহার নহে।

একান্নবর্ত্তী পরিবারের ভ্রাতাদিগের মধ্যে বয়োধিক্যমতে প্রাধান্য জন্মে, কিন্তু সন্তানগণের পক্ষে পিতাই কর্ত্তা; গৃহস্বামী কনিষ্ঠদিগের সেই কর্ত্তৃত্বের প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। ইহাতে একটী গুরুতর হানি হয়। বালক বালিকারা একজনের দ্বারা শাসিত হইলে অন্যের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে,সুতরাং এক দিকে পিতা, অন্য দিকে গৃহস্বামী আংশিক রূপে তাহাদিগের অভিভাবক হওয়াতে উভয়ের কেহই আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন না, এবং উহারাও মস্তকহীনের ন্যায় আচরণ করে।

পূর্ব্বকালে বধূগণ কেবল গৃহস্বামিকেই

সর্ব্বাচ্ছাদক বলিয়া জানিতেন, এক্ষণে দাম্পত্য প্রণয়ের আধিক্য বশতঃ তাঁহারাও পতি এবং শ্বশুর অথবা ভাসুর, দুইজন কর্ত্তার অধীন হইয়া অনেক স্থলে নিতান্ত স্বেচ্ছাচারীর ন্যায় ব্যবহার করেন।

ভ্রাতৃস্নেহ অতি অমূল্য পদার্থ; কিন্তু একবার ভ্রাতার যত্ন বাহ্য বলিয়া সন্দেহ হইলে সে ক্ষোভ কদাচ নিবৃত্ত হয় না। অপর ব্যক্তি মৌখিক স্নেহ প্রকাশ করিলেও সুখোৎপত্তি হয়, কিন্তু আত্মীয়গণের বিন্দু মাত্র ত্রুটি হইলেই অসহ্য বোধ হয়। ফলতঃ মনুষ্যের মনে একটী প্রবৃত্তি বলপ্রাপ্ত হইলে অন্য গুলি সহজেই খর্ব্ব হইয়া যায়; পতি পত্নীর মধ্যে প্রগাঢ় স্নেহ এবং গুরু জনের প্রতি অবিচলিত ভক্তি, উভয় রক্ষা করা অসাধ্য। অতএব একান্নবর্ত্তী পরিবারের বিশৃঙ্খলা স্বভাবসিদ্ধ বলিতে হইবেক।

২। এতদ্দেশে অতি অল্প বয়সে বিবাহ হইয়া থাকে; তৎকালে পুত্র বা পুত্রবধূ কেহই আশ্রম রক্ষার নিয়ম শিক্ষা করিতে পারেন না। সুতরাং তজ্জন্য কিছুকাল গুরুজনের আশ্রমে থাকা প্রয়োজন। আবার, পক্ষান্তরে দেখা যাইতেছে, বিবাহের অব্যবহিত পরে পৃথক হইবার নিয়ম প্রচলিত হইলে, বাল্যবিবাহ এবং তজ্জনিত ক্ষতি সমস্তই যুগপৎ নিবারিত হইতে পারে।

৩। পৃথগন্ন হইলে সম্পত্তি বিভাগের প্রয়োজন হয়, এবং তৎকারণে ব্যয় বাহুল্য হইয়া উঠে। একান্নে থাকিলে তাহা উপস্থিত হয় না। বস্তুতঃ ইহাই পৃথগন্ন হইবার মূলীভূত প্রতিবন্ধক। এতদ্দেশীয় লোকের প্রধান সম্পত্তি ভূমি। কৃষকদিগের পক্ষে ভূমি বিভাগে বিশেষ ক্ষতি নাই, কিন্তু যাঁহারা তাহাদিগের নিকট কর গ্রহণ পূর্ব্বক ভূমি অধিকার করেন, তাঁহাদিগের বিষয় বিভাগের পরে কর সংগ্রহের জন্য পৃথক বন্দোবস্ত করিতে হয়, তাহাতে কাজে কাজেই অধিক খরচ পড়ে। ভূমির পরিবর্ত্তে কেবল ভূমি-স্বত্ব বিভাগ করিলে ভূমি কিম্বা প্রজার উপরে মালিকের তাদৃশ ক্ষমতা থাকে না। কোন কার্য্যে এক জন শরিক বক্র হইলেই অপর সকলকে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে হয়। ওদিকে ভূমি বিভাগ করিলে সে অসুবিধা দূরীকৃত হইতে পারে বটে, কিন্তু একবার বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহার পরে ভূমি বিভাগ করা এক প্রকার অসাধ্য বলিয়া গণ্য। কারণ বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎকালের সকল প্রকার ক্ষতি বৃদ্ধির বিচার করিলে ভূমি বিভাগ কখনই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইতে পারে না। তদ্ভিন্ন এতদ্দেশের ভূমি "বেঁধা ফোঁড়া" (পিতল গোলা) বলিয়া এই সঙ্কট শত গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই জন্য ভূমি সম্পত্তি বিশিষ্ট লোকেরা নিতান্ত অসহ্য না হইলে একান্নে থাকিবার ক্লেশ মোচনের চেষ্টা করেন না।

ভদ্রাসন বিভাগের নিয়ম আরো ভয়ানক। কত সময়ে ভ্রাতৃগণ পৃথক কুঠরী গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়া এক একটী কুঠরীকে দ্বিভাগ করতঃ উভয়াংশই অব্যবহার্য্য করিয়া ফেলেন। বিবাদের এতই দৌড় যে, কেহ কেহ বিভাগের সময়ে পুষ্করিণীর মধ্য স্থলে বাঁধ দিয়া থাকেন।

ইংরাজদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র একাকী সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি অধিকার করেন। সুতরাং এরূপ কোন গোলযোগই নাই। কিন্তু অভিনব সমাজ শাস্ত্রবেত্তাদিগের মতানুসারে এই নিয়ম দূষণীয়। অন্যান্য দেশে বিভাগ বিষয়ে শরিকদিগের মতভেদ হইলে ভূমি বিক্রয় পূর্ব্বক মূল্য ভাগ করিয়া লয়। এতদ্দেশে এই প্রণালীতে সচরাচর ন্যায্য মূল্য পাওয়া যায় না, এবং অস্থায়ী বলিয়া, ভূমির পরিবর্ত্তে, অর্থ গ্রহণ করিতে সকলেই আপত্তি করেন।

৪। একান্নবর্ত্তী পরিবারের কলহের বিষয় বাঙ্গালি মাত্রেই অবগত আছেন। তদ্বিষয়ে আমাদিগের এই মাত্র বক্তব্য যে, তাহা অনিবার্য্য। কলহ হইবেক না, এরূপ প্রত্যাশা লুব্ধ আশ্বাস মাত্র। সুতরাং প্রথম হইতেই তাহার উপায় করা যুক্তিসিদ্ধ।

কোন২ মহৎ পরিবারে পৃথক হইবার প্রতি এতই আপত্তি আছে যে, সম্পত্তি-অধিকারী মোকদ্দমা ব্যতীত শরিককে ভাগ দিতে চাহেন না। এরূপ স্থলে শরিকের অংশ অপহরণ করাই অনেকের মানস থাকে। কিন্তু তাদৃশ অসৎ অভিসন্ধি না থাকিলেও কেহ২ মনে করেন যে, অন্যায়কারী ব্যক্তি মোকদ্দমার ক্লেশ জানিতে পারিলে, তাহা হইতে নিরস্ত হইয়া একান্নে থাকিতে সম্মত হইবেন, এবং উভয়েই লোকাপবাদ হইতে অব্যাহতি পাইব। কিন্তু তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, আন্তরিক মনোবাদ জন্মিলে লোকের লাভালাভের প্রতি দৃষ্টি থাকে না। পৃথক হইবার যত প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়, পরিণামে সমস্তই অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। কেবল উভয় পক্ষের অর্থ নাশ, মান হানি, মনের গ্লানি, এবং লোকাপবাদের সীমা থাকে না।

পরিবারের মধ্যে এক জন অন্য শরিকের অর্থাপহরণ করিলে, তাহাদিগকে কোন প্রকারে উৎপীড়ন করিলে, অথবা অপব্যয়ী হইলে সংসার সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়। অতি বড় ধনী পরিবারেও অপব্যয়ী ব্যক্তির ব্যয় সংকুলান হওয়া দুঃসাধ্য। সুতরাং এরূপ স্থলে যাঁহারা আত্মরক্ষা এবং স্ত্রী পুত্রের মঙ্গলার্থ ভ্রাতৃত্যাগ করেন, তাঁহাদিগের নিন্দা করা অন্যায়।

মধ্যবর্ত্তী পরিবারে অর্থের অসচ্ছলতা নিবন্ধন নানা প্রকারে পরস্পরের মধ্যে বিরোধ উৎপন্ন হয়। স্বার্থসাধনের জন্যই হউক বা পরিবারের সম্ভ্রম রক্ষার জন্যই হউক, গৃহস্বামী সকল ব্যক্তিকে ন্যায্য অংশ না দিয়া যদি কোন প্রকারে নিজের আধিক্য রক্ষা করেন, তাহাহইলে সকলেই তাঁহার প্রতি কুপিত হয়েন। মনে কর, কোন পরিবারের এক খানি গাড়ি আছে; না রাখিলে সম্ভ্রমের ব্যাঘাত, আবার রাখিলে প্রধানতঃ গৃহস্বামির নিজ প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইহাতেও বিরোধ ঘটে; কর্ত্তা মনে করেন, আমি সকলেরই মান রক্ষা করিতেছি; অধীনেরা মনে করেন, তিনি ন্যায্যাংশের অতিরিক্ত লইতেছেন; এরূপ ঘটনা কেবল গাড়ির বিষয়ে নহে, পোষাক, চাকর প্রভৃতি সমস্ত সম্ভ্রম সূচক ব্যয়ের স্থলেই উপস্থিত হইয়া থাকে।

জ্যেষ্ঠ দেশকাল বিবেচনা না করিয়া জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ কনিষ্ঠগণের নিকট

আপনার কোন প্রাধান্য প্রকাশ করিলেই তাঁহাদিগের মনে ক্রোধ উপস্থিত হয়। আবার যেখানে কনিষ্ঠ কৃতী হইয়া জ্যেষ্ঠের ন্যায় প্রাধান্য প্রাপ্ত হয়েন, সেখানে তাঁহার দ্বারা এরূপ কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ নিতান্ত অসহনীয়। কিন্তু অর্থ বা বিদ্যা বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা জন্য যে প্রাধান্য জন্মে, তাহাতে কোন ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে গর্ব্বহীন হইতে পারেন না;—এবং মনে যাহা থাকে,তাহা কালসহকারে অতি মূর্খের নিকটেও প্রকাশ হয়। ফলতঃ নিতান্ত দরিদ্র অথবা মহাধনী না হইলে সকল ব্যক্তির মধ্যে সমস্ত বিষয়ের তুল্যতা রক্ষা করা অসম্ভব। গৃহস্বামী সর্ব্বদা সকলের সুখ দুঃখের তত্ত্বাবধান, সামান্য বিষয়েও আত্মসংযম এবং সর্ব্বোপরি বাক্‌সংযম—না করিলে, কখনই ভ্রাতৃগণকে একান্নে রাখিতে পারেন না। এতাদৃশ বৈরাগ্য, সাংসারী ব্যক্তির মধ্যে নিতান্ত দুর্লভ।

সহোদরগণের সন্তান সন্ততি লইয়া আর এক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। কোন ব্যক্তির সন্তান সংখ্যা অধিক এবং কাহার অল্প হইলে খরচপত্র বিষয়ে ভ্রাতা এবং সন্তান উভয় শ্রেণীতেই প্রত্যেকের তুল্যতারক্ষা করা অসম্ভাবিত। সুতরাং ইহার অব্যর্থ ফল—পরদ্বেষ, অভিমান এবং যন্ত্রণা প্রভৃতি সহস্র বিপদ—নিবারণ করা অসাধ্য; পরিশেষে নিশ্চয়ই সংসার বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। অন্তঃপুর বাসিনীদিগের মধ্যে কেহ ভর্ত্তার বিশেষ অনুগ্রহ পাত্রী হইলে সর্ব্বনাশ হয়। পিতৃদত্ত আনুকুল্যের প্রতি কেহ আপত্তি করিতে পারে না; কিন্তু যে বধূ পিতার নিকট সর্ব্বদা উপকার প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহার স্বাভাবিক গর্ব্ব অপরের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠে।

একান্নবর্ত্তী পরিবারে কনিষ্ঠেরা পদে২ কেবল জ্যেষ্ঠের 'দোষই' দেখেন, কিন্তু গুণের বিষয় কেহই মনে করেন না।—সকলেই পরামর্শ দিতে প্রস্তুত, কিন্তু কি জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ, তাহা গ্রহণ করিতে কেহই ব্যগ্র নহেন। কিন্তু গৃহস্বামীর সহস্র দোষ থাকিলেও স্বীকার করিতে হইবেক যে, তাঁহাকে পরিবারের জন্য সর্ব্বদাই চিন্তা করিতে হয়। কনিষ্ঠেরা কেবল আত্মবিষয়ক চিন্তাতেই নিপুণ, সুতরাং গৃহস্বামী স্বভাবতঃ কনিষ্ঠদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রত্যাশা করেন। পরন্তু মনুষ্য প্রাত্যহিক উপকারের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রতিপালনে নিতান্ত অপটু। অতএব গৃহস্বামীর সেই প্রত্যাশা অসম্পূর্ণ থাকাতে প্রথমতঃ অসন্তোষ, পরে তাচ্ছল্য, এবং পক্ষান্তরে অভিমান, পরিণামে বিরোধ অবশ্যই ঘটিবেক। এই প্রকার ঘটনা দুই একটীতে কিছুই হয় না; পুনঃ২ হইতে থাকিলে কেহ তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিলেও মনের মালিন্য ক্রমশঃ সঞ্চিত হইতে থাকে।

জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ মধ্যে এই রূপ; আবার কনিষ্ঠ পরস্পরার মধ্যে বিরোধ আরো সহজে উৎপন্ন হয়। সামান্য বিষয়ে তাহা প্রকাশ পায় না, কিন্তু প্রকাশ পাইলে তাহা নিবারণ করা দুঃসাধ্য। গৃহস্বামী তজ্জন্য কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ করিলে কনিষ্ঠদিগের আক্রোশে পতিত হয়েন। তাচ্ছল্য করিলে বিরোধী ব্যক্তিগণের উভয় পক্ষই ক্ষুণ্ণ হয়েন, এবং মীমাংসার চেষ্টা করিলে উভয়েই পক্ষপাতের দোষ

দেন। একান্নবর্ত্তী পরিবারের মহদ্দোষ এই যে, কনিষ্ঠেরা কখনই সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিতে পারেন না।'

পুরুষদিগের তুলনায় অন্তঃপুরবাসিনীদিগের বিরোধ চতুর্গুণ ভয়ঙ্কর। বধূগণ সকলেই শ্বশ্রূ অথবা জ্যেষ্ঠ যাতাকে ভয় করেন; তাঁহার ছিদ্রানুসন্ধানে নিবিষ্ট থাকেন; তৎকৃত উপকার ভুলিয়া যান; তাঁহার নিকট মনের কথা গোপন করেন এবং পরস্পরের প্রতি অসন্তোষ সঞ্চয় করিতে থাকেন। অন্দরে আছেন বলিয়া লোক লজ্জা অল্প হয়, এবং শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য বশত কথার কোন আটক থাকে না। অধিকন্তু বধূগণের মধ্যে কেহ সম্পর্কে ছোট, কিন্তু বয়সে বড় অথবা তদ্বিপরীত ঘটনা উপস্থিত হইলে বিরোধের আর একটী সূত্র বৃদ্ধি হয়। বয়ঃকনিষ্ঠের সম্মান পাওয়া দুষ্কর, কিন্তু তিনি আপন পদের প্রাধান্য ভুলিতে পারেন না। বিশেষতঃ স্বামির নিকট বিশেষরূপ আদর পাইলে (দ্বিতীয় সংসার স্থলে ইহা সর্ব্বদাই ঘটে) তখন আর তাঁহার বুদ্ধি স্থির থাকা অসম্ভব হইয়া উঠে। তিনি ভর্ত্তার উপর কর্ত্রী, অতএব এই স্পর্দ্ধা প্রদর্শন করিবার জন্য বয়সে-জ্যেষ্ঠ-সম্পর্কে-কনিষ্ঠ বধূগণ ভিন্ন আর উৎকৃষ্ট স্থান কোথায় পাইবেন?

পৃথিবীতে যত বিরোধ উপস্থিত হয়, সূত্রপাত কালীন বিবদমানদিগের মধ্যে প্রায় কেহই তাহা জানিতে পারেন না। কিন্তু পুরুষেরা লোকচরিত্র বিষয়ে স্ত্রীজাতি অপেক্ষা অভিজ্ঞ, এই জন্য অবিলম্বে বিরোধের লক্ষণ ও পরিণাম বুঝিতে পারিয়া অনেক কৌশলের দ্বারা তাহাহইতে নিষ্কৃতি পান। স্ত্রীজাতি চিরকাল অন্তঃপুরে বাস করাতে সেরূপ কৌশলও শিক্ষা করেন নাই, এবং পুরুষের ন্যায় হঠাৎ বিপদও টের পান না। অনন্তর অন্নত্যাগ, রোদন, কপালে আঘাত, স্বামির নিকট নালিশ ইত্যাদি গৃহবিচ্ছেদের সমস্ত উপকরণ আসিয়া উপস্থিত হয়। মনে কর, একটী বধূ অনবধানতা বশতঃ কোন কার্য্যের দ্বারা আর এক জনের কিঞ্চিৎ ক্লেশ জন্মাইলেন। ইনি ইহার হেতু অনুসন্ধানে কাল হরণ বা বাক্য ব্যয় না করিয়া প্রথমার দুরভিসন্ধি অনুমান করিয়া লইলেন। এবং প্রতিফল না দিলে আধিক্য বা তুল্যতা রক্ষা হয় না; অতএব সুযোগ বুঝিয়া একটী জ্ঞানকৃত অন্যায় করিলেন। প্রথমাও দ্বিতীয়ার অনুরূপ, বিশেষতঃ স্পষ্ট অন্যায় দেখিয়া কি প্রকারে ক্ষান্ত থাকেন; অতএব একটী শ্রেষ্ঠতর অন্যায় করিলেন। একবার কল চলিলে আর থামান কাহার্ সাধ্য? ওদিগে ইহাঁদিগের প্রভুগণ প্রত্যহ রাত্রিতে বিচারকার্য্যে নিযুক্ত হইতেছেন। ভ্রাতাদিগের মধ্যে স্ত্রীসম্বন্ধীয় আলাপ নিষিদ্ধ, সুতরাং অনেক স্থলে "এক তরফা" বিচারেই একান্নবর্ত্তী পরিবার নিঃশেষিত হয়। যদি ভ্রাতৃগণ "ওয়াইফের" বিষয়ে আলাপ করেন, তবে কথা চালা চালিতে আর কিছু দিন অতিবাহিত হয়। মীমাংসার জন্য চারি জনের সাক্ষাৎ হওয়া নিতান্ত অভব্যতার লক্ষণ। অতএব পরিশেষে মূল কথা অন্তরীক্ষে থাকিয়া কাল্পনিক কথার প্রসঙ্গে সংসার ভাঙ্গিয়া যায়।

এই সকল কারণে আমরা বিবেচনা করি যে, মনের বিচ্ছেদ হইবার পূর্ব্বেই অন্ন পৃথক করা ভাল।

একান্নবর্ত্তী পরিবারের অন্যান্য দোষের মধ্যে পরভাগ্যোপজীবিতা অতি প্রধান। যাঁহারা পৈতৃক সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা স্বভাবত পরভাগ্যোপজীবী, সুতরাং একান্ন পৃথগন্ন উভয় অবস্থাতেই সমান। কিন্তু যাঁহারা স্বয়ং উপার্জ্জন করেন, তাঁহারা সকলেই কখন তুল্যরূপ উপায়ী হইতে পারেন না। অথবা স্বাধীন হইবার ক্ষমতা জন্মিলে সামান্য কষ্টও অসহ্য বোধ হয়, সুতরাং অল্প কাল মধ্যেই পৃথগন্ন হয়েন। আর যাঁহারা একান্নে থাকেন, তাঁহাদিগের অধিকাংশই উপার্জ্জনে অক্ষম অথবা প্রধান ভ্রাতার তুল্য না হইতে পারিলে, অভিমান বশতঃ তাঁহার অন্ন ধ্বংস করাই শ্রেয় মনে করেন। কিন্তু ইহাঁদিগের ন্যায় অকর্ম্মণ্য পুরুষ পৃথিবীতে আর নাই। অথচ উপার্জ্জনকারী আশ্রয় না দিলে তাঁহাদিগের যে দিন পাতের ব্যাঘাত হয়, এমত নহে; বরং কেহ২ অর্থ সঞ্চয়ও করিতে পারেন। পরিবারগণের মধ্যে উপার্জ্জনের ন্যূনাতিরেক থাকিলে, এক জনের গর্ব্ব, অন্যের অভিমান, কাহারো ঈর্ষা এবং কখন কখন কোন ব্যক্তির দ্বারা ভ্রাতৃধনাপহরণ পর্য্যন্তও ঘটনা হয়।

অনন্তর এই বিপত্তি নিবারণ জন্য আমরা যে উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য মনে করিয়াছি, তাহা প্রকাশ করা যাইতেছে। এতদ্বিষয়ে সর্ব্ব সাধারণের পরামর্শ অত্যাবশ্যক।

উপায়। গৃহস্বামী পুত্রকে উপার্জ্জনে সক্ষম দেখিলে বিবাহ দিবেন এবং পুত্রবধূকে সংসার কার্য্য শিখাইবার জন্য কিছু দিন তাঁহার শ্বশ্রূর অধীনে রাখিবেন, অনন্তর সঙ্গতি অনুসারে তাঁহাদিগের জন্য পৃথক আবাস নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন। নতুবা, বিবাহের ব্যয়সংক্ষেপ করিয়া কিঞ্চিৎ অর্থ দান করিবেন। এই রূপে এক জনের বাসস্থান পৃথক না করিয়া অন্য পুত্রের বিবাহ দিবেন না। যাঁহারা উপার্জ্জনে অক্ষম, তাঁহাদিগের বিবাহ না দিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট বয়সে কিঞ্চিৎ অর্থ দানান্তে তাঁহাদিগকে পৃথক করিবেন। পরিণামে কনিষ্ঠ পুত্র পিতৃ-আবাস অধিকার করিয়া মাতা, বিমাতা ও বৃদ্ধ পিতার প্রতি পালন ভার গ্রহণ করিবেন। পিতার অবর্ত্তমানে মাতা এবং তদভাবে ভ্রাতা কি অন্য অভিভাবক এই নিয়মে পিতৃ কার্য্য সম্পাদন করিবেন। ভূমি সম্পত্তি যদি পিতা বিভাগ করিয়া দেন, তবেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইতে পারে। তাঁহার অকস্মাৎ মৃত্যু হইলে ভ্রাতৃগণ স্বয়ং বিভাগের উপায় করিবেন। কিন্তু কোন ব্যক্তি কিঞ্চিৎ মাত্র আপত্তি প্রকাশ করিলেই শালিশ নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। অন্ততঃ অগত্যা আদালতের সাহায্য লইতে হইবেক। কিন্তু দুটীনিয়ম অভিন্ন রূপে প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। যথা;—

১। বিরোধ হইবার অগ্রে অন্ন পৃথক করা বিধেয়।

২। পৃথগন্ন হইয়া এত দূরবর্ত্তী স্থানে আবাস নির্দ্দিষ্ট করা উচিত যে ইচ্ছার বহির্ভূত সাক্ষাৎ না ঘটে। সর্ব্বদা একত্র

থাকিলে বিরোধ নিবারণ করা অসাধ্য, অতএব যাহাতে ইচ্ছা করিলে অনায়াসে বিনা সাক্ষাতে কাল যাপন করা যায়, এরূপ বন্দোবস্ত করা আবশ্যক।

আচার্য্য গোল্‌ডষ্টুকর কৃত

পাণিনি বিচার।

আচার্য্যের মৃত্যু ঘটনায় আমরা দুঃখিত আছি, সেই দুঃখ সহকারে আজি এই কয়েক পংক্তি স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ তাঁহার পরলোক গত আত্মার উদ্দেশে উৎসর্গ করিলাম।

"পাণিনি বিচার" অতি আশ্চর্য্য গ্রন্থ। গ্রন্থখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া যাঁহার মনে গ্রন্থকারের প্রতি ভক্তি রসের উদয় না হয়, তিনি অতি অসাধারণ ব্যক্তি হইবেন। দৃঢ় অধ্যবসায়সহ অনন্য সাধারণ পরিশ্রম, সত্যোদ্ভাবনে ও সত্য প্রকাশে অকুতোভয়ভাব, অতি পরিপাটি বিচার শক্তি, অল্পদর্শী পণ্ডিতাভিমানিদিগের প্রগল্‌ভ বচন শ্রবণে প্রগাঢ়শ্রমী ও অগাধগামী ভট্টাচার্য্য স্বভাব সুলভ কোপ প্রকাশ, প্রাচীন আর্য্যগণে আস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক আর্য্যগণের মহত্ত্ব স্থাপন জন্য ও লুপ্তপ্রায় আর্য্যগৌরব উদ্ধার জন্য একান্তমনে ও ব্রতপালনে চেষ্টা, এ গুলি জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। শারদীয়া প্রতিমার প্রধান পঞ্চ পুত্তলির ন্যায় জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। আর্য্য গৌরবোদ্ধার চেষ্টামূর্ত্তি মধ্যস্থলে দশহাতে বিরাজ করিতেছে। সকল গুলিই দেবমূর্ত্তি, প্রত্যেকটি দেখিলেই হিন্দুর মনে ভক্তির আবির্ভাব হয়, কিন্তু এই পুত্তলি সমষ্টি অতি আশ্চর্য্য দর্শন। ইহার মহত্ত্ব আমরা আমাদের ক্ষুদ্রায়ত চিত্তে আয়ত্ত করিতে পারি না। সকল গুলিকেই প্রণাম করি, মধ্য মূর্ত্তিই মনে চিরঅঙ্কিত থাকে। "পাণিনি বিচার" অতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। তৎপাঠে বিচিত্র শিক্ষা জন্মে। পাণিনি ব্যাকরণ কোন্ সময়ে হয়, এই বিষয়ে গ্রন্থমধ্যে অতি সুন্দর বিচার আছে।

পাণিনি ব্যাকরণের কাত্যায়ন কৃত "বার্ত্তিক" আছে; সবার্ত্তিক সূত্রসমস্তের পতঞ্জলিকৃত "মহাভাষ্য" আছে; এই মহাভাষ্যের কৈয়ট (*) কৃত টীকা আছে; সিদ্ধান্তকৌমুদী প্রভৃতি আরো অনেক টীকা গ্রন্থ আছে; কিন্তু আধুনিক বলিয়া আচার্য্য বিচার কালে সে গুলির বড় প্রসঙ্গ করেন নাই। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি পদ্যময়ী রচনা আছে; সেগুলিকে "কারিকা" বলে। সকল ব্যাকরণেই দুই প্রকার সূত্র থাকে; সংজ্ঞাসূত্র ও পরিভাষা সূত্র। সংজ্ঞাসূত্র গুলি প্রকৃত সূত্র; ঐ সকল সূত্র কি প্রকারে বুঝিতে

(*) কৈয়্যট।

হইবে, তাহাই পরিভাষায় লিখিত থাকে।

পাণিনি ব্যাকরণের বার্ত্তিককার ভাষ্যকারগণের মধ্যে কাত্যায়নই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। তাঁহার পূর্ব্বে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কেহই লেখনী সঞ্চালন করেন নাই। তাঁহার কৃত যেমন "বার্ত্তিক" আছে, তেমনি গুটিকত কারিকাও আছে। আর মহাভাষ্যের অধিকাংশ বার্ত্তিকই মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি কৃত। মহাভাষ্যের আর কতকগুলি রচনাকে "ইষ্টি" বলে। পাণিনির অসম্পূর্ণতা ও অস্পষ্টতা কাত্যায়ন প্রদর্শন করেন। মহাভাষ্যকার সেই সমালোচন কতদূর সঙ্গত, তাহার বিচার করিয়াছেন ও পাণিনি সূত্র সম্বন্ধে যাহা নিজ বক্তব্য, তাহা "ইষ্টি" রচনায় গ্রন্থন করিয়াছেন। ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, পাণিনির সকল সূত্রের কাত্যায়ন কৃত বার্ত্তিক নাই। কাত্যায়ন বার্ত্তিকের সকল গুলিই পতঞ্জলি পরীক্ষা করিয়াছেন; কিন্তু পতঞ্জলিও সকল পাণিনি সূত্রের উল্লেখ করেন নাই; আবশ্যক হয় নাই। সুতরাং কাত্যায়ন বা পতঞ্জলি কোন সূত্রের উল্লেখ করেন নাই বলিয়া সে গুলি যে প্রকৃত পাণিনি সূত্র নহে, পরে সন্নিবেশিত হইয়াছে, এ কথা বলা যাইতে পারে না। সচরাচর প্রকৃতি প্রত্যয়ে, উভয়ের অর্থসঙ্গতি জন্য শব্দের অর্থ হইয়া থাকে; কতকগুলি প্রত্যয় আছে, তাহাদের এরূপ অর্থ সঙ্গতি হয় না। তাহাদিগকে "উণাদি" বলে। সেই সকল প্রত্যয় যোগনিষ্পন্ন শব্দকেও উণাদি বলে। গোল্‌ডষ্টুকর দেখাইয়াছেন যে, পাণিনি ব্যাকরণে যে উণাদি গুলি আছে, তাহা পাণিনির নিজের; কিন্তু উণাদি সূত্রগুলি সম্ভবতঃ কাত্যায়ন বররুচির। এবং ধাতু পাঠও পাণিনির নিজকৃত।

আচার্য্য গোল্‌ডষ্টুকর কয় জন বৈয়াকরণিক মধ্যে কাহার্ পরে কে, তাহা অতি সুন্দর যুক্তি সহকারে স্থির করিয়াছেন। যাস্ক এক জন বৈয়াকরণিক। পাণিনি বলেন,নিপাত তিন প্রকার; উপসর্গ, গতি ও কর্ম্ম প্রবণ্য। যাস্ক এরূপ কিছু বিভেদ করেন নাই। যাস্কের পাণিনির পরে না হওয়াই সম্ভব। বিশেষতঃ যখন পাণিনির "যাস্কাদিভ্যো গোত্রে" একটি সূত্রই রহিয়াছে, তখন যাস্ক যে পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী লোক, তাহাতে আর কোন সন্দেহই হইতে পারে না।

ব্যাড়ি বা ব্যালি নামে আর এক জন সংগ্রহকার আছেন। কথিত আছে, তদীয় গ্রন্থ লক্ষ শ্লোকময়। পতঞ্জলির একটি সূত্র এই, যদি ভিন্ন সময়বর্ত্তী অনেক ব্যক্তির নাম একত্রে এক পদভুক্ত করিতে হয়, তাহাহইলে কাল গণনায় যে পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহাকে পূর্ব্বে স্থাপন করিতে হইবে। আমরা একটি উদাহরণ দি। যেমন মৎস্যকূর্ম্মবরাহ; পৌরাণিক মতে মৎস্যাবতারই কাল গণনায় অগ্রবর্ত্তী, সুতরাং সমস্ত পদেও মৎস্য সর্ব্বপূর্ব্ববর্ত্তী হইলেন। পতঞ্জলির উদাহরণ;—

"আপিশল-পাণিনীয়-ব্যাড়ীয়-গৌতমীয়া।" সুতরাং ব্যাড়ি পাণিনির পরে হইলেন। ইহার আরো প্রমাণ আছে। পতঞ্জলি ব্যাড়িকে দাক্ষায়ণ বলিয়াছেন। দক্ষপুত্র দাক্ষি; সেই গোত্রজ

দাক্ষায়ণ। পাণিনি যুবন্ শব্দের "অপত্যং পৌত্র প্রভৃতি গোত্রং" এই রূপ ব্যাখ্যা করেন, অর্থাৎ পৌত্র প্রপৌত্র ইত্যাদিকে যুবন্ বলা যায়। উদাহরণে ভাষ্যকারেরা যেমন দাক্ষির দাক্ষায়ণ ইত্যাদি লিখিয়াছেন। সুতরাং দাক্ষায়ণ দাক্ষির তিন চারি পুরুষ পরবর্ত্তী হওয়া সম্ভব। পতঞ্জলি বলেন, পাণিনির মাতার নাম দাক্ষী। দাক্ষী, দাক্ষির জ্যেষ্ঠা ভগিনী। সুতরাং পাণিনি ও ব্যাড়ি (দাক্ষায়ণ) দুই পুরুষ ব্যবহিত।

বার্ত্তিককার বৈয়াকরণিক কাত্যায়ন যে ব্যাকরণকার পাণিনির পরবর্ত্তী, তাহাতেও অনেকে সন্দেহ করিতেন। অনেকে বলিতেন, তাঁহারা সমকালবর্ত্তী; আচার্য্য নানা যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা সেই সন্দেহ ভঞ্জন করিয়াছেন। আমরা তাহার সকল গুলি এ প্রবন্ধে সন্নিবেশ করিতে পারি না। একটি অতি সামান্য তর্ক উল্লেখ করিলাম। পাণিনির ৩৯৯২ বা ৩৯৯৩ সূত্র আছে। তন্মধ্যে ১৫০০র অধিক সূত্রে কাত্যায়ন অঙ্গুলিক্ষেপ করিয়া দোষ দেখাইয়াছেন। সেই জন্য ৪০০০ বার্ত্তিক লিখিয়াছেন; সেই চারি সহস্র বার্ত্তিকে ন্যূনত দশ সহস্র বিশেষ স্থল আছে। যদি সূত্রকার ও বার্ত্তিককার সমকালিক হইতেন, তাহা হইলে লোকে কাহার্ গৌরব করিত? পাণিনির কখনই নহে। কিন্তু হিন্দু বিশ্বাসে পাণিনি কেবল পূজ্যপাদ মহর্ষি নহেন; ঈশ্বরাবতার। কাত্যায়ন পাণিনির অনেক পরে হইবেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। পতঞ্জলি যে সকলের পরে, তাহা নিজেই স্বীকার করেন। পাণিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কতকগুলি বৈয়াকরণিকের নাম করিয়াছেন; যথা, —আপিশলি, কাশ্যপ, গার্গ্য, গালব, চাক্রবর্ম্মণ, ভরদ্বাজ, শাকটায়ন, শাকল্য, সেনক, স্ফোটায়ন। তাহার পর ক্রমে আমরা আর কয়েকটি নাম পাইতেছি; যাস্ক, পাণিনি, ব্যাড়ি, কাত্যায়ন (বররুচি) ও পতঞ্জলি। ইহাতে বৈয়াকরণিকদিগের মধ্যে পাণিনির স্থলাবধারণ হইল; কিন্তু পাণিনিব্যাকরণের বয়ক্রম কত? এই প্রশ্নের আচার্য্য কিরূপ উত্তর দিয়াছেন, পাঠক মনোনিবেশ পূর্ব্বক দেখুন।

শাক্যসিংহ বুদ্ধ প্রাচীন ভারতে কিরূপ সামাজিক বিপ্লব উৎপাদন করেন, তাহা বঙ্গদর্শনের ২য় সংখ্যায় উদ্দীপনা প্রবন্ধে কথঞ্চিৎ বিবৃত হইয়াছে। শাক্যসিংহ ধর্ম্মবিশ্বাসেও বিষম বিপর্য্যয় উৎপাদন করেন। আর্য্যেরা এত দিন অপবর্গ, মোক্ষ, মুক্তি, নিঃশ্রেয়স ইত্যাদি জন্য গভীর কাননে সমাধি করিতেছিলেন। শাক্যসিংহ বলিলেন, ওরূপ আশা করিলে হইবে না; একবারে নির্ব্বাণ পদ প্রাপ্ত হইতে হইবে। তিনি এই নির্ব্বাণ মত প্রচার করিলেন। বৌদ্ধ মতে নির্ব্বাণপদ সংজ্ঞারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; আর্য্যমতে সেরূপ হয় না। পাণিনি বলেন, "নির্ব্বাণোঽবাতে।" নির্ব্বাণ শব্দের বৌদ্ধ অর্থ থাকা দূরে থাকুক, নির্ব্বাণ শব্দ "প্রদীপ নির্ব্বাণ" স্থলে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাও পাণিনি লেখেন নাই। "নিভে যাওয়া" অর্থ আর "বায়ুহীন" অর্থ অনেক বিভিন্ন; পাণিনির সময়ে দুই

অর্থ প্রচারিত থাকিলে তাঁহার মত বৈয়াকরণিকের তাহা না লেখা অসম্ভব। সুতরাং পাণিনি কেবল বৌদ্ধ মত প্রচারের পূর্ব্বে নহে, যে অর্থ অবলম্বন করিয়া বৌদ্ধেরা নির্ব্বাণ শব্দের সংজ্ঞাবাচক অর্থ ব্যবহার করিয়াছেন, সেই অর্থ জন্মিবারও পূর্ব্বে, ব্যাকরণ লিখেন। সিংহলীয় বৌদ্ধ গণনায় খ্রীষ্টজন্মের ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে শাক্যসিংহের মৃত্যু হয়। সুতরাং পাণিনি তৎপূর্ব্ব কোন সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি গান্ধার (কান্দাহার) দেশবাসী ছিলেন, সুতরাং তিনি প্রতীচী বৈয়াকরণিক কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি উভয়েই প্রাচী বৈয়াকরণিক।

পাতঞ্জল মহাভাষ্যের বয়ক্রম অতি সুন্দর রূপে নির্ণীত হইয়াছে। পাণিনি লিখিয়াছেন, "জীবিকার্থে চাপণ্যে।" যে সকল বস্তু জীবিকার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে অথচ বিক্রীত হয় না, তৎসমুদায়ের এইরূপ হইবে। পতঞ্জলি স্বীয় ভাষ্যে বলেন, মৌর্য্যেরা হিরণ্যার্থী হইয়াই অর্চ্চনা পদ্ধতি স্থাপন করেন, কিন্তু তাঁহাদের বেলা বিক্রয় নহে, তাঁহাদের সম্বন্ধে এ নিয়ম খাটিবে না ইত্যাদি। ইহাতেই বোধ হইতেছে যে, পতঞ্জলি মৌর্য্যবংশীয় প্রথম রাজা চন্দ্রগুপ্তের পরবর্ত্তী লোক। তাঁহার ভাষ্যের উপহাস ভঙ্গি লক্ষ্য করিলে তাঁহাকে সেই বংশের শেষ রাজার পরবর্ত্তী বলিয়াও বোধ হয়। যুনানী পঞ্জিকায় বিশ্বাস করিলে চন্দ্রগুপ্ত খ্রীষ্টের ৩১৫ বৎসর পূর্ব্বে রাজা হয়েন ও খ্রীষ্টের ১৮০ বৎসর পূর্ব্বে মৌর্য্য রাজ বংশের লোপ হয়। সুতরাং পতঞ্জলি খ্রীষ্ট জন্মের ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে ও সম্ভবত ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে মহাভাষ্য লেখেন। আরো প্রমাণ আছে ;—

পাণিনি সূত্র। অনদ্যতনে লঙ্।

কাত্যায়ন বার্ত্তিক। পরোক্ষেচ লোকবিজ্ঞাতে প্রযোক্তুর্দর্শন বিষয়ে।

পাতঞ্জল ভাষ্য। পরোক্ষেচ লোকবিজ্ঞাতে প্রযোক্তুর্দর্শন বিষয়ে লঙ্ বক্তব্যঃ।

অরুণদ্যবনঃ সাকেতং। অরুণদ্যবনো মাধ্যমিকান্। ইত্যাদি

যখন কার্য্যটি পরোক্ষ, লোকবিখ্যাত, এবং যখন তাহা ক্রিয়া প্রয়োগ কর্ত্তার দর্শন বিষয় ছিল, অর্থাৎ যাহা তিনি দেখিতে পাইতেন, তখন লঙ্ হইবে, যেমন, যবন অযোধ্যা অবরোধ করিয়াছিল ; মাধ্যমিকদিগকে অবরোধ করিয়াছিল ; এরূপ স্থলে অরুণৎ হইবে।

নাগার্জ্জুন মাধ্যমিক নামক বৌদ্ধ গ্রন্থের প্রবর্ত্তক ; বৌদ্ধ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বুদ্ধের মৃত্যুর ৪০০ বৎসর পরে নাগার্জ্জুন এই গ্রন্থ সংস্থাপন করেন। সুতরাং নাগার্জ্জুন খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ১৪৩ বৎসরে জীবিত ছিলেন ; পতঞ্জলিও সেই সময়ে ছিলেন। তা নহিলে তিনি যবনাবরোধ দেখিবেন কি প্রকারে? ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমে (in Bactria) অনার্য্য একজাতি এই সময়ে রাজ্যস্থাপন (Grœco-Bactrian Kingdom) করিয়াছিল, তাহাদিগকেই তৎকালে আর্য্যেরা যবন বলিতেন। খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ১৬০ হইতে ৮৫ পর্য্যন্ত এই জাতীয় নয় জন রাজা হয়েন। তন্মধ্যে একজনের নাম মেনান্দ্র। স্ত্রাবো বলেন, তিনি যমুনাতীর পর্য্যন্ত যবন

রাজ্য বিস্তার করেন। মথুরায় তাঁহার নামাঙ্কিত একটি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল। ইনিই অযোধ্যা আক্রমণ করিয়াছিলেন। লাসেন সুন্দর রূপে দেখাইয়াছেন যে, খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ১৪৪ বৎসর হইতে বিংশতি বৎসরের অধিককাল ইনি রাজত্ব করেন। অতএব খ্রীষ্ট পূর্ব্বে প্রায় ১৩০ বৎসরে অথবা আজি হইতে প্রায় ঠিক দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পতঞ্জলি মহাভাষ্য প্রণয়ন করেন। আচার্য্য গোল্‌ডষ্টুকর কহিয়াছেন, সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধীয় কালনির্ণয় কল্পে বোধ হয়, কেবল এই গণনাটি শুদ্ধ কল্পনা প্রসূতা নহে। যথার্থ। তিনি এ স্পর্দ্ধা করিতে পারেন। আমরা এই তর্কের সকল কথা লিখিতে পারি নাই। এ পর্য্যন্ত বাঙ্‌নিষ্পত্তিও করি নাই। তাঁহার সঙ্গে নীরবে এত দূর আসিয়াছি। যাঁহারা আচার্য্য গোল্‌ডষ্টুকর রচিত পাণিনি বিচার পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, যাঁহারা পাঠ করেন নাই, অনুরোধ করি, একবার নির্জ্জনে পাঠ করিবেন।

বাঙ্গালা ভাষা।*

কোন বিশেষ গ্রন্থ সমালোচন করা বড় কষ্টকর। যাহা ভাল পারিলে, তাহাতে হস্তার্পণ করিলে কিছু কষ্ট অবশ্যই হইবে; যদি কেবল সেই জন্যই কষ্ট হইত, তাহা হইলে তাহা আর কোন্ মুখে বলিয়া বেড়াইতাম। শুধু মূর্খতা প্রকাশ ভয়ের কষ্ট নহে, নানা কষ্ট আছে। অনেক সময়ে গ্রন্থকার সমালোচককে শত্রু বোধ করেন, স্বীয় গৌরবদ্বেষী মনে করেন, এসব ভাবিলে মনে একটু কষ্ট হয় না? অবশ্যই হয়। উকীল, কন্সলি মধ্যে দেখিবেন, পরস্পর পরস্পরকে বিশেষ বক্রোক্তিতে বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া উভয়ে প্রশান্ত মনে বিচরণ করিতেছেন। কোন কোন দেশে লেখক ও প্রতিলেখককেও এইরূপ সম্বন্ধ স্থাপন হইয়াছে। এরূপ হওয়া যে ভাল, তাহা আমরা বলিতেছি না। গণ্ডার স্থূল চর্ম্মধারী বলিয়া জীব সৃষ্টি মধ্যে তাহাকে সর্ব্বপ্রধান বলি না! বরং আমরা ইহা বলি, যে ব্যক্তি স্বীয় অঙ্গে আঘাত লাগিলে বিশেষ ব্যথিত হয়, সেই পরের ব্যথার ব্যথা বুঝিতে পারে। তবে আমরা এ কথাও বলিতেছি যে, বঙ্গীয় গ্রন্থকারগণ আর একটু ঘাতৃ-সহিষ্ণু হইলে ভাল হয়। মৃৎকলস ঘা সহিতে পারে না; ধাতু কলস চারিদিকে টোল পড়িলেও আপন কার্য্য করিতে থাকে। সমল স্বর্ণ ঘা সহিতে পারে না, চটিয়া ফাটিয়া যায়, খাঁটি সোণা যত পিটিবে, ফাটিবে না, চটিবে না, বাড়িবে বই কমিবে না।

প্রস্তাব লেখক ন্যায়রত্ন মহাশয় আমাদের সুপরিচিত ও মাননীয়। এত কথা কিছু তাঁহাকে বলিলাম এমত নহে; তাঁহাকে গুটি কত কথা বলিতেছি। আ-

* বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব। বিখ্যাত বাঙ্গালা গ্রন্থকারগণের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও তাঁহাদের রচিত গ্রন্থসকলের কিঞ্চিৎ সমালোচন সমেত প্রথমভাগ। শ্রীরামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত। হুগলী।

মরা কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন জন্য তাঁহার গ্রন্থ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা আবশ্যক বোধ করিব, অকুতোভয়ে বলিব। ভাষার দোষেই হউক বা মিষ্ট লেখা লিখিতে অভ্যাস করি নাই বলিয়া আমাদের অভ্যাস দোষেই হউক, আমাদের ভাষাটা সব সময় মিষ্ট হইবে না। যদি কোন কথা বিদ্বেষ ভাবে বলি, তবে যেন ধর্ম্মে পতিত হই। আর আমরা সকল কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিলাম, তথাপি যদি তিনি আমাদিগকে বিদ্বেষী মনে করেন, তাহাহইলে আমরা যথার্থই দুঃখিত হইব।

আমরা খণ্ড সমালোচন করিব না। সাধারণতঃ ভাষা বিষয়ে আমাদের যাহা বক্তব্য, বলিয়া যাইব। পাঠকগণ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মতের সহিত আমাদের মতের তুলনা করিয়া দেখিবেন; চিন্তা করিবেন, আপাততঃ আর কিছু করিতে অনুরোধ করি না। তবে তুলনা করিবার জন্য সমালোচ্য গ্রন্থ এক এক খণ্ড ক্রয় করিবেন। তাহা না করিলে গ্রন্থকার ও সমালোচক, উভয়েরই শ্রম বিফল হইবে।

কোন বিশেষ ভাষা এক সময়ে হয় না, একবারে যায়ও না। নানা শব্দ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন২ রূপ ধারণ করে। কোন সময়ের প্রচলিত শব্দ যে রূপই কেন ধারণ করুক না, সেই শব্দ গুলির সমষ্টির নামকে তখনকার ভাষা বলে। "তখনকার" শব্দটিই আমরা উদাহরণ স্বরূপ লইলাম। সকলেই তখনকার লেখেন, "তক্ষণকার" বা "তৎক্ষণকার" লিখিতে কাহাকেও দেখি না। কিন্তু "এখনকার" "এক্ষণকার" দুই রূপ পদই দেখিতে পাওয়া যায়। এক জন দুই মূর্ত্তিতে দেখা দিতেছেন; অন্যের এক বই দুই মূর্ত্তি এখন আর নাই। কালে বোধ করুন "এক্ষণকার" এরূপ মূর্ত্তিটিও লোপ পাইল, কেবল "এখনকার" রহিল। ভবিষ্যৎ ভাষাবিজ্ঞানবিৎ লিখিবেন, "পূর্ব্বে 'এক্ষণকার' 'তক্ষণকার' বা 'তৎক্ষণকার' এইরূপ ছিল, এত দিন হইল 'এখনকার' 'তখনকার' এই প্রকার লেখা চলিতেছে।" আমরা তাঁহার ভুল দেখিতে পাইতেছি। একটি শব্দের যেরূপ পরিবর্ত্তন হইল, ঠিক অনুরূপ শব্দের পূর্ব্বরূপ রূপভেদ হইতে আর সহস্র বর্ষ লাগিল। হুগলি, কৃষ্ণনগর জেলায় এইরূপ হইল; বাঁকুড়াতে সেইরূপ পরিবর্ত্তন হইতে আর তিন শত বৎসর লাগিল। সুতরাং ভাষা পরিবর্ত্তন বিষয়ে কোন কথা হঠাৎ বলা বড় দায়। একটি কথায় যখন এইরূপ হইতে পারে ও হইতেছে—তখন ৫০০০ কি ৬০০০ কথা পরিবর্ত্তন কল্পে কি রূপ হইতেছে, তাহা সুন্দর বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু একথাও আমরা স্বীকার করি যে, বালকেরা যেমন এক বার মাথা কাড়া দিয়া উঠে, বালিকারা যেমন এককার বিবাহের জল পেয়ে আজ কাল পাতা কচান লতার মত একটু একটু ভরকাল হয়, একটু বেশী সুন্দরও হয়, সেইরূপ ভাষাও সময়ে সময়ে বিশেষ বিশেষ কারণে অতি অল্প সময় মধ্যে অনেক ভাগে পরিবর্ত্তিত রূপ ধারণ করে। অনেক শব্দের এককালে একই রূপ পরিবর্ত্তন হয়। রাজবিপ্লব, ধর্ম্ম বিপ্লব বা বিজ্ঞান বিপ্লবে এই রূপ হইয়া থাকে।

ইংলণ্ডে রোমান, ডেনিশ, নর্ম্মাণ রাজগণ সকলেই সাক্ষণ ভাষার অঙ্গে খেলাত দিয়া গিয়াছেন, ভাষা রাজ-ভক্তি সহকারে সেই সকল রাজচিহ্ন এখনও অঙ্গে ধারণ করিয়া আছেন। বাইবেল অনুবাদকগণ সেই ভাষার সর্ব্ব অঙ্গে খ্রীষ্টীয় তিলক চিহ্ন দিয়া গিয়াছেন, ভাষা তাহাও ধারণ করিতেছেন। রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময়ে বেকন প্রভৃতি যে রসের তরঙ্গ তুলিয়াছিলেন, ভাষা সেই রসে স্নান করিয়া সেই জ্ঞান চিহ্ন শিরোভূষণ করিয়া এখনও সেই রসের লাবণ্যে ঢল ঢল কান্তিতে বিরাজ করিতেছেন। জর্ম্মান, ফরাসি, ইটালীয়, হিস্পানীয় প্রভৃতি সকল ভাষাই এই রূপ রাজ চিহ্ন, ধর্ম্ম তিলক, জ্ঞানভূষণ প্রভৃতি ধারণ করিয়া আছেন। বঙ্গভাষাও সেই রূপ আছেন।

বঙ্গদেশে এক সহস্র বৎসর মধ্যে বোধ হয়, চারিটি কি পাঁচটি বিপ্লব ঘটিয়াছে। দুই তিনটি রাজবিপ্লব, দুই তিনটি ধর্ম্ম-বিপ্লব। রাজবিপ্লব দুইটির ফল ভারত-ব্যাপী। বখ্‌তিয়ার খিলজি ও রবর্ট ক্লাইবের নাম দশমবর্ষীয় বালক পর্য্যন্ত জানে। খিলজি, শেখজি, সৈয়দজি সকলেই ভাষার অঙ্গে চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। ক্লাইবের জাতীয় ভ্রাতৃগণের চেষ্টায় ও উৎসাহ দানে বঙ্গ ভাষা জগৎ বিখ্যাত হইতে চলিল। এই ভাষার এখন যত কেন গৌরব করি না, ইংরাজ-উৎসাহ গুণে যে ভাষার অনেক উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা দুইটি মাত্র রাজ-বিপ্লবের উল্লেখ করিলাম; কিন্তু দুই তিনটির কথা বলিতেছিলাম। তাহার কারণ আছে। বঙ্গদেশীয় সেন রাজগণের আগমন বার্ত্তা আমরা বিশেষ জানি না, কিন্তু ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিয়াছেন, যে সুন্দরবন মধ্যে যে সনন্দ-পত্রফলক পাওয়া গিয়াছিল, ও তিনি দেখিয়াছিলেন, তাহার বয়ঃক্রমও প্রায় সহস্র বৎসর হইবে; এবং তাহাতে বাঙ্গালা অক্ষরের সেই সময় যে রূপান্তর হইতেছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। যাহাই হউক, অন্য অন্য নানা কারণে আমাদিগেরও প্রতীতি আছে, যে সেন রাজ্য স্থাপন জন্য বঙ্গভাষার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিবে।

দুই তিনটি ধর্ম্মবিপ্লব হইয়াছে। প্রথম দুইটি, তন্ত্র মত বিস্তার ও ভাগবত মত বিস্তার। এ দুইটি সমুদায় আর্য্যাবর্ত্ত-ব্যাপী। তন্ত্র বা ভাগবতের সময় স্থির করা অত্যন্ত কঠিন। তন্ত্র শাস্ত্রে বাঙ্গালা বর্ণ মালার বিশেষ বর্ণন আছে ও অনেকে বলেন যে, তন্ত্রশাস্ত্র সম্পূর্ণ এই দেশজাত ও ইহাতে যে সকল আচার ব্যবহারের বর্ণনা আছে, তাহার অনেক গুলি বাঙ্গালি সম্বন্ধে বিশেষ খাটিতে পারে। সুতরাং তন্ত্র শাস্ত্রের সময় নির্দ্ধারণ করিতে পারিলে বঙ্গভাষার ও বাঙ্গালি জাতির ইতিহাস কিছু স্থির হইতে পারে বলিয়া আমরা এবিষয়ের আলোড়ন করিতেছি। তন্ত্র শাস্ত্র খাটি বাঙ্গালি জিনিষ, এমন কথাও আমরা বলিতে পারি না। মহারাষ্ট্রে, রাজবারাদেশে তান্ত্রিক মত প্রচলিত ছিল; এখনও আছে, বলা যাইতে পারে। তবে এতটুকু বলা যায় যে আর্য্য নাটকের প্রথমাঙ্ক যে সকল রঙ্গভূমিতে

অভিনীত হইয়াছিল; সেই ব্রহ্মর্ষি বা ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে, কুরু, মৎস্য, পাঞ্চাল, শূরসেন প্রভৃতি দেশে, তাঁহারা সেই নাটকের প্রহসন অথচ লোমহর্ষণ ভাগ গুলি অভিনীত করেন নাই। করেন নাই—তাই বা ভরসা করিয়া বলিতে পারি কই? পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীতে তাঁহারা "শ্যামারহস্য" মতের মুক্তি পথে বিচরণ জন্য, "উথাপিস্থা" "পিস্থাউথা" করিয়াছিলেন কি না, কেমন করিয়া বলিব? যাহাই হউক, তন্ত্র শাস্ত্র কেবল বাঙ্গালায় আবদ্ধ ছিল না। বাঙ্গালির মেয়েরা, বোধ হয়, পূর্ব্বে কখনই কাঁচলি পরে নাই! যদি পরিত, ত ছাড়িত না। যদি তন্ত্রাভিনয় কেবল বাঙ্গালাতেই হইত তাহা হইলে, "কাঞ্চুলিক" মত কখনই তন্ত্রশাস্ত্র মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত না। তন্ত্রশাস্ত্র বাঙ্গালায় আবদ্ধ থাকুক বা না থাকুক, ইহাতে ভাষার কি করিয়াছে? যিনি উগ্রভাবে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন, তিনি একটু শান্ত হইয়া আরো কয়েকটি প্রশ্ন মনে মনে চিন্তা করিবেন। তন্ত্র শাস্ত্রে বাঙ্গালির আচার ব্যবহারের কত দূর পরিবর্ত্তন হইয়াছে? যাহাতে আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন করে, তাহাতে ভাষার ব্যত্যয় করে কি না? যখন কালীকিঙ্কর কবি রামপ্রসাদ সেন গান করিয়াছিলেন।

> সুরাপান করিনে আমি সুধা খাইরে কুতূহলে,
> আমার মন মাতালে মেতেছে আজ মদমাতালে মাতাল বলে।

তখন তন্ত্র মতে বাঙ্গালির বা বাঙ্গালা ভাষার কি করিয়াছিল, তাহা তিনি না বুঝিতে পারুন, আমরা এখন কতক বুঝিতে পারি। ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, নীলচন্দ্র, দেওয়ান মহাশয় প্রভৃতির রচনায়, ও তদ্ব্যতীত সহস্র জনের লক্ষ শ্যামা বিষয়িণী গীতিতে যে বাঙ্গালা ভাষার কতক পরিবর্ত্তন হয় নাই, এমন কথা কেহই বলিবেন না; আর তন্ত্র শাস্ত্র না থাকিলে এ সকল কোথায় থাকিত?

তন্ত্রশাস্ত্রকে আমরা যোগ শাস্ত্রের ও সাংখ্যদর্শনের একত্র নিষ্পন্ন অতি বিকৃত কীট পরিপূর্ণ কলমের চারা বলিয়া সময়ে সময়ে বিবেচনা করি। যোগ শাস্ত্রের পরমাত্মা ও জীবাত্মার যোগ লইয়া তন্ত্র প্রণেতাগণ সাংখ্যোক্ত পুরুষ-প্রকৃতিবাদে কলম লাগাইয়াছিলেন। সেই কলম তখনকার কুৎসিৎ প্রবৃত্তি লালসা মশলার গুণে শীঘ্রই সতেজ হয়, ও অচিরাৎ এক নূতন বৃক্ষে পরিণত হয়। সেই বৃক্ষে কালে যে বিষময় ফল ফলিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা যাইতে পারে না। সাংখ্য দর্শনের প্রকৃতিতত্ত্ব চিন্তায় মগ্ন থাকিয়া এই সকল ব্রাহ্মণেরা সৃষ্টির আদিকারণকে প্রকৃতি বা শক্তি উপাধি দিয়া, উপনিষদে, দর্শন শাস্ত্রে সেই কারণকে যে ক্লীবলিঙ্গ "ব্রহ্মবাক্যে" নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, জগৎ কারণের সেই ব্রহ্ম উপাধি ইচ্ছা পূর্ব্বক অগ্রাহ্য করিয়া, জগদীশ্বরী, জগদম্বা পদের ব্যবহার আরম্ভ করিল। আবার যোগশাস্ত্রতত্ত্বে অভিনিবিষ্ট থাকিয়া এই জগদীশ্বরীর সহিত তাহাদের যোগ কি প্রকার, তাহার অনুধ্যান করিতে লাগিল। সৃষ্টিকর্ত্রীর সহিত সৃষ্ট জীবের যোগ কেবল এক

প্রকারেরই হইতে পারে। তিনি প্রসূতি, আমরা প্রসূত। বিশ্বাসের সহধর্ম্মিণী ভক্তি আসিয়া এই বিশ্বাসকে এক রূপ জীবন্ত করিল। নূতন তান্ত্রিক ভক্তি সহকারে দৃঢ় বিশ্বাসে সৃষ্টিস্থিতি কারণকে "জগদম্বে মা" বলিয়া অপূর্ব্ব তৃপ্তি লাভ করিল। সৃষ্টি কারণ এখন আর অচিন্ত্য অব্যক্তরূপ নহেন, তিনি জননী; জননী অচিন্তনীয়া নহেন; উপনিষদ সময়ের ব্রাহ্মণগণের ন্যায় "নমস্তে সতেতে জগৎ কারাণায়, নমস্তে সতেতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়," বলিয়া ঈশ্বরোপাসানা করিয়া ভক্তিবান্ কি ক্ষান্ত থাকিতে পারে, বা তৃপ্তি লাভ করিতে পারে? মাতার সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ, জ্ঞানসম্বন্ধ নহে; ক্ষুধা পাইলে মায়ের কাছে কেঁদে বলিব, তৃষার সময় বলিব "মা জল দেও!" মায়ের উপর অভিমান করিব, আবদার করিব, স্নেহ-ময়ী মায়ের স্নেহ বল পূর্ব্বক আকর্ষণ করিব;—তন্ত্রোপাসক এই রূপ স্থির করিয়াছিলেন। এরূপ স্থির করিয়া আর কেহ অধ্যাত্ম পদার্থবাচক শব্দ লইয়া, দীর্ঘ সমাস রচনা করিলা কৃত্রিম ব্যাকরণের জটিলতা রক্ষা করিয়া, দাঁতভাঙ্গা বর্ণ বিন্যাস করিয়া,—রচনা করিতে পারে? তা পারে না।

বাঙ্গালি তন্ত্রোপাসকের পক্ষে সৃষ্টি কারণ কেবল মা নহেন, তিনি বাঙ্গালি মা; স্নেহময়ী, কিন্তু সংস্কৃতজ্ঞা নহেন। উপাসকের জ্ঞান বলিল, ঈশ্বর সর্ব্ববিৎ, তুমি যে ভাষায় ডাকিবে, তিনি তাহাতেই শুনিবেন; বাঙ্গালি উপাসকের ভক্তি বলিতে লাগিল, তোমার ঘরে যিনি তোমার ব্যারামের সময় তোমার গায়ে হাত বুলাইয়া "বাবা কেমন আছিস্ রে?" বলিয়া অতি কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করেন, তিনিই ঈশ্বররূপিণী। মায়ের স্নেহই ঈশ্বরের শক্তি। যদি তুমি জগদীশ্বরীকে, তোমার ঐ মায়ের সহিত যেরূপ কথা কহিতেছ, ঐরূপ শাদা কথায় মন খুলে ডাক, তাঁহার কাছে কাঁদ, তবেই তোমার প্রাণ ভরিবে। সাধক ভক্তির উপদেশ গ্রহন করিল; প্রাণভরে গায়িল "আমায় দেওমা তবিল দারি" ইত্যাদি "আমি বিনা মাইনায় চাকর ইত্যাদি। "ধনাধ্যক্ষত্ব পদ প্রদান কর," "আমি অবৈতনিক সম্পাদক," এরূপ বাক্য তাহার জিহ্বায় আসিল না। বাঙ্গালা ভাষা কাজে কাজেই এই পণ্ডিত পরিত্যক্তপথে,(আমরা বলি) অথচ সহজ, সোজা, ঠিক পথে চলিতে লাগিল।

ভাগবত। ভাগবত গ্রন্থ কত দিনের? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড় কঠিন। ভাগবতের ১২ স্কন্ধ, ১৩ অধ্যায়ে লিখিত আছে "চতুর্দ্দশং ভবিষ্যংস্যাৎ।" ভাগবত ভবিষ্যের পরে হইল। তাহা হইলে বড় আধুনিক বিবেচনা করিতে হয়। পাদ্মে ও মাৎস্যে ভাগবত পুরাণের উল্লেখ আছে। কতক পুরাতন মনে করিতে হইল। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, "যবনাস্ত্যজ গ্রীকোবাকট্রিয়ানেরা খাতান্ত; এ কোন যবন? গ্রীকো-বাক্ট্রিয়ানেরা? না মুসলমানেরা? আবার পদ্ম পুরাণ বলেন,পুরাণ মধ্যে সময় গণনায় পাদ্ম প্রথম, ভাগবত শেষ। এবার কিছুই বোঝা গেল না। পাদ্ম যদি প্রথম, তবে ভাগবতের নাম জানিল কি প্রকারে? আবার ভাগবতে সকল পুরা-

েণরই নাম আছে, সুতরাং ভাগবত শেষ পুরাণ হওয়াই সম্ভব। ব্রহ্ম বৈবর্ত্তে বাঙ্গালিরা যে ভাবটি মনে করিয়া এঁটো বা সগড়ি বলে, সেই ভাবটির আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাতে কেমন একটু বাঙ্গালি বাঙ্গালি বোধ হয়। ভাগবত এই বাঙ্গালি গন্ধী পুরাণেরও পরে? ভবিষ্যেরও পরে? তবে বড় আধুনিক। এমনও হইতে পারে যে, ভবিষ্যের বা ব্রহ্ম বৈবর্ত্তের যে শ্লোকগুলি দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আধুনিক বলিয়া থাকি, সেই গুলি পরে বসান। হউক বা না হউক, ভাগবত পুরাণ বড় আধুনিক নহে। ইয়ুরোপীয় কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, ভাগবত, পুরাণ খ্রীষ্টাব্দের ত্রয়োদশ শতাব্দীর লিখিত ও বোপদেব গোস্বামী ইহার প্রণেতা। ইহার বয়ক্রম যে এত অল্প ও মুসলমানের রাজ্যাধিকারের পর ইহা লিখিত হইয়াছিল, তাহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। ভাগবতের প্রগাঢ় অথচ কূট রচনাভঙ্গি দেখিলে, অন্যান্য পুরাণ যে সময় মধ্যে লিখিত, সে সময়ের লিখিত বলিয়া বোধ হয় না, সকলের পরের লেখাই বোধ হয়। ভাগবতে অনার্য্য জাতি মধ্যে হূন (Huns) জাতির উল্লেখ আছে। সুতরাং ইহা ত্রয়োদশ শতাব্দীর লিখিত না হইয়া আরো প্রায় দুই তিন শতাব্দী পূর্ব্বের বলিয়া বোধ হয়।

পাঠক বিরক্ত হইয়া প্রশ্ন করিতে পারেন, মনে করুন, ভাগবত না হয় দশম শতাব্দীর রচনাই হইল; তাহাতে ভাষার কি হইয়াছে? গোপনে চিন্তা না করিয়া মহাশয়ের সমক্ষে কাগজে কলমে চিন্তা করিতেছি—অত ক্রুদ্ধ হইবেন না। আর শ্রীমদ্ভাগবত বিষয়ে ভাবিতেছিলাম, সুতরাং ক্ষমা প্রার্থনাও করিতে পারি না। ভাগবতের সূত্র এই বঙ্গ ভূমিতেও ওত প্রোতভাবে রহিয়াছে। ভাষায়ও সেইরূপ। জয়দেবের "ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে" সেই ভাগবতেরই মধুর গন্ধ বহন করিতেছে; বিদ্যাপতি, "রসধাম" চণ্ডীদাস "রসশেখর", কোন্ রসে? এই ভাগবতের রসে। চৈতন্য দেব যে প্রেমে মাতিয়াছিলেন, ভাগবতই তাহার নিদান। চৈতন্য দেবের বিষয় বিশেষ সমালোচন করিবার ইচ্ছা আছে। এক্ষণে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি চৈতন্যের পূর্ব্বগামী ভাবুকদিগের রচনায় ভাষার কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাই দেখা যাউক। প্রথমতঃ জয়দেবের সহিত বাঙ্গালা ভাষার কি সম্বন্ধ আছে? অতি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ আছে। জয়দেবের ভাষা সংস্কৃত ও বাঙ্গালার মধ্যবর্ত্তিনী ভাষা। তবে কি আমরা বলি যে সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা হইয়াছে। না, তাহা বলি না। সংস্কৃত ভাষা বাঙ্গালার জননী, মাতামহী বা পিতামহী নহে! তবে জয়দেবের সংস্কৃত এ দুয়ের মধ্যবর্ত্তী কি রূপ? সজীব প্রাণী হইতে উদ্ভিদ তরুলতাদির জন্ম হয় নাই অথবা উদ্ভিদ হইতে জন্তু সৃষ্ট হয় নাই; কিন্তু পুরুভুজ বা প্রবাল এক জাতি, ও জীবজাতির মধ্যবর্ত্তী। জয়দেবের ভাষাও সেই রূপ। সে ভাষা বিশুদ্ধ সংস্কৃত; অথচ "চলসখি কুঞ্জং" বলিলে নায়িকাকে আধঘোমটা টানা, পেড়ে

শাড়ী পরিহিতা বলিয়াই বোধ হয়। যেন বাঙ্গালির মেয়ে বাঙ্গালা কথাই কহিল। কোন গ্রন্থোক্তা নায়িকা সংস্কৃতে সম্ভাষণ করিতেছে, এমন বোধ হয় না। তাহাতেই বলিতেছিলাম, জয়দেবের ভাষা বাঙ্গালা ও সংস্কৃতের মধ্যবর্ত্তিনী। যদিও এ প্রবন্ধে বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিতে আমাদের ইচ্ছা নাই, তথাপি জয়দেব, বিদ্যাপতিকে প্রণাম করিবার জন্য একটু দাঁড়াইতে হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ, প্রেমী; রামচন্দ্র, ক্ষত্রিয় ধর্ম্মা রাজা; শাক্যসিংহ, শুদ্ধ বুদ্ধ; ঈশা, নিঃস্বার্থ পরোপকারী মানব; গৌরাঙ্গ, ভগবান ভক্ত; মহম্মদ—তাঁহার পয়গম্বর; কোমৎ—মহাজ্ঞানী। ইহাঁরা মনুষ্য হৃদয়ের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। অপেক্ষাকৃত বীর ধর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ধর্ম্মা পশ্চিম দেশীয়েরা শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র বুঝিতে পারিল; তাঁহাকে চিনিতে পারিল; সাদরে গ্রহণ করিল। কোমল স্বভাব বাঙ্গালি কোমল প্রেমে মজিল; আবার গৌরাঙ্গ আসিয়া যখন ভক্তি বাতাসে সেই প্রেম নদীতে নদীর কিনারায় নদীয়ায় ঢেউ উঠাইলেন, তখন তাহারা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সেই তরঙ্গে নাচিতে নাচিতে চলিল। গৌরাঙ্গের পূর্ব্বেই এই প্রেমের ছড়াছড়ি হইয়াছিল। যে প্রেমাবতারকে ঈশ্বর বলিয়াছে,সে প্রেম হইতে ব্যভিচার সম্ভব, একথা কখনই মনে করিতে পারে না। প্রেম স্বর্গীয় পদার্থ, তা কি কখন কলুষিত হয়? রামোপাসক কি সীতা নির্ব্বাসনে পাপ মনে করিতে পারে? ক্ষত্রিয়ের কুলধর্ম্ম পালনে পাপ কখনই হইতে পারে না। প্রকৃত গৌরাঙ্গোপাসক বৈষ্ণবকে যদি বলা যায়, "কেবল ভক্তিতে কোন ফল হইতে পারে না; জ্ঞান দ্বারা ভক্তির সংযম করা উচিত; ভক্তির আধিক্যে বাতুলতা জন্মিতে পারে; ঈশ্বরদত্ত এই মহৎ জ্ঞান ইচ্ছাপূর্ব্বক হারান কখনই উচিত নহে, তুমি ভক্তি একটু সংযত কর।" এ কথা কি বৈষ্ণব বুঝিতে পারিবে? সে বলিবে, "আপনি তাই বলুন, আমি যেন ভক্তির আধিক্যে বাতুলই হই; আমি যেন সেই 'দশা প্রাপ্ত' হইয়া চিরকাল যাপন করি! আহা! তাহইলে ত প্রভুর কৃপা হইয়াছে।"

জয়দেব, বিদ্যাপতি প্রভৃতি সেই রূপ, প্রেম যে কখন কলুষিত হইতে পারে, কলুষিত প্রেম রূপ যে কোন পদার্থ আছে, তাহা অনুভবও করিতে পারেন নাই। প্রেম হইলেই হইল, সে প্রেম যখনই পাইয়াছেন, আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া, তারি লোফালুফি, তারি ছড়াছড়ি, তারি ঢলা ঢলি করিয়াছেন। যে আপনা ভুলে পরের জন্য ব্যস্ত, তাঁহারা তাঁহারি জন্য ব্যস্ত ছিলেন। বৃন্দাবন বিলাসিনী রাধা যখন ঘোরতিমিরা রজনীতে, চাতকিনী যেমন ধায় বারি পানে, সেই রূপ, সেই তিমির পুঞ্জ কুঞ্জ বনে, একাকিনী,—লম্বিতাবেণী, চুম্বিতাধরণী একাকিনী শ্যাম গুণমণির জন্য ভ্রমণ করিতেন, তখন তাঁহারা সেই একগতা প্রাণার পশ্চাতেং ধাবমান হইতেন। তাঁহারা পবিত্র হৃদয়ে রাধা শ্যামের মিলন দেখিতে পারিতেন। জয়দেব, বিদ্যাপতি প্রভৃতি এই প্রেম পথের প-

থিক। পদকল্পতরু গ্রন্থের প্রথম ভাগ এই প্রেমের পাথার, এই গ্রন্থে প্রেম পরিচ্ছেদের কুত্রাপি বিচ্ছেদ নাই। নায়কের বিচ্ছেদকে প্রেমবিচ্ছেদ বলি না। বরং বিচ্ছেদে কত প্রেম দেখুন।

পেখনু কলাবতী প্রিয় সখী মাঝে।
আছইতে আছলা কাঞ্চন পুতলা।
ভুবনে অনুপম রূপ গুণে কুশলা॥
এবে ভেল বিপরীত ঝামর দেহা।
দিবসে মলিন জনু চাঁদ কি রেহা॥
বাম করে কপোল লুলিত কেশ ভার।
কর নখে লিখু মহী আঁখি জল ধার॥
বিদ্যাপতি ভণ——

* * *

নব প্রেমে বিচ্ছেদের ছায়া পড়িয়াছে; ছায়ায় এই চিত্র কি মনোহর ভাবেই দেখা যাইতেছে! আমরা বিদ্যাপতির এই পদটি তুলিয়াই অগত্যা ক্ষান্ত রহিলাম। ইহাঁদের সুন্দর পদাবলীর বিশেষ সমালোচনের ইচ্ছা রহিল।

প্রধান কয়টী বিপ্লবে ভাষার কত দূর পরিবর্ত্তন হইয়াছে, আমরা তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি। ভাগবতে ভাষার অনেক রূপান্তর করিয়াছে। ইহার প্রেমভাগে ভাষার কত দূর সুন্দরতা, কোমলতা, সরসতা, লালিত্য সম্পাদন করিয়াছে, ভাষাকে কত দূর সংস্কৃতাপসারিণী করিয়াছে, সকলে বিবেচনা করুন। ইহার প্রগাঢ় রচনা প্রণালীতে বঙ্গভাষাকে কতক সংস্কৃতাভিসারিণী করিয়াছিল। তাহাই এখন বক্তব্য।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

জ্ঞান ও নীতি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সকলেই স্বীকার করেন, সভ্যতার বৃদ্ধি-সহকারে জ্ঞান বৃদ্ধি হইতেছে। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে এক প্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে যে, সভ্যতার তারতম্যানুসারে নীতিরও তারতম্য লক্ষিত হয়। এরূপ হইবার কারণ কি, সভ্যতার প্রকৃতি বিবেচনা করিলেই সহজে বুঝা যায়। মনুষ্য যত পশুভাব পরিত্যাগ করিতেছে, যত প্রকৃতির নিয়ম অবগত হইয়া বাহ্য জগতের উপর কর্ত্তৃত্ব সংস্থাপন করিতেছে, যত নিজের প্রবৃত্তি দমন করিয়া সমাজের মঙ্গল সাধন করিতে শিখিতেছে, ততই ক্রমে ক্রমে সভ্য হইতেছে। "সভ্যতার ইতিহাস" নামক গ্রন্থে বাকল্ সাহেবও ইহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন। তিনি মানসিক উন্নতিকেই সভ্যতার প্রধান লক্ষণ বলিয়া গণ্য করেন। তাঁহার মতে "এই উন্নতি দুই প্রকার, নৈতিক ও বৌদ্ধিক; প্রথমটী সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য বিষয়ে, দ্বিতীয়টী জ্ঞান বিষয়ে।" (১) তিনি আরও বলেন, "যদি, এক পক্ষে,

(১) Buckle's History of Civilization. Vol. I. p. 174.

কোন জাতির ক্ষমতা বৃদ্ধি সহকারে পাপ বৃদ্ধি হইতে থাকে, অথবা, অপর পক্ষে, যদি ধর্ম্মোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞানতা বাড়িতে থাকে, নিঃসন্দেহ সে জাতি উন্নত হইতেছে না। এই দুই প্রকার গতি, নৈতিক ও বৌদ্ধিক, সভ্যতা রূপ ভাবের অঙ্গ স্বরূপ, এবং মানসিক উন্নতির সম্পূর্ণ মর্ম্ম নির্দ্দেশক।" (২)

কিন্তু বাক্‌ল্ যদিও নৈতিক উন্নতিকে সভ্যতার অঙ্গ স্বরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহার মতে মনুষ্যের নীতি কিঞ্চিন্মাত্রও উন্নত হয় নাই; উহা চিরকালই স্থির-ভাবাপন্ন আছে; পূর্ব্বকালেও যেমন ছিল, এখনও তেমনই আছে। লোকে পূর্ব্বাপেক্ষা সুনীতি সম্পন্ন হইয়াছে কি না, বাক্‌ল্ বোধ করেন, ইহা নির্ণয় করিবার একটী মাত্র উপায় আছে। দেখ, নীতি বিষয়ে কোন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে কি না। লোকের কার্য্য বিশ্বাসের অনুগত; যদি অভিনব নৈতিক তত্ত্বের আবিষ্কার দ্বারা সেই বিশ্বাস পরিবর্ত্তিত না হইয়া থাকে, তবে নীতি-সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। এই যুক্তিঅবলম্বন করিয়া বাক্‌ল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, নীতির উন্নতি নাই। তিনি বলেন, "আমাদিগের নৈতিক আচরণ সম্বন্ধে, সভ্যতম ইউরোপীয়-দিগের জ্ঞাত এমন একটী নিয়ম নাই, যাহা প্রাচীনেরা জানিতেন না।" (৩) "পরের ভাল করিবে; পরের উপকারার্থে আপনার বাসনা বিসর্জ্জন করিবে; প্রতিবেশীগণকে আত্মবৎ ভাল বাসিবে; শত্রুদিগকে ক্ষমা করিবে; ইন্দ্রিয়গণকে দমন করিবে; পিতা মাতাকে ভক্তি করিবে; উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদিগকে মান্য করিবে; এই গুলি এবং আরো গোটা কতক নীতি শাস্ত্রের সার কথা। কিন্তু এগুলি কত সহস্র বৎসর পরিজ্ঞাত রহিয়াছে, এবং কি উপদেশ, কি বক্তৃতা, কি গ্রন্থ দ্বারা কোন নীতিবেত্তা ও ধর্ম্মোপদেষ্টা একটী বিন্দু বিসর্গও বৃদ্ধি করিতে পারেন নাই।" (৪) "যে বলে পূর্ব্বাজ্ঞাত কোন নীতিতত্ত্ব মানবজাতি খ্রীষ্ট ধর্ম্মের নিকটে প্রাপ্ত হইয়াছে, সে হয় ত মহামূর্খ, অথবা জ্ঞানপূর্ব্বক বঞ্চনাকারী।" (৫)

আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যত দুর আইসে, তাহাতে বোধ হয়, বাক্‌ল্ সাহেব মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন। প্রথমতঃ আমরা স্বীকার করি না যে, যদি নীতি বিষয়ক কোন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে নৈতিক উন্নতি হয় নাই। কোন অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি অতি দূরবর্ত্তী ভবিষ্যৎকাল যোগ্য নীতিতত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার সমকালবর্ত্তী লোকদিগের অযোগ্যতা নিবন্ধন এই তত্ত্ব সমুদ্রতলস্থিত রত্নের ন্যায় অব্যবহৃতাবস্থায় পড়িয়া থাকিতে পারে। তাহা পুনরুদ্ধৃত বা জন সমাজে পরিগৃহীত হইতে অনেক সময় অতিবাহিত হইবার সম্ভাবনা; এবং পরিগৃহীত হই-

(২) Buckle's History of Civilization. Vol. I. p. 174-75

(৩) I bid p. 181.

(৪) Buckle's History of Civilization. Vol I. p. 180.

(৫) Note to Page 180 Vol. I. B. H. C.

লেও তদ্দ্বারা লোকের কার্য্য নিয়মিত হইতে বহুকাল গত হইবে। কর্ত্তব্য জানিলেও অভ্যাসের বিপরীত কার্য্য করা সহজ ব্যাপার নহে। অনেকে বলিয়া থাকেন, "আমাদিগের উপদেশানুসারে চল, আমাদিগের আচরণের অনুকরণ করিও না।" তাঁহারা জানেন, তাঁহারা অন্যায় করিতেছেন, কিন্তু প্রবৃত্তি দমন করিতে পারেন না। এই রূপ বিবেক ও বাসনার সমর কত লোকের অন্তঃকরণে চলিতেছে। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রায় সহস্র বর্ষ ইউরোপ খণ্ডে প্রচলিত আছে; কিন্তু সেখানকার কত অংশ লোকে তাহার সারনীতিতত্ত্ব গুলি জানে, এবং যাহারা জানে তন্মধ্যে কত ভাগ লোকে তদনুরূপ কার্য্য করে। ঈশার শিক্ষার যথার্থ মর্ম্ম বুঝিয়া সম্যক্ প্রকারে তদনুসারে চলিলে ইউরোপীয়দিগের নূতন দেবতুল্য ভাব হইত। তাহা হইলে আর তাঁহারা পরের স্বাধীনতা হরণ করিতে চেষ্টা পাইতেন না, অর্থ এবং ইন্দ্রিয়ের দাস থাকিতেন না। তাহা হইলে আর ভূমণ্ডলের সভ্যতম বিভাগে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইত না, নরশোণিত পাত হইত না, দেশ লুণ্ঠিত ও ভষ্মীভূত হইত না। যখন খ্রীষ্টধর্ম্ম বহুকাল পরিগৃহীত হইয়াও নিতান্ত অসম্পূর্ণরূপে জ্ঞান ব্যাপ্ত ইউরোপ মণ্ডলের কার্য্য নিয়মিত করিতে পারিতেছে, তখন স্বীকার করিতে হইবে যে, কোন নীতিতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া কার্য্যকারী হইতে অনেক সময় লাগে। সুতরাং যে সময়ে কোন অভিনব নৈতিকতত্ত্ব উদ্ভাবিত হইতেছে না, সে সময়ে পূর্ব্বাবিষ্কৃত তত্ত্ব জনিত নৈতিকউন্নতি বহুল পরিমাণে আস্তে আস্তে হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, ইহাও বিবেচনা করা উচিত যে, নীতিশাস্ত্র সর্ব্বশাস্ত্রাপেক্ষা জটিল; সুতরাং অন্য শাস্ত্রে যে কাল মধ্যে যে পরিমাণে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা, নীতি শাস্ত্রে সে কাল মধ্যে সে পরিমাণে নূতন তত্ত্ব প্রকাশিত না হইবারই কথা। অগোস্ত্ কোম্‌ত্ দেখাইয়াছেন, যে বিজ্ঞানের বিষয় যত সরল, তাহার তত শীঘ্র উন্নতি হইয়া থাকে। নীতিবিজ্ঞান, মনুষ্য সমাজ ও মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে গিয়া জটিলতম ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছে; কি প্রকারে ত্বরায় উন্নত হইবে? কি রূপ কার্য্য মনুষ্যের মঙ্গলকর, কি রূপ কার্য্য অমঙ্গল কর, বহুকাল পর্য্যবেক্ষণ ব্যতিরেকে নির্ণীত হইবার নহে। অগোস্ত কোম্‌ত্ বিজ্ঞান শাখা নিচয়কে জটিলতার তারতম্যানুসারে শ্রেণি বদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সরলতম গণিতকে সর্ব্বপ্রথমে স্থান দিয়াছেন, তৎপরে অপেক্ষাকৃত জটিলতর জ্যোতিষকে, তদনন্তর জটিলতা বৃদ্ধির ক্রমাবলম্বন পূর্ব্বক পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন তত্ত্ব, জীবনতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বকে যথাক্রমে রাখিয়া সর্ব্বশেষে জটিলতাশ্রেষ্ঠ নীতি শাস্ত্রকে সংস্থাপন করিয়াছেন। সুতরাং যাঁহারা নীতিশাস্ত্রকে পদার্থবিদ্যা বা রসায়নতত্ত্বের ন্যায় উন্নতিশীল না দেখিয়া তাহার একবারে উন্নতি নাই, স্থির করিয়া বসেন, তাঁহাদিগের নিতান্ত ভ্রম। জ্যোতিষের অনুন্নতি সন্দর্শনে

প্রাচীনপণ্ডিতকুলচূড় সক্রেটিস্‌ও এক সময়ে ভাবিয়াছিলেন যে, গগনচর জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের বিষয়ে মানবজাতি কখনও কিছু স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারিবে না। কিন্তু মনুষ্যের জ্ঞানোন্নতি-দ্বারা এক্ষণে সেই সিদ্ধান্ত ভ্রান্তি মূলক বলিয়া প্রতীত হইতেছে।

তৃতীয়তঃ, নীতিবিষয়কজ্ঞানসম্বন্ধে যে মানবজাতি চিরকাল স্থিরভাবাপন্ন রহিয়াছে, এ কথা অপ্রামাণ্য। যদি ইহা সত্য হইত, তাহা হইলে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সকলের ন্যায়ান্যায় বোধ একরূপই হইত। কিন্তু যাঁহারা ইতিহাসপাঠ ও দেশ-ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা বিলক্ষণ জানেন যে, দেশভেদে ও কালভেদে কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্যজ্ঞানের কত বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। এক সময়ে বা এক প্রদেশে যাহা সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইতেছে, অন্য সময়ে বা অপর প্রদেশে তাহা নিতান্ত জঘন্য ও নিন্দনীয় কর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতেছে। স্পার্টাবাসিদিগের মধ্যে চৌর্য্যবৃত্তি এবং আমাদিগের দেশে সহমরণ প্রশংসনীয় ছিল; কিন্তু এক্ষণে কে এবম্বিধ ব্যাপারের অনুমোদন করে? যদি পুরাবৃত্ত উদ্‌ঘাটন করিতে না চাও, বর্ত্তমান কালের অসভ্য জাতিগণের প্রতি দৃষ্টি কর; জানিতে পারিবে, তাহারা নীতিতত্ত্বসম্বন্ধে সভ্য-জাতিগণাপেক্ষা কত অনভিজ্ঞ। সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ্ হার্বার্ট স্পেন্সার লিখিয়াছেন, "অষ্ট্রেলীয় ভাষায় ন্যায়পরতা, পাপ, দোষ, বুঝায়, এমন কোন শব্দ নাই। অধিকাংশ নিরৃষ্ট জাতিদিগের মধ্যে পরোপকারিতা ও ক্ষমাশীলতা সূচক কার্য্যের অর্থ বোধ হয় না, অর্থাৎ, সমাজ সম্পর্কে মনুষ্য কার্য্যের জটিলতর সম্বন্ধ সকল বোধগম্য হয় না।"(৬) গ্যাল্‌ব্রেথ্ সাহেব আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগের মধ্যে অনেক কাল বাস করিয়া তাহাদিগের নীতি বিষয়ে এই বলিয়াছেন যে, "তাহারা অধিকাংশ পাপ কর্ম্মকে পুণ্য জ্ঞান করে। চুরি, ঘর জ্বালানি, বলাৎকার এবং হত্যা, তাহাদিগের মধ্যে খ্যাত্যাপন্ন হইবার উপায় বলিয়া গণ্য হয়, এবং অল্প বয়স্ক আমেরিক বাল্যকাল হইতে হত্যাকে ধর্ম্মশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতে শিক্ষিত হয়।"(৭) পলিনেসীয় পর্য্যালোচনায় উক্ত হইয়াছে, "সন্তানগণের মধ্যে তিনভাগের দুইভাগ পিতামাতায় ইচ্ছাপূর্ব্বক মারিয়া ফেলে।" (৮) বার্টন সাহেব কহিয়াছেন, "পূর্ব্ব আফ্রিকায় বিবেক নাই, এবং আত্মগ্লানি বলিতে মারাত্মক দুষ্কর্ম্ম করিবার সুযোগ হারানজন্য দুঃখ বুঝায়। ডাকাতি, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির লক্ষণ; হত্যা —যত নিষ্ঠুর ও নিশীথকাল কালীন, তত ভাল—শূরের চিহ্ন।" (৯) মধ্য আফ্রিকা পর্য্যটক পিথারিক সাহেব বলেন, "আমি রাক্ষসনাম-গর্ব্বিত নিম্নার্য্যদিগের নিকটে শুনিয়াছি যে, তাহাদিগের মধ্যে যাহারা বৃদ্ধ বা মৃত্যু সমীপবর্ত্তী হয়, তাহারা বিনষ্ট এবং ভক্ষিত হইয়া

(৬) Herbert Spencer's Principles of Psychology Vol. I. p. 369.
(৭) Ethnological Journal 1869. p. 304.
(৮) Polynesian Researches Vol. I. p. 334.
(৯) Burton's First Footsteps in East Africa p. 176

থাকে,"। (১০) পাল্‌বিডুসেলু আফ্রিকাস্থ নরমাংসাশী ফান্ এবং ওশিবা জাতির বর্ণনায় লিখিয়াছেন, তাহারা মনুষ্য-ভোজী বলিয়া অহঙ্কার করে। (১১) ফিজি দ্বীপপুঞ্জবাসীরা ভয়ঙ্কর রাক্ষস। (১২) অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত নবজিলণ্ড নিবাসিরা অল্পদিন মনুষ্যভক্ষণ পরিত্যাগ করিয়াছে। (১৩) ভাষা এবং চিত্তের দরিদ্রতা নিবন্ধন ধর্ম্মের উন্নত ভাব সকল ভ্যান্‌ডিমেন্ দ্বীপবাসিদিগের বোধগম্য করান যায় না, বলিয়া টাসমেনিয়ার ইংরাজ বিশপ নিক্সন তাহাদিগের ধর্ম্ম পরিবর্ত্ত চেষ্টায় বিরত হইয়াছেন। ডন্ রকাস্ বলেন যে নবকালিডনিয়া নিবাসিরা নির্লজ্জ, পশুবৎ বুদ্ধিবিশিষ্ট, নীতিবোধবিবর্জ্জিত, অবিশ্বাসী, মিথ্যাবাদী, নরমাংসাশী। (১৪) মরিজ উয়াগ্নর নামক বিখ্যাত পর্য্যটক লিখিয়াছেন যে, দক্ষিণ আমেরিকার কাহিবিরা মানবাহারী; এমন কি, নিজের সন্তান পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিয়া থাকে। (১৫) ব্রেজিলের অরণ্যস্থ আদিমবাসিদিগের সম্বন্ধে ডাক্তর রবার্ট আভিলালিমন্ট কহেন, তাহারা উলঙ্গ, ব্রীড়াহীন, মনুষ্যভক্ষক, নীতিভাব শূন্য; যেজন তাহাদিগের বন্ধু সেই ভাল, যে মিত্র নয়, সে মন্দ। (১৬) আমেরিকার দক্ষিণাংশ-স্থিত টিরাডেল্ ফিউগো দ্বীপবাসিদিগের বিষয়ে আমাদিগের বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয় ষ্টেট্ সেক্রেটারী ডিউক অব্ আর্গিল "আদিম-মনুষ্য" নামক গ্রন্থে (১৭) লিখিয়াছেন যে, তাহারা, বোধ হয়, সকল জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট। তাহারা বিবস্ত্র ও নরমাংসাহারী; বৃদ্ধা স্ত্রীলোকগুলিকে কুক্কুরাদির ন্যায় মারিয়া ভক্ষণ করে। ডারউইন্ বলেন, "যখন আমরা ঈদৃশ মনুষ্যগণকে দেখি, তখন তাহারা যে আমাদিগের সদৃশজীব এবং এই ভূমণ্ডল-নিবাসী, এরূপ জ্ঞান করিতে কষ্ট হয়।" (১৮)

চতুর্থতঃ, প্রাচীনদিগের অজ্ঞাত একটী নৈতিক নিয়মও যে বর্ত্তমানকালের সভ্যতম ইউরোপীয়েরা জানেন না, ইহা আমরা স্বীকার করি না। "কাহাকেও দাস করিয়া রাখিবে না," এই নীতিতত্ত্বটী এক্ষণে ইউরোপ খণ্ডে জ্ঞানীমাত্রেরই নিকটে সমাদৃত হইতেছে। যদি "প্রাচীন" বলিতে ঐতিহিসাহিক গ্রীক, রোমক, যিহুদী, হিন্দু, মৈসর প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যজাতিগণই বুঝায়, তাহা হইলেও দেখান যায় যে, উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠিয়াও তাঁহারা এতত্ত্বটী অবগত হইতে পারেন নাই। রাজনীতিগ্রন্থে আরিষ্টট্‌ল্ দাসদিগকে সমাজের অঙ্গস্বরূপ বিবে-

(১০) Egypt, the Soudan and Central Africa by Johon Petherick.

(১১) Explorations and Adventures in Equatorial Africa by Paul B. Duchaillu.

(১২) Chamber's Encyclopedia Vol. II. p. 564

(১৩) I bid Vol. IV. p. 332.

(১৪) Man in the Past, Present and Future by L. Buchner p. 315.

(১৫) I bid p. 321

(১৬) Journey through North Brazil 1859 by Dr. Robert Ave Lallemont,

(১৭) Primeval Man by Duke of Argyll p. 167.

(১৮) Darwin's Voyage of the Beagle.

চনা করিয়াছেন। (১৯) রোমের ব্যবস্থাকারেরা দাসত্ব সংক্রান্ত কতকথা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং রোম ও গ্রীসে কৃষি প্রভৃতি পরিশ্রমের কার্য্য দাসদিগের দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইত। মুসার ব্যবস্থা এবং বাইবলের অন্যান্য স্থল হইতে জানিতে পারা যায় যে, যিহুদিদিগের মধ্যে দাসত্ব প্রচলিত ছিল। মানবধর্ম্ম শাস্ত্রে মনু বলেন, দাসত্বই শূদ্রোচিত কর্ম্ম; এবং হিরোডোটস্ মিসর দেশে দাসের উল্লেখ করিয়াছেন। পুরাতন কোন সভ্য জাতির এমন কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না, যাহাতে দাসত্ব ন্যায়বিরুদ্ধ অধর্ম্ম কর্ম্ম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, বরং তদ্বিপরীত প্রমাণই ভূরি ভূরি লক্ষিত হয়।

ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া বোধ হইতে পারে বটে যে,যে গ্রীক্জাতি স্বাধীনতাপ্রিয়তা গুণে অসংখ্য শত্রুদলন পূর্ব্বক জয়পতাকা উড্ডীন করিয়া মানবমণ্ডলীর দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে, যে জাতির পুরাবৃত্ত পাঠ করিতে করিতে স্বতন্ত্রতা ও শৌর্য্যরসে অভিষিক্ত হইয়া চিত্তবৃত্তি সকল উন্নত ও নবস্ফূর্ত্তি সম্পন্ন হয়, সে জাতিও দাসত্ব কলঙ্কে দূষিত ছিল এবং সে কলঙ্ককে কলঙ্ক বলিয়া বোধ করিতে কখনও সক্ষম হয় নাই। কিন্তু যাঁহারা জানেন যে, স্বশ্রেণী বা স্বজাতির সহিত সম্বন্ধ বুঝিতে যে সময় লাগে,সমগ্র মানবজাতির সহিত সম্বন্ধ বুঝিতে তদপেক্ষা কত অধিকসময় আবশ্যক, তাঁহারা অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন, স্বশ্রেণী বা স্বজাতির প্রতি কর্ত্তব্যজ্ঞানস্বত্ত্বেও সমুদায় মনুষ্যসম্পর্কীয় কর্ত্তব্যবোধ উদিত না হইবার কারণ কি? বিসদৃশ প্রতীয়মান পদার্থ নিচয়ের সাদৃশ্য নির্ণয় দ্বারাই তাহাদিগকে এক নিয়মের অধীন বলিয়া জানা যায়। জ্ঞানবৃদ্ধিসহকারে ভিন্ন ভিন্ন জাতির বাহ্য বৈলক্ষণ্য সমুদায়ের অভ্যন্তরে মূল-প্রকৃতিস্থ সমতা যত লক্ষিত হইতেছে, দিন দিন যত প্রতিপন্ন হইতেছে যে, স্বজাতির ন্যায় সমস্ত নরজাতির সুখদুঃখের সহিত প্রত্যেক ব্যক্তির সুখ দুঃখ সম্বন্ধ রহিয়াছে, ততই সাধারণনৈতিক তত্ত্বের বিকাশ হইতেছে।

পঞ্চমতঃ, যদি "প্রাচীনেরা" বলিতে অতি পূর্ব্বকালীয় অনৈতিহাসিক সময়ের লোক বুঝায়, তাহা হইলে প্রমাণ করা যায় যে, তাঁহারা নীতিজ্ঞান সম্বন্ধে বর্ত্তমানকালীয় সভ্যজাতিগণাপেক্ষা অনেক দূর অনভিজ্ঞ ছিলেন। সকলেই স্বীকার করিবেন যে, বিবাহই সমাজের পত্তনভূমি। বিবাহ হইতেই পরিবার—পতি পত্নী, পুত্র কন্যা, পিতা মাতা, ভ্রাতা-স্বসা, জামাতা, বধূ, মধুরতাময় পবিত্র ভাব ধারণ করিয়াছে। বিবাহ হইতেই দম্পতি প্রেম, মাতৃস্নেহ, পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃপ্রণয় প্রভৃতি স্বর্গীয় সামগ্রী সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু অতি পূর্ব্বকালে বিবাহ ছিল না, সকলেই পশুবৎ যদৃচ্ছা বিহার করিত। ইহার প্রমাণ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে দেখাইয়াছি, মহাভারত পাঠে জানা যায়, "পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোকেরা অরুদ্ধ, স্বাধীন ও সচ্ছন্দবিহা-

(১৯) See Aristotle's Politics.

রিণী ছিল।" ভারতবর্ষে ইহার অনেক চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। মালাবারের নায়রদিগের মধ্যে মহিলাগণ স্ববর্ণে বিহার করিয়া থাকেন। কে কাহার পুত্র, কেহই বলিতে পারে না; সুতরাং ভাগিনেয় মাতুলের বিষয়াধিকারী। অযোধ্যায় তিহুরদিগের মধ্যে এইরূপ সচ্ছন্দবিহার দৃষ্ট হয়। মহাভারতে আরও লিখিত আছে যে, "উত্তর কুরুদেশে অদ্যাপি এই ধর্ম্ম মান্য ও প্রচলিত আছে।" (২০) উত্তর কুরু বলিতে প্রাচীন আর্য্যগণ ভারতভূমির উত্তর কোন পুণ্যময় দেশ বুঝিতেন! বোধ হয়, ইহা আদিম আর্য্যদিগের বাসস্থল হইবে। তাহাহইলে এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, অতি পূর্ব্বকালের আর্য্যপিতৃগণ যথেচ্ছবিহারী ছিলেন। প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমকজাতির ইতিহাসদ্বারা এই মতের সম্পূর্ণ পোষকতা হয়। গ্রীক্ পুরাবৃত্তলেখকগণ পুরাতনশ্রুতি অবলম্বন করিয়া বলেন যে, সিক্রপ্স গ্রীস্ দেশে বিবাহপদ্ধতি প্রচলিত করেন। প্লুটার্ক স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন যে, রোমকদিগের মধ্যে বন্ধুদিগকে স্ত্রীপ্রদান করা রীতি ছিল।

অতি পূর্ব্বকালে স্ত্রীগণ যে সর্ব্বসাধারণের ভোগ্য সামগ্রী ছিল, বর্ণিত আচার ব্যবহারে তাহার কোন কোন নিদর্শন পাওয়া যায়। বিবাহপ্রণালী বদ্ধমূল হইলেও স্বামী সহবাস সুখলাভ করিবার পূর্ব্বে কোন কোন দেশে এক দিনের জন্যে মহিলাগণ সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইত। হেরোডোটস্ লিখিয়াছেন যে, ব্যাবিলনীয়াতে কোন স্ত্রীলোক একবার রতিমন্দিরে না থাকিয়া বিবাহ করিবার অনুমতি পাইত না। (২১) ষ্ট্রাবো বলেন, আর্মিনিয়াতেও এই নিয়ম ছিল। (২২) ডিলরি সাহেবের মতে কার্থেজে এবং গ্রীসের কোন কোন অংশে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। সাইপ্রস দ্বীপে, ইথিওপিয়ায়, লিডিয়ায় ঈদৃশ রীতির চিহ্ন লক্ষিত হয়। (২৩) ডাওডোরস্ সিকুলস্ কহেন, মেজর্কা, মাইনকা, আইভিকা দ্বীপে বিবাহ রাত্রে পাত্রী উপস্থিত অতিথি বর্গের সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইতেন। (২৪)

চীনেরা বলে, তাহাদিগের দেশে ফৌহির সময়ে বিবাহপ্রথা প্রচলিত হয়। হেরোডোটস্ কহেন যে, মেসাজেটি এবং ইথিওপীয় অশেস্ জাতি বিবাহ কাহাকে বলে, জানিত না। মেসাজেটিদিগের বিষয়ে বিখ্যাত ইতিবৃত্ত ও ভূগোলবিৎ ষ্ট্রাবোও এই কথা লিখিয়াছেন, (২৫) মিসরদেশেও উদ্বাহপদ্ধতি প্রারম্ভের জনশ্রুতি ছিল। (২৬)

এপর্য্যন্ত যাহা প্রকটিত হইল, তদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে, সভ্যতম জাতিগণও এক সময়ে বিবাহপ্রথাশূন্য ছিলেন। কি

(২০) মহাভারত, আদিপর্ব্ব ১২২ অধ্যায়।

(২১) Herodotus, Clio, 199.
(২২) Strabo. Lib. 2,
(২৩) Lubbock,s Origin of Civilization. p. 100.
(২৪) I bid p. 101.
(২৫) Lubbock's Origin of Civilization.
(২৬) Buchner's Man in the Past, Present and Future p. 326.

আর্য্যবংশোদ্ভূত হিন্দু, গ্রীক্ ও রোমকগণ, কি সৈমকুলকেশরী ব্যাবিলনীয় এবং কার্থেজীয় বা ফিনিসীয় জাতি, কি আফ্রিকাশিরোরত্ন মৈসরনিকর, কি তুরাণবংশচূড় চীনজাতি, কেহই অতি পূর্ব্বকালে পরিণয় সূত্রে বদ্ধ হইতেন না। এতদ্ব্যতিরিক্ত অনেক অসভ্যজাতির মধ্যে গ্রীস্ এবং রোমের প্রাদুর্ভাব সময়ে যে বিবাহপ্রণালী সংস্থাপিত হয় নাই, ইহাও দৃষ্ট হইতেছে। বোর্ণিও দ্বীপের অরণ্যবাসী ও আফ্রিকার মধ্যস্থ ডোকো প্রভৃতি অসভ্যতম জাতি আদিমাবস্থা অতিক্রম করিয়া অদ্যাপি উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে শিখে নাই, পরিবার কাহাকে বলে জানে না, পশুবৎ সচ্ছন্দ বিহার করে। (২৭) অপেক্ষাকৃত উন্নত আমেরিকার আপাচীরা ও বিবাহ বুঝে না; কিছু দিনের জন্য স্ত্রীপুরুষে একত্র থাকে, সন্তানগুলি কিঞ্চিৎ বড় হইলেই স্বদেশীয়দিগের দলে মিশিয়া যায় এবং জনক জননীর অপরিচিত হইয়া পড়ে। (২৮) নারীগণ যেপূর্ব্বকালে সর্ব্ব সাধারণের ভোগ্য বস্তু বলিয়া গণ্য হইত, অসভ্যদিগের কোন২ আচার দৃষ্টে তাহা অনুমিত হইতে পারে। গ্রিণ্লণ্ডের ইতিবৃত্তনামক গ্রন্থে ইর্জিডি সাহেব লিখিয়াছেন, এস্কিমোদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি অম্লানবদনে বন্ধুদিগকে স্ত্রীদান করিতে পারে, সেই সর্ব্বাপেক্ষা অমায়িকস্বভাব বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। (২৯) এস্কিমো, আদিম আমেরিকগণ, পলিনেসীয়েরা, অষ্ট্রেলিয়া বাসীরা, নিগ্রোনিচয়, আরবেরা, আবিসিনীয়, কাফ্রি এবং মোগলেরা, যে কেহ তাহাদিগের নিকটে অতিথি হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক স্ত্রী দিয়া থাকে; এবং ইহা না করিলে তাহাদিগের বিবেচনায় আতিথ্য ভঙ্গ হয়। (৩০)

অতিপূর্ব্বকালে যে লোকে কেবল বিবাহশূন্য ছিল, এমত নহে; মনুষ্য মারিয়াও ভক্ষণ করিত। যে নর আহারসামগ্রী বলিয়া গণ্য হইত, সেই নর ভালবাসার সামগ্রী বলিয়া গণ্য হইতেছে। একি অল্প নৈতিক উন্নতির চিহ্ন? আমরা পূর্ব্বপরিচ্ছেদে বলিয়াছি যে, সকল দেশেই নরবলি প্রচলিত ছিল, ইহার প্রমাণ আছে; এবং যেখানে নরবলি প্রদত্ত হইত, সেই খানেই কোন না কোন সময়ে নরমাংস ভক্ষণ প্রচলিত ছিল; কারণ লোকে যাহা সুখাদ্য জ্ঞান করে, আহারার্থে তাহা দিয়াই দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা পায়। আদিম কালের মানবজাতির অবস্থা যিনি মনোযোগপূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিবেন, তিনিই তাৎকালিক রাক্ষসত্ব লক্ষণ স্বীকার করিবেন। কোম্তের মতে আদৌ মনুষ্য নরমাংসাশী ছিল। (৩১) বুকনর বলেন, "ভগ্ন ও দগ্ধ মনুজাস্থির যে বহুসংখ্যক আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, ঐতিহাসিক সময়ের অধিকাংশ অসভ্য জাতিদিগের ন্যায় অনৈতিহাসিক

(২৭) Buchner's Man in the Past, Present and Future p. 326

(২৮) Ibid 323

(২৯) Egede's History of Greenland p. 142.

(৩০) Lubbock's Origin of Civilization. p. 102.

(৩১) See Miss Martineau's Translation of Positive Philosophy Vol. II. p. 186

ইউরোপবাসিগণ মানবভোজী ছিল।"(৩২) অদ্যাপি যে কোন কোন অসভ্য-জাতির মধ্যে নরমাংস ভক্ষণ চলিতেছে, ইহার উল্লেখ আমরা পুর্ব্বেই করিয়াছি। আফ্রিকাস্থ নিম্নাম্, ফান্ এবং ওসিবাজাতি, আমেরিকার কাহিবি, ব্রেজিলবাসী ও টেরাডেল্ফিওগো নিবাসীগণ, ফিজি, নবকলিডনিয়া প্রভৃতি দ্বীপাধিবাসিসকল, ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। পূর্ব্বকালে আমাদিগের দেশে যে রাক্ষস ছিল, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির বর্ণনাদ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। প্রসিদ্ধ গ্রীক্ পুরাবৃত্তবিদ্ হেরোডোটস্ মাসাজিটি নামক মধ্য আসিয়াস্থ জাতিবিষয়ে বলেন যে, যখন কেহ তাহাদিগের মধ্যে বৃদ্ধ হইত, তাহার জ্ঞাতি কুটুম্ব সকলে একত্রিত হইয়া তাহাকে মারিয়া আহার করিত। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক সেন্ট জেরোম লিখিয়াছেন যে, যখন তিনি বাল্যকালে গল্ প্রদেশে ছিলেন, ব্রিটেন নিবাসী স্কটদিগকে নরমাংস ভক্ষণ করিতে দেখিয়াছেন। (৩৩)

অসভ্যজাতিগণের অবস্থা হইতে সভ্যজাতিগণের পূর্ব্বপুরুষগণের অবস্থা অনেক দূর অনুমিত হইতে পারে; কারণ সভ্যজাতিগণ যে সকল সামাজিক সোপান অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন, অসভ্যজাতিগণ তাহার কোননা কোনটায় পড়িয়া আছে। এই জন্যই আমরা মনুষ্যের আদিমাবস্থা বুঝিবার নিমিত্ত অসভ্য জাতিদিগের প্রতি বারম্বার দৃষ্টিপাত করিলাম।

ষষ্ঠতঃ, "পরের ভাল করিবে; পরের উপকারার্থে আপনার বাসনা বিসর্জ্জন করিবে; প্রতিবেশীগণকে আত্মবৎ ভাল বাসিবে; শত্রুদিগকে ক্ষমা করিবে; ইন্দ্রিয়গণকে দমন করিবে; পিতা মাতাকে ভক্তি করিবে; উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদিগকে মান্য করিবে;" এই সকল উপদেশ হিন্দু, গ্রীক, রোমক, য়িহুদী প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যজাতিগণের মধ্যে পাওয়া যায় বটে। কিন্তু এই প্রবন্ধের মধ্যে যাহাং লিখিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, অদ্যাপি এমন অনেক অসভ্য জাতি আছে, যাহারা এই সকল নীতিতত্ত্ব অবগত নহে এবং পূর্ব্বে এমন এক কাল ছিল, যখন এসমুদায় সত্য কি হিন্দু, কি গ্রীক্, কি রোমক, কি য়িহুদী, কাহারও চিত্তক্ষেত্রে উদিত হয় নাই। যখন মনুষ্য মনুষ্যের আহার ছিল, যখন নরগণ ছলে বলে কৌশলে কোন নারীকে নিজায়ত্ত করিয়া পশুবৎ বাসনা পরিতৃপ্ত করিত, যখন পতি পত্নী, পিতা মাতা, এ সকল সুধাময় শব্দ শ্রুত হইত না, তখন কাহার মনে এই সমস্ত নৈতিক উপদেশ প্রকাশিত বা স্থান প্রাপ্ত হইতে পারিত? বাস্তবিক অনেক দূর সভ্য না হইলে কেহ এই সকল তত্ত্ব জানিতে পারে না, এবং প্রাচীন হিন্দু, গ্রীক্, রোমক এবং য়িহুদিদিগের অপেক্ষা বর্ত্তমান কালীয় ইউরোপীয়গণ সভ্যতাবর্ত্মে অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই বলিয়াই নীতিতেও অধিক উন্নতি দেখাইতে পারিতেছেন না। তথাপি আমরা প্রতিপন্ন করিয়াছি

(৩২) Buchner's Man in the Past, Present and Future. p. 261.

(৩৩) Chamber's Encyclopedia Vol. II. p. 563.

যে, "কাহাকেও দাস করিয়া রাখিবে না" অর্থাৎ "সকল মনুষ্যকেই স্বাধীন বলিয়া গণ্য করিবে" এই নীতিতত্ত্বটী প্রাচীনেরা জানিতেন না, নব্যেরা আবিষ্কার করিয়াছেন।

সপ্তমতঃ, মহামূর্খ বা বঞ্চক বলিয়া অভিহিত হইবার ভয় থাকিলেও, আমরা স্বীকার করিতে পারি না যে, খ্রীষ্টধর্ম্ম কোন নূতন নীতিতত্ত্ব প্রকাশ করে নাই। ঈশার মতে প্রীতি ভিন্ন ধর্ম্ম নাই। ঈশ্বরপ্রেমে এবং মানবপ্রেমে অভিষিক্ত হও; সম্পূর্ণরূপে কায়মনোবাক্যে অভিষিক্ত হও, তোমার কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইল। যে পিতা মাতাকে তুমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ভাল বাস, তাঁহাদিগের আজ্ঞা যেমন উৎসাহচিত্তে যত্নের সহিত পালন কর, তেমনি ভাবে ঈশ্বরের মঙ্গলময়ী ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া চল। স্নেহময়ী ভগিনী বা প্রাণোপম ভ্রাতার মঙ্গল সাধন জন্য যেরূপ অধ্যবসায় ও ব্যগ্রতাসহকারে আপনি অনেক কষ্ট সহিয়াও চেষ্টা করিয়া থাক, প্রত্যেক মনুষ্যের সম্বন্ধে তদ্রূপ করিবে; সে তোমার যত কেন অপকার করুক না, সে তোমার যত কেন শত্রু হউক না, সে যত কেন পাপ পঙ্কে নিমগ্ন হউক না, কেবল বাহ্য কার্য্যে নয়, অন্তরের প্রতিতন্তুতে, এই সর্ব্বতঃপ্রসারী প্রেম ব্যাপ্ত থাকিবে, তাহা হইলে তুমি ধার্ম্মিক হইবে, নতুবা নয়। এইরূপে মনুষ্যের সমস্ত কর্ত্তব্য একমাত্র প্রীতিতে পরিণত করিয়া ঈশা আমাদিগের বিবেচনায় সর্ব্বোচ্চতম নৈতিক নিয়মপ্রকাশ করিয়াছেন। এই সামান্য নিয়মেই পূর্ব্বাবিষ্কৃত বিশেষ বিশেষ নৈতিক নিয়ম পর্য্যবসিত হইয়াছে; এবং ইহাতেই উত্তরকাল সমুদ্ভাবিত নীতিতত্ত্বসকলের মূল নিহিত রহিয়াছে। "পর দ্রব্য অপহরণ করিবে না, পরদারা হরণ করিবে না, মিথ্যা কথা কহিবে না, শত্রুকে ক্ষমা করিবে, প্রতিবেশীদিগকে আত্মবৎ ভাল বাসিবে," প্রভৃতি সমুদায় প্রাচীন কালের নিয়ম, ভিন্ন ভিন্ন নদীর ন্যায়, একমাত্র সার্ব্বভৌম প্রেম সাগরে লীন হইয়াছে; এবং "কাহাকেও দাস করিয়া রাখিবে না," "সকলকেই সুখভোগে সমান স্বত্ববান্ বোধ করিবে," ইত্যাদি বর্ত্তমান সময়ের নীতিতত্ত্ব সকলও সুধাকর ও কমলার ন্যায় সেই প্রীতিসিন্ধুর মন্থনে উত্থিত হইয়াছে; কেননা যে তোমার ভ্রাতা, সে কি তোমার দাস হইতে পারে? সে যে সমান স্বত্বাধিকারী।

এই প্রবন্ধে যাহা যাহা লিখিত হইল, তদ্দারা প্রমাণ হইতেছে যে, নীতিজ্ঞান সম্বন্ধে অসভ্যজাতিদিগের অপেক্ষা সভ্যজাতিগণ, এবং প্রাচীনদিগের অপেক্ষা নব্য ইউরোপীয়গণ শ্রেষ্ঠ। সুতরাং সভ্যতা বৃদ্ধিসহকারে নীতির উন্নতি হইয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে।

বিষবৃক্ষ।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

চোরের উপর বাটপাড়ি।

হীরা দাসীর চাকরি গেল, কিন্তু দত্তবাড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ ঘুচিল না। সে বাড়ীর সম্বাদের জন্য হীরা সর্ব্বদা ব্যস্ত। সেখানকার লোক পাইলে ধরিয়া বসাইয়া গল্প ফাঁদে। কথার ছলে সূর্য্যমুখীর প্রতি নগেন্দ্রের কি ভাব, তাহা জানিয়া লয়। যে দিন কাহারও সাক্ষাৎ না পায়, সে দিন ছল করিয়া বাবুদের বাড়ীতেই আসিয়া বসে। দাসী মহলে পাঁচ রকম কথা পাড়িয়া, অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়া চলিয়া যায়।

এই রূপে কিছু দিন গেল। কিন্তু এক দিন একটি গোলযোগ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিল।—

দেবেন্দ্রের নিকট হীরার পরিচয়াবধি, হীরার বাড়ী মালতী গোয়ালিনীর কিছু ঘনং যাতায়াত হইতে লাগিল। মালতী দেখিল, তাহাতে হীরা বড় সন্তুষ্ট নহে। আরও দেখিল, একটি ঘর প্রায় বন্ধ থাকে। সে ঘরে, হীরার বুদ্ধির প্রাখর্য্য হেতু, বাহির হইতে শিকল এবং তাহাতে তালা চাবি আঁটা থাকিত, কিন্তু এক দিন অকস্মাৎ মালতী আসিয়া দেখিল, তালা চাবি দেওয়া নাই। মালতী হঠাৎ শিকল খুলিয়া দুয়ার ঠেলিয়া দেখিল। দেখিল, ঘর ভিতর হইতে বন্ধ। তখন সে বুঝিল, ইহার ভিতর মানুষ থাকে।

মালতী হীরাকে কিছু বলিল না, কিন্তু মনেং ভাবিতে লাগিল—মানুষটা কে? প্রথমে ভাবিল, উপপতি। কিন্তু কে কার উপপতি, মালতী সকলই ত জানিত—এ কথা সে বড মনে স্থান দিল না। শেষ তাহার মনেং সন্দেহ হইল—কুন্দই বা এখানে আছে। কুন্দের নিরুদ্দেশ হওয়ার কথা মালতী সকলই শুনিয়াছিল। এখন সন্দেহ ভঞ্জনার্থ শীঘ্র সদুপায় করিল।

হীরা বাবুদিগের বাড়ীহইতে একটি হরিণশিশু আনিয়াছিল। সেটি বড় চঞ্চল বলিয়া বাঁধাই থাকিত। এক দিন মালতী তাহাকে আহার করাইতেছিল। আহার করাইতে করাইতে হীরার অলক্ষ্যে তাহার বন্ধন খুলিয়া দিল। হরিণশিশু মুক্ত হইবামাত্র বেগে বাহিরে পলায়ন করিল। দেখিয়া, হীরা ধরিবার জন্য তাহার পশ্চাৎং গেল।

হীরা যখন ছুটিয়া যায়, মালতী তখন ব্যগ্রস্বরে ডাকিতে লাগিল, "হীরে! ও হীরে! ও গঙ্গাজল!" হীরা দূরে গেলে, মালতী আছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল "ওমা! আমার গঙ্গাজল এমন হলো কেন?" এই বলিয়া কাঁদিতেং কুন্দের ঘরে ঘা মারিয়া কাতর স্বরে বলিতে লাগিল—"কুন্দ ঠাকুরুণ! কুন্দ! শীঘ্র বাহির হও! গঙ্গাজল কেমন হইয়াছে।" সুতরাং কুন্দ ব্যস্ত হইয়া ঘর খুলিল। মালতী তাহাকে দেখিয়া হিং করিয়া হাসিয়া পলাইল।

কুন্দ দ্বার রুদ্ধ করিল। পাছে তিরস্কার করে বলিয়া হীরাকে কিছু বলিল না।

মালতী গিয়া দেবেন্দ্রকে সন্ধান বলিল। দেবেন্দ্র স্থির করিলেন, স্বয়ং হীরার বাড়ী গিয়া এস্পার কি ওস্পার, যা হয় একটা করিয়া আসিবেন। কিন্তু সে দিন একটা "পার্টি" ছিল—সুতরাং জুটিতে পারিলেন না। পর দিন যাইবেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

পিঞ্জরের পাখী।

কুন্দ এখন পিঞ্জরের পাখী—"সতত চঞ্চল।" দুইটি ভিন্নদিগভিমুখগামিনী স্রোতস্বতী পরস্পরে প্রতিহত হইলে স্রোতোবেগ বাড়িয়াই উঠে। কুন্দের হৃদয়ে তাহাই হইল। এ দিগে মহালজ্জা—অপমান—তিরস্কার—মুখ দেখাইবার উপায় নাই—সূর্য্যমুখী ত বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু সেই লজ্জাস্রোতের উপরে প্রণয়স্রোতঃ আসিয়া পড়িল। পরস্পর প্রতিঘাতে প্রণয় প্রবাহই বাড়িয়া উঠিল। বড় নদীতে ছোট নদী ডুবিয়া গেল। সূর্য্যমুখীকৃত অপমান ক্রমে বিলুপ্ত হইতে লাগিল৷ সূর্য্যমুখী আর মনে স্থান পাইলেননা—নগেন্দ্রই সর্ব্বত্র। ক্রমে কুন্দ ভাবিতে লাগিল, "আমি কেন সে গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিলাম? দুটো কথায় আমার কি ক্ষতি হইয়াছিল। আমি ত নগেন্দ্রকে দেখিতাম। এখন যে এক বারও দেখিতে পাই না! তা আমি কি আবার ফিরে সে বাড়ীতে যাব? তা যদি আমাকে তাড়াইয়া না দেয়, তবে আমি যাই। কিন্তু পাছে আবার তাড়াইয়া দেয়?" কুন্দনন্দিনী দিবানিশি মনোমধ্যে এই চিন্তা করিত। দত্তগৃহে প্রত্যাগমন কর্ত্তব্য কি না, এ বিচার আর বড় করিত না—সেটা দুই চারি দিনে স্থির সিদ্ধান্ত হইল যে,যাওয়াই কর্ত্তব্য—নহিলে প্রাণ যায়। তবে গেলে সূর্য্যমুখী পুনশ্চ দূরীকৃত করিবে কিনা, ইহাই বিবেচ্য হইল। শেষে কুন্দের এমনই দুর্দ্দশা হইল, যে সে সিদ্ধান্ত করিল, সূর্য্যমুখী দূরীকৃতই করুক আর যাহাই করুক, যাওয়াই স্থির।

কিন্তু কি বলিয়া কুন্দ আবার গিয়া সে গৃহপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইবে? একা ত যাইতে বড় লজ্জা করে—তবে হীরা যদি সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়, তাহলে যাওয়া হয়। কিন্তু হীরাকে মুখ ফুটিয়া বলিতে বড় লজ্জা করিতে লাগিল। মুখ ফুটিয়া বলিতেও পারিল না।

হৃদয়ও আর প্রাণাধিকের অদর্শন সহ্য করিতে পারে না। এক দিন দুই চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে কুন্দ শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিল। হীরা তখন নিদ্রিত, নিঃশব্দে কুন্দ দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া বাটীর বাহির হইল। কৃষ্ণ পক্ষাবশেষ, ক্ষীণচন্দ্র আকাশপ্রান্তে সাগরে নিক্ষিপ্তা বালিকা সুন্দরীর ন্যায় ভাসিতেছিল। বৃক্ষান্তরাল মধ্যে রাশি২ অন্ধকার লুকাইয়াছিল। অতি মন্দ শীতল বায়ুতে পথিপার্শ্বস্থ সরোবরের পদ্মপত্র শৈবালাদি সমাচ্ছন্ন জলে, বীচিবিক্ষেপ হইতেছিল না। অস্পষ্ট লক্ষ্য বৃক্ষাগ্রভাগ সকলের উপর অতি নিবীড় নীল আকাশ শোভা পাইতেছিল। কুকুরেরা পথিপার্শ্বে নিদ্রা

যাইতেছিল। প্রকৃতি স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য্যময়ী হইয়া শোভা পাইতেছিল। কুন্দ পথ অনুমান করিয়া দত্তগৃহাভিমুখে, সন্দেহ-মন্দ পদে চলিল। যাইবার আর কিছুই অভিপ্রায় নহে—যদি কোন সুযোগে একবার নগেন্দ্রকে দেখিতে পায়। দত্তগৃহে ফিরিয়া যাওয়া ত ঘটিতেছে না—যবে ঘটিবে, তবে ঘটিবে—ইতি মধ্যে একদিন লুকাইয়া দেখিয়া আসিলে ক্ষতি কি? কিন্তু লুকাইয়া দেখিবে কখন্? কি প্রকারে? কুন্দ ভাবিয়া ভাবিয়া এই স্থির করিয়াছিল যে, রাত্রি থাকিতে দত্ত-দিগের গৃহসন্নিধানে গিয়া চারিদিগে বেড়াইব—কোন সুযোগে নগেন্দ্রকে বাতায়নে, কি প্রাসাদে, কি উদ্যানে কি পথে দেখিতে পাইব। নগেন্দ্র প্র-ভাতে উঠিয়া থাকেন, কুন্দ তাঁহাকে দেখিতে পাইলেও পাইতে পারে। দেখিয়াই কুন্দ অমনি ফিরিয়া আসিবে।

মনে মনে এই রূপ কল্পনা করিয়া কুন্দ শেষরাত্রে নগেন্দ্রগৃহাভিমুখে চ-লিল। অট্টালিকাসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, তখন রাত্রি প্রভাত হইতে কিছু বিলম্ব আছে। কুন্দ পথ পানে চাহিয়া দেখিল—নগেন্দ্র কোথাও নাই—ছাদ পানে চাহিল, সেখানেও নগেন্দ্র নাই—বাতায়নেও নগেন্দ্র নাই। কুন্দ ভাবিল, এখনও তিনি বুঝি উঠেন নাই—উঠিবার সময় হয় নাই। প্রভাত হউক—আমি ঝাউতলায় বসি। কুন্দ ঝাউ তলায় বসিল। ঝাউতলা বড় অন্ধকার। দুই একটি ঝাউয়ের ফল কি পল্লব মুট মুট করিয়া নীরব মধ্যে খসিয়া পড়িতে-ছিল। মাতার উপরে বৃক্ষস্থ পক্ষিরা পাকা ঝাড়া দিতেছিল। অট্টালিকারক্ষক দ্বারবানগণ কৃত দ্বারোদ্ঘাটনের ও অব-রোধের শব্দ মধ্যে মধ্যে শুনা যাইতে-ছিল। শেষে উষাসমাগম সূচক শীতল বায়ু বহিল।

তখন পাপিয়া স্বরলহরীতে আকাশ ভাসাইয়া মাতার উপর দিয়া ডাকিয়া গেল। কিছু পরে ঝাউ গাছে কোকিল ডাকিল। শেষে সকল পক্ষী মিলিয়া গণ্ড গোল করিতে লাগিল। তখন কুন্দের ভরসা নিবিতে লাগিল—আর ত ঝাউ তলায় বসিয়া থাকিতে পারে না, প্রভাত হইল—কেহ যে দেখিতে পাইবে। তখন প্রত্যাবর্ত্তনার্থে কুন্দ গাত্রোত্থান করিল। এক আশা মনে বড় প্রবলা হইল। অন্তঃপুর সংলগ্ন যে পুঁ-ষ্পোদ্যান আছে—নগেন্দ্র প্রভাতে উঠিয়া কোন কোন দিন সেইখানে বায়ু-সেবন করিয়া থাকেন। হয় ত নগেন্দ্র এতক্ষণ সেইখানে পাদচারণ করিতে-ছেন। একবার সে স্থান না দেখিয়া কুন্দ ফিরিতে পারিল না। কিন্তু সে উদ্যান প্রাচীরবেষ্টিত। খিডকির দ্বার যুক্ত না হইলে তাহার মধ্যে প্রবেশের পথ নাই। বাহির হইতেও তাহা দেখা যায় না। খিড়কির দ্বার মুক্ত কি রুদ্ধ, ইহা দেখিবার জন্য কুন্দ সেই দিকে গেল।

দেখিল, দ্বার মুক্ত। কুন্দ সাহসে ভর করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। এবং উদ্যানপ্রান্তে ধীরে ধীরে আসিয়া এক বকুল বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইল।

উদ্যানটি ঘনবৃক্ষ লতাগুল্মরাজি পরি-বৃত। বৃক্ষশ্রেণী মধ্যে প্রস্তর রচিত সুন্দর পথ, স্থানে২ শ্বেত রক্ত নীলপীতবর্ণ বহু

কুসমরাশিতে বৃক্ষাদি মণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে—তদুপরি প্রভাতমধুলুব্ধ মক্ষিকা সকল দলে দলে ভ্রমিতেছে—বসিতেছে উড়িতেছে—গুন্ গুন্ শব্দ করিতেছে। এবং মনুষ্যের চরিত্রের অনুকরণ করিয়া একটা একটা বিশেষ মধুযুক্ত ফুলের উপর পালে২ ঝুঁকিতেছে। বিচিত্রবর্ণ অতি ক্ষুদ্র পক্ষিগণ প্রস্ফুটিত পুষ্পগুচ্ছোপরি বৃক্ষফলবৎ আরোহণ করিয়া পুষ্পরসপান করিতেছে, কাহারও কণ্ঠ হইতে সপ্তস্বর সংমিলিত ধ্বনি নির্গত হইতেছে। প্রভাত বায়ুর মন্দ হিল্লোলে পুষ্প ভারাবনত ক্ষুদ্র শাখা দুলিতেছে—পুষ্পহীন শাখাসকল দুলিতেছেনা, কেননা তাহারা নম্র নহে। কোকিল মহাশয় বকুলের ঝোপের মধ্যে কালবর্ণ লুকাইয়া গলা বাজিতে সকলকে জিতিতেছে।

উদ্যান মধ্য স্থলে, একটি শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত লতা মণ্ডপ। তাহা অবলম্বন করিয়া নানাবিধ লতা পুষ্পধারণ করিয়া রহিয়াছে এবং তাহার ধারে মৃত্তিকাধারে রোপিত সপুষ্প গুল্ম সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

কুন্দনন্দিনী বকুলান্তরাল হইতে উদ্যান মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া নগেন্দ্রের দীর্ঘায়ত দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাইল না। লতামণ্ডপ মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, যে তাহার প্রস্তর নির্ম্মিত স্নিগ্ধ হর্ম্ম্যোপরি কেহ শয়ন করিয়া রহিয়াছে, কুন্দনন্দিনীর বোধ হইল, সেই নগেন্দ্র। ভাল করিয়া দেখিবার জন্য সে ধীরে২ বৃক্ষের অন্তরালে২ থাকিয়া অগ্রবর্ত্তিনী হইতে লাগিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময়ে লতামণ্ডপস্থ ব্যক্তি গাত্রোত্থান করিয়া বাহির হইল। হতভাগিনী কুন্দ দেখিল যে, সে নগেন্দ্র নহে, সূর্য্যমুখী।

কুন্দ তখন ভীতা হইয়া এক প্রস্ফুটিতা কামিনীর অন্তরালে দাঁড়াইল। ভয়ে, অগ্রসরও হইতে পারিল না— পশ্চাদপসৃতাও হইতে পারিল না। দেখিতে লাগিল, সূর্য্যমুখী উদ্যান মধ্যে পুষ্পচয়ন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যে খানে কুন্দ লুকাইয়া আছে, সূর্য্যমুখী ক্রমে সেই দিকেই আসিতে লাগিলেন। কুন্দ দেখিল যে, ধরা পড়িলাম। শেষে সূর্য্যমুখী কুন্দকে দেখিতে পাইলেন। দূর হইতে চিনিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কে গা?"

কুন্দ ভয়ে নীরব হইয়া রহিল—পা সরিল না। সূর্য্যমুখী তখন নিকটে আসিলেন—দেখিলেন—চিনিলেন যে, কুন্দ। বিস্মিতা হইয়া কহিলেন, "কে, কুন্দ না কি?"

কুন্দ তখনও উত্তর করিতে পারিল না। সূর্য্যমুখী কুন্দের হাত ধরিলেন। বলেলিন,

"কুন্দ? এসো—দিদি এসো! আর আমি তোমায় কিছু বলিব না।"

এই বলিয়া সূর্য্যমুখী হস্ত ধরিয়া কুন্দনন্দিনীকে অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া গেলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

অবতরণ।

সেই দিন রাত্রে দেবেন্দ্র দত্ত, একাকী ছদ্মবেশে, সুরারঞ্জিত হইয়া, কুন্দনন্দিনীর অনুসন্ধানে হীরার বাড়ীতে দর্শন দিলেন। এ ঘর ও ঘর খুঁজিয়া দেখি-

লেন, কুন্দ নাই। হীরা মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। দেবেন্দ্র রুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাসিস কেন?"

হীরা বলিল, "তোমার দুঃখ দেখে। পিঁজরার পাখী পলাইয়াছে—আমার খানা তল্লাসী করিলে পাইবে না।"

তখন দেবেন্দ্রের প্রশ্নে হীরা যাহাং জানিত, আদ্যোপান্ত কহিল। শেষে কহিল, প্রভাতে তাহাকে না দেখিয়া অনেক খুঁজিলাম, খুঁজিতেং বাবুদের বাড়ীতে দেখিলাম—এবার বড় আদর।"

দেবেন্দ্র হতাশ্বাস হইয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু মনের সন্দেহ মিটিল না। ইচ্ছা, আর একটু বসিয়া ভাব গতি বুঝিয়া যান। আকাশে একটু কালা মেঘ ছিল, দেখিয়া বলিলেন, "বুঝি বৃষ্টি এলো।" অনন্তর ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। হীরার ইচ্ছা, দেবেন্দ্র একটু বসেন—কিন্তু সে স্ত্রীলোক—একাকিনী থাকে—তাহাতে রাত্রি—বসিতে বলিতে পারিল না। তাহা হইলে অধঃপাতের সোপানে আর একপদ নামিতে হয়। কিন্তু তাহাও তাহার কপালে ছিল। দেবেন্দ্র বলিলেন, "তোমার ঘরে ছাতি আছে?"

হীরার ঘরে ছাতি ছিল না। দেবেন্দ্র বলিলেন,

"তোমার এখানে একটু বসিয়া জলটা দেখিয়া গেলে কেহ কিছু মনে করিবে?"

হীরা বলিল, "মনে করিবে না কেন? কিন্তু যাহা দোষ, আপনি রাত্রে আমার বাড়ী আসাতেই তাহা ঘটিয়াছে।"

দে। তবে বসিতে পারি?

হীরা উত্তর করিল না। দেবেন্দ্র বসিলেন।

তখন হীরা তক্তপোষের উপর অতি পরিষ্কার শয্যা রচনা করিয়া দেবেন্দ্রকে বসাইল। এবং সিন্দুক হইতে একটি ক্ষুদ্র রূপা বাঁধা হুক্কা বাহির করিল। স্বহস্তে তাহাতে শীতল জল পুরিয়া মিটাকড়া তামাকু সাজিয়া, পাতার নল করিয়া দিল।

দেবেন্দ্র পকেট হইতে একটি ব্রাণ্ডি ফ্লাস্ক বাহির করিয়া, বিনা জলে পান করিলেন, এবং রাগযুক্ত হইলে দেখিলেন, হীরার চক্ষু বড় সুন্দর। বস্তুতঃ সে চক্ষু সুন্দর। চক্ষু বৃহৎ, নিবিড় কৃষ্ণতার, প্রদীপ্ত এবং বিলোল কটাক্ষ।

দেবেন্দ্র হীরাকে বলিলেন, "তোমার দিব্য চক্ষু!" হীরা মৃদু হাসিল, দেবেন্দ্র দেখিলেন, এক কোণে একখানা ভাঙ্গা বেহালা পড়িয়া আছে। দেবেন্দ্র গুন্২ করিয়া গান করিতেং সেই বেহালা আনিয়া তাহাতে ছড়ি দিলেন। বেহালা খাঁকর ঘোঁকর করিতে লাগিল। দেবেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, এ বেহালা কোথায় পাইলে?"

হীরা কহিল, "একজন ভিখারীর কাছে কিনিয়াছিলাম।"

দেবেন্দ্র বেহালা হস্তে লইয়া এক প্রকার চলন সই করিয়া লইলেন, এবং তাহার সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া, মধুর স্বরে মধুর ভাবযুক্ত মধুর পদ, মধুর ভাবে গায়িলেন। হীরার চক্ষু আরও জ্বলিতে লাগিল। ক্ষণকাল জন্য হীরার সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতি জন্মিল। সে যে হীরা, ওই যে দেবেন্দ্র, তাহা ভুলিয়া গেল। মনে

করিতেছিল, ইনি স্বামী, আমি পত্নী। মনে করিতেছিল, বিধাতা দুই জনকে পরস্পরের জন্য সৃজন করিয়া, বহুকাল হইতে মিলিত করিয়াছেন, বহুকাল হইতে যেন উভয়ের প্রণয়সুখে উভয়ে সুখী। এই মোহে অভিভূত হীরার মনের কথা মুখে ব্যক্ত হইল। দেবেন্দ্র হীরার মুখে অর্দ্ধব্যক্ত স্বরে শুনিলেন যে, হীরা দেবেন্দ্রকে মনে মনে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে।

কথা ব্যক্ত হইবার পর হীরার চৈতন্য হইল, মস্তক ঘুরিয়া উঠিল। তখন সে উন্মত্তের ন্যায় আকুল হইয়া দেবেন্দ্রকে কহিল, "আপনি শীঘ্র আমার ঘর হইতে যান।"

দেবেন্দ্র বিস্মিত হইয়া কহিলেন,

"সে কি, হীরা?"

হীরা। আপনি শীঘ্র যান—নহিলে আমি চলিলাম।

দে। সে কি, তাড়াইয়া দিতেছ কেন?

হীরা। আপনি যান—নহিলে আমি লোক ডাকিব—আপনি কেন আমার সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছিলেন।

হীরা তখন উন্মাদিনীর ন্যায় বিবশা।

দে। একেই বলে স্ত্রীচরিত্র?

হীরা রাগিল—বলিল "স্ত্রীচরিত্র? স্ত্রীচরিত্র মন্দ নহে। তোমাদিগের ন্যায় পুরুষের চরিত্রই অতি মন্দ। তোমাদের ধর্ম্ম জ্ঞান নাই—পরের ভাল মন্দ বোধ নাই—কেবল আপনার সুখ খুঁজিয়া বেড়াও—কেবল কিসে কোন স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করিবে, সেই চেষ্টায় ফের। নহিলে কেন তুমি আমার বাড়ীতে বসিলে? আমার সর্ব্বনাশ করিবে, তোমার কি এ অভিপ্রায় ছিল না? তুমি আমাকে কুলটা ভাবিয়াছিলে, নহিলে কোন্ সাহসে বসিবে? কিন্তু আমি কুলটা নহি। আমরা দুঃখী লোক, গতর খাটাইয়া খাই—কুলটা হইবার আমাদের অবকাশ নাই—বড় মানুষের বউ হইলে কি হইতাম, বলিতে পারি না।" দেবেন্দ্র ভ্রূভঙ্গী করিলেন। দেখিয়া হীরা প্রীতা হইল। পরে উন্নমিতাননে দেবেন্দ্রের প্রতি স্থির দৃষ্টি করিয়া কোমলতরস্বরে কহিতে লাগিল, "প্রভো, আমি আপনার রূপ গুণ দেখিয়া পাগল হইয়াছি। কিন্তু আমাকে কুলটা বিবেচনা করিবেন না। আমি আপনাকে দেখিলেই সুখী হই। এজন্য আপনি আমার ঘরে বসিতে চাহিলে বারণ করিতে পারি নাই—কিন্তু অবলা, স্ত্রীজাতি—আমি বারণ করিতে পারি নাই বলিয়া কি আপনার বসা উচিত হইয়াছে? আপনি মহাপাপিষ্ঠ, এই ছলে ঘরে প্রবেশ করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এখন আপনি এখান হইতে যান্।"

দেবেন্দ্র আর এক গ্লাস পান করিয়া বলিলেন, "ভাল, ভাল! হীরে, তুমি ভাল বক্তৃতা করিয়াছ। আমাদের ব্রহ্ম সমাজে এক দিন বক্তৃতা দিবে?"

হীরা এই উপহাসে মর্ম্মপীড়িতা হইয়া, রোষ-কাতরস্বরে কহিল, "আমি আপনার উপহাসের যোগ্য নই—আপনাকে অতি অধম লোকে ভাল বাসিলেও, তাহার ভাল বাসা লইয়া রহস্য করা কর্ত্তব্য নয়। আমি ধার্ম্মিক নহি, ধর্ম্ম বুঝি না—এবং ধর্ম্মে আমার মন নাই। তবে যে

আমি কুলটা নই বলিয়া স্পর্দ্ধা করিলাম, তাহার কারণ এই, আমার মনেং প্রতিজ্ঞা আছে, আপনার ভালবাসার লোভে পড়িয়া কখন কলঙ্ক কিনিব না। যদি আপনি আমাকে এতটুকুও ভাল বাসিতেন, তাহা হইলে আমি এ প্রতিজ্ঞা করিতাম না—আমার ধর্ম্ম জ্ঞান নাই, ধর্ম্মে ভক্তি নাই—আমি আপনার ভালবাসার তুলনায় কলঙ্ককে তৃণজ্ঞান করি। কিন্তু আপনি ভাল বাসেন না—সেখানে কি সুখের বিনিময়ে কলঙ্ক কিনিব? কিসের লোভে আমার স্বাধীনতা ছাড়িব? আপনি যুবতী স্ত্রী হাতে পাইলে কখন ত্যাগ করেন না, এ জন্য আমার পূজা গ্রহণ করিলেও করিতে পারেন, কিন্তু কাল আমাকে হয় ত ভুলিয়া যাইবেন, নয়ত যদি স্মরণ রাখেন, তবে আমার কথা লইয়া দলবলের কাছে উপহাস করিবেন—এমন স্থানে কেন আমি আপনার অধীন হইব? কিন্তু যে দিন আপনি আমাকে ভাল বাসিবেন, সেই দিন আপনার দাসী হইয়া চরণসেবা করিব।"

দেবেন্দ্র হীরার মুখে এইরূপ তিন প্রকার কথা শুনিলেন। তাহার চিত্তের অবস্থা বুঝিলেন। মনেং ভাবিলেন, "আমি তোমাকে চিনিলাম, এখন কলে নাচাইতে পারিব। যে দিন মনে করিব, সেই দিন তোমার দ্বারা কার্য্যোদ্ধার করিব।" এই ভাবিয়া চলিয়া গেলেন।

দেবেন্দ্র হীরার সম্পূর্ণ পরিচয় পান নাই।

স্বাভাবিক ও অভ্যস্ত পুণ্য কর্ম্ম।

পুণ্য কিসে হয়? সৎকর্ম্ম করিলে পুণ্য হয় অথবা সৎকামনাতেই তাহা সম্পন্ন হইয়া থাকে? অথবা উভয় একত্রিত না হইলে পুণ্যকর্ম্ম হয় না?—লোকে সৎপ্রবৃত্তি বিনাও সৎকর্ম্ম করিয়া থাকে, এবং কখনং প্রকৃত অসৎ প্রবৃত্তি হইতেও সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। যশোবাসনাই অনেক পুণ্য কর্ম্মের মূলীভূত। উহাতে সাত্ত্বিকতা না থাকিতে পারে, কিন্তু এরূপ কর্ম্মকে অসৎ প্রবৃত্তি হইতে উৎপন্ন বলিয়া গণনা করা যায় না। যখন কেহ পরের ক্ষতি করিবার মানসে তাহার বিশ্বাস পাত্র হইবার জন্য কোন সৎকর্ম্ম করে, তাহাই প্রকৃত রূপে অসৎ প্রবৃত্তিমূলক। তথাচ কখন কখন ঘটনা ক্রমে এতাদৃশ পাপিষ্ঠের ইচ্ছা সম্পূর্ণ না হইয়া, কৃত্রিম সৎকর্ম্মটী করিয়াই তাহার কুক্রিয়ার অন্ত হইয়া থাকে।

মনে কর, কোন ব্যক্তি রাজমুকুট অপহরণ মানসে লোকরঞ্জনে নিযুক্ত থাকিয়া পরিশেষে ঘটনাক্রমে আপন মুখ্য উদ্দেশ্যে বঞ্চিত হইল। এরূপ স্থলে তাহার লোকরঞ্জন ক্রিয়া কদাচ পুণ্য কর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইবেক না। কিন্তু যাহারা এই প্রকারে তাহাকর্ত্তৃক উপকৃত

হইয়াছে, তাঁহাদিগের পক্ষেও সেই উপকার এক কালীন বিস্মরণ করা কি কর্ত্তব্য?

থেমিষ্টক্লিস্ যে স্বীয় বুদ্ধিবলে নানা উপায়ের দ্বারা এথেন্সের প্রাধান্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার গূঢ় অভিসন্ধি কি ছিল, তাহা কেহই জানে না, বরং তাঁহার স্বদেশহিতৈষিতার অকৃত্রিমতার প্রতি অনেক সন্দেহই আছে। তথাপি তিনি না থাকিলে সালামিসের যুদ্ধে গ্রীকেরা কদাচ জয় লাভ করিতে পারিতেন না। আর যদি ঐ যুদ্ধের দ্বারা পারস্য সম্রাট্ দুরীকৃত না হইতেন, তবে বুঝি গ্রীসের সৌভাগ্যসূর্য্য আর উদয় হইত না এবং ইউরোপ অদ্যাবধি অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিত। অতএব থেমিষ্টক্লিস্কে অতি পাষণ্ড মনে করিলেও তৎকৃত উপকার বিস্মরণ করা মনুষ্যের সাধ্য নহে।

ফলতঃ সৎকর্ম্ম এবং সৎকামনা, বিভিন্ন পদার্থ, এবং উভয়ের প্রতি পৃথক রূপে দৃষ্টিপাত করিলেই এতদ্বিষয়ক দ্বিধা দূরীকৃত হইবেক। অমুক ব্যক্তির কামনা সৎ এবং স্বার্থপর নহে,—লোকের মনে এতাদৃশ সংস্কার না হইলে তাঁহার প্রতি প্রীতির উদ্রেক হয় না। কিন্তু কামনা যেরূপ হউক, কর্ম্মটি সৎ এবং অন্যের উপকারজনক হইলেই কর্ত্তা কৃতজ্ঞতার ভাজন হয়েন। তদ্রূপ দুরভিসন্ধি না থাকিলে অপরাধী দণ্ডনীয় হয় না; তথাচ অজ্ঞানকৃত পাপ যে, পৃথিবীর ক্ষতিজনক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হিন্দু শাস্ত্রে অজ্ঞানকৃত পাপের জন্য যে পৃথক প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে, তাহার নিগূঢ় কারণ এই। আমার আশয় ভাল, অতএব আমাকর্ত্তৃক লোকের ক্ষতি হইলেও আমি জনসমাজে এবং জগদীশ্বরের সমীপে সর্ব্বতোভাবে দোষহীন, এরূপ বিশ্বাস মঙ্গলকর নহে।

আমার সৎকামনার জন্য আমি পুণ্যবান বলিয়া গণ্য হইতে পারি, কিন্তু আমার কার্য্য মন্দ হইলে, তাহার দোষ আমাকেই বহন করিতে হইবেক। সদভিপ্রায় হইতে কুকর্ম্ম উৎপন্ন হইলে কেবল বুদ্ধির দোষ থাকাই জ্ঞান করিতে হইবেক; কিন্তু বুদ্ধির দোষ বড় তুচ্ছ পদার্থ নহে। তবে বুদ্ধিমত্তার সীমা নাই, সুতরাং বুদ্ধির ইতর বিশেষে কিঞ্চিৎ বা অধিক পরিমাণে সকল লোকেই পৃথিবীর ক্ষতি বা মঙ্গল সাধন করেন। এই জন্য কেহ পুণ্যবান কি না, এপ্রকার বিচার স্থলে কেহই তাঁহার বুদ্ধির প্রতি লক্ষ্য করেন না। কিন্তু বুদ্ধি সৎকামনার সহকারী না হইলে কিছুতেই ফল দর্শে না; অতএব যাঁহারা স্বীয় কার্য্য ফলের দোষ গুণ বিচার না করিয়া, কার্য্যটী সদভিপ্রায় মূলক, কেবল এই বলিয়া তাহার ঐহিক কিম্বা পারত্রিক মঙ্গলের প্রত্যাশা করেন, তাঁহাদিগকে কথঞ্চিৎ নিরস্ত করা কর্ত্তব্য। এবং কামনা, ভূয়সী প্রশংসার যোগ্য হইলেও কর্ম্মফলের দোষ গুণের প্রতি অনাস্থা করা অন্যায়।

কোন২ নীতিশাস্ত্রবেত্তা বলেন, সৎকর্ম্ম করিলে মনে এক প্রকার সুখোদয় হয়, এবং তাহাই কর্ম্মের সততার প্রমাণ। কিন্তু সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়, কোন সৎকর্ম্ম উপর্য্যুপরি করিলে এই রূপ তৃপ্তির হ্রাস হইয়া থাকে। তবে ইহাতে কি সততারও

লাঘব স্বীকার করিতে হইবেক?—কদাচ নহে।

স্পৃহা সৎই হউক আর অসৎই হউক, চরিতার্থ হইলেই সুখ হয়, এবং অবরুদ্ধ হইলেই ক্লেশ জন্মে; ইহা মনুষ্যের স্বভাব সিদ্ধ ধর্ম্ম। মনোমধ্যে বিভিন্ন স্পৃহা উদিত হইলে যেটী চরিতার্থ হয়, তাহা হইতে সুখ, এবং অপর গুলি পরিতৃপ্ত না হওয়াতে, তন্নিমিত্ত কষ্ট অবশ্যই অনুভূত হইবেক। ধরাতলে সৎকর্ম্মের মাহাত্ম্য এতই কীর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে যে, সভ্যসমাজে যখন কেহ কুকর্ম্ম করিতে সর্ব্বপ্রথমে আরম্ভ করে, তখন তাহার মনোমধ্যে উহা হইতে ক্ষান্ত থাকিবার বাসনা এক কালে অনুপস্থিত থাকে না। সুতরাং যে পর্য্যন্ত কুকর্ম্মের অভ্যাস না হইয়া যায়, সে পর্য্যন্ত সদসৎ প্রবৃত্তির বিরোধজনিত অসুখ অবশ্যই হইতে থাকে। কিন্তু সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানস্থলে সকল সময়ে কুপ্রবৃত্তির উদ্রেক হয় না; এতাদৃশ অবস্থায় ইহার সুখ অবিচ্ছিন্নভাবে মনোমধ্যে বিকশিত হয়। কিন্তু যে স্থলে কোন কুপ্রবৃত্তিকে দমন করিয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়, সেস্থলে যে কিছু মাত্র কষ্ট বোধ হয় না, একথা কখনই বলিতে পারি না।

আবার অভ্যাস হইলে কামনার দোষগুণজনিত সুখ দুঃখ উভয়ই নিস্তেজ হইয়া উঠে। এমন কি, কোন২ বিষয়ে স্পৃহা গুলি স্পষ্টরূপে অনুভব করা যায় না। এক জনকে কটূক্তি করিবার সময়ে কোন সদাশয় ব্যক্তির যে চিত্ত বিকার প্রকাশ হয়, এক জন ঠগীর (ফেঁসেড়ার) মনে নরহত্যা কালে তাহার চতুর্থাংশ উদয় হয় কি না, সন্দেহ স্থল। সাংসারিক দুরবস্থা নিবন্ধন যে ব্যক্তি কখন অনাহারীকে অন্নদান করিতে পারেন নাই, তাঁহার সেই ক্ষমতা উপস্থিত হইলে মনে যে অপূর্ব্ব করুণার উদয় হয়, কিছু কাল পরে বহু লোককে অন্নদান করিলেও আর সেরূপ ভাব থাকে না।

এস্থলে ঠগীর পাপাধিক্য এবং অন্নদাতার পুণ্যবৃদ্ধি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। ইহাদিগের তীব্র স্পৃহার অভাব স্বাভাবিক নহে। প্রথমু উদ্যমে অবশ্যই অন্নদানেচ্ছা এবং নরহত্যা বাসনা উভয়েরই যথেষ্ট তীব্রতা ছিল, কিন্তু অভ্যাস সহকারে তাহার অবস্থান্তর হইয়াছে। অতএব অভ্যস্ত পুণ্য স্বাভাবিক পুণ্যাপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে, বরং উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইবেক।

হিন্দু শাস্ত্রের এক প্রধান লক্ষণ এই যে, শাস্ত্রকারেরা পুণ্য কর্ম্ম অভ্যাস করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

"আসনাশন শয্যাভিরদ্ভির্মূল ফলেন বা।
"নাস্য কশ্চিদ্বসেদ্গেহে শক্তিতোঽনর্চ্চিতোঽতিথিঃ॥

"অর্থ। শক্ত্যনুসারে ভোজন শয়ন পানীয় ফল "মূলাদি দ্বারা অর্চ্চিত না হইয়া যেন কোন "অতিথি তাঁহার বাটীতে বাস না করেন। "তাৎপর্য্য; শক্ত্যনুসারে অতিথিকে পূজা "করিবেক।" ভরত শিরোমণির মনু ১৯৯ পৃঃ ৪ অ. ২৯।

মনুর প্রভুত্ব সহকারে এতদ্দেশে অতিথি সৎকার ধর্ম্ম এত প্রচলিত হইয়াছে যে, তাহার প্রতিপালনে পুণ্য নাই, অবহেলনে পাপ হয়; লোকের মনে প্রায় এই রূপ বিশ্বাস হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যে ব্যক্তি অতিথির পরিতোষ জন্য

আপনি অনাহারে থাকিতে প্রস্তুত,হয় ত দেশহিতৈষিতার কোন অনুষ্ঠান হইলে তিনি আদৌ তাহাতে যত্ন করিবেন না।

মিল্ প্রভৃতি কোন২ মহৎ ব্যক্তি অভ্যস্ত পুণ্যের নিন্দা করিয়াছেন। (আমরা স্ব স্বভাবানুবর্ত্তিতা * বিষয়ক প্রবন্ধে ইহার আলোচনা করিয়াছি।) তাঁহাদিগের মতে প্রবল বাসনা হইতে সৎকর্ম্মের উদয় না হইলে সেই সৎকর্ম্মের মাহাত্ম্য খর্ব্ব হইয়া যায়। কিন্তু একথা বলিলে, কাহারো পাপ কর্ম্ম অভ্যা সহকারে যখন এতাদৃশ সহজ হইয়া উঠে যে, তাহাতে প্রবৃত্ত হইবার সময়ে তাহার মনে সতেজঃ স্পৃহার আবশ্যকতা থাকে না, তখন তাহার সেই পাপ কর্ম্মটীও কি গুরুতর নহে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক? ইহা কদাচ যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে না।

পরন্তু এস্থলে বলা কর্ত্তব্য যে, সৎ কি অসৎ কর্ম্মের অভ্যাস, দুই প্রকার হইয়া থাকে। উভয়েই, কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার সময়ে বাসনার প্রবলতা জানা যায় না। কিন্তু এক প্রকার অভ্যাসের প্রতিষেধ হইলে অত্যন্ত কষ্ট হয়; দ্বিতীয় প্রকার অভ্যাসের লক্ষণ এই যে অভ্যস্ত সৎ বা অসৎ কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য আয়াসের প্রয়োজন থাকে না, এবং কার্য্যটী না করিলেও বিশেষ কষ্ট বোধ হয় না। ইহার প্রথম দৃষ্টান্তে বাসনার বিলক্ষণ তেজ আছে, কিন্তু তাহা অনুভব করা গেল না—এবং দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে বাসনার তেজ প্রকৃতপক্ষে খর্ব্বই হইয়াছে, একথা স্বীকার করিতে হইবেক। কিন্তু জনসমাজে উভয়বিধ কুকার্য্যই তুল্যরূপে ক্ষতিজনক এবং যখন কোন ব্যক্তি অনায়াসে একটী কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তখন উহা হইতে ক্ষান্ত থাকা তাহার পক্ষে অসাধ্য নহে বলিয়া, তাহার পাপের ন্যূনতা স্বীকার করা যায় না।

মিল্ চীন ও ভারতবর্ষের উদাহরণ দেখাইয়া বলিয়াছেন, এই দুই দেশে সকল বিষয়ের নিয়ম নিবদ্ধ থাকাতেই এক্ষণে শ্রীহীন হইয়াছে। পরন্তু নিয়ম না করিলে সৎকর্ম্ম কখনই অভ্যস্ত হয় না। মনুষ্য সৎ অসৎ উভয় গুণেরই আধার। যত্নসহকারে সচ্চরিত্রতার উত্তেজনা এবং কুক্রিয়াসক্তির দমন না করিলে মনুষ্যপ্রকৃতি এবং জনসমাজের উন্নতি হইতে পারে না। অতএব নিয়ম নির্দ্ধারণকে দোষ দেওয়া অন্যায়। মিল বলেন, নিয়মানুসারে কার্য্য করিলে অচিরাৎ কর্ত্তার মন নিতান্ত অসার হইয়া যায়। কিন্তু কার্য্যের ফল কেবল কর্ত্তাতেই ক্ষান্ত হয় না। তুমি সৎকর্ম্মই কর বা কুকর্ম্মই কর, মৃত্যুর পরে পৃথিবীর সহিত তোমার কি সম্বন্ধ থাকিবেক, তাহা বুঝিতে পারিনা। কিন্তু চিন্তারূপ ক্রিয়াই বল কি বাহ্য ক্রিয়াই বল, তোমার কার্য্য মাত্রেই অবিনশ্বর। যত দিন মনুষ্যজাতি পৃথিবীতে থাকিবেক, ততদিন তোমার কার্য্যের ফল জগতে বিস্তার হইবেক। এক একটি কার্য্য কর্ত্তার মন হইতে উদিত হয়;—অনন্তর তাহা হইতে একদিকে কর্ত্তার মানসিক অবস্থার ইতর বিশেষ, অন্য দিগে তাহা প্রকাশ হইলে অপর ব্যক্তির অবস্থান্তর হয়। মানসিক ক্রিয়াটি প্রকাশ না হইলেও

* এই প্রবন্ধে স্বস্বভাবানুবর্ত্তিতা শব্দের পরিবর্ত্তে স্বানুবর্ত্তিতা শব্দ প্রয়োগ করা যাইবেক।

রাজনারায়ণ বাবুর লেখনীর উপর পুষ্প চন্দন বৃষ্টি হউক! এই মহাগীত ভারতের সর্ব্বত্র গীত হউক। হিমালয় কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক! গঙ্গা যমুনা সিন্ধু নর্ম্মদা গোদাবরী তটে বৃক্ষে২ মর্ম্মরিত হউক! পূর্ব্ব পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জ্জনে মন্দ্রীভূত হউক! এই বিংশতি কোটি ভারত বাসির হৃদয় যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক!

কিঞ্চিৎ জলযোগ। প্রহসন, কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্র।

একেই কি বলে সভ্যতার জন্মাবধি প্রহসনের কিছু ছড়াছড়ি হইয়াছে। সেই সকল পাঠে আমরা স্থির করিয়াছি যে হাস্যরসবিহীন অশ্লীল প্রলাপকেই বঙ্গদেশে প্রহসন বলে। দুই খানি প্রহসন এই পরিভাষা হইতে বিশেষ রূপে বর্জ্জিত, **একেই কি বলে সভ্যতা** এবং **সধবার একাদশী**। সধবার একাদশী অশ্লীলতা দোষে দূষিত হইলেও, অন্যান্য গুণে ভারতবর্ষীয় ভাষায় এ রূপ প্রহসন দুর্লভ। "কিঞ্চিৎ জলযোগ" ঐ দুই-প্রহসনের তুল্য নহে বটে কিন্তু ইহাকেও বর্জ্জিত করিতে পারি। ইহাও এক খানি উৎকৃষ্ট প্রহসন। এ প্রহসনের একটি গুণ এই যে তৎপ্রণেতা প্রহসন লিখিতে নাটক লিখিয়া ফেলেন নাই। অনেকেরই প্রণীত প্রহসন, প্রহসন নহে, অপকৃষ্ট নাটক মাত্র; এ প্রহসন প্রহসন মাত্র, কিন্তু অপকৃষ্ট নহে। ইহাতে হাস্যের প্রাচুর্য্য না থাকুক, নিতান্ত অভাব নাই, এবং ব্যঙ্গ যথেষ্ট। সেই ব্যঙ্গ যদি কোন শ্রেণী বিশেষের প্রতি লক্ষ্য হইয়া থাকে তথাপি নিন্দনীয় নহে, কেননা ব্যঙ্গের অনুপযুক্ত বিষয় লইয়া কোথাও ব্যঙ্গ দেখিলাম না। যাহা ব্যঙ্গের যোগ্য, তৎপ্রতি ব্যঙ্গ প্রযুজ্য; তাহাতে অনিষ্ট নাই, ইষ্ট আছে। কে ব্যঙ্গের যোগ্য, তাহার মীমাংসার স্থান এ নহে; সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলিব।

কার্য্যের যে সকল গুণ আছে, তাহার মধ্যে একটি ফলোপধায়কতা। কার্য্য হয় সফল, নয় নিষ্ফল। কার্য্য সফল হইলে, তাহার ফলে যদি অন্যের ইষ্ট হয়, তবে তাহাকে পুণ্য বলি। যদি তাহার ফলে পরের অনিষ্ট হয়, তবে তাহাকে কর্ত্তার অভিপ্রায় ভেদে পাপ বা ভ্রান্তি বলি। যদি অসদভিপ্রায়ে সেই অনিষ্টজনক কার্য্য কৃত হইয়া থাকে, তবে তাহা পাপ বা দুষ্ক্রিয়া। যদি অসদভিপ্রায় ব্যতীত ঘটিয়া থাকে, তবে তাহা ভ্রান্তি মাত্র।

দেখা যাইতেছে যে পুণ্য, পাপ, বা ভ্রান্তি, কেহই ব্যঙ্গের যোগ্য নহে। পুণ্য প্রতিষ্ঠার যোগ্য, তৎপ্রতি ব্যঙ্গ অপ্রযুজ্য। পাপ, ভর্ৎসনা, দণ্ড, বা শোচনার যোগ্য, তৎপ্রতিও ব্যঙ্গ অপ্রযুজ্য। যাহাতে দুঃখ করা উচিত, তাহা ব্যঙ্গের যোগ্য নহে। তদ্রূপ, ভ্রান্তিও ব্যঙ্গের যোগ্য নহে—উপদেশ তৎপ্রতি প্রযুজ্য।

নিষ্ফল ক্রিয়ার প্রতি অবস্থা বিশেষে ব্যঙ্গ প্রযুজ্য। ক্রিয়া যে নিষ্ফল হয়, তাহার সচরাচর কারণ এই যে উদ্দেশ্যের সহিত অনুষ্ঠানের সঙ্গতি থাকে না। যে খানে অনুষ্ঠানে উদ্দেশ্যে অসঙ্গত, সেই খানে ব্যঙ্গ প্রযুজ্য। বাঙ্গালার কথার অপ্রতুল হেতু ইহাকেও প্রমাদ বলিতে হয়, কিন্তু প্রথমোক্ত ভ্রান্তির সহিত

ইহার বিশেষ প্রভেদ আছে। ইংরাজি ভাষায় এই দুইটির জন্য পৃথক২ নাম আছে। একটিকে Error বলে আর একটিকে Mistake বলে। Error ব্যঙ্গের যোগ্য নহে, Mistake ব্যঙ্গের যোগ্য।

ক্রিয়া সম্বন্ধে যেরূপ, ক্রিয়ায় অপরিণত মনের ভাব সম্বন্ধেও সেইরূপ। পুণ্যের উপযোগী চিত্তভাবকে ধর্ম্ম বলা যায়; পাপের উপযোগী ভাবকে অধর্ম্ম বলি, এবং ভ্রান্তির উপযোগী ভাবকে অজ্ঞানতা বলি। এই তিনই ব্যঙ্গের অযোগ্য। কিন্তু যে চিত্তবৃত্তি হইতে প্রমাদ জন্মে, তাহা ব্যঙ্গের যোগ্য। আমরা দুইটি ইংরাজি কথা ব্যবহার করিয়াছি, আর একটি ব্যবহার করিলে অধিক দোষ হইবে না। Mistake যেরূপ ব্যঙ্গের যোগ্য, Follyও তদ্রূপ। এই নাটকে বিধুমুখীর বা পূর্ণচন্দ্র বা পেরুরামের চিত্রে যে ব্যঙ্গ দেখা যায়, তাহা ঐরূপ অসঙ্গত কার্য্য বা ভাবের উপর লক্ষিত। সুতরাং নিন্দনীয় নহে। পরন্তু এই প্রহসনের আদ্যোপান্ত পাঠ বাঅভিনয় দর্শন প্রীতিকর; ইহা সামান্য প্রশংসা নহে, কেননা অন্যান্য বাঙ্গালা প্রহসনে প্রায় তাহা অসহ্য কষ্টকর।

পরিতাপের বিষয় এই যে, এ প্রহসনের কোন২ স্থলে এমত ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে যে ভদ্রলোকে পরস্পরের সাক্ষাতে উচ্চারণ করেন না। ইহাকে অশ্লীলতা বলা যাউক বা না যাউক, একটু দোষ বটে। কিন্তু ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারা যায়, যে ইহাতে কদর্য্য ভাবজনক কথা কিছুই নাই। এমত কোন কথা নাই যে তাহাতে পাঠকের বা দর্শকের মন কলুষিত হইতে পারে।

মূল্য প্রাপ্তি। ফেব্রয়ারি ১৮৭৩।

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়
ভবানীপুর ... ৩৲
,, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
আলিপুর ... ৩৲
,, রামকৃষ্ণ দাস ঐ ... ১৸০
,, নন্দলাল মিত্র ভবানীপুর ৩৲
,, নগেন্দ্র নারায়ণ গুপ্ত মলঙ্গা ১৸০
,, মহেশ্চন্দ্র সরকার কালিঘাট ৩৲
,, নগেন্দ্র নাথ বসু ঠণ্ঠনে ৩৲
,, শরৎচন্দ্র ঘোষ বং ব্যাঙ্ক ৩
,, বনওয়ারী লাল দাস কলিকাতা ২৲
,, রসিক লাল দত্ত চিৎপুর ৩৲
,, মনোহর ঘোষ ট্রেজরি ১৸০
,, যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু কলিকাতা ২
,, কেশব চন্দ্র মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা ... ৩৲
,, যদুনাথ মুখোপাধ্যায়
ট্রেজরি ... ১৲
,, উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
বৈঠকখানা ... ৩৲
,, গোপালচন্দ্র দত্ত ভবানীপুর ৩৲
,, গুরুচরণ গুপ্ত বং ব্যাঙ্ক ৩৲
,, নত্যগোপাল লাহিড়ী
রাম বাগান ... ৩৲
,, অঘোর নাথ কুমার তালতলা ১৲
,, ভূধর চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ভবানীপুর ... ১৲
,, শরৎকুমার ঘোষাল পটলডাঙ্গা ৩৲
,, রূপনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
সোভাবাজার ... ১৲
,, জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র বসু ভবানীপুর ৬
,, গোপালশঙ্কর হড়
থিয়েটর রোড ১৸০
,, শ্রীকৃষ্ণ হাজরা শিয়ালদা ... ১৲
,, বরদা দাস মিত্র ভবানীপুর ১৲
,, সিদ্ধেশ্বর ঘোষ টেজরি ... ৩৲

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গানারায়ণ প্রধান
পাথুরেঘাটা ... ১৲
,, হেমচন্দ্র মিত্র বড়বাজার ... ৩৲
,, যোগেশ্চন্দ্র দে পটলডাঙ্গা ১৸০
,, মহেন্দ্রচন্দ্র দাস কলিকাতা ২৲
,, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সুকিয়া
ষ্ট্রিট ... ৩৲
,, ভুবনমোহন বিশ্বাস সিমলা ১৸০
,, রামলাল শ্রীমানি
বাগবাজার ... ১৸০
,, প্রসন্ন কুমার পাড়ে পোষ্ট ১৲
Rev. J. E. Payne
ভবানীপুর ... ৩৲
শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ হাজরা ঐ ... ৩৲
,, বেহারি কৃষ্ণ বসু
শ্যামপুকুর ... ১৸০
,, হরিহর সেন কলিকাতা ... ৩৲
,, তারাকান্ত চক্রবর্ত্তী
জোড়াসাঁকো ... ১৸০
,, উপেন্দ্র চন্দ্র বসাক
পাথুরেঘাটা ... ১৸০
,, বেণীমাধব গঙ্গোপাধ্যায়
মেছোবাজার ... ১৷০
,, রামতারণ চৌধুরা ঐ ... ১।০
,, নীলমণি দে কলিকাতা ১৸০
,, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
চড়কডাঙ্গা ... ১৷০
,, রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বেহালা ৩৲
,, গোপালচন্দ্র ঘোষ ভবানীপুর ৩৲
,, হরিমোহন মুখোপাধ্যায় হেদো ৩৲
,, গোপালচন্দ্র ঘোষ হাইকোর্ট ১৲
,, নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
হোটেল ১৸০
,, রাখালদাস ঘোষ
নর্ম্ম্যালস্কুল ... ১৸০
,, রতন লাল শেঠ গরাণহাটা ৩৲
,, দুর্গাদাস ঘোষ ভবানীপুর ৩৲
,, অক্ষয় কুমার বসু হোগলকুড়ে ৩৲

শ্রীযুক্ত বাবু তারক সরকার পটলডাঙ্গা ৩৲
,, ভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়
ভবানীপুর ... ৩৲
,, ত্রিগুণ নাথ চট্টোপাধ্যায়
রামবাগান ... ১৸০
,, শারদা প্রসন্ন গুহ চক্রবেড় ১৸০
,, কৃষ্ণকিশোর নেউগী
কলিকাতা ... ২৲
,, ভোলানাথ ধর প্রেঃ কলেজ ২৲
,, নন্দকৃষ্ণ বসু ঐ ১৸০
,, যোগেশচন্দ্র দে ঐ ১৸০
,, বেহারী কৃষ্ণ বসু শ্যামপুকুর ১৸০
,, দেবেন্দ্রনাথ বসু ইটালি ১৲

মফঃস্বল।

শ্রীযুক্ত বাবু মথুর মোহন ভট্টাচার্য্য
কানপুর ... ২৶
,, শশীভূষণ রায় লক্ষ্মীতলা ।০
,, দুর্গাচরণ ঘোষ কুমিল্লা ১৸৴১০
,, প্রতাপ চন্দ্র ঠাকুরতা বরিশাল ৩৲
রাজা যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় কান্দি ৩৶১০
বাবু গৌর সুন্দর পাঁড়ে বীরভূম ৩৶১০
,, গোপাল চন্দ্র অধিকারী
মেমারি ... ১৵১০
,, কালী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
ত্রিহুত ... ১৸৴
,, দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়
ওনাও ... ১৷৴
,, হরিশ্চন্দ্র, বারাণসী ৩৷৷৴১০
,, তারক চন্দ্র সেন মরেলগঞ্জ ৩৷৵১০
,, বরদা প্রসাদ বাগছি
রামপুরা ... ৩৴০
,, শ্রীনারায়ণ মুনসি ঐ ৩৷৷৶১০
,, শ্যামাচরণ খাঁ ঐ ... ৩৷৷৶১০
,, ললিত চন্দ্র রায় ঢাকা ৩৷৷৶
,, কালীকুমার কর চট্টগ্রাম ৩৸০
,, দীননাথ সিংহ বাঁকিপুর ৩
,, বৈকুণ্ঠ নাথ দে বালেশ্বর ৩৸০

শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র চৌধুরী বীরভুম ৩৷৶
,, রঘুনন্দন লালা দানাপুর ৩৸০
,, আনন্দ চন্দ্র সেন বরিশাল ৩৷৷৴০
,, হরি প্রসন্ন রায় গোবরডাঙ্গা ৩৴
,, ললিতমোহন চৌধুরী
সাতক্ষীরা ... ৩৴
,, হেমচন্দ্র সরকার করঞ্জা ১৷৵
,, তারক নাথ চক্রবর্ত্তী তমলুক ১৵
" আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়
বহরমপূর ... ৩৷৶
,, ক্ষেত্রনাথ রায় ঐ ... ৩৷৶
,, শ্যামাচরণ বসু চোঁয়া ৩৷৵১০
,, রামগোপাল সান্যাল
সম্বলপুর ... ২৲
,, উপেন্দ্র চন্দ্র দত্ত নরাইল ৩৵০
,, কালীকুমার পাল কাপাসিয়া ৩৷৷৴
,, ব্রজনাথ দাস মহারাজপুর ৩৷৵১০
,, কালীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কানপুর ... ১৸৵০
,, হরিশ্চন্দ্র সরকার ছাদড়া ২৵১০
,, গোবিন্দ চন্দ্র চৌধুরী
তাজহাট ... ৩৷৷৶
,, অভয়ানন্দ দাস বরিশাল ৩৷৷১০
,, কীর্ত্তিচন্দ্র রায় আলাহাবাদ ২৷৴
,, মথুরানাথ রায় সিদ্ধকাটী ১৷৷৶
,, কেদার নাথ দাস বর্দ্ধমান ৩৸
,, কালীরঞ্জন লাহুড়ী পুঁটিয়া ৩৵
লক্ষ্ণৌ এজেণ্ট লক্ষ্ণৌ ১৪৷৶
,, ইন্দ্রনারায়ণ তেয়ারি
মুরাদপুর ... ৩৷৷৶১০
,, যদুনাথ রায় ত্রিপুরা ১৵
,, কালীপ্রসাদ মিত্র ঐ ১৵
,, শ্যামাচরণ মজুমদার
নওয়াখালি ... ১৷৷৶
,, নবীনকৃষ্ণ পালিত আকনা ৩৶
, বৈকুণ্ঠ নাথ দাস চাটনা ৷৷০
,, রাজেন্দ্র চন্দ্র দে কাজলা ৩৷৵১০
,, মিহির চন্দ্র মিত্র হামিরপুর ৷৷৶

শ্রীযুক্ত বাবু রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
হাওড়া ... ২।৶১০
„ কালীকুমার বক্রবর্ত্তী
চট্টগ্রাম ... ।৶১০
„ অন্নদা প্রসাদ দাস
ময়মনসিংহ ১১০
„ ক্ষেত্রপাল সিংহ
বড় জাগুলি ... ৩/১০
„ কুঞ্জবেহারি ঘোষ মোকামে ৩৶
„ মহিমাচন্দ্র ঘটক দিনাজপুর ৩।৶
„ জগন্নাথ দাস মেদনিপুর ২।৵
„ রাজকুমার রায় নরাইল ৩৵
„ শ্যামাচরণ মিত্র আলাহাবাদ ৩১০
„ আশুতোষ ঘোষ মেদিনীপুর ৩১০
C. W. Bolton Esq.
Berhampore ৩॥৶১০
„ সুরেন্দ্র মোহন রায় ঢাকা ৩॥/০
„ দুর্গাগতি মৈত্র সেরাজগঞ্জ ১॥৶১০
„ দিননাথ সোম বারভূম ৩/০
„ হরিকৃষ্ণ মজুমদার খাগড়া ৩৶

শ্রীযুক্ত বাবু জানকী কান্ত রায় নওয়াপাড়া ৩৵
„ ভবানী কিশোর সেন শ্রীহট্ট ৩॥৵
„ চন্দ্র নাথ মৈত্র নাটোর ৩॥/০
„ মাধব চন্দ্র রায় বাগের হাট ৩।৶
„ চণ্ডীচরণ সিংহ জামালপুর ৩।৶
„ রুদ্র প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
কাশীদহ ... ৩৫
„ আনন্দ প্রসন্ন সেন
কামারপুর ... ৩৶
„ দ্বারকানাথ সাণ্ড্যাল
পর্জনা ... ৩॥৶১০
„ কান্তিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বারাসাত ... ৩।৶০
„ নবীনচন্দ্র সেন চট্টগ্রাম ৩।/০
„ হেমচন্দ্র সরকার পাবনা ২
„ গঙ্গানারায়ণ মিত্র বর্দ্ধমান ৩।১০
“ গুরুপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী
ময়মনসিংহ ... ১৮/০
“ হরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুঙ্গের ৩॥০
“ শ্রীকৃষ্ণ মল্লিক মেহেরপুর ৩॥৵১০